ADMINISTRATIVE REFORM

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন

রিপোর্ট

মূল্যঃ ২০·০০ টাকা

মে, ১৯৭৪

ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার অভিশাপে জর্জরিত হবার পর কঠোর ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতা, নিপীড়ন ও শোষণের মধ্যেও এদেশের জনগণ কখনও উন্নত ও মহৎ জীবনের স্বপ্ন ত্যাগ করেননি। এক সমৃদ্ধ, আনন্দময় জীবন সৃষ্টির জন্য তাঁরা নিরন্তর শ্রমে রত থেকেছেন, বারবার সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন। অবশেষে স্বাধীনতার নবীন সূর্যের উদয় তাঁদের নবজীবন সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনার তোরণ দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

এই নবজীবন সৃষ্টির অন্যতম চাবিকাঠি যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিহিত সে সত্য এদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পূর্বেই উপলব্ধি করেন। এজন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের দাবী এদেশের গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের জনসম্পদ বিপুল, প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর, প্রয়োজন এই জনসম্পদের উপযুক্ত শিক্ষার এবং নিজেদের জীবনকে সুন্দর, সুসমৃদ্ধ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাবার যথাযথ দক্ষতা অর্জনের। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের নিষ্ঠুর শোষণের স্বার্থে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে নানা প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ বারংবার এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আজ স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে এই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন তাই জাতির সম্মুখে একটি মৌলিক দায়িত্বরূপে দেখা দিয়েছে।

১৩৭৯ সনের ১১ই শ্রাবণ (১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্দীপ্নাময় উদ্বোধনী ভাষণে কমিশনের সদস্যগণকে বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন যে আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রেখে কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করবেন যা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে শিক্ষা কমিশনের সভাপতির নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত ভ্রমণ করেন। প্রায় এক মাস ব্যাপী এই সফরে তাঁরা ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই সফরের সুব্যবস্থা ও সহৃদয় আতিথেয়তার জন্য ভারত সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারসমূহ এবং সেখানকার শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সরকারী প্রস্তাবের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন আমরা অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করি। এই রিপোর্ট গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সংস্থা, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষাবিদ এবং নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরিত হয়। প্রশ্নমালাটি সংবাদপত্র মারফতও প্রচারিত হয়। এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত জবাবগুলি কম্পিউটার দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বহু শিক্ষাদরদী

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের কাছে বিস্তারিত স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। তদুপরি স্বাধীনতা-উত্তর-কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা সম্পর্কে যেসব নিবন্ধ, সমালোচনা ও প্রস্তাবনা প্রকাশিত হয়েছে তাও আমরা পর্যালোচনা করেছি। এসব প্রশ্নমালার জবাব, স্মারকলিপি, পত্র-পত্রিকা, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাদরদীদের আলোচনা থেকে আমরা বহু মূল্যবান অভিমত ও প্রস্তাব পেয়েছি। যাঁরা কমিশনের কাজে এভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকেই আমরা ধন্যবাদ জানাই।

জনমত যাচাইয়ের অন্যতম পন্থা হিসাবে এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা দেশের প্রত্যেকটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করি। এ সময় আমরা সর্বস্তরের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার এবং অধ্যাপকগণের সংগে বৈঠকে মিলিত হই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও বহু সাধারণ কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সংগে এবং অন্যান্য স্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংগে আলাপ-আলোচনা করি। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথেও আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে শিক্ষাদরদী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনা সভায় তাঁদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হই। এসব সফর থেকে আমরা বহু মূল্যবান ইঙ্গিত পাই ও শিক্ষা সংক্রান্ত ধ্যানধারণার সংগে পরিচিত হই, শিক্ষায়তনগুলির বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করি এবং গণসংযোগ ও জনমত যাচাইয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করি। এসব অভিজ্ঞতা এ রিপোর্ট প্রণয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

আমাদের আভ্যন্তরীণ পরিভ্রমণ সফল করার জন্য শিক্ষা বিভাগের অফিসারবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মচারীরা, বিভিন্ন জেলা প্রশাসক, মহকুমা প্রশাসক ও অন্যান্য অফিসারেরা এবং স্থানীয় শিক্ষাব্রতী ও নেতৃবৃন্দ অকুণ্ঠ সহযোগিতা দান করেন এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। আমরা তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

কমিশন গভীর চিন্তা, দীর্ঘ আলোচনা ও বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণের পর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রায় চারশ জন সদস্য সম্বলিত ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাবিদ ও সুধী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে সহায়তা করেন। বিভিন্ন অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির সদস্যবৃন্দ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা ঋণী।

বর্তমান রিপোর্টে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন সম্পর্কে আমরা যথাসম্ভব সুস্পষ্ট দিক নির্দেশের চেষ্টা করেছি এবং নির্দেশিত লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের প্রস্তাবনাও করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, সর্বস্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাদরদী এবং দেশের গণমানুষ শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে যে মৌল আশা ও আকাঙ্খা পোষণ করেন তা আমাদের এই রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নানাবিধ জটিল, ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। এ প্রেক্ষিতে আমরা যেসব সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেগুলির উপরে বিশেষ জোর দিয়েছি এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ দুর্বলতা ও দোষত্রুটি দূরীকরণের পন্থা নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছি।

শিক্ষা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির একটা নিজস্ব মতামত রয়েছে। আমরা দেখেছি, শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত, কিন্তু এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার উপায় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব প্রস্তাব সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে আমরা সেগুলিই গ্রহণ করেছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে দুর্যোগ বিরাজ করছে তার আশু নিরসন প্রয়োজন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে। অতএব আমরা আশা করি আমাদের প্রস্তাবাবলী সরকার

আশু বিবেচনা করে বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা গ্রহণ করবেন। এ উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বাস্তবায়ন সংস্থা গঠন অত্যাবশ্যক। সত্বর কারিকুলাম কমিটি গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কমিশনের প্রস্তাবাবলীর বাস্তব রূপায়ণের জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে কমিশনের পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী নানাভাবে আমাদের সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন। আমরা তাঁকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষা কমিশনের অফিসারবৃন্দ ও অফিসের কর্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা

মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	এম, ইউ, আহমেদ	মাহ্‌মুদ মোকার্‌রম হোসেন
মোহাম্মদ নূরুস্‌ সাফা	এম, আবদুস সাত্তার	কবীর চৌধুরী
আবদুল হক	আনিসুজ্জামান	নূরুল ইসলাম
শামসুল ইসলাম	আ, মু, জহুরুল হক	সিরাজুল হক
বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান	মুহম্মদ নূরুল হক
মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ	হেনা দাস	মোঃ আশরাফ উদ্দিন খান

তারিখঃ ৩০শে মে, ১৯৭৪ সাল।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১ :	শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী	১
অধ্যায় ২ :	চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন	৫
অধ্যায় ৩ :	কর্ম অভিজ্ঞতা	১০
অধ্যায় ৪ :	শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান	১৩
অধ্যায় ৫ :	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার	১৬
অধ্যায় ৬ :	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	২০
অধ্যায় ৭ :	প্রাথমিক শিক্ষা	২৩
অধ্যায় ৮ :	মাধ্যমিক শিক্ষা	২৯
অধ্যায় ৯ :	বৃত্তিমূলক শিক্ষা	৪১
অধ্যায় ১০ :	ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা ..	৫০
অধ্যায় ১১ :	মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা	৫৭
অধ্যায় ১২ :	শিক্ষক শিক্ষণ	৬০
অধ্যায় ১৩ :	উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা	৮৩
অধ্যায় ১৪ :	ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা	১০৩
অধ্যায় ১৫ :	বিজ্ঞান শিক্ষা	১০৮
অধ্যায় ১৬ :	কৃষি শিক্ষা	১১২
অধ্যায় ১৭ :	চিকিৎসা শিক্ষা	১১৮
অধ্যায় ১৮ :	বাণিজ্য শিক্ষা	১৩৮
অধ্যায় ১৯ :	আইন শিক্ষা	১৪৫
অধ্যায় ২০ :	ললিত কলা শিক্ষা	১৫৬
অধ্যায় ২১ :	পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি	১৬৩

পৃষ্ঠা।

অধ্যায় ২২ : শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা ১৭৬

অধ্যায় ২৩ : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা .. ১৮৮

অধ্যায় ২৪ : নারী শিক্ষা ১৯৬

অধ্যায় ২৫ : বিশেষ শিক্ষা : শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য, বিশেষ মেধাবীদের জন্য। ১৯৯

অধ্যায় ২৬ : স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা ২০৩

অধ্যায় ২৭ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ২০৮

অধ্যায় ২৮ : শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ২১১

অধ্যায় ২৯ : শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ ২২৮

অধ্যায় ৩০ : গ্রন্থাগার ২৩২

অধ্যায় ৩১ : শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান ২৪৮

অধ্যায় ৩২ : ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান ২৫৬

অধ্যায় ৩৩ : ছাত্র কল্যাণ ও জাতীয় সেবা ২৬০

অধ্যায় ৩৪ : শিক্ষা প্রশাসন ২৬৪

অধ্যায় ৩৫ : শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান ২৮২

অধ্যায় ৩৬ : পরিশেষ ২৯৩

পরিশিষ্ট :

(ক) শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাব প-১

(খ) অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটিসমূহ প-৫

(গ) শিক্ষা কমিশনের অফিসারবৃন্দ প-২৭

(ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প-৩১

(ঙ) জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা প-৩৫

(চ) প্রশ্নমালার জবাব বিশ্লেষণ প-৫৭

(ছ) প্রস্তাবিত শিক্ষা মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠান চার্ট

(জ) প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষাপরিদপ্তর চার্ট

অধ্যায় ১

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

১.১. শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাংখা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়।

১.২. **দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্বঃ** প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই তার নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে। এই দেশপ্রেম বলতে কোন অস্পষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ অনুভূতির কথা বুঝায় না, বাংলাদেশের আদর্শের যথার্থ উপলব্ধির কথাই বুঝায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে, জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধ করা, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী হওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা পোষণ করা। দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। সে অনুভব করবে যে সে দেশের একজন, যেমন সে তার পরিবারের একজন। সে আরও অনুভব করবে যে দেশের ভাগ্যে ভালমন্দ যা কিছুই ঘটে তা যেন তার নিজের ভাগ্যেই ঘটছে।

সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং সমাজের প্রগতিশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ, আশা-আকাঙ্খা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণচেতনায় দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ক) **জাতীয়তাবাদঃ** ইতিহাস, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের জ্ঞান, সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সম্বৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক বাংলাভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে। গোষ্ঠীচেতনার ঊর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সকলের জন্য একই পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(খ) **সমাজতন্ত্রঃ** সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সেজন্য সমাজের চেতনা জগতেও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জনগণের মনে সেই সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত করা শিক্ষানীতির লক্ষ্য বলে স্থির করতে হবে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক শর্তরূপে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় দৃষ্টিকোণ হতে নাগরিকতাবোধ ও অধিকারবোধের সঙ্গে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণার্থে জ্ঞান আহরণ ও নৈপুণ্য অর্জন এবং জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(গ) **গণতন্ত্রঃ** গণতন্ত্রে সমাজের সকলের সমান অধিকার ও কর্তব্য সর্বজনস্বীকৃত। এই অধিকারের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করা দরকার। মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানবসত্তার মর্যাদাবোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কিভাবে নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও সঠিক ধারণা সকল শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীদের মনে জাগ্রত করা প্রয়োজন।

(ঘ) **ধর্মনিরপেক্ষতাঃ** রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করেছে। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৩. **মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্বঃ** জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে শোষণহীন নূতন সমাজ সৃষ্টির মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিশ্বের সকল সংগ্রামী মানুষের প্রতি বন্ধুত্ব ও একতার হস্ত প্রসারিত করতে হবে। মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

১.৪. **নৈতিক মূল্যবোধঃ** শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পাঠক্রমে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশে তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষকতায় যাতে বহু প্রত্যাশিত উচ্চ নৈতিকমানের সৃষ্টি হয় সেজন্য সত্যিকার পাণ্ডিত্য ও নিপুণ শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষকদেরকে সততা, নিরপেক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম এবং ছাত্রদের প্রতি প্রকৃত দরদও অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে কল্পনা, উদ্যম ও সাহসিকতার প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ক্ষেত্রে এই সকল গুণাবলী উন্মেষের জন্য আমাদের অবশ্যই ব্রতী হতে হবে।

১.৫. **সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষাঃ** দীর্ঘদিনের শোষণ জর্জরিত সমাজে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা-লাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান দ্বারা জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তার বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টিরও বন্দোবস্ত করতে হবে। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী, আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১.৬. **প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষাঃ** দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির বিশাল দায়িত্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার। আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম, আমাদের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে। জাতি হিসাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন এই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের

ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক পুঁজি বিশেষ বলে জনসাধারণের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসও সূচিত হয়। প্রধানত একটি দেশের সকল স্তরের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজনের ফলেই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব হয়। সে অগ্রগতিকে দ্রুততর করে তোলার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের বিপুল জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্যভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের সেই শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতাদানের সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়। কৃষির ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির যথা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হলে, কৃষি ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলতে হলে, শিল্পক্ষেত্রে নতুনতর ও সার্থকতর উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভবপর করে তুলতে হলে, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি ও বাণিজ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণকে ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। এক কথায় শুধু প্রশিক্ষণদান নয় এইসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী ধী, কল্পনা ও উচ্চমানের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগাবার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে।

১.৭. জাতি হিসাবে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে হাতের কাজের প্রতি অনীহা এবং কায়িক শ্রমের মর্যাদাদানে কুণ্ঠাবোধ। এ মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়নকর্ম মন্থরগতি হতে বাধ্য। এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১.৮. সংক্ষেপে বলা যায় যে কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন একদিকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সঙ্গে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে, তেমনি অন্য দিকে কৃষি, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে। যে সব বয়স্ক কর্মজীবি ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাঁদেরও শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমদক্ষতা ও মানসিক গুণাবলীর উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে।

১.৯. **নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা:** পরাধীনতার যুগে যেভাবে অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতা লালন করা হত, সে অবস্থার দ্রুত অবসানের প্রয়োজন। নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়—উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদা দান এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.১০. সর্বতোভাবে আমাদের শিক্ষানীতিকে গতিশীল করতে হবে। সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

সারাংশ

শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্খা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাঁদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। তদুপরি শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় মূল-নীতি চতুষ্টয়ের সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় নীতিমালা চতুষ্টয়ের যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়ঃ

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা, প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা। (১.১.—১.১০.)

অধ্যায় ২

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন

২.১. যে-কোন শিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সংস্কারের ফলে যদি বাংলাদেশের জনসাধারণ, শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি না হয়, তবে এ' সংস্কারের নির্ধারিত সুফল লাভ করা যাবে না।

২.২. ব্যাপক অর্থে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রই হল তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। তার সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যজ্ঞান, তার সুশৃংখল আচরণ এবং দেশসেবাকে আত্ম-স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মনোবৃত্তি, এ সবই তার ব্যক্তিত্বের মূলকথা। শিক্ষাদানকালে তাঁর মধ্যে এ সমস্ত গুণ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে, যেন এ সকল আদর্শ অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করা তার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

২.৩. তাই শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার পরিবেশ, পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। অপরিচ্ছন্ন ও নিষ্প্রাণ পরিবেশে শিক্ষার্থীর মনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় শক্তি সম্পর্কে গর্ববোধ সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য শিক্ষাগৃহ, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ স্বল্প ব্যয়ে তৈরী হলেও এগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় করতে হবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও ভবনাদি এভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সামান্য প্রচেষ্টা ও খরচের প্রয়োজন হয় কিন্তু এর ফলে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে তার মূল্য অপরিসীম।

২.৪. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে মানুষের মৌলিক গুণাবলী বিশেষত ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার ও জাতীয় জীবনে স্মরণীয় অবদান ইত্যাদির দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলীর বিবরণ এবং শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিকদের জীবন কাহিনী সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমরা যে আদর্শ বাস্তবায়নে ব্রতী হয়েছি, এ সমস্ত ঘটনাবলী ও জীবনকথা সেই আদর্শ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্টবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচীতে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.৫. শিক্ষার্থীর মনে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও সাধারণ সততাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা দল, সমিতি ও ক্লাব গঠন করে এগুলি পরিচালনা করবে যেন তারা নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ পায়। এ ব্যাপারে শিক্ষকগণ তাঁদের পরিচালনামূলক কর্তব্য পালনের সময়ে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে উৎসাহ দিবেন এবং তাদের কাজের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ছোটখাট সাধারণ তহবিল গঠন করে পরিচালনার ভার শিক্ষার্থীর হাতে দিতে হবে, এ সব তহবিলের অর্থ কি কাজে ব্যয় করা হবে তা শিক্ষকদের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা স্থির করবে। এ সব তহবিল পরিচালনার ব্যাপারে যারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাবে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষার্থীর কর্তব্যবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার উপর বেশী জোর দিতে হবে। তদুপরি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে সততা ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া ধার নেবার ব্যবস্থাযুক্ত উন্মুক্ত গ্রন্থাগার প্রবর্তন করা এবং শিক্ষার্থীদের আচরণের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে "সম্মান বিধি" প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২.৬. শিক্ষার্থীকে সমাজ-সচেতন করে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজের ধারা, মানুষের জন্য সমাজ যে সমস্ত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে সেগুলি এবং সমাজ শাসনের পদ্ধতি বুঝতে পারে তজ্জন্য বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতেই প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সংস্পর্শে শিক্ষার্থীদের আনা প্রয়োজন যাতে এর মাধ্যমে তারা সমাজ-সচেতন হয় এবং সমাজের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। সমাজের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যে সাধারণ নাগরিক অধিকার ভোগ করে তার প্রয়োজনেই অন্যান্যদের কাজের গুরুত্ব তাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং তাদের সহযোগিতার মনোভাবও সৃষ্টি করতে হবে।

২.৭ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে খেলাধুলোর ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করতে হবে। এভাবে তার ভিতর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সমবায় ভিত্তিক প্রচেষ্টা এবং সৎ নেতৃত্বের চেতনাবোধ জাগাতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে, সেজন্য এ কর্মসূচীতে এমন সব খেলাধুলোর উপর জোর দিতে হবে যাতে বাঞ্ছিত টীম বা দলীয় মনোভাব গড়ে ওঠে।

২.৮. শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে কোন বিদ্যালয়ই এ ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করতে পারবে না। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম, যেখানে শিক্ষার্থীদের বসবার স্থান, সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষার উপকরণ অপর্যাপ্ত, যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান গতানুগতিক অথবা যেখানে পরিচালনা দুর্বল, শৃঙ্খলা শিথিল, সে বিদ্যালয়ে এমন সব শিক্ষার্থী তৈরী হবে যারা অত্যন্ত নিম্নমানের হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন স্থান হতে হবে যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ শুধু পরিশ্রমই করবেন না, অধিকন্তু কাজের মাধ্যমে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ, সময়ানুবর্তিতা ও অপরের জন্য কষ্ট স্বীকারের মতো সমস্ত গুণের আদর্শ স্থাপন করবেন। কোন বিদ্যালয় এই লক্ষ্য কতখানি অর্জন করবে, তা নির্ভর করবে সে বিদ্যালয়ের প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার উপর। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। সুতরাং শিক্ষকদের নিয়োগের বেলায় এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র যোগ্যতার উচ্চমান ও কঠোর পরিশ্রম সুনিশ্চিত করার জন্য যে সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে ব্যবস্থার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২.৯. আমাদের শিক্ষিত সমাজের কায়িক শ্রমের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা একটি কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। সুতরাং সর্বস্তরে লোকের মধ্যে, বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে, কায়িক শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি ও প্রশংসাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। অনতিবিলম্বে আমাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে এমন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদা এবং প্রশংসাবোধ জাগ্রত হয়। এজন্য সকল শিক্ষার্থীকে নিয়মিত কায়িক শ্রমের কাজে লাগাতে হবে। অবশ্য শিক্ষার্থীদের শারীরিক সামর্থ অনুসারে কায়িক শ্রমের ধারা ও পরিমাপের তারতম্য নির্ভর করবে। কেবল চরিত্র গঠনের জন্য নয়, শ্রমশীল হওয়ার জন্য এবং কঠিন কাজ সম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও শিক্ষার্থীদের সমগ্র শিক্ষাজীবনে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা লাভের কর্মসূচী দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন।

২.১০. উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ কার্যকর করতে হলে নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত সুদক্ষ শিক্ষকবৃন্দ এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাদানের অন্যান্য উপকরণ অত্যাবশ্যক।

২.১১. শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাব্যবস্থাই যে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে পারে তা নয়। গৃহ, পরিবার এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশই শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে বিদ্যালয় এবং তার পরিবেশের প্রভাব শিশুর চরিত্র গঠনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। বস্তুত বিদ্যালয়, পরিবার, বৃহত্তর সমাজ ইত্যাদি শিশুর মনোবৃত্তি ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। সাধারণত বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে শিশু অন্তত পাঁচ বছর তার বাড়ীর পরিবেশে অতিবাহিত করে, বাড়ীর নৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব তার উপর পড়ে। বাড়ীর পরিবেশে তার মৌলিক অভ্যাস ও মনোবৃত্তি রূপ নিতে আরম্ভ করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃ স্থানীয় সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করে। এখানে তারা বিদ্যালয় ও পরিবার উভয়েরই বাইরে নানা ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে আসে এবং সমাজের আদর্শ, আচার-ব্যবহার ও মনোবৃত্তি তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়।

২.১২. উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে পিতামাতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকার শিক্ষার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে যেখানে শতকরা আশি ভাগেরও বেশী লোক নিরক্ষর, সেখানে অধিকাংশ বালক-বালিকার পিতামাতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকাকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য অর্জন খুবই কষ্টসাধ্য। সুতরাং আশু ফললাভের জন্য বয়স্ক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছেলে-মেয়েদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পিতামাতাকে ওয়াকিফহাল করে তোলা। পিতামাতা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া হলে বালক-বালিকাদের উপর তাঁদের প্রভাব সুস্থ এবং সংগত চরিত্র গঠনের অনুকূল হবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, আহার-নিদ্রার ব্যাপারে নিয়ম মেনে চলা, মিথ্যা ভাষণ ও মিথ্যা অংগীকার পরিহার করা, নিয়মানুবর্তিতা, সদাচার ও সত্য ভাষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোর দিতে হবে। পিতামাতার উচিত ছেলেমেয়েদের গৃহস্থালীর ছোট-খাট কাজ করতে উৎসাহিত করা। তাঁদের উচিত যা অন্যায় তা বুঝিয়ে বলে তা থেকে ছেলেমেয়েদের নিবৃত্ত করা এবং ন্যায়সংগত কাজ করতে আগ্রহান্বিত করে তোলা। ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির বদলে স্নেহ, দৃঢ়তা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা পিতামাতাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের অধিকাংশ স্তরে অসাধুতা পরিব্যপ্ত থাকলে শুধু শিক্ষার্থীর জীবনে সততা ও ন্যায়নীতির বিকাশ-সাধনের প্রয়াস বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে না।

২.১৩. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ-আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। এর প্রধান লক্ষ্য হবে জাতীয় ঐতিহ্যে গর্ববোধ করা, জাতির বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী হওয়া, তার ভবিষ্যত সম্পর্কে আস্থা পোষণ করা এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই যে সাধ্যানুযায়ী জাতির উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে তা বিশ্বাস করা। জাতীয়তাবোধের বিকাশ-সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য হবে যেন সেই সঙ্গে বিশ্বনাগরিকত্বের শিক্ষাও উপেক্ষিত না হয়, যেন সকলের প্রতি মৈত্রীর মনোভাব, মানবিক সৌহার্দ ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোবৃত্তিও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে।

২.১৪. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। নাগরিকতাবোধের বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীর মনে শুধু অধিকার নয়, বরং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ এবং সততা, ন্যায়নীতি, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মনে সুন্দর সুসমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গতানুগতিক ভঙ্গীতে নীতিবাচক নির্দেশাবলীর দ্বারা এ মূল্যবোধ জাগানো যায় না বরং আকর্ষণীয় গল্পমালা ও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার পরিসরে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মনে নৈতিক মূল্যবোধ ও নাগরিকতাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

২.১৫. শিক্ষার্থীদের চরিত্র জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর করে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনাদি গ্রহণের এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হবে। আমাদের আকাঙ্খিত

আদর্শসমূহ বাস্তবায়িত করতে হলে বিদ্যালয়, বাড়ী ও সমাজকে অবশ্যই একযোগে কাজ করতে হবে। তাই বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাড়ী ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীর জীবনে কোনটির প্রভাব কোনরূপ অসামঞ্জস্য সৃষ্টি না করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

২.১৬. শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ মহৎ কাজে শিক্ষকের পূর্ণ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক তাঁর ছাত্রের ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন, কারণ শিক্ষার্থীদের চরিত্রেই সার্বিকভাবে দেশের জনসাধারণের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটবে। সুতরাং শিক্ষককে আচার, আচরণে, শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রশিক্ষণে ও কর্মদক্ষতায় আদর্শস্থানীয় হতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শুধু শিক্ষককে নয় দেশের সকল দায়িত্বশীল নাগরিককে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগঠন

সারাংশ

১। শিক্ষা কর্মসূচীতে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার পরিবেশ, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাদান পদ্ধতি, খেলাধুলার ব্যবস্থা ইত্যাদি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ, নিরপেক্ষতা, কর্তব্যজ্ঞান, সুশৃংখল আচরণ এবং দেশসেবাকে আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মনোবৃত্তি, এ সমস্ত গুণসৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। (২.১.—২.৩.)

২। বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্টবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচীতে এ ধরনের বিষয়-বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মনে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও সাধারণ সততাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা সমিতি ও ক্লাব গঠন করে এগুলি পরিচালনা করবে যেন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ পায়। (২.৪.—২.৫.)

৩। শিক্ষার্থীকে সমাজ-সচেতন করে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে সমাজের ধারা, মানুষের জন্য সমাজ যে সমস্ত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে সেগুলি এবং সমাজ শাসনের পদ্ধতি বুঝতে পারে তজ্জন্য বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (২.৬.)

৪। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে খেলাধুলার ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করতে হবে। এর মাধ্যমে তার ভিতর নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা, সহযোগিতা, সমবায় ভিত্তিক প্রচেষ্টা এবং সুনেতৃত্বের চেতনাবোধ জাগ্রত করতে হবে। (২.৭.)

৫। চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে কোন বিদ্যালয়ই এ ভূমিকা কার্যকর ভাবে পালন করতে পারবে না। কোন বিদ্যালয় এই লক্ষ্য কতখানি অর্জন করবে, তা নির্ভর করবে সে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার উপর। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। (২.৮.)

৬। আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি বড় ত্রুটি হচ্ছে কায়িক শ্রমের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মনোভাব। অনতিবিলম্বে আমাদের শিক্ষাক্রমের এমন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মনে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদা এবং প্রশংসাবোধ জাগ্রত হয়। এজন্য সকল শিক্ষার্থীকে নিয়মিত কায়িক শ্রমের কাজে লাগাতে হবে। (২.৯.)

৭। একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাব্যবস্থাই যে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে পারে তা নয়। বাড়ী, পরিবার এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশই শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পিতামাতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকার শিক্ষার এবং ভূমিকার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি দেশের সকল দায়িত্বশীল নাগরিককে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে। (২.১০.—২.১৫.)

৮। শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ মহৎ কাজে শিক্ষকের পূর্ণ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। (২.১৬.)

অধ্যায় ৩

কর্ম অভিজ্ঞতা

৩.১. সাধারণত কর্ম অভিজ্ঞতা বলতে যে-কোন উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ বুঝায়, সে কাজ বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, খামারে, কারখানায় অথবা যে-কোন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সম্পন্ন করা হোক না কেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্ম-অভিজ্ঞতার লক্ষ্য হল শিক্ষার সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধন। কর্ম অভিজ্ঞতা শিক্ষার শুধু একটি বড় হাতিয়ারই নয়, বরং এর সাহায্যে মননশীল কাজ ও হাতের কাজের মধ্যে বর্তমানে যে অনভিপ্রেত দুস্তর সামাজিক বিভেদ বিরাজ করছে তাও দূর করা সম্ভব।

৩.২. আমাদের দেশে সুদীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক, পুথিসর্বস্ব ও কর্ম অভিজ্ঞতা বিবর্জিত শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিকৃত মূল্যবোধ ও শ্রম-বিমুখ মনোভাব বিদ্যমান। তাই শৈশব কাল থেকেই যাতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা শ্রমকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে শেখে, সে বিষয়ে জাতিকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এমনভাবে করা দরকার যাতে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সুষ্ঠু কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে শ্রমের প্রতি শুধু মর্যাদাবোধই জাগ্রত হবে না, বরং তারা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার প্রেরণা লাভ করবে।

৩.৩. আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা এবং যাঁরা সাধারণভাবে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত নন এমন ব্যক্তিরা সামান্য কায়িক কাজের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল। এ পরিস্থিতি শুধু যে পেশাগত নৈপুণ্য নষ্ট করে তা নয়, এতে কতকগুলি কাজ বিশেষ বিশেষ একশ্রেণীর লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবার একটি সামাজিক প্রথার সৃষ্টি হয়। এরূপ অবাঞ্ছিত সামাজিক প্রথা কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। কোন পেশা অন্যান্য পেশা থেকে নিকৃষ্ট এরূপ ধারণা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অনিবার্য কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরনের পেশা ও ব্যবসায় গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমের মধ্যেও তারতম্য ঘটে থাকে। স্বাভাবিকভাবে কতিপয় কাজ অন্যান্য কাজের চেয়ে কম আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে বর্তমান শিল্প কারিগরি কর্মোদ্যোগের যুগে আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হলে হস্ত-শিল্পী, কারিগর, শ্রমিক, সবাইকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি প্রগতিশীল জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪. আমাদের নিজস্ব আদর্শকে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগের দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে এ লক্ষ্যের বাস্তবায়নের উপযোগী করতে হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে অংশত তা করা যেতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন বৃত্তির প্রতি তরুণদের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্রমে সাধারণের অবজ্ঞার ভাবের পরিবর্তন আশা করা যায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে কর্মের এই অভিজ্ঞতা-অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

৩.৫. প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে একটি নিয়মিত কার্যসূচীর মারফতে কোন-না-কোন ধরণের কায়িক শ্রমের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করবেন এবং তাদের কার্যসূচী তদারক করবেন।

প্রাথমিক শ্রেণীতে হালকা ধরনের হাতের কাজ প্রবর্তন করা দরকার যাতে হাতের ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের আবেগগত ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিদ্যালয় ভবন নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং অনুরূপ কাজ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং সমাজ-উন্নয়নমূলক কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করবে। কর্মভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও সৃজনী শক্তি বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চাষাবাদের কাজেও তারা অংশগ্রহণ করবে। ফসল তোলার মৌসুমে বিদ্যালয় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা এবং সে অনুযায়ী বিদ্যালয়ের কার্যকাল নির্ধারণ করা উচিত হবে যাতে এ মৌসুমে পরিবারের সকল সদস্য এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পায়। অনুরূপভাবে তারা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেও কাজ করবে। আমাদের শিক্ষা প্রকল্পের সর্বস্তরে কর্ম-অভিজ্ঞতার কার্যসূচীকে কৃষি এবং শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের জন্য অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে উপযুক্ত কর্ম-অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩.৬. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যও কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ ছুটির সময়ে নানাবিধ জনহিতকর প্রকল্পে যোগদান করবে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের ছুটিতে এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বেশীর ভাগ কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাতে হবে। এদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অন্তত তিন মাস কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এ কাজ বহুবিধ হতে পারে, যথাঃ কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্যাম্পে নানা ধরনের কাজ—ম্যালেরিয়া নিরোধ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গঠনমূলক কাজ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রীরা নার্সিং, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা এবং অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩.৭. শিক্ষার্থীদের জন্য কায়িক কর্মের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপর অর্পণ করতে হবে। তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ও জাতীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনার কাজ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা ও তদারক করবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী এ সবের রদবদল করবেন।

৩.৮. কর্ম-অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবেঃ (ক) একটি ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে কর্ম-অভিজ্ঞতার ক্রম সম্প্রসারণ, (খ) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, তথা মাল-মসলা, সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি (গ) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ।

৩.৯. শ্রমের প্রতি নতুন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির জন্য শিক্ষাঙ্গনের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে শ্রম সম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলির নিরসন হয়। যে সকল ব্যক্তি অফিস-আদালত, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরিরত এবং যাঁদের কোন প্রকার কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হয় না তাঁদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তাঁরা প্রায়শঃ কর্তব্যের বাইরে কোন না কোন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।

৩.১০. জনসাধারণের নিকট শ্রমিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন মারফত জাতীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং তা প্রচার করা প্রয়োজন এবং অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকদের জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যদি আমরা আমাদের শ্রমিকদের কাজের মর্যাদা দিই তা'হলে তারাও অন্যান্যদের কাজের গুরুত্ব এবং তাদের মর্যাদা উপলব্ধি করবে।

কর্ম অভিজ্ঞতা

সারাংশ

১। আমাদের দেশে পুঁথিসর্বস্ব ও কর্ম অভিজ্ঞতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকার ফলশ্রুতিরূপে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিকৃত মূল্যবোধের দরুণ শ্রম-বিমুখ মনোভাব বিদ্যমান। শিক্ষিত লোকেরা এবং সাধারণভাবে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত নন এমন ব্যক্তিরা সামান্য কায়িক শ্রমের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল। কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষার একটি বড় হাতিয়ার এবং এর সাহায্যে মননশীল কাজ ও হাতের কাজের মধ্যে বর্তমানে যে অনভিপ্রেত দুস্তর সামাজিক বিভেদ বিরাজ করছে তাও দূর করা সম্ভব। তাই শৈশবকাল থেকেই যাতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা শ্রমকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে শিখে, সে বিষয়ে জাতিকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এমনভাবে করা দরকার যাতে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সুষ্ঠু কর্ম-ভিত্তিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে শ্রমের প্রতি শুধু মর্যাদাবোধই জাগ্রত হবে না বরং তারা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার প্রেরণাও লাভ করবে। (৩.১.—৩.৬.)

২। শিক্ষার্থীদের জন্য কায়িক কর্মের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপর অর্পণ করতে হবে। (৩.৭.)

৩। কর্ম-অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবেঃ (ক) একটি ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে কর্ম-অভিজ্ঞতার ক্রম সম্প্রসারণ, (খ) প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, তথা মাল-মসলা, সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি (গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ। (৩.৮.)

৪। শ্রমের প্রতি নতুন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির জন্য শিক্ষাংগনের একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে শ্রম সম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলির নিরসন হয়। (৩.৯.—৩.১০.)

অধ্যায় ৪

শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান

৪.১. জাতীয় ভাষা হচ্ছে জাতির চিন্তা ও সংস্কৃতির আধার, অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ এবং জাতীয়তাবোধ বিকাশের প্রধান উৎস। এই ভাষার সাহায্যে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণ অনুভব, চিন্তা ও কাজ করতে সক্ষম হয়। জাতীয় ভাষা জাতিগত ঐক্যসাধনের সর্বপ্রধান মাধ্যম, জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রধানতম প্রতীক এবং জ্ঞানচর্চা ও দক্ষতা প্রচারের শ্রেষ্ঠ বাহন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সংস্কারকদের নানামুখী চিন্তা, গবেষণা ও কর্মের সুফল শুধু জাতীয় ভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে তা সহজবোধ্য হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের সহজাত বুদ্ধি, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন সহজতর হয়। অধিকন্তু জাতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি শ্রেণীকক্ষের বাইরেও জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রসারে সহায়তা করে। শিক্ষা পদ্ধতিতে ভাষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানের বিস্তার, সংস্কৃতির প্রসার এবং জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি। অতএব আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে অবিলম্বে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সরকারী ঘোষণা বিদ্যমান এবং এর অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তাও সর্বজন স্বীকৃত।

৪.২. আমাদের নিম্নস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলার প্রচলন থাকলেও ঔপনিবেশিক শিক্ষাপদ্ধতির ফলে আজও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চস্তরের শিক্ষাদান করা হয়। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটি বোঝাস্বরূপ এবং এর ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিঘ্নিত হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, বাণিজ্য এবং কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রভূত বাধার সৃষ্টি করেছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণাপ্রসূত জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে আমাদের বিশেষ কোন অবদান নাই। সুতরাং উচ্চস্তরের শিক্ষার মাধ্যমরূপেও অবিলম্বে বাংলা ভাষার প্রচলনের জন্য আমাদের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩. শ্রেণীকক্ষে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং উত্তরপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার এখন থেকে সর্বস্তরে প্রবর্তন করা সম্ভবপর বলে আমরা মনে করি। তবে উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব এ ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়, সে কথা আমরা স্বীকার করি। সেজন্য এ অভাব মোচনের ক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চতর পর্যায়ের বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং অন্যান্য পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় রচিত বই-পুস্তকের অভাব দূরীকরণের ব্যাপারে সরকারকে অধিকতর উদ্যোগী হতে হবে। অন্যপক্ষে এই পর্যায়ের জন্য বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদ এবং মৌলিক পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকেও অধিকতর আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সুপরিকল্পিত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪. এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন আবশ্যক বলেও আমরা বিবেচনা করি। স্কুল পর্যায়ে ভাষা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপিত হয়, কিন্তু আমাদের স্কুলে ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা উচ্চারণ, বানান ও বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে যে উদাসীনতা ও শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়, তা দুঃখজনক। এসব ত্রুটি দূর করা আশু কর্তব্য।

৪.৫. প্রত্যেক দেশে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের নিমিত্ত যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এ প্রযোজ্য। বাংলা ভাষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে চালু থাকবে।

৪.৬. আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দানের অর্থ এই নয় যে আমাদের জাতীয় জীবনে অন্য কোন ভাষার প্রয়োজনীয়তা নাই। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম

হিসাবে প্রবর্তনের পরও আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিখবার প্রয়োজন থাকবে। আমাদের মতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় হতে শুরু করে প্রাথমিক পর্যায়ের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একটি উন্নত আধুনিক বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত উত্তমরূপে শিখতে হবে। এই ভাষা ইংরেজী, আরবী, ফরাসী, রুশ, জার্মান, জাপানী, চীনা ইত্যাদি যে কোন একটি হতে পারে। তবে ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশ যা তাতে ইংরেজীই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বর্তমানে অব্যাহত থাকবে।

৪.৭. বর্তমান পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে ইংরেজী হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক লোকের ব্যবহৃত ভাষা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথ্য বিনিময় এবং লেনদেনের ব্যাপারে ইংরেজীর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ইংরেজী ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডারে নতুন নতুন জ্ঞানের প্রতিনিয়ত সংযোজন ঘটছে এবং প্রতি বছর অসংখ্য পুস্তক ও উচ্চ শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত তথ্যাদিও ইংরেজী পুস্তক-পত্রিকায় স্থান পাচ্ছে। ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর সবর্ত্র এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছে যে বর্তমানে তা প্রত্যেকটি মহাদেশে প্রচলিত রয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী এমন মর্যাদা লাভ করেছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

৪.৮. ষষ্ঠ শ্রেণী হতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে ইংরেজী অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা যেন এ ভাষায় লিখিত উচ্চতর পর্যায়ে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পড়ে জ্ঞান আহরণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য অপেক্ষা ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ভাবের আদান প্রদানের বাহন হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা করতে হবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই শিক্ষাদান করতে হবে। ভাষার বিশেষ প্রয়োগ এবং ধ্বনিতত্ত্বের দিকে নজর দিতে হবে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নততর, পাঠ্য-পুস্তকের আধুনিকীকরণ এবং আধুনিক উপকরণাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৯. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স বা তার পরবর্তী শ্রেণীতে বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামিক ষ্টাডিজ কিংবা তুলনামূলক ধর্ম ইত্যাদি বিভাগে অধ্যয়ন এবং গবেষণার প্রয়োজন অনুসারে সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার জন্য প্রয়োজনবোধে ফরাসী, জার্মান, রুশ, চীনা ও জাপানী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা বিভাগ খোলা প্রয়োজন।

৪.১০. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে কোন একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এ পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা যার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে ছাত্র ও শিক্ষক বাংলা বই ছাড়া আর কিছু পড়বে না। বস্তুত শিক্ষার্থীকে এ পর্যায়ে সন্তোষজনক জ্ঞানার্জনের জন্য নানা ভাষার, অন্তত নিজের মাতৃভাষা ছাড়া আরেকটি উন্নত আধুনিক বিদেশী ভাষার বইপত্র পাঠ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তবে উপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ করতে হবে নিজের মাতৃভাষা বাংলায়। এর দ্বারাই জাতির সৃজনশীলতার দ্বার অর্গলমুক্ত হবে।

৪.১১. আমাদের কূটনীতিবিদদের শিক্ষার জন্য, উচ্চতর গবেষণা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে একটি আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। যথাযোগ্যভাবে তার দায়িত্ব পালনের জন্য এ ইনষ্টিটিউটে বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের সর্বাধুনিক বন্দোবস্ত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, কারিগরি ও উচ্চতর পেশাগত শিক্ষার বিভিন্ন দিকে নানা বিদেশী ভাষার পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ এ ইনষ্টিটিউটে থাকবে।

শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষায় বিদেশী ভাষার স্থান

সারাংশ

১। জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে তা শিক্ষার্থীদের সহজবোধ্য হয় এবং এতে তাদের সহজাত বুদ্ধি, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন সহজতর হয়। অধিকন্তু জাতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি শ্রেণীকক্ষের বাইরেও জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রসারে সহায়তা করে। শিক্ষা পদ্ধতিতে ভাষার গুরুত্ব খুব বেশী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানের বিস্তার, সংস্কৃতির প্রসার এবং জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি। অতএব আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে অবিলম্বে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। (৪·১·)

২। বাংলা ভাষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে চালু থাকবে। সরকারী অর্থানুকূল্যে উচ্চ শিক্ষার বই-পুস্তক, বিশেষ করে বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রকৌশল ও বৃত্তিশিক্ষা বিষয়ের বই-পুস্তক বাংলায় প্রণয়ন ও অনুবাদের কাজে অবিলম্বে হাত দিতে হবে। বাংলা-ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়নও আবশ্যক। (৪·২·—৪·৫·)

৩। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তনের পরও আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিখবার প্রয়োজন থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একটি উন্নত আধুনিক বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উত্তমরূপে শিখতে হবে। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশ যা তাতে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অব্যাহত থাকবে। (৪.৬.—৪.৮.)

৪। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স বা তার পরবর্তী শ্রেণীতে বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করবে। (৪·৯·—৪·১০·)

৫। আমাদের কুটনীতিবিদদের শিক্ষার জন্য, উচ্চতর গবেষণা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে একটি আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। (৪·১১·)

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার

৫.১. যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা তার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হারের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। ক্লাশে পাঠদান ছাড়াও শিক্ষককে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর প্রতি বেশ কিছুটা ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে হয়। সম্যক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আত্ম বিকাশের পথে পরিচালিত ও অধিকতর সাফল্য লাভের জন্য উৎসাহিত করতে হয়, তার দোষ-ত্রুটি সংশোধনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিতে হয়, জ্ঞানার্জনে তার অগ্রগতির নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হয়। এমন কি তার আচার আচরণের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হলে শিক্ষকের পক্ষে তার গুরুদায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫.২. এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথা বিবেচনা করা যাক। এই স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মোটামুটি হার ১ঃ৪৭-এর মতো। তদুপরি গ্রামাঞ্চলের প্রায় স্কুলেই দেখা যায় প্রথম শ্রেণীতে একজন শিক্ষকের জিম্মায় একশ' দেড়শ' ছেলেমেয়ে রয়েছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে এতগুলি শিশুকে শিক্ষাদান মোটেই সম্ভব নয়। শহরের বহু প্রাথমিক স্কুলেও দেখা যায় প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে যেখানে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জনের স্থান সংকুলান হতে পারে সেখানে প্রায় ষাট-সত্তর জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলির অবস্থা এতটা খারাপ না হলেও বেসরকারী স্কুলে, যাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার বেশ অসামঞ্জস্য, ১ঃ২০ থেকে ১ঃ৫০-এর মধ্যে। আবার প্রায় বেসরকারী কলেজগুলিতে এ অসামঞ্জস্য বেশ প্রকট, তারা বহুলাংশে ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরশীল বলে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে অত্যন্ত উদার, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে না। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার অসন্তোষ-জনক। এমন বহু কলেজের সন্ধান মিলবে যেখানে ১ঃ১০০ হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত।

৫.৩. বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ হার কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহে কার্যক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে, তবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা যখন এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেন তখন তাঁরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতের সর্বোচ্চ একটা হার নির্ধারণের উপর জোর দেন।

৫.৪. আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার প্রয়োজনীয় মাত্রায় না বাড়ালে শিক্ষা উন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে 'বাঞ্ছনীয় হার' অর্জন আমাদের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। একই সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাবে না, তদুপরি আমাদের সীমিত সম্পদও এর বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হবে। এ কারণে প্রথমত প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার যথাসম্ভব উন্নীত করা হোক। তাতে পরবর্তী পরিকল্পনা কালে 'বাঞ্ছনীয় হারে' উত্তরণের পথ সহজ হবে।

৫.৫. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বর্তমান হার, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় হার এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হারের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

শিক্ষা স্তর।	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বর্তমান হার।	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বাঞ্ছনীয় হার।	প্রথম/পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হারের লক্ষ্যমাত্রা।
১। প্রাথমিক	১:৪৫ থেকে ১:৫০	১:৩৫	১:৪০
২। সরকারী মাধ্যমিক স্কুল।	১:২০ থেকে ১:৩০	১:২০	১:২৫
বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল।	১:২০ থেকে ১:৫০		
বৃত্তিমূলক কোর্স	..	১:২০	১:২৫
৩। কারিগরি ডিপ্লোমা কোর্স	১:১৫	১:১৫	১:২০
৪। কলেজ :			
সরকারী কলেজ	১:২৫ থেকে ১:৩৫	ইন্টার-মিডিয়েট কোর্স। ১:৩০	১:৩৫
বেসরকারী কলেজ	১:৫০ থেকে ১:১০০	পাস, সাব-সিডিয়ারী কোর্স। ১:২৫	১:৩০
		অনার্স কোর্স ১:১৫	১:২০
		পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স। ১:১০	১:১৫
৫। বিশ্ববিদ্যালয়			
(ক) সাধারণ	মোটামুটি হার ১:২৫	মোটামুটি হার ১:১৫	মোটামুটি হার ১:২০
		সাবসিডিয়ারী ১:২৫	১:৩০
		অনার্স ১:১৫	১:২০
		পোষ্ট গ্রাজুয়েট ১:১০	১:১৫
		পোষ্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ। ১:৫	১:৫
(খ) প্রকৌশল		১:১০	১:১০	১:১০
(গ) কৃষি		১:১০	১:১০	১:১০
(ঘ) চিকিৎসা			১:১০	১:১০

৫.৬. বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের কোন ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণের বেলায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উক্ত হার প্রয়োগ করার পূর্বে অনার্স ও সাবসিডিয়ারী/পাস কোর্সের ছাত্র সংখ্যা কিছুটা সংশোধন করে নিতে হবে, কারণ এসব কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষার্থীরা তাদের সময়ের এক তৃতীয়াংশের মত এই ডিপার্টমেন্ট ব্যয় করে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার নির্ণয়ের জন্য সংশোধিত ছাত্র সংখ্যা হবে এ ডিপার্টমেন্টের অনার্স ও সাবসিডিয়ারী পাস কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের মোট শিক্ষার্থীর এক-তৃতীয়াংশ।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার

সারাংশ

যে-কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা তার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হারের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার বিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার প্রয়োজনীয় মাত্রায় না বাড়ালে শিক্ষা উন্নয়নের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। প্রথম জাতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনেই শিক্ষক, শিক্ষার্থীর হার যথাসম্ভব উন্নীত করতে হবে যাতে পরবর্তী পরিকল্পনাকালে "বাঞ্ছনীয় হারে" উত্তরণের পথ সহজ হয়। (৫.১.—৫.৬.)।

অধ্যায় ৬

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

৬.১. জন্ম থেকে প্রথম পাঁচ বছর মানব জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মনোবিজ্ঞানীরা একে জীবনের গঠনমূলক পর্যায় বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে এ বয়সে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক আচরণ ক্রমবর্ধমান ধারায় এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে শিশুর ভবিষ্যত জীবন গড়ে ওঠে। এ জন্যই জীবনের প্রথম অবস্থায় শিশু যেরূপ পরিবেশ ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করে সে পরিবেশ তার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে যায়।

৬.২. গৃহে স্নেহ-বেষ্টনীর মধ্যে মাতাপিতার সান্নিধ্যে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি আদর্শ ব্যবস্থা। কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না বলে বিশ্বের বহু উন্নত দেশে জন্মের কয়েক মাস পর হতে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষায়তনগুলি দু'প্রকার হতে পারে যথাঃ প্রথম পর্যায়ে শিশু ভবন, জন্মের কয়েক মাস পর হতে তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু উদ্যান তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য। এই উভয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদানের জন্য মহিলারাই উপযোগী। এর জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার, যিনি স্নেহ-মমতা দিয়ে শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং তার দুরন্তপনাকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন।

৬.৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে শিশু ভবনের উদ্দেশ্য হলো (ক) পরবর্তী জীবনে শিশুর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করা, (খ) খেলাধুলা এবং আনন্দদায়ক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় অভ্যাস সৃষ্টি করা, (গ) শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন করা এবং (ঘ) ভবিষ্যতে তাকে সুসমঞ্জস ও সুশৃংখল সামাজিক জীবনযাপনের জন্য যথাবিহিত সহায়তা করা। এ সকল ছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু উদ্যানের উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের পূর্বে শিশুদের পঠন প্রস্তুতি ও সংখ্যা পরিচিতি এবং ভালমন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জন করতে শিশুদের সাহায্য করা।

৬.৪. উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্যে শিশু ভবনে শিশুর পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিধানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই উদ্দেশ্যে সময়মত খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম গ্রহণ, খেলাধুলা, ইত্যাদির অভ্যাস সৃষ্টি এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী আচার ব্যবহার শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। শিশু উদ্যানের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য শিশু ভবনের শিক্ষাসূচী ছাড়াও শিশুকে গান, ছড়া, বাংলা অক্ষর ও গণনা, ছবি আঁকা শেখানো, কাপড় পরা, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে শিক্ষাদান করে তাকে আত্মনির্ভরশীল করা প্রয়োজন।

৬.৫. শিশুর এই গঠনমূলক স্তরের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন দরকার। আমাদের দেশে যাঁরা প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের উভয় পর্যায়ে শিক্ষাদান করবেন তাঁদের অন্ততঃ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস হতে হবে এবং এক বছরের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণও নিতে হবে।

৬.৬. উপরে উল্লিখিত প্রশিক্ষণের শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ কমপক্ষে হবে শিশুশিক্ষা পদ্ধতির ব্যবহারিক জ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশু সাহিত্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা, গান-বাজনা, খেলাধুলা, অংকন, হাতের কাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া শিশু ভবনের শিক্ষিকাদের বিশেষভাবে নার্সিং শিক্ষা নিতে হবে যাতে তারা শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োগ

করতে পারেন। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা ছাড়াও শিক্ষিকাকে হতে হবে শিশুদের প্রতি স্নেহ-মমতাশীল, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, উৎসাহী। ভর্তির পূর্বে প্রার্থীদের শিক্ষকতা বৃত্তির প্রতি আসক্তি ও সফল শিক্ষকতার জন্য উপরে বর্ণিত গুণাবলী যাচাই করে নিতে হবে।

৬.৭. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজনমত শিশু ভবন ও শিশু উদ্যান স্থাপন করতে হবে। শহরে ও শিল্পাঞ্চলে বহু পরিবারের মাতাপিতা উভয়কেই প্রয়োজনের তাগিদে কোন না কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। ফলে সেসব পরিবারের স্নেহবঞ্চিত শিশুরা সারাদিন অনাদৃত অবস্থায় ঘরে নিরানন্দ জীবনযাপন করে। পরবর্তীকালে এসব শিশুর অনেকেরই জীবনে এই বিরূপ পরিবেশের অকল্যাণকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতির প্রতিরোধকল্পে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে, প্রধানতঃ শ্রমজীবী সমাজের প্রয়োজনমত শিশু উদ্যান স্থাপন করা যেতে পারে।

৬.৮. বিশ্বের বহু উন্নত দেশে শিশুদের মানসিক, সামাজিক ও দৈহিক উন্নতির দায়িত্বভার সেই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিভাগগুলি যৌথভাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের এই বিশেষ দায়িত্ব স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা দফতর অথবা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থার উপর অর্পণ করা যায়। শিল্পাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের উভয় পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা ও আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনবোধে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দায়িত্ব এবং পরিচালনার ভার স্থানীয় জনসাধারণের উপর বর্তাবে। পরবর্তী-কালে সরকারের স্বাস্থ্য দফতর, সমাজকল্যাণ দফতর ও পরিবার পরিকল্পনা দফতর, কৃষি দফতর এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দফতর ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবর্তক সাহায্যদানে এগিয়ে আসতে হবে।

৬.৯. স্থানীয় প্রয়োজনে জনসাধারণের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশু শ্রেণী খুলে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬.১০. একটি শিশুশিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন হবে। এই ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য হবে শিশুমনস্তত্ব ও শিশুশিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করে দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিশুশিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করা। যতদিন পর্যন্ত পৃথকভাবে এই ইনস্টিটিউট স্থাপন করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে একটি শিশুশিক্ষা বিভাগ খোলা যেতে পারে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

সারাংশ

১। জন্ম থেকে প্রথম পাঁচ বছর হচ্ছে মানবজীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের প্রথম অবস্থায় শিশু যেরূপ পরিবেশ ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করে তা তার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশলাভের পথে স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে যায়। গৃহে স্নেহবেষ্টনীর মধ্যে মাতা-পিতার সান্নিধ্যে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে আদর্শ ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না বলে বিশ্বের বহু উন্নত দেশে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য "শিশুভবন", "শিশু উদ্যান" ইত্যাদি নামে বিভিন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আছে। এ সব শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য হলো শিশুর অভ্যাস, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করা এবং শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন করা। এ সকল ছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে এ সমস্ত শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের পূর্বে শিশুদের পঠন প্রস্তুতি ও সংখ্যা পরিচিতি এবং ভাল মন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জন করতে সহায়তা করা। এসব শিক্ষায়তনে খেলাধূলা ও অন্যান্য আনন্দময় ক্রিয়াকল্যাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলতে থাকে। এর জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার যিনি স্নেহ-মমতা দিয়ে শিশুর দুরন্তপনাকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন এবং তার মনে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন। (৬.১.—৬.৬.)

২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে প্রয়োজনমত "শিশুভবন" ও "শিশু উদ্যান" স্থাপন করা যেতে পারে। শহরে ও শিল্পাঞ্চলে, প্রধানতঃ শ্রমজীবি সমাজের প্রয়োজনমত শিশু-উদ্যান স্থাপন করতে হবে। স্থানীয় প্রয়োজনে জনসাধারণের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশুশ্রেণী খুলে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। (৬.৭.—৬.৯.)

৩। শিশু শিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করে দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিশু শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করা ইত্যাদির জন্য একটি শিশু শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন হবে। এই ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা যতদিন সম্ভব না হয়, ততদিন প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে একটি শিশু শিক্ষা বিভাগ খোলা যেতে পারে। (৬.১০.)

অধ্যায় ৭

প্রাথমিক শিক্ষা

৭·১· আমাদের দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও তার ফল হিসাবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি যে সব পথে আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই প্রাথমিক শিক্ষাই পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য আবশ্যিক ভিত্তি রচনা করবে। এই ভিত্তিভূমিকে দুর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করে গড়া সম্ভব নয়।

৭·২· প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

(১) শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

(২) শিশুর মনে দেশ প্রেম, নাগরিকতাবোধ; কর্তব্যবোধ ও কৌতূহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন।

(৩) মাতৃভাষার লিখন, পঠন ও হিসাব রক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরি ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে যে-সব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতি।

(৪) পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি।

৭.৩. অতীতে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছে। ফলে এই স্তরে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে এবং শিক্ষার ব্যাপক অপচয় ঘটছে। আমাদের প্রাথমিক স্কুলগুলি বর্তমানে যে সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচীর অভাব।

(খ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষকের অপ্রতুলতা।

(গ) প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাব।

(ঘ) সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্যপুস্তকের অভাব।

(ঙ) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, খেলার সরঞ্জাম ও লাইব্রেরী পুস্তকের অভাব।

৭·৪· দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকায় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হলে একটি সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতির আবশ্যক। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এমন পর্যায়ের হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে স্বাধীন নাগরিকের সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার ও তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে আট হতে বার বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ চালু রয়েছে। আমাদের বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাইমারী শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। কারণ পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে শিশুমনে ধারণা ও বোধশক্তি জাগ্রত করার এবং অর্থকরী বিদ্যার প্রাথমিক বিষয়গুলি তাকে শিক্ষা দেবার মত সময় পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি, আট বছরের কম মেয়াদী স্কুল শিক্ষায় এসব উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয় এবং অষ্টম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও অন্যান্য যে সব কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ আমরা করছি সেগুলির সুষ্ঠু ভিত্তি রচনাও সম্ভব নয়। সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য এই আট বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে প্রসার হচ্ছে, তাতে শিক্ষায়তনে কমপক্ষে আট বছর মেয়াদের একটি

জীবন্ত ও বাস্তব পরিবেশভিত্তিক সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম চালু না করতে পারলে সে শিক্ষাকে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়াররূপে কাজে লাগানো যাবে না। এ কারণে আমরা প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সার্বজনীন করতে চাই। এই পর্যায়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করলে তার সার্বজনীনত্ব রক্ষিত হতে পারে না।

৭·৫· আমরা সুপারিশ করি যে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম শ্রেণী বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং যে-সব স্কুলে এখনও অবৈতনিক শিক্ষা চালু হয়নি, সেগুলিতে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথেই অবৈতনিকও করতে হবে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সরকারকে এর প্রস্তুতি পর্ব শেষ করতে হবে। অতঃপর ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয় শ্রেণী, ১৯৭৮ সালে তৃতীয় শ্রেণী এবং পরবর্তী বছরগুলিতে ক্রমান্বয়ে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করতে হবে। এ প্রস্তাব সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের ষাট লক্ষ অতিরিক্ত ছেলে-মেয়ের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে এ বয়সের ৭২ লক্ষ ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছে। দশ হাজার স্কুল খুলে এবং ১৫ হাজার বর্তমান প্রাইমারী স্কুলে অতিরিক্ত শিফ্‌ট চালু করে এই অতিরিক্ত সংখ্যক শিশুর স্থান করা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে দশ হাজার প্রাইমারী স্কুলকে আট শ্রেণী স্কুলে উন্নীত করতে হবে এবং দু'হাজার হাই স্কুল বা জুনিয়র হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিফ্‌ট (প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন স্কুল নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত) চালু করতে হবে। এতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রায় বার লক্ষ অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর সংস্থান হবে। ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম শ্রেণীর বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে বার লক্ষ, কিন্তু এ বয়সের ছেলে মেয়ের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ষাট লক্ষ। (পরিশিষ্টের পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য)।

৭.৬. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কারণে পাঁচ থেকে তের বছর বয়স্ক অধিকাংশ বালক বালিকাকেই পরিবারের আর্থিক উপার্জনের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তার ফলে তাদের অনেকের পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না, কিংবা সম্ভব হলেও তারা সেখানে বেশী দিন শিক্ষারত থাকতে পারে না। এদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈশ স্কুলে শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। এসব নৈশ স্কুলে পনর বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

৭.৭. বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালিকার সংখ্যা মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মাত্র। এই হার অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। মেয়েদের আরো অধিক সংখ্যায় স্কুলের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। সহ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজন-বোধে আগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠিও কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যায়ে আমাদের প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সের প্রবর্তন মহিলাদের অধিক সংখ্যায় শিক্ষা বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করবে।

৭·৮· প্রথম শ্রেণীতে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই স্কুল ত্যাগ করে এবং ক্রমে ক্রমে আবার নিরক্ষর হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিরাট অপচয় বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। বাধ্যবাধকতা আরোপ ছাড়াও পাঠ্যসূচী

ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। বয়স্ক শিক্ষাও এ অপচয়রোধে বিশেষ সাহায্য করবে। কারণ বয়স্ক শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিভাবকগণ স্বভাবতই শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে তৎপর হবেন।

৭·৯· দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা দরকার। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষা পদ্ধতি কর্মমুখী হবে এবং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ বিভিন্নতার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমানের সব মৌলিক পার্থক্য দূরীভূত করে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। নীচে পঠিতব্য বিষয় এবং পাঠক্রমের ধারণা দেওয়া হল।

৭·১০· প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পঠিতব্য বিষয়ঃ

পঠিতব্য বিষয়।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা।				
	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী।	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী।	পঞ্চম শ্রেণী।	ষষ্ঠ শ্রেণী।	সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী।
১। বাংলা	১০	৯	৮	৭	৬
২। অংক	৬	৬	৬	৬	৬
৩। ইতিহাস	..	২	২	২	৩
৪। ভূগোল	..	২	২	২	৩
৫। বিজ্ঞান:					
(ক) প্রকৃতি পাঠ, কৃষি বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও পুষ্টি বিজ্ঞান।	..	৩	৩	২	১
(খ) জীব বিদ্যা ..	..	..	২	২	২
(গ) পদার্থ বিদ্যা ..	..	..	..	২	২
(ঘ) রসায়ন ..	..	..	..	২	২
৬। দ্বিতীয় ভাষা ..	..	..	..	৩	৩
৭। শরীর চর্চা ও খেলাধূলা ..	৫	৪	৪	৩	৩
৮। কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত	২	২	২	১	১
৯। চিত্রাংকন ..	২	২	২	২	২
১০। ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষা।	..	..	..	২	২

পঠিতব্য বিষয়।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা।				
	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী।	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী।	পঞ্চম শ্রেণী।	ষষ্ঠ শ্রেণী।	সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী।
১১। হাতের কাজ (বাগানের কাজ, স্কুল ঘরের পরিচ্ছন্নতা, খেলনা তৈরী, মাটির মডেল তৈরী, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, বই বাঁধানো, বেত-বাঁশের কাজ, কাপড়-রঞ্জন, সেলাইয়ের কাজ, হাঁস-মুরগী পালন, সাবান তৈরী, প্লাষ্টিকের কাজ ইত্যাদি)।	২	৩	৩	৩	৩
১২। কৃষি সম্প্রসারণ কাজ—তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ কৃষি সম্প্রসারণ কাজেও অংশ গ্রহন করবে। ফল ও শস্যের উন্নত ধরণের বীজ নিজেদের ঘরের আঙ্গিনায় লাগাবে এবং প্রত্যেক ঋতুতেই স্কুল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।	..	..	..	..	..
মোট পিরিয়ড সংখ্যা ..	২৭	৩৩	৩৪	৩৯	৩৯

প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচী কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবেন। ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজনীয় পৌর বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭·১১· প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকতার জন্য বিশেষ করে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। তাঁরা যাতে অধিক সংখ্যায় এই কাজে ব্রতী হন সে বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

৭·১২· গতিশীল ও বাস্তবানুগ পাঠক্রমের ভিত্তিতে যথার্থ পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রশ্নটি এই পর্যায়ের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭·১৩· প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যের জন্য এবং দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়াসকে সুসমন্বিত করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষণ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

সারাংশ

১। দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকায় অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষিত করে তুলতে হলে একটি সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতির আবশ্যক। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এমন পর্যায়ের হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে স্বাধীন নাগরিকের সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার ও তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। আমাদের বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাইমারী শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। তদুপরি পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে বালক-বালিকার মনে ধারণা ও বোধশক্তি জাগ্রত করার এবং অর্থকরী বিদ্যার প্রাথমিক বিষয়গুলি তাদের শিক্ষা দেবার মত সময় পাওয়া যায় না। আট বছরের কম মেয়াদী স্কুল শিক্ষায় এসব উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়। সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য এই আট বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের যে প্রসার হচ্ছে, তাতে শিক্ষায়তনে কম-পক্ষে আট বছর মেয়াদের একটি জীবন্ত ও বাস্তব পরিবেশভিত্তিক সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম চালু না করতে পারলে সে শিক্ষাকে দেশের অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়াররূপে কাজে লাগানো যাবে না। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে আট হতে বার বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ চালু রয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে—

(ক) প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সার্বজনীন করতে হবে।

(খ) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা' ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) উপরিউক্ত প্রস্তাব সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্য-পুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে। (৭.১.—৭.৫.).

২। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কারণে পাঁচ থেকে তের বছর বয়স্ক অধিকাংশ বালক-বালিকাকেই পরিবারের আর্থিক উপার্জনের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলে তাদের অনেকের পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। এদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে তাদের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈশ স্কুলে শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। (৭.৬.)

৩। বালিকাদের অধিক সংখ্যায় স্কুলের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে পৃথক বালিকা স্কুল স্থাপন করতে হবে। (৭.৭.)

৪। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার উদ্দেশ্যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা ছাড়াও পাঠ্যসূচী ও স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। (৭.৮.)

৫। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা দরকার। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষা পদ্ধতির কর্মমুখী হবে এবং পুঁথি-গত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচীভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজ জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ বিভিন্নতার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। (৭.৯.)

৬। প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক। এজন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। **(৭.১১.)**

৭। গতিশীল ও বাস্তবানুগ পাঠক্রমের ভিত্তিতে যথার্থ পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রশ্নটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (৭.১২.)

৮। প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যের জন্য এবং দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়াসকে সুসমন্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা দরকার। (৭.১৩.)

অধ্যায় ৮

মাধ্যমিক শিক্ষা

৮.১. শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রী শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষা-কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের শিক্ষা।

৮.২. মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী হলঃ (ক) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা, (খ) সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা, (গ) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং (ঘ) মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৮.৩. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সংগঠনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর ধরে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায় বলে গণ্য করা যায়। নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই তিন/চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত। বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির, যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে পরিবেশ বিচ্ছিন্ন। এই পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকে একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মনে করে, ফলে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির সাথে তাদের মানসিক যোগসূত্র গভীরতা লাভ করে না। এই অবস্থার অবসানকল্পে বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির কর্তৃপক্ষকে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার নির্দেশ দিতে হবে। এতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর চাপ নিরসনে নতুন মাধ্যমিক স্কুল খোলার ব্যয়ভার অনেকাংশে লাঘব হবে।

৮.৪. আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে বাঞ্ছনীয়। কারণ নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে (অর্থাৎ বয়স সীমা ১৪ বছর থেকে ১৭ বছরের মধ্যে) প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষের মত ছাত্রছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে এবং পুরোপুরিভাবে সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, অথচ জীবিকা অর্জনে সহায়ক তেমন কোন প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ফলে তাদের অধিকাংশই ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজের জীবনধারায় আপন সংকীর্ণ ভূমিকা পালন করে যায়। যে-কোন দেশের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৮.৫. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা ও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণী এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলতঃ দ্বিধাবিভক্ত হবেঃ (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।

এ- ৪৭৫০১

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে নবম ও দশম শ্রেণীতে উভয় ধারায় কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসাবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবে। দশম শ্রেণীর শেষে উভয় ধারার শিক্ষার্থীরা বহিঃ পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। দশম শ্রেণীর পর সাধারণ শিক্ষা-ধারার শিক্ষার্থীরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নির্ধারিত বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমসমূহের যে-কোন একটিতে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে। দ্বাদশ শ্রেণীর পর সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। অপর পক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর বৃত্তি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনমত একাদশ শ্রেণীতে এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সম্পূর্ণতা লাভ করবে। একাদশ শ্রেণীতে প্রশিক্ষণের পর বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা একটি বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। বৃত্তিমূলক দশম শ্রেণীর শিক্ষা-সমাপনান্তে যারা শিল্প কারখানায় দক্ষ শ্রমিক হিসাবে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য শিল্পে শিক্ষানবিসি কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রান্তিক শিক্ষা-প্রাপ্ত এসব শিক্ষার্থী কর্মকুশল, দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ জনশক্তি হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করে ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সচেষ্ট হতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। কিন্তু কোন শিক্ষার্থী যদি দশম শ্রেণী কিংবা একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের পর সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে উচ্চ শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়, তবে সে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সুযোগ পাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর সাধারণ শিক্ষালাভের পথও উন্মুক্ত থাকবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বহুমুখী সাধারণ শিক্ষাক্রমের যে বিভাগ বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থী সেই বিভাগে একাদশ শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পারবে। শিক্ষার্থী যদি একাদশ শ্রেণীর প্রশিক্ষণ লাভের পর সাধারণ শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করে তা'হলে শিক্ষার্থীর একাদশ শ্রেণীর প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত শিক্ষায় পর্যবসিত হবে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আমাদের লক্ষ্য হবে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা বিশ ভাগকে প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা। পরবর্তী পরিকল্পনায় এ হারকে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগে উন্নীত করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা:

৮·৬· মাধ্যমিক স্তরের এই শিক্ষা মুখ্যতঃ প্রান্তিক শিক্ষা। সে জন্য নবম ও দশম শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের পরও একাদশ শ্রেণীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের চাহিদা এবং কর্ম প্রদান সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুযায়ী নির্ণীত হবে। আগেই বলা হয়েছে যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রান্তিক শিক্ষা-লাভের পর মধ্যস্তরের জনশক্তিতে পরিণত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। প্রস্তাবিত এসব বৃত্তিমূলক কোর্স আরো একভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। অসমপূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশের জনশক্তি কিংবা সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মকুশল করে তোলার উদ্দেশ্যে এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা স্কুলের রুটিন বহির্ভূত সময়ে তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হবে বটে কিন্তু শিক্ষার যে বৃহত্তম স্বার্থ তাতে সাধিত হবে তার তুলনায় এ ব্যয় নগণ্য।

মাধ্যমিক স্তরে প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা দুরূহ কাজ। আশা করা হচ্ছে যে এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়ে কর্মসংস্থান করে নেবে। এজন্য অবশ্য মূলধন প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি সীমিত সম্পদের অধিকারী সেজন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে, কিংবা তাদের কর্মকুশলতাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে

আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রয়োজন মতো সমবায় সংস্থা গঠন করতে হবে। সরকারী প্রচেষ্টায় এ দুটো ক্ষেত্রে সাহায্য পেলে অনেকেই চাকরি না খুঁজে আপন বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়াস পাবে এবং নিজের কর্মসংস্থান নিজেই সৃষ্টি করে নেবে।

৮.৭. বৃত্তিমুখীন শিক্ষার প্রসার ও তাকে জনপ্রিয় করার জন্য ভারতের কয়েক স্থানে "শিখ ও উপার্জন কর" প্রকল্পের মত আমাদের দেশেও অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করা উচিত হবে। প্রকল্পটির প্রচারের জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে এবং কাঁচামাল ক্রয় ও আনুসংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একটি আবর্তক তহবিল সৃষ্টি করতে হবে। নবম হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাজের কার্ড রাখা হবে যাতে কাজের পরিমাণ ও মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করা সম্ভব হয়। তৈরী পণ্যের বাজারজাত করার জন্য একজন মার্কেটিং অফিসারের অধীনে বিক্রি কেন্দ্র খুলতে হবে। তদুপরি এসব পণ্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকার সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দেবেন।

৮.৮. বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ হতে পারেঃ

পাঠ্য বিষয়।	নবম ও দশম শ্রেণী।		একাদশ শ্রেণী।	
	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।
১। বাংলা	২০০	৮		
২। গনিত ..	১০০	৪		
৩। সাধারণ বিজ্ঞান ..	১০০	৪		
৪। ইংরেজী	১০০	৫		
৫। বৃত্তিমূলক	৫০০	১৮	৫০০	৩৮
মোট ..	১,০০০	৩৯	৫০০	৩৮
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা ..	নিয়মিত যোগদিতে হবে		নিয়মিত যোগ দিতে হবে।	
সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মে অংশ গ্রহণ।	বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতা-মূলক।		বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতা-মূলক।	

৮.৯ বৃত্তিমুলক কোর্সসমূহঃ

১। টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফী।
২। বুক কীপিং।
৩। বানিজ্যিক পদ্ধতি ও সেলসম্যান-শিপ।
৪। শিক্ষক শিক্ষণ।
৫। গ্রন্থাগার সহকারী শিক্ষণ।
৬। বই বাঁধানো।
৭। কাঠের কাজ।
৮। ধাতুর কাজ।
৯। বিজলীর কাজ।
১০। যন্ত্রের কাজ।
১১। ফাউন্ড্রির কাজ।
১২। মোটর গাড়ী মেরামত।
১৩। রেডিও মেরামত।
১৪। গৃহ নির্মাণ—প্লাম্বিং ও মেশিনারিসহ
১৫। ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ।
১৬। কৃষি বিদ্যা : শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ।

১৭। মৎস বিজ্ঞান।
১৮। হাঁস মুরগী ও পশুপালন।
১৯। খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি বিজ্ঞান।
২০। চামড়ার কাজ।
২১। গ্রাফিক আর্টস্।
২২। মুদ্রণ শিল্প।
২৩। মৃৎ শিল্প।
২৪। তাঁত শিল্প।
২৫। সীবন শিল্প (এমব্রয়ডারিসহ)।
২৬। কাপড় রঞ্জন ও ছাপানো।
২৭। নার্সিং।
২৮। প্যারামেডিকেল।
২৯। ধর্মশিক্ষা।
৩০। অংকন বিদ্যা।
৩১। কন্ঠ সংগীত।
৩২। যন্ত্র সংগীত।
৩৩। নৃত্য।
৩৪। অভিনয় ও আবৃতি।
৩৫। বাঁশ-বেতের কাজ।
৩৬। খেলনা তৈরী।
৩৭। প্লাষ্টিক শিল্প।
৩৮। সাবান তৈরী।
৩৯। কেটারিং ও হোটেল ব্যবস্থাপনা।
৪০। ইলেকট্রোপ্লেটিং ও ধাতব শীটের কাজ।
৪১। ক্লেশ বিন্যাস।

বৃত্তিমূলক কোর্সসমূহের বিস্তারিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি ঠিক করবেন। এসব কোর্সের মেয়াদ মোটামুটি তিন বছর (নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী) হবে। মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি যদি এর কোন কোনটি দু'বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব মনে করেন কিংবা কোন কোনটি চার বছর পর্যন্ত চলা উচিত মনে করেন তবে তাঁরা তাই নির্ধারণ করবেন। উপরিউক্ত কোর্স ছাড়াও কারিকুলাম কমিটি প্রয়োজন-বোধে বৃত্তিমূলক অন্য কোর্সের প্রস্তাবও দিতে পারবেন।

যে-সব ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান ভিত্তিক বৃত্তিমুখী কোর্স (যেমন কৃষি, নার্সিং, প্যারামেডিকেল, বিজলীর কাজ, যন্ত্রের কাজ ইত্যাদি) বেছে নেবে তারা সাধারণ বিজ্ঞানের পরিবর্তে নিজ নিজ কোর্সেই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পড়বে। তাদের জন্য বৃত্তিমুখী কোর্সের নম্বর হবে ৬০০।

দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী এক বা একাধিক বৃত্তি-মূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের জন্য সরকারী ও স্থানীয় উদ্যোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে টেকনিকাল এডুকেশন ডাইরেক্টরেটের অধীনে সরকারী ব্যয়ে যে ৩৫টি বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ভোকেশনেল ইনষ্টিটিউট) রয়েছে তাদের প্রত্যেকটিতে বিদ্যুতের কাজ, কাঠের কাজ, যন্ত্রের কাজ, ড্রাফটসম্যানশিপ ইত্যাদি বিষয়ে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর বৃত্তিমূলক কোর্স অতি সহজেই প্রবর্তিত হতে পারে। তাদের বর্তমান প্রশিক্ষণ ক্রম-আদৌ জনপ্রিয় হয়নি।

সাধারণ শিক্ষা ঃ

৮·১০· উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি দানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের এই শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত। এই শিক্ষাক্রম চার বছর মেয়াদী অর্থাৎ নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রমএর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সব শিক্ষার্থীই এ পর্যায়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঁচ বা ছয়টি নির্দিষ্ট বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসাবে অধ্যয়ন করবে। এ ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী আরও দুই বা তিনটি বিষয় ও একটি বৃত্তিমূলক বিষয় অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন করবে। এই বৃত্তিমূলক বিষয় অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যদাবোধ অক্ষুন্ন থাকে। দশম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীরা বহিঃ পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে। দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নের

প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যত শিক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী বহুমুখী শিক্ষাক্রম সমূহের, যে-কোন একটিতে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া আরও চারটি বিষয় পড়বে। দ্বাদশ শ্রেণীর পর তারা একটি বহিঃ পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে।

শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধূলায় নিয়মিত এবং সমাজ-কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মে বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হবে।

৮·১১· সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ হতে পারেঃ

বিজ্ঞান বিভাগ

নবম ও দশম শ্রেণী।				একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।			
	পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।		পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।
১।	বাংলা ..	২০০	৮	১।	বাংলা ..	২০০	৮
২।	ইংরেজী ..	১০০	৪	২।	ইংরেজী ..	১০০	৫
৩।	গণিত ..	১০০	৪				
৪।	পদার্থ বিদ্যা	১০০	৪				
৫।	রসায়ন বিদ্যা	১০০	৪	৩।	ঐচ্ছিক বিষয় (৪টি বিষয়)	৮০০	২৬
৬।	ঐচ্ছিক বিষয় (৩টি বিষয়)	৩০০	১২				
৭।	বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি বিষয়)	১০০	৩				
	মোট ..	১,০০০	৩৯			১,১০০	৩৯

নবম ও দশম শ্রেণীঃ

ঐচ্ছিক বিষয়ঃ বিশেষ গণিত, জীববিজ্ঞান, জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, জ্যোতির্বিদ্যা অথবা আবহাওয়া বিদ্যা, খাদ্য পুষ্টি বিজ্ঞান, গৃহ ব্যবস্থাপনা, বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, কৃষি বিজ্ঞান, পশুপালন, ভূগোল, প্রাথমিক অর্থনীতি অথবা ইতিহাস অথবা পৌরবিজ্ঞান।

বৃত্তিমূলক বিষয়ঃ 'টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফী, কৃষিকাজ, কাঠের কাজ, বিদ্যুতের কাজ, তাঁতের কাজ কামারের কাজ, বই বাঁধানো, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির কাজ, সেলাইয়ের কাজ, খেলনা তৈরী, ইত্যাদি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীঃ

ঐচ্ছিক বিষয়ঃ ১। গণিত, ২। পদার্থ বিজ্ঞান, ৩। রসায়ন বিদ্যা, ৪। জীব বিজ্ঞান, ৫। মনো-বিজ্ঞান, ৬। ভূগোল, ৭। জ্যোতির্বিদ্যা, ৮। আবহাওয়া বিদ্যা, ৯। অর্থনীতি, ১০। পরিসংখ্যান, ১১। কারিগরি অংকন ও ওয়ার্কশপ প্রাক্‌টিস্ ১২। সামরিক বিজ্ঞান, অথবা স্বাস্থ্য ও শরীর বিজ্ঞান।

বাণিজ্য বিভাগ

পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।	পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।
১। বাংলা ..	২০০	৮	১। বাংলা ..	১০০	৮
২। ইংরেজী ..	১০০	৪	২। ইংরেজী ..	১০০	৫
৩। গণিত ..	১০০	৪	৩। ঐচ্ছিক বিষয় (৪টি বিষয়)	৮০০	২৬
৪। সাধারণ বিজ্ঞান	১০০	৪			
৫। ভূগোল ..	১০০	৪			
৬। ঐচ্ছিক বিষয় (৩টি বিষয়)	৩০০	১২			
৭। বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি বিষয়)	১০০	৩			
মোট ..	১,০০০	৩৯		১,১০০	৩৯

নবম ও দশম শ্রেণী:

ঐচ্ছিক বিষয়: বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও বাণিজ্যিক লিপি, বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ, টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফী, বাণিজ্যিক ভূগোল, অথবা প্রাথমিক অর্থনীতি অথবা ইতিহাস অথবা পৌরবিজ্ঞান।

বৃত্তিমূলক বিষয়: কৃষিকাজ, কাঠের কাজ, বিদ্যুতের কাজ, তাঁতের কাজ, কামারের কাজ, বই বাঁধানো, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির কাজ, সেলাইয়ের কাজ, খেলনা তৈরী ইত্যাদি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী:

ঐচ্ছিক বিষয়: ১। ব্যবসা বাণিজ্য পদ্ধতি ও বাণিজ্য লিপি, ২। বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ, ৩। ব্যাংকিং, ৪। বাণিজ্যিক ভূগোল, ৫। টাইপ রাইটিং, ও ষ্টেনোগ্রাফী, ৬। অর্থনীতি, ৭। গণিত, ৮। অফিস ও নথিপত্র ব্যবস্থাপনা।

কলা বিভাগ

নবম ও দশম শ্রেণী।				একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।			
	পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।		পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।
১।	বাংলা ..	২০০	৮	১।	বাংলা ..	২০০	৮
২।	ইংরেজী ..	১০০	৪	২।	ইংরেজী ..	১০০	৫
৩।	গণিত ..	১০০	৪	৩।	ঐচ্ছিক বিষয় (৪টি বিষয়)	৮০০	২৬
৪।	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০	৪				
৫।	ইতিহাস ..	১০০	৪				
৬।	ভূগোল ..	১০০	৪				
৭।	ঐচ্ছিক বিষয় (২টি বিষয়)	২০০	৮				
৮।	বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি বিষয়)	১০০	৩				
	মোট ..	১,০০০	৩৯			১,১০০	৩৯

নবম ও দশম শ্রেণী:

ঐচ্ছিক বিষয়: বাংলা (উচ্চতর), ইংরেজী (উচ্চতর), মানব সভ্যতার ইতিহাস, কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত, চারুকলা, আরবী, সংস্কৃত, পালি, ফার্সি ইত্যাদি, আধুনিক ভাষা, প্রাথমিক অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞান, ধর্মশিক্ষা, সহজ গার্হস্থ্য অর্থনীতি, শরীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশেষ গণিত।

বৃত্তিমূলক বিষয়: টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফী, কৃষি কাজ, কাঠের কাজ, বিদ্যুতের কাজ, তাঁতের কাজ, কামারের কাজ, বই বাঁধানো, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির কাজ, সেলাইয়ের কাজ খেলনা তৈরী, ইত্যাদি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী:

ঐচ্ছিক বিষয়: ১। বাংলা (উচ্চতর), ২। ইংরেজী (উচ্চতর), ৩। ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস, ৪। গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ৫। ভূগোল, ৬। অর্থনীতি, ৭। পৌরনীতি, ৮। গণিত, ৯। আধুনিক ভাষা, ১০। আরবী, ফার্সী সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি, ১১। মনোবিজ্ঞান, ১২। পরিসংখ্যান, ১৩। যুক্তি বিদ্যা, ১৪। সমাজ বিজ্ঞান অথবা ১৫। সমাজ কল্যাণ, ১৬। সামরিক বিজ্ঞান, ১৭। সংগীত ১৮। গণিত।

কৃষি বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ, ললিত কলা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং ধর্মশিক্ষা বিভাগঃ

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

পাঠ্য বিষয়।	নম্বর।	সাপ্তাহিক পিরিয়ড।
১। বাংলা	২০০	৮
২। ইংরেজী	১০০	৫
৩। ঐচ্ছিক বিষয় (৪টি বিষয়) ..	৮০০	২৬
মোট ..	১,১০০	৩৯

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীঃ

কৃষি বিভাগঃ ঐচ্ছিক বিষয়ঃ ১। কৃষি বিজ্ঞান, ২। পদার্থ বিজ্ঞান, ৩। রসায়ন বিদ্যা, ৪। গণিত, ৫। জীববিজ্ঞান, ৬। মৃত্তিকা বিজ্ঞান।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগঃ ঐচ্ছিক বিষয়ঃ ১। সাধারণ বিজ্ঞান, ২। বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, ৩। গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন, ৪। খাদ্য ও পরিপুষ্ট যে-কোন একটিঃ ৫। অর্থনীতি, ৬। গণিত, ৭। শিশু মনোবিজ্ঞান, ৮। সংগীত, ৯। ভূগোল, ১০ ব্যবহারিক শিল্পকলা ও বয়ন শিল্প।

ললিত কলা বিভাগঃ ঐচ্ছিক বিষয়ঃ ১। নৃত্য, ২। কণ্ঠ সংগীত, ৩। যন্ত্র সংগীত, ৪। চিত্রাংকন, ৫। অভিনয় ও মঞ্চ শিল্প, যে-কোন একটিঃ ৬। গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ৭। সমাজ কল্যাণ, ৮। সমাজ বিজ্ঞান, ৯। মনোবিজ্ঞান, ১০। যুক্তি বিদ্যা, ১১। শরীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

শিক্ষা বিভাগঃ ঐচ্ছিক বিষয়ঃ ১। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, ২। শিক্ষার ইতিহাস, ৩। শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা দর্শন, ৪। শিক্ষা পরিসংখ্যান, ৫। শিক্ষা পদ্ধতি, ৬। স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, ৭। শিল্প কলা ও কারু শিল্প, ৮। সাধারণ বিজ্ঞান, ৯। গণিত। ১০। ভূগোল, ১১। ইতিহাস, ১২। পৌরনীতি, ১৩। অর্থনীতি।

ধর্মবিভাগঃ ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবেন।

৮.১২. আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষার কাঠামো অনুসারে প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর, মাধ্যমিক স্তর পাঁচ বছর, ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর দুই বছর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রীর মেয়াদ দুই বা তিন বছর এবং দ্বিতীয় ডিগ্রীর মেয়াদ দুই বা এক বছর। অবশ্য পেশাগত ডিগ্রীর ব্যাপারটি উপরোক্ত সাধারণ ডিগ্রী হতে স্বতন্ত্র। অতীতের একাধিক শিক্ষা কমিটি ও কমিশন—১৯৩৪ সালের সাপ্রু কমিটি, ১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট কমিটি, ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ শিক্ষা কমিটি, ১৯৫৭ সালের সাবেক পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বিলোপ সাধন করে নতুন শিক্ষা কাঠামো প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এ

সুপারিশ মতে স্কুল শিক্ষাকাল হবে এগারো বছর এবং সাধারণ প্রথম ডিগ্রীর মেয়াদ হবে তিন বছর। এ প্রস্তাবিত কাঠামোর স্বপক্ষে বলা হয়েছেঃ (ক) ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চমাধ্যমিক কোর্সটি একটি বিশেষ স্তর বলে গণ্য হতে পারে না, কেননা এর এক দিকে মাধ্যমিক স্তর, অন্য দিকে ডিগ্রী স্তর এবং এ দুটোর মধ্যস্থিত উপরোক্ত কোর্সটি কোন স্তরের সঙ্গে সত্যিকার-ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, (খ) ইন্টারমিডিয়েট স্তরের বিলোপ সাধন করে এর একটি বছর মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে এবং অন্য বছরটি ডিগ্রী স্তরের সঙ্গে সংযোজিত করলে অধীত বিষয়ে বাঞ্ছিত ব্যুৎপত্তি লাভ সম্ভবপর হবে, কেননা প্রথম ডিগ্রীর মেয়াদ কিছুতেই তিন বছরের চেয়ে কম হওয়া সমীচীন নয়, অন্যপক্ষে মাধ্যমিক স্তরে একটি অতিরিক্ত বছর যোগ হওয়ার ফলে সুসমন্বিত বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার পক্ষে সহায়ক হবে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় যে শ্রীলঙ্কায় ১৯৭২ সাল হতে বার বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষার স্থলে সারা দেশে এগার বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষা চালু করা হয়েছে। উপরোক্ত যুক্তিগুলির বিপক্ষে বলা হয় যে ভারতে ১৯৫২ সালের মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বহু একাদশ শ্রেণী বিশিষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় বটে কিন্তু ১৯৬৬ সালের কোঠারী কমিশন আবার উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সুপারিশ করেন। অবশ্য এ কথাও বলা হয় যে এগার বছরের স্কুল শিক্ষার ব্যাপারে ভারতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষাবিদের অভিমত হল যে প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার ফলে নানা অসুবিধা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোঠারী কমিশনের সুপারিশকৃত দশ বছর স্থায়ী মাধ্যমিক স্তর, দুই বছর স্থায়ী উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর ও তিন বছর স্থায়ী প্রথম সাধারণ ডিগ্রী স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা কাঠামো ভারতে গৃহীত হয়েছে। এ কাঠামো পাকিস্তানী আমলের ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশনের সুপারিশকৃত শিক্ষা কাঠামোরই অনুরূপ। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তদানিন্তন সরকার কর্তৃক কাঠামোটি গৃহীত হওয়া সত্বেও তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। একথা সত্য যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় দশম শ্রেণীর শেষে এস. এস, সি, পরীক্ষার পর বেশ কয়েক মাস পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং আবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে নবম-দশম শ্রেণীর সিলেবাসের বহু অংশ পুনঃ-পঠিত হয়। এসব কারণে অনেকে বিশ্বাস করেন যে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর চার বছরের কোর্স অনায়াসে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী—এ তিন বছরের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব। তাই তারা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর তুলে দিয়ে একাদশ শ্রেণীর স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে মাধ্যমিক স্তরকে তিন বছর মেয়াদী করলে সময়ের অযথা অপচয় বন্ধ হবে এবং পাঠ্যবিষয়ের পুনরাবৃত্তিও বাদ পড়বে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ ও সুসংহত হবে। নীতিগতভাবে এ প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হলেও আমাদের বর্তমান অবস্থায় তা বাস্তবায়নের পথে বহু অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে, যেমন উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে (যাদের সংখ্যা এখন সাত হাজারের অধিক) এম-এ ও এম-এস-সি পাশ শিক্ষক নিয়োগ (এক সঙ্গে এত অধিক সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া ভার), পাঠাগার-গবেষণাগার ইত্যাদির সম্যক উন্নয়ন, নতুন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, স্কুল-কলেজের আর্থিক অসংগতি দূরীকরণ ইত্যাদি।

সব কিছু বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে একাদশ শ্রেণী মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশের কিছু সংখ্যক শিক্ষায়তনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলুক। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ক্রম রূপায়ণের কার্যক্রম স্থির করা যাবে।

৮.১৩. শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের কাছে এও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বর্তমান উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বিলোপ সাধন করে দশ বছর স্কুল শিক্ষার পরই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তিন বছরের পাস-ডিগ্রী কোর্স কিংবা চার বছরের অনার্স কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। রাশিয়ায় দশ বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে। তবে এ ব্যবস্থা আমাদের মত অনগ্রসর দেশে বর্তমানে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না, কারণ আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান বর্তমানে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং আমাদের শিক্ষায়তনে যোগ্য

শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত কারণেই স্কুলের দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বর্তমানে চার বছর-মেয়াদী অনার্স কোর্স প্রবর্তনের পক্ষপাতী নন। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহের সার্থক রূপায়ণের ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে এবং শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মান বিশেষভাবে উন্নীত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অতএব পাঁচ বছর পর এই মানোন্নয়নের সম্যক পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সে সময় নতুন শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষার উন্নত মানের পরিপ্রেক্ষিতে দশ বছর স্কুল শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির বিষয়টিও পুনর্বিবেচিত হতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সারাংশ

১। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষাকাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী হল প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা, সুসমন্বিত ও কল্যাণ-ধর্মী জীবন যাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে কর্ম কুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা। (৮.১—৮.২)

২। নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা। নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের যোগসূত্র বজায় রাখা ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সমতা নিশ্চিত করার জন্য একই শিক্ষায়তনে এই তিন/চারটি শ্রেণীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বান্ছনীয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরকে একটি পূর্ণাংগ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই স্তরের সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষা কার্য-ক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষা-দানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত। এসব কারণে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির কর্তৃপক্ষকে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন না করে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার নির্দেশ দিতে হবে। (৮.৩.)

৩। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবন-যাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যত কর্ম সংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজন। (৮.৪.)

৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিক্ষা এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে বিবেচিত হবে। এ উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা মূলতঃ দ্বিধা বিভক্ত হবে, বৃত্তিমূলক-শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি তিন বছর মেয়াদী (নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী) হবে। সাধারণ শিক্ষা চার বছর মেয়াদী (নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) থাকবে। উভয় ধারার শিক্ষাক্রমে কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বৃত্তিমূলক বিষয়ে অথবা সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে আমাদের লক্ষ্য হবে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা বিশ ভাগকে প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা। পরবর্তী পরিকল্পনা কালে এ হারকে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাস ভাগে উন্নীত করতে হবে। (৮.৫.)

৫। বৃত্তিমূলক শিক্ষা মুখ্যতঃ প্রান্তিক শিক্ষা। সেজন্য নবম ও দশম শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের পরও একাদশ শ্রেণীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের চাহিদা এবং কর্মপ্রদান সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুযায়ী নির্ণীত হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত সকলের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করা দুরূহ কাজ। এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়ে কর্ম সংস্থাপন করে নেবে। এজন্য সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের কর্ম-কুশলতাকে কাজে লাগাবার জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রয়োজন মত সমবায় সংস্থা গঠন করতে হবে। (৮.৬.)

৬। বৃত্তিমুখীন শিক্ষার প্রসার ও তাকে জনপ্রিয় করার জন্য ভারতের কয়েক স্থানে "শিখ ও উপার্জন কর" প্রকল্পের মত আমাদের দেশেও অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করা উচিত হবে। (৮.৭.)

৭। দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী এক বা একাধিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের জন্য সরকারী ও স্থানীয় উদ্দোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৮.৯.)

৮। ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ মাধ্যমিক কোনটি একটি বিশেষ স্তর বলে গণ্য হতে পারে না, কেননা এর একদিকে মাধ্যমিক স্তর, অন্য দিকে ডিগ্রী স্তর এবং এ দু'টির মধ্যস্থিত উপরোক্ত কোর্সটি কোন স্তরের সঙ্গে সত্যিকারভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের বিলোপ সাধন করে এর একটি বছর মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে এবং অন্য বছরটি ডিগ্রী স্তরের সঙ্গে সংযোজিত করলে অধিক বিষয়ে বাঞ্ছিত বুৎপত্তি লাভ সম্ভবপর হবে, কেননা প্রথম ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ তিন বছরের চেয়ে কম হওয়া সমীচীন নয়, অন্যপক্ষে নবম-দশম শ্রেণীর সঙ্গে একটি অতিরিক্ত বছর যোগ করলে সুসমন্বিত বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার পক্ষে সহায়ক হবে। অবশ্য আমাদের বর্তমান অবস্থায় এ বাস্তবায়নের পক্ষে বহু অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে, যেমন উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে এম, এ, এম, এসসি, পাশ শিক্ষক নিয়োগ, পাঠাগার, গবেষণাগার ইত্যাদির সম্যক উন্নয়ন, নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, স্কুল কলেজের আর্থিক অসংগতি দূরীকরণ, ইত্যাদি। সবকিছু বিবেচনা করে শিক্ষার কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রস্তাব হচ্ছেঃ

(ক) একাদশ শ্রেণী মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কে প্রথম পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের কিছু সংখ্যক শিক্ষায়তনে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলুক। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় জাতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ক্রম রূপায়নের কার্যক্রম স্থির করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ হবে তিন বছর এবং মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ হবে দুই বছর।

(খ) অগামী পাঁচ বছরে শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মান বিশেষভাবে উন্নীত হলে দশ বছর স্কুল শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিন বছরের পাস-ডিগ্রী কোর্স এবং চার বছরের অনার্স ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। আর মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স হবে পাস ডিগ্রী-ধারীদের বেলায় দুই বছর এবং অনার্স ডিগ্রীধারীদের বেলায় এক বছর। (৮.১২.—৮.১৩.)

অধ্যায় ৯

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

৯.১. বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা বৃত্তির যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন জাতি কৃষি, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য উৎপাদন ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারে না। বর্তমান যুগে মানব জীবনের প্রাত ক্ষেত্রেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বৃত্তিমূলক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে অল্প সময়সাপেক্ষ এবং সে জন্য অল্প কালের ভিতরই এর ফল লাভ করা যায়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার লাভের দ্বারা জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব। এর নজির পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে।

৯.২. বাংলাদেশে বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অপর্যাপ্ত এবং নিম্ন মানের। পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশনসমূহ, কারিগরি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ দেশে উন্নত মানের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়নি। এর ফলে এক দিকে দেশে যেমন দক্ষ কর্মীর অভাব, অন্য দিকে দেশ শিক্ষিত বেকার সমস্যার সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং কৃষি উপযোগী জমির অপ্রাচর্য হেতু দেশ জটিল সমস্যার সম্মুখীন। এ অবস্থার বিহিত করার অন্যতম পন্থা হল বৃত্তিমূলক শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করে যুব সম্প্রদায়কে কর্মমুখী করে তোলা, যাতে অল্প বয়স থেকেই তারা পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সক্রিয় সহায়তা করতে পারে।

৯.৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার তুলনায় অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ। তাই আমাদের সীমিত সম্পদের দ্বারা এ শিক্ষা প্রসারিত করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন, অন্যথায় সম্পদের অপচয়ের সম্ভাবনাই বেশী।

৯.৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে কার্যক্রম, স্বাবলম্বী এবং অর্থ উপার্জন সক্ষম করে তোলা যাতে ইচ্ছা করলে কর্মক্ষেত্রে চাকরীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সংগে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে।

৯.৫. বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে। বৃত্তিমুখী শিক্ষাক্রমের দশম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনমত উচ্চ পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে দক্ষ কর্মী হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবে। এ উদ্দেশ্যে শিল্পে শিক্ষানবিশি প্রকল্প এবং একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.৬. **বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহঃ** প্রস্তাবিত বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(ক) কারিগরি শিল্প ভিত্তিকঃ

(১) কাঠের কাজ, (২) ধাতুর কাজ, (৩) বিজলীর কাজ, (৪) যন্ত্রের কাজ, (৫) ফাউণ্ড্রির কাজ, (৬) মোটর গাড়ী মেরামত, (৭) রেডিও মেরামত, (৮) গৃহ নিমাণ, (৯) ড্রাফটস্‌-ম্যানসিপ, (১০) মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের কাজ, (১১) ইলেকট্রোপ্লেটিং ও ধাতব সীটের কাজ, (১২) বয়ন শিল্প, (১৩) সীবন শিল্প ও এমব্রয়ডারির কাজ, (১৪) মুদ্রণ শিল্প, (১৫) গ্রাফিক আর্টস, (১৬) মৃৎ শিল্প, (১৭) চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

(খ) কৃষি ভিত্তিকঃ

(১) কৃষি বিদ্যা—শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, (২) মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, (৩) হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, (৪) খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি বিজ্ঞান, (৫) কৃষি যন্ত্রপাতি (রক্ষণাবেক্ষণ), ইত্যাদি।

(গ) ললিতকলা ভিত্তিকঃ

(১) অঙ্কন বিদ্যা, (২) কণ্ঠসঙ্গীত, (৩) যন্ত্রসঙ্গীত, (৪) নৃত্য, (৫) অভিনয় ও আবৃত্তি, ইত্যাদি।

(ঘ) ব্যবসা ও বাণিজ্য ভিত্তিকঃ

(১) টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফি, (২) বুক কীপিং ও হিসাব রক্ষণ, (৩) বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও সেলসম্যানশিপ, ইত্যাদি।

(ঙ) চিকিৎসা ভিত্তিকঃ

(১) নার্সিং, (২) প্যারা মেডিকেল, ইত্যাদি।

(চ) অন্যান্যঃ

(১) শিক্ষক শিক্ষণ, (২) ধর্মশিক্ষা, (৩) গ্রন্থাগার সহকারী শিক্ষণ, (৪) খেলনা তৈরী, (৫) প্লাষ্টিক শিল্প, (৬) সাবান তৈরী, (৭) বাঁশ বেতের কাজ, (৮) কেটারিং ও হোটেল ব্যবস্থাপনা, (৯) বই বাঁধান ইত্যাদি।

৯.৭. বৃত্তিমূলক কোর্সসমূহের কারিকুলাম ও সিলেবাস কারিকুলাম কমিটি ঠিক করবেন। এসব কোর্সের মেয়াদ সাধারণভাবে তিন বছর (নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী) হবে। মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে কারিকুলাম কমিটি যদি এসব কোর্সের কোন কোনটি দু বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব মনে করেন তবে তারা তাই সুপারিশ করবেন। উপরোক্ত কোর্স ছাড়াও প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি প্রয়োজনবোধে অন্য কোর্সের প্রস্তাবও দিতে পারবেন।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাঃ

৯.৮. বাংলাদেশের বর্তমান বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা কারিগরি শিল্প ভিত্তিক বিষয়-সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এ শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(ক) শ্রম পরিচালকের অধীনস্থ পাঁচটি টেকনিকেল ট্রেনিং সেন্টারে প্রতি বছর প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ কোর্সের মেয়াদ দু'বছর। ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস, কতিপয় ক্ষেত্রে দশম শ্রেণী পাস।

(খ) ইনডাষ্ট্রিয়াল এপ্রেনটিসশিপ স্কীমের মাধ্যমে প্রতি বছর গড়ে এক শত পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন হতে সাড়ে তিন বছর। বর্তমানে প্রায় তিন শত শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

(গ) শ্রম পরিচালকের অধীনে নারায়ণগঞ্জ নৌ-ডিজেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতি বছর এক শত দশ জন শিক্ষার্থীকে দু'বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) শিল্প পরিচালকের অধীনে পাঁচটি বয়ন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতি বছর প্রায় এক শত পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীকে দু'বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

(ঙ) কারিগরি শিক্ষা পরিচালকের অধীন পঁয়ত্রিশটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে প্রতি বছর দু হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করার ব্যবস্থা আছে। ভর্তির জন্য নিম্নতম যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ দু বছর।

(চ) কারিগরি শিক্ষা পরিচালকের অধীনস্থ তেরটি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে সান্ধ্য-কালীন কার্যক্রমে বছরে প্রায় এক হাজার সাতশ শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ যথাক্রমে অষ্টম শ্রেণী পাস এবং দু বছর।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিঃ

৯.৯. যে-সব কারণে আমাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারলাভ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোপুরি ফলপ্রসূ হতে পারেনি তা হলঃ

(ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়নি এবং সুসংবদ্ধ করা হয়নি। এখনও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি শ্রম পরি-চালকের অধীনে এবং অন্য কয়েকটি শিল্প পরিচালকের অধীনে রয়েছে, যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা গৌণ স্থান পায় এবং যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা চালনায় উপযুক্ত তদারক এবং নির্দেশনার কোন সুব্যবস্থা নাই। কারিগরি শিক্ষা পরিচালকের অধীনস্থ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারক এবং নির্দেশনার যে ব্যবস্থা আছে তাও অপর্যাপ্ত।

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার এবং উৎকর্ষ সাধনে আজ পর্যন্ত সরকার যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উচ্চতর পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষার তুলনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা অল্প সময়ে অধিকতর ফলপ্রসূ। তা ছাড়া সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসংবদ্ধ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা ঈপ্সিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। উন্নয়ন, প্রসার এবং উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য স্তরের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক পেছনে রয়েছে। অথচ দেশের এবং জনসাধারণের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্যান্য স্তরের কারিগরি শিক্ষা থেকে অধিকতর প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল।

(গ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিল্প কারখানা বা অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় স্বল্প সংখ্যক এবং নিম্নমানের শিক্ষার্থীরা এ সব কোর্সে ভর্তি হয়।

(ঘ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সহযোগীতা করতে শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিচ্ছার দরুণ শিক্ষার্থীরা বাস্তব কারিগরি অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায় না যার ফলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(ঙ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষা কোর্সে যাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকগণ এ শিক্ষা পরিহার করে।

(চ) কায়িক শ্রমের প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিরূপ মনোভাবের জন্য দেশের যুব সমাজ বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জনকে সম্মানজনক কাজ বলে মনে করে না।

(ছ) শিল্প কারখানাসমূহের মধ্যে উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রতিযোগিতা না থাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান কম পারিশ্রমিকে অদক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা নিম্নমানের জিনিষ উৎপাদন করে প্রচুর মুনাফা লাভে সমর্থ হওয়ায়, তারা দক্ষ কারিগর নিয়োগের প্রয়োজনবোধ করে না।

(জ) উপযুক্ত এবং দক্ষ কারিগরি শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষক নিযুক্তির সময় তাদের কারিগরি দক্ষতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং পরবর্তীকালে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

(ঝ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজ এবং কায়িক শ্রমের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ায় পরবর্তী কালে শিক্ষার্থীরা হাতের কাজকে ঘৃণা করে।

(ঞ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগী বইয়ের একান্ত অভাব রয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখিত এ রকম বই নাই বললেও চলে। বাজারে যে সমস্ত বই আছে তা ইংরেজী ভাষায় লিখিত, প্রয়োজনের তুলনায় অগণ্য এবং অত্যন্ত উচ্চ মূল্যের, যা সাধারণ স্তরের ছেলেমেয়েদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

(ট) কোন্ কোন্ বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থীরা সমাজের প্রয়োজনে আসবে এবং নিজেরাও উপকৃত হবে সে সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যের অভাব থাকায় শিক্ষার্থীরা সঠিক বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে না।

(ঠ) শিক্ষাদানের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও পরিবেশের সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রের কাজ কর্মের পদ্ধতি, বিষয় বস্তু ও পরিবেশের সামঞ্জস্যের অভাব থাকায় শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে সহজে খাপ খাওয়াতে এবং সফলকাম হতে পারে না।

(ড) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কারিগরি শিল্প ভিত্তিক কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলাফল সীমিত।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নঃ

৯.১০. দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংবদ্ধ করে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরীর পথ সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা সুপারিশ করিঃ

(ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করে তাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত স্থান দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে হাতের কাজের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে যাতে প্রথম হতেই শিক্ষার্থীরা হাতের কাজে অভ্যস্ত হয় এবং তাদের মনে কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জন্মে। মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োজন উপযোগী বৃত্তিমুখী শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমুখী শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

(খ) কারিগরি শিক্ষা পরিচালকের অধীনস্থ পঁয়ত্রিশটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর বৃত্তিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করা হোক। বর্তমানে এসব ইনষ্টিটিউটে অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, ফলে এগুলোর যথার্থ সদব্যবহার হচ্ছে না। অবশ্য বৃত্তিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করতে আরও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। কোন কোন স্থানে দু একটি শ্রেণী কক্ষ তৈরীর প্রয়োজন হতে পারে। ইনষ্টিটিউটগুলি প্রয়োজন মত বৈকালিক সান্ধ্যকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী এবং অন্যান্যদের জন্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে

সমাপনী ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে পারে। শিল্প পরিচালকের অধীনস্থ পাঁচটি বয়ন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বয়ন শিল্প ভিত্তিক বৃত্তিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করা প্রয়োজন। এ কেন্দ্রগুলিতেও বর্তমানে অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করতে এ কেন্দ্রগুলিতে আরও শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হবে। ঠিক একই পদ্ধতিতে শ্রম পরিচালকের অধীনস্থ টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলিতেও বৃত্তিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে তাদের বর্তমান সমাপনী শিক্ষাক্রমে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকই বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র। অন্য যে কোন শিক্ষাক্রমের তুলনায়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কার্যকারিতা এবং সাফল্য শিক্ষকের উপর অধিকতর নির্ভরশীল। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষকের অত্যন্ত অভাব। বেতনের হার নিম্ন হওয়ায়, যোগ্য ব্যক্তিরা শিক্ষকতা গ্রহণ করতে চান না। কারণ শিল্প কারখানায় তারা অধিক বেতন এবং সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রকৃত যোগ্য এবং দক্ষ কারিগরদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হলে বেতনের হার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে অন্ততঃ শিল্প কারখানায় চাকরীর সমতুল্য করতে হবে। পূর্ণকালীন শিক্ষকতার জন্য যোগ্য লোক পাওয়া না গেলে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিদের মেয়াদি চুক্তিতে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) বর্তমানে দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষক শিক্ষণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই অথচ এরূপ ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। তাই আমরা সুপারিশ করি যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশে অন্ততঃ দুটো বৃত্তিমূলক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হউক যাতে প্রতি বছর যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে নিয়োজিত হতে পারেন। যেহেতু এরূপ প্রশিক্ষণের আশু প্রয়োজন রয়েছে তাই আমরা আরও সুপারিশ করি যে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করে কোন একটি বা দুটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে এ কোর্স চালু করা হোক।

বৃত্তিমূলক শিক্ষক শিক্ষণের কোর্স ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ কমিটি ঠিক করবেন। এর মেয়াদ অন্ততঃ এক বছরের হওয়া প্রয়োজন। পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা কোর্স ছাড়াও বৃত্তিমূলক কোর্স হতে উত্তীর্ণ প্রার্থী এবং দক্ষ কারিগরগণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

(১) নির্ধারিত বৃত্তিমূলক বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ।

(২) শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ।

(৩) শিল্প কারখানায় বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন।

প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা পাবেনঃ

কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, বুনন শিল্প, প্রিন্টিং, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প, ললিতকলা, প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা ঐ জাতীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠান যথা, কৃষি পলিটেকনিক, কর্মাশিয়াল ইনষ্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, লেদার ইনষ্টিটিউট, সিরামিক ইনষ্টিটিউট ইত্যাদিতে করতে হবে। কারণ উপরে উল্লিখিত শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিতে উচ্চতর শিক্ষার যে সুপারিশ করা হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে তাঁর প্রত্যেকটির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে।

(ঙ) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে দেশের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তিন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তিন জন 'পরিচালকের অধীনে রয়েছে। এ-ব্যবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় এবং উৎকর্ষ সাধন দুরূহ হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে প্রসারিত, সুসংবদ্ধ এবং তার মান উন্নত করতে হলে দেশের যাবতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিভাগের আওতাধীনে আনা প্রয়োজন। চলতি পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক প্রসার এবং উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর মাত্র পাঁচ হাজার দক্ষ কর্মী তৈরী হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৮ সাল হতে আমাদের প্রতি বছর ত্রিশ হাজার দক্ষ কর্মী তৈরী করতে হবে। উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যতীত বৃত্তিমূলক শিক্ষার এত প্রসার সাধন করা সম্ভব হবে না।

(চ) বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম হতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। যারা একাদশ শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করবে তাদেরও ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। এরূপ শিক্ষার্থীদের পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের সান্ধ্যকালীন কার্যক্রমে ভর্তি করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে। উচ্চ শিক্ষার পথ খোলা থাকলে অধিক সংখ্যায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি-মূলক শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হবে বলে আমরা মনে করি। একাদশ শ্রেণীর বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা শিল্পে শিক্ষানবিসী সমাপনান্তে যারা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরও শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে, তাদের পাঠক্রম এবং পাঠ্যকাল 'ইকোভ্যালেন্স কমিটি' ঠিক করে দেবেন।

(ছ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রার্থীরা যাতে শিল্প কারখানা এবং কারিগরি সংস্থাসমূহে উপযুক্ত চাকরি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে।

(জ) শিল্পে শিক্ষানবিসী কার্যক্রমকে ব্যাপক ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কারণ এ ব্যবস্থাই দক্ষ কর্মী তৈরীর উত্তম পন্থা এবং এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের শিল্প কারখানায় চাকরির পথ সুগম হয়।

(ঝ) কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার সাধন করতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার ৮০% এর উপর গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তাই বৃত্তিমূলক শিক্ষা গণমুখী করতে হলে গ্রামাঞ্চলের উপযোগী বৃত্তিসমূহ নির্ধারণ করে স্থানীয় স্কুলসমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আমরা মনে করি। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে মহিলাদের প্রাথমিক স্কুলসমূহে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মাধ্যমিক স্কুলসমূহে অবিলম্বে এ কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঞ) বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ে দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বই বাংলা ভাষায় প্রকাশনের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যথায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারে সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। একেত দেশে দক্ষ কারিগরি শিক্ষকদের অভাব, তার উপর উপযুক্ত বই না থাকলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। বাজারে ইংরেজী ভাষায় সে সব বই রয়েছে তাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে এই ব্যাপারে ইউনেস্কো বা এ রকম অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। সে সব বৃত্তিমূলক বিষয়ে বিদেশী ভাষায় উপযুক্ত বই পাওয়া যায় না এ সব বিষয়ে বই লিখবার জন্য আমাদের দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত লোক

দেশে অনেক আছে। আকর্ষণীয় পারিশ্রমিকের দ্বারা তাদেরকে বই লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপযুক্ত বই পাওয়া গেলে অনেক বৃত্তিমূলক বিষয় লোকে ঘরে বসেও আয়ত্ত করতে পারবে। বইয়ের অভাবজনিত অবস্থা জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। গতানুগতিকভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে না এবং দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভবপর হবে না।

(ট) দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের একান্ত অভাব। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন এবং দেশে প্রস্তুত করণের জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান 'সরঞ্জাম উন্নয়ন ব্যুরো'-কে সঞ্জীবিত ও সম্প্রসারিত করতে হবে। পলিটেকনিক এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উপযোগী যন্ত্রপাতি ফার্নিচার ইত্যাদি তৈরী করার বিষয় বিবেচনা করতে আমরা সুপারিশ করি।

(ঠ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য এবং হাতে-কলমে শিক্ষা আরও কার্যকর করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উপযুক্ত কারখানা গড়ে তুলে তাতে "শিখ ও উপার্জন কর" ব্যবস্থার প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করতে আমরা সুপারিশ করি। এরূপ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণদানের ব্যয়ের কিছুটা উৎপাদনে রূপান্তরিত হবে। আমাদের দেশে অগণিত ছাত্রছাত্রী শুধু আর্থিক অভাবের দরুণ অতি অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 'শেখ ও উপার্জন কর' ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে এদের অনেকেই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে। আমরা আরও সুপারিশ করি যে ভবিষ্যতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতদূর সম্ভব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা:

৯.১১. অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে স্কুলের শিক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন না করেই স্কুল পরিত্যাগ করে চলে যায়। এ অসমাপ্ত শিক্ষা পরবর্তী কালে তাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ কোন কাজে আসে না এবং তারা পরিবারের তথা সমাজের বোঝা হয়ে থাকে। এসব স্কুল পরিত্যাগকারীদের জন্য এবং বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী বিশেষ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে সেখানে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে আমরা বিশেষ সুপারিশ করি। দেশের কয়েকটি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সাফল্যের সহিত পরচালিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা আরও প্রসারিত এবং সুসংবদ্ধ করতে হবে।

শিল্পে শিক্ষানবিশী কার্যক্রম:

৯.১২. শিল্পে শিক্ষানবিসী কার্যক্রম দক্ষ কর্মী তৈরীর উত্তম পন্থা হিসাবে বিশ্বের শিল্পায়িত দেশে পরিগণিত। ১৯৬৪ সালে আমাদের দেশে শিল্পে শিক্ষানবিসী কার্যক্রম (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এপ্রেনটিসশীপ স্কীম) এক অর্ডিনেন্সের মারফত প্রচলিত হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহা ব্যাপক ভিত্তিতে কার্যকরী হয় নাই। এ কার্যক্রমকে সঞ্জীবিত, সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক ভিত্তিক করে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান অর্ডিনেন্সে কিছু রদ বদল করা প্রয়োজন হবে। বৃত্তিমুখী শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের, অধিক সংখ্যায় এর মাধ্যমে দক্ষকর্মী করে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কার্যক্রমের এক বিশেষ দিক হল, প্রশিক্ষণ কালে শিক্ষার্থীরা শিল্প কারখানা হতে মাসিক ভাতা পায়, প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় শিল্পকারখানা বহণ করে এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তাদের চাকরির নিশ্চয়তা থাকে। আমরা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে শিল্প

কারখানা বা কারিগরি সংস্থায় কর্ম অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ কারণেই সকল উন্নত দেশে শিল্প কারখানা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা কর্ম অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায় না, ফলে বিভিন্ন স্তরের কারিগরি শিক্ষা পুরোপুরি ফলপ্রসূ হচ্ছে না। আমরা সুপারিশ করি যে এরূপ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা বিভাগ, শিল্প কারখানা এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শিক্ষানবিসী বোর্ড গঠন করা হোক। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হবে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, কারিগরি সংস্থা, ব্যবসা-বণিজ্য প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীদের কর্ম অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা। দেশের বিভিন্ন শহর ও শিল্পাঞ্চলে বোর্ডের শাখা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে। এ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারেও অত্যন্ত সহায়ক হবে।

৯.১৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষার আর্থিক দিকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সম্পদ খুবই সীমিত। দেশের অধিকাংশ লোক এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। জনসাধারণের জন্য নূন্যতম শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করতে হলে শিক্ষা খাতে এবং উন্নয়নমূলক কাজে প্রচুর অর্থ নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। এটা একটা জটিল পরিস্থিতি। তাই আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্প যথাযথভাবে দ্রুত রূপায়িত হয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত যুব সম্প্রদায় অনতিবিলম্বে কর্ম ক্ষেত্রে যোগদান করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সক্রিয় অংশ নিতে পারে।

৯.১৪. বর্তমানে দেশে বেকার সমস্যা প্রকট। তাই আমরা সুপারিশ করি যে, চাকরির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেশের বিভিন্ন স্থানে সমবায় সমিতি গঠন করে ছোট ছোট কারখানা এবং খামার গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হোক। এতে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হবে এবং দেশের উৎপাদন বাড়বে। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং উপদেশ দান করবেন এবং ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে অর্থ সরবরাহ করবে। এরূপ ব্যবস্থা অনেক দেশে চালু আছে। এ প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

৯.১৫. শিক্ষক-শিক্ষণ, কৃষি, ললিত কলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

সারাংশ

১। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা বৃত্তির যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন জাতি কৃষি, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য উৎপাদন ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার লাভের দ্বারা জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব। বৃত্তিমূলক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে অল্প সময় সাপেক্ষ এবং সেজন্য অল্পকালের ভেতরই এর ফললাভ করা যায়। (৯.১.)

২। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষার একটি ধারা হিসাবে প্রবর্তন করতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল, বৃত্তিমূলক স্কুল, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে বিভিন্ন কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, ললিতকলা, নার্সিং, প্যারামেডিকেল ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (৯.৪.—৬.)

৩। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এবং বহুসংখ্যক পুস্তক ও দক্ষ শিক্ষক সরবরাহের প্রয়োজন হবে। এজন্য দেশে যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে, পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনের কাজ হাতে নিতে হবে এবং অবিলম্বে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। (৯.১০.)

৪। কারিগরি শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বিভাগের আওতাধীনে আনতে হবে। (৯.১০.-ঙ)

৫। বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ মেধাবী প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। (৯.১০.-চ)

৬। "শিখ ও উপার্জন কর" ব্যবস্থা সম্বলিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করে দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্প কারখানার সহিত সংযুক্ত থাকলে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। (৯.১০.-ঠ)

৭। সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী এবং বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে এদেরকে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। (৯.১১.)

৮। বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষা সমাপনান্তে তাদের কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। আইন প্রণয়ন করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিসী কার্যক্রমের প্রবর্তন এবং শিল্প কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন কারিগরি সংস্থায় দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। (৯.১২.)

৯। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমবায় ভিত্তিতে ছোট ছোট কারখানা/খামার ইত্যাদি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে তাদের কর্ম সংস্থান সমস্যার আংশিক সমাধান করা যেতে পারে। (৯.১৪.)

অধ্যায় ১০

ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা

১০.১. ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল এমন এক শ্রেণী দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা যাঁরা কারিগরি ক্ষেত্রে নিজ হাতে দক্ষতার সাথে কাজ করার যোগ্যতার অধিকারী হবেন, শিল্প পদ্ধতি এবং কারিগরি বিষয়ের মৌলিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন এবং সুচারুরূপে শিল্প শ্রমিক পরিচালনায় সক্ষম হবেন। তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম এমন হবে যে পুঁথিগত জ্ঞানের দ্বারা তাঁরা ডিগ্রী প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের চিন্তাধারা হৃদয়ংগম করে দক্ষ শ্রমিকের নিকট ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন, এবং নিজেদের বাস্তব কারিগরি দক্ষতার দ্বারা শ্রমিকদের কাজের কার্যকরী তদারক ও পরিচালনা করে শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। এ ধরণের মধ্যম স্তরের জনশক্তিকে টেকনিশিয়ান বা টেকনিকেল সুপারভাইজার বলা হয়। তাঁরা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারদের সহকারী হিসাবেও কাজ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের পর অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও কাজ করতে সক্ষম হবেন।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাঃ

১০.২. বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এবং অনুরূপ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে এ শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বিশটি পলিটেকনিক এবং অনুরূপ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী নিম্নে উল্লিখিত ষোলটি বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষা নিচ্ছেঃ

১। অটোমোবাইল টেকনোলজি,
২। সিভিল টেকনোলজি,
৩। ইলেক্ট্রিকেল টেকনোলজি,
৪। মেকানিকেল টেকনোলজি,
৫। পাওয়ার টেকনোলজি,
৬। জুট টেকনোলজি,
৭। টেক্সটাইল টেকনোলজি,
৮। টেক্সটাইল কেমিকেল টেকনোলজি,
৯। ইলেকট্রোনিকস্ টেকনোলজি,
১০। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল উড টেকনোলজি,
১১। সার্ভে টেকনোলজি,
১২। আরকিটেকচারেল টেকনোলজি,
১৩। লেদার টেকনোলজি,
১৪। প্রিণ্টিং এণ্ড গ্রাফিক আর্ট টেকনোলজি,
১৫। কেমিকেল টেকনোলজি, এবং
১৬। ফার্ম টেকনোলজি।

প্রতি বছর প্রায় দু'হাজার শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করে বের হয়।

১০:৩. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ঢাকাস্থ আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে প্রতি বছর একশ' বিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে কতিপয় কারিগরি ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এ স্কুলে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের পর ১৯৫৮ সাল থেকে ডিপ্লোমা কোর্সে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে লেদার ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে চারটি কারিগরি ক্ষেত্রে একশ' বিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ঢাকায় চালু হয়। পলিটেকনিক এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে গত ১৮ বছরে ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষা বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করেছে। ১৯৫৮ সালে টেকনিশিয়ানদের প্রথম দল শিক্ষা সমাপন করে বের হয়। প্রথম দিকে কয়েক বছরে তাঁরা বেশ তাড়াতাড়ি এবং যথাযোগ্য চাকরি লাভ করে। কিন্তু গত কয়েক বছর টেকনিশিয়ানদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে এবং বর্তমানে দেশে কয়েক হাজার টেকনিশিয়ান বেকার রয়েছে বলে প্রকাশ। টেকনিশিয়ানদের বেকারত্ব এবং তার ক্রমবিস্তার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে।

১০.৪. ১৯৫৪ সালে যখন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠার প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তখন মনে করা হয়েছিল যে আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় বৃহদাকার শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং অনেক টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐ সময় দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই সীমিত ছিল। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) মাত্র একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল যেখানে প্রতি বছর মাত্র একশ' বিশ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হত। গত বিশ বছরে দেশে কিছু সংখ্যক বৃহদাকার শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে তবে আশানুরূপ সংখ্যায় হয়নি। ওদিকে এ সময়ের মধ্যে বিশটি পলিটেকনিক, তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তদুপরি গত স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের শিল্প কারখানাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কমে গেছে, যার ফলে শিল্প কারখানাসমূহে টেকনিশিয়ান এবং ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ দেশে উন্নয়নমূলক কাজের গতি মন্থর হয়ে যাওয়ায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্র অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে।

১০·৫· গত কয়েক বছরে সাধারণ শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে মানের অবনতির বিশেষ কারণগুলি নিম্নরূপ বলে প্রতীয়মান হয়ঃ

(ক) গত ৭/৮ বছরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। এসব ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেই চালু করতে হয়েছে। যন্ত্রপাতি, ওয়ার্কশপ, কারিগরি শিক্ষক প্রভৃতি দিক থেকে এখনও অসম্পূর্ণ এরূপ কয়েকটা পলিটেকনিক হতে এরই মধ্যে কয়েক দল ছাত্র শিক্ষা সমাপন করে বেরিয়ে গেছে। আবার অনেক স্থলে ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হয়েছে। গত কয়েক বছরে পলিটেকনিকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। শিক্ষক প্রশিক্ষণেরও তেমন উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কারিগরি শিক্ষাক্রম অনুসারে শতকরা ৬০ ভাগ সময় শিক্ষার্থীরা ওয়ার্কশপে এবং লেবরেটরীতে হাতে কলমে শিক্ষা নেওয়ার কথা, কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং দক্ষ শিক্ষকদের অভাবে হাতে কলমে শিক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের পুরো সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, ফলে শিক্ষা সম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

(খ) কারিগরি শিক্ষাক্রম হতে যথার্থ ফল লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তরের গণিত, রসায়ন বিদ্যা এবং পদার্থ বিদ্যায় ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব

ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বিজ্ঞান শাখার যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী না থাকায় মানবিক এবং অন্যান্য শাখার প্রার্থীরা, যাদের গণিত এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান খুবই সীমিত, কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

(গ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষকের অভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষকের শিল্প কারখানার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই এবং শিল্প কারখানায় কি ধরণের দক্ষতা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা নাই। তাছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। শিক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে শিক্ষার মান, বাস্তব অভিজ্ঞতা, শিক্ষকতার উপযোগিতা এবং কারিগরি দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

(ঘ) পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর চাকরির নিশ্চয়তা, পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা এবং উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা না থাকায় যথেষ্ট সংখ্যক মেধাবী ছাত্র এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে উৎসাহিত বোধ করে না। ফলে কম যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ভর্তি করতে হয়।

(ঙ) কারিগরি শিক্ষা বাস্তবমুখী এবং ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারিগর নিয়োগকারী সংস্হাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ অত্যাবশ্যক কিন্তু আমাদের দেশে এ রকম কোন যোগাযোগ গড়ে উঠেনি বল্লেই চলে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং মান উন্নয়নের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য কারিগরি সংস্হাসমূহ অতীতে এ ব্যাপারে প্রায় নিষ্ক্রয় ছিল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে তাদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। এতে কারিগরি শিক্ষাক্রম বাস্তব ভিত্তিক হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়ে পড়েছে। শিল্প কারখানায় সাফল্যের সহিত কাজ করতে হলে কি রকম দক্ষতার প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।

(চ) কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে উপযুক্ত বই এর একান্ত অভাব। বাজারে যে সামান্য সংখ্যক বই পাওয়া যায় সেগুলি ইংরেজী ভাষায় লিখিত এবং মূল্যের দিক থেকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। ইংরেজীতে লিখিত বই পড়ে শিক্ষার্থীরা তার বিষয়বস্তু ভালমত হৃদয়ংগম করতে পারে না। উপযুক্ত বই এবং দক্ষ কারিগরি শিক্ষকের অভাবে কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে কতটুকু কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করছে তা সহজেই অনুমেয়।

সুপারিশসমূহঃ

১০.৬. এ স্তরের কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির প্রতি অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া এবং কার্যকরী প্রতিকারমূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন তা নিম্নে দেওয়া হলঃ

(ক) **শিক্ষার মান উন্নয়নঃ**

কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্হাদি গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) পলিটেকনিক এবং এ জাতীয় অন্যান্য ইনষ্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ শুধু বৃত্তিমুখী এবং বিজ্ঞান শাখায় মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ দু' গ্রুপ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া না গেলে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্হা হিসাবে অন্যান্য গ্রুপের শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে, তবে তাদের বিজ্ঞান ও গণিতে অতিরিক্ত সময়ে বিশেষ কোচিং দেবার ব্যবস্হা করতে হবে। উপযুক্ত নির্বাচনী

পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার প্রতি তাদের মানসিক প্রবণতা আছে কিনা তাও বিবেচনা করা দরকার। প্রথম বর্ষের শিক্ষাক্রমে বৃত্তিমুখীন গ্রুপের শিক্ষার্থীদের গণিত এবং বিজ্ঞানে অধিক সময় দিতে হবে এবং বিজ্ঞানমুখী ও অন্যান্য গ্রুপের শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কশপ এবং অংকনের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে সকল গ্রুপের শিক্ষাক্রম একই হবে।

(২) যে সব ইনষ্টিটিউটে সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্য শিক্ষক ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কোন নতুন কোর্স চালু করা উচিত নয়।

(৩) পলিটেকনিকগুলিতে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার এবং বি-এড (টেকনোলজি) ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্ততঃ ৫০% করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে নিম্নমানের কিছু সংখ্যক পদ উচ্চ মানের পদে উন্নীত করতে হবে। ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রার্থীদের শিক্ষকতায় নিয়োগের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। সাফল্যজনক শিক্ষকতার জন্য ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কারিগরি জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আরও প্রসারিত ও উন্নত করে এর কার্যকারিতা বাড়াতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের শিল্প কারখানা বা অনুরূপ কারিগরি সংস্থার উপযুক্ত কর্ম অভিজ্ঞতা থাকা অত্যাবশ্যক। অন্ততঃ এক বছরের বাস্তব কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষকতায় নিয়োগ করা উচিত নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্য উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৪) বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক বই বাংলা ভাষায় প্রকাশনের ব্যবস্থা করে বই-এর অভাব জরুরী ভিত্তিতে মিটাতে হবে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান করতে বহু বছর লাগবে। বিভিন্ন স্তরের কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রের শিক্ষকদের আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে পুরো বেতনে ছুটি দিয়ে পুস্তক রচনা কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এসব পুস্তক প্রকাশনের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রে বই-এর চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

(৫) শিক্ষা কালে বা শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের শিল্প-কারখানা এবং কারিগরি কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিতে হবে। 'সেন্ডউইচ কোর্স' কিংবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধ্যায়ে বর্ণিত শিক্ষানবিশী প্রকল্পের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি পলিটেকনিকে সেন্ডউইচ কোর্স চালু করা যেতে পারে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে সেন্ডউইচ কোর্স চালু রয়েছে।

(ঋ) **কর্মসংস্থানঃ**

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে দেশে কয়েক হাজার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত টেকনিশিয়ান বেকার অবস্থায় আছে। প্রতি বছর প্রায় দু হাজার শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা নিয়ে বের হচ্ছে। এদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার থেকে যাচ্ছে। শিল্প-কারখানা উন্নয়ন ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক কার্যসূচী গৃহীত না হলে এদের মধ্যে এই বেকারত্ব আরও বিস্তার লাভ করবে। এ বেকার সমস্যা লাঘব করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করছিঃ

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যায়ে প্রস্তাবিত বৃত্তিমুখীন শিক্ষা বাস্তবায়িত করতে অনেক কারিগরি শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স থেকে উত্তীর্ণ টেকনিশিয়ানরা মাধ্যমিক স্কুলে বৃত্তিমুখী বিষয়সমূহের শিক্ষকতার উপযোগী বলে বিবেচিত হবেন। তবে তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের বাছাই করে তাদের এক বছর মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে ভর্তি করা হোক। এ কোর্সের ৪০% সময় শিক্ষা-পদ্ধতি বিষয়ে এবং ৬০% সময় কারিগরি দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনে ব্যয়িত হবে। কোন ভাল পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটেও এ প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।

(২) দেশের শিল্প-কারখানাসমূহে বিশেষতঃ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-কারখানাসমূহে টেকনিশিয়ানদের উপযোগী শূন্য পদসমূহ চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

(৩) পরিকল্পনা কমিশনের জনশক্তি বিভাগ দ্বারা দেশে বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের কারিগরি জনশক্তির চাহিদা নির্ধারণ করে তদনুযায়ী কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে বর্তমানে টেকনিশিয়ানদের চাহিদা কম, সে সব ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা আপাততঃ কমিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান যেমন রেলওে, বিমান, প্রতিরক্ষা বিভাগ, ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পৃথক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন না করে বর্তমান পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটগুলির সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করা উচিত।

(৫) সরকারী চাকরিতে কারিগরি ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত বিধায় স্বভাবতই তাদের মধ্যে নৈরাশ্য ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মনে করি অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে এদের পদোন্নতির সুযোগ প্রসারিত হওয়া উচিত।

(৬) কারিগরদের দেশের বিভিন্ন স্থানে সমবায় সমিতি গঠন করে ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা উচিত। এতে তাদের চাকরির সংস্থান হবে এবং দেশের উৎপাদনও বাড়বে। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এ ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং উপদেশ দান করবেন এবং ব্যাংক ঋণ হিসাবে অর্থ সরবরাহ করবে। এরূপ ব্যবস্থা অনেক দেশে চালু আছে।

শিক্ষাক্রমের সম্প্রসারণ ঃ

১০.৭. (ক) বর্তমানে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটগুলিতে কয়েকটি সীমিত বিষয়ে একই মেয়াদের (৩ বছর) কোর্স চালু আছে। আমরা মনে করি যে দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য আরো অনেক বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে টেকনিশিয়ান তৈরীর প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ গ্যাস টেকনোলজি, প্রডাকশন টেকনোলজি, ইনষ্ট্রুমেন্ট টেকনোলজি, ফুড টেকনোলজির উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব কোর্সের কোনটি স্বল্প-মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স হতে পারে আবার কোনটি তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সও হতে পারে। এতদ্ব্যতীত কর্মরত কারিগরদের জন্য প্রয়োজনমত খন্ডকালীন কোর্সেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকার আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করতে হলে বিপুল সংখ্যক কৃষি কারিগরের প্রয়োজন হবে। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব অল্প। বর্তমানে মাত্র দুটি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে

তিন বছর মেয়াদী ফার্ম টেকনোলজি কোর্স চালু আছে। আমরা সুপারিশ করি যে অন্যান্য পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে বিভিন্ন কৃষি কারিগরি কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করা হোক এবং কৃষি কারিগরদের সমবায় ভিত্তিতে খামার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করা হোক।

শিক্ষক-শিক্ষণঃ

১০.৮. ঢাকাস্থ কারিগরি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে কর্মরত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ শিক্ষাক্রম তিন বছর মেয়াদী এবং দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম বছরের শিক্ষা সমাপনান্তে ডিপ্লোমা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী দু'বছরের শিক্ষা সমাপনান্তে বি-এড (টেকনোলজি) ডিগ্রী দেওয়া হয়। পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের ব্যাপারে বি-এড (টেকনোলজি) ডিগ্রী, প্রকৌশল ডিগ্রীর সমতুল্য বলে গণ্য হয়। উপরোক্ত কলেজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম, যোগ্য শিক্ষক, লাইব্রেরী, ওয়ার্কসপ, ল্যাবরেটরী, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষকদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। এ কলেজকে সম্প্রসারিত ও উন্নীত করে এর কার্যকারিতা এরূপভাবে বৃদ্ধি করা হোক যেন এতে ডিপ্লোমা স্তরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া এ কলেজে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন সঞ্জীবনী (রিফ্রেসার্স) কোর্সও চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। কলেজটি সিরামিক ইনষ্টিটিউট ভবনের একাংশে অবস্থিত। এখানে এর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই কলেজটিকে কোন উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করা হোক।

পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাঃ

১০.৯. এ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল মধ্যস্তরের দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা, যারা শিক্ষা সমাপনান্তে টেকনিশিয়ান হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রম সমাপণী ধরণের করে তৈরী করা হয়েছে, ডিগ্রী স্তরে যাবার ধাপ হিসাবে তৈরী করা হয়নি। পলিটেকনিক হতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ অনেক দিন থেকে ডিগ্রী স্তরে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দাবী করে আসছে। কিন্তু পলিটেকনিক শিক্ষাকালে বিজ্ঞান ও গণিতে তারা যে জ্ঞান লাভ করে, ডিগ্রী স্তরে শিক্ষালাভের জন্য তা পর্যাপ্ত নয় বলে সরাসরি তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয় না।

১০.১০. পলিটেকনিক থেকে পাস করা কিছু সংখ্যক টেকনিশিয়ান বেশ মেধাবী এবং উচ্চ শিক্ষালাভের উপযোগী। এ সব মেধাবী টেকনিশিয়ানদের ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে সরকার এক অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা চালু করেছেন। এক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী টেকনিশিয়ানদের নির্বাচিত করে চল্লিশ সপ্তাহ ব্যাপী এক বিশেষ প্রিপারেটরী কোর্সে ভর্তি করা হয়। পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের শিক্ষাক্রম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা করে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি উপরোক্ত প্রিপারেটরী কোর্স তৈরী করেছেন। যারা এ কোর্স সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করে তাদেরকে ডিগ্রী কোর্সের তৃতীয় বর্ষে ভর্তি করা হয়। তারপর তারা নিয়মিত ছাত্রদের সাথে দু'বছর শিক্ষা গ্রহণ করে ডিগ্রী কোর্স সমাপ্ত করে। এই ব্যবস্থা আপাততঃ চালু থাকবে। পাঁচ বছর পর এই কোর্সের কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

১০.১১. আমরা আরো সুপারিশ করি যে উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও পলিটেকনিকের যে সব ছাত্র ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবে তারা সরাসরি অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে প্রকৌশল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নির্বাচনী পরীক্ষায় বসতে পারবে এবং প্রতিযোগিতায় সফল হলে ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে পারবে। এই পদ্ধতিতে যারা ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হবে তাদের জন্য খন্ডকালীন কোর্সেরও ব্যবস্থা থাকা উচিত। এতে অনেক কর্মরত টেকনিশিয়ান উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। এই খন্ডকালীন কোর্সের মেয়াদ স্বভাবতই নিয়মিত কোর্সের চেয়ে বেশী হবে। এরূপ খন্ডকালীন কোর্সের ব্যবস্থা পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে প্রচলিত আছে।

ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা

সারাংশ

১। ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল এমন এক শ্রেণী দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা যাঁরা কারিগরি ক্ষেত্রে নিজ হাতে দক্ষতার সাথে কাজ করার যোগ্যতার অধিকারী হবেন, শিল্প পদ্ধতি এবং কারিগরি বিষয়ের মৌলিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন এবং নিজেদের কারিগরি দক্ষতার দ্বারা শ্রমিকদের কাজের কার্যকরী তদারক ও পরিচালনা করে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারদের সহকারী এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের পর অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও কাজ করতে সক্ষম হবেন। (১০.১.)

২। উপরিউক্ত মানের কারিগরি জনশক্তি তৈরী করার জন্য ডিপ্লোমা কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য শুধু বিজ্ঞান গ্রুপ বা বৃত্তিমুখী গ্রুপে মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে। (১০.৬.-ক)

৩। ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি বাস্তবভিত্তিক করতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং কাচামালের অভাব দূর করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্প-কারখানা এবং কারিগরি সংস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (১০.৬.-ক)

৪। পলিটেকনিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার এবং বি-এড (টেকনোলজি) ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা অন্ততঃ ৫০% করতে হবে। তদুপরি শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং শিল্প-কারখানায় তাঁদের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ততঃ এক বছরের বাস্তব কারিগরি অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষকতায় নিয়োগ করা উচিত নয়। (১০.৬-ক, ১০.৮.)

৫। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে বইয়ের অভাব দূর এবং বাংলা ভাষায় বই প্রকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। (১০.৬-ক)

৬। ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের চাকরীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সমবায় ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কারখানা ও খামার গড়ে তুলতে তাদের উৎসাহিত এবং প্রয়োজন-বোধে ঋণ হিসাবে অর্থ সরবরাহ করতে হবে। দেশের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। (১০.৬-খ)

৭। সরকারী চাকরীতে কারিগরি ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের পদোন্নতির সুযোগ প্রসারিত করতে হবে। (১০.৬-খ)

৮। কৃষির উন্নতির জন্য ডিপ্লোমা স্তরের কৃষি কারিগরি কোর্স চালু করা প্রয়োজন। (১০.৭.)

৯। মেধাবী টেকনিশিয়ানদের ডিগ্রী স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এঁদের জন্য খণ্ডকালীন কোর্সেরও ব্যবস্থা থাকা উচিত। (১০.৯.)

অধ্যায় ১১

মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষাঃ

১১.১. বাংলাদেশে এখন ১,৪১২টি মাদ্রাসা রয়েছে, তন্মধ্যে ৪৫টি কামিল মাদ্রাসা, ৩০০টি ফাযিল মাদ্রাসা, ৩০২টি আলিম মাদ্রাসা এবং ৭৬৫টি দাখিল মাদ্রাসা। এ সব প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় চার লাখ এবং শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। এদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সংগে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন সংযোগ নাই। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা একটা পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থারূপে গড়ে উঠেছে। এদের বর্তমান স্তর বিন্যাস হচ্ছে নিম্নরূপঃ

> ইবতিদায়ী বা প্রাথমিক ৪ বছর, দাখিল ৬ বছর, আলিম ২ বছর, ফাযিল ২ বছর ও কামিল ২ বছর। ফাযিল পাসের পর ছাত্ররা সরাসরি উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসে ভর্তি হতে পারে।

১১.২. ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজী ও বাংলা মাদ্রাসার শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে ইসলামী শিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।

১১.৩. বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সর্বস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য যে আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি যে কোন একটি হতে পারে। তবে যারা ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা পড়বে না তারা সপ্তম শ্রেণী থেকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়বে। তদুপরি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি বিষয়ক শিক্ষাও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক ও সাধারণ উভয় কোর্সেই ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে স্থান পেয়েছে। মাদ্রাসাগুলিও তাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক জীবনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সংস্থা তাঁদের স্মারকলিপিতে মাদ্রাসা সংস্কারের যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে "জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরটিকে সমপরিসর ও একীভূত করা এবং পরবর্তী স্তরগুলিকেও সমপরিসর ও যথাসম্ভব সমন্বিত করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা"।

১১.৪. আমরা উক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সংগে একমত। আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদ্রাসা ছাত্রেরা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক 'ধর্মশিক্ষা' কোর্স পড়তে পারবে। এ কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত আবশ্যিক চারটি পাঠ্য বিষয় (বাংলা গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী) অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। এ শিক্ষার পরবর্তী স্তর বিন্যাস হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দু'বছরের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স। এ কোর্সগুলির নামকরণ এবং তাদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবেন। আমরা আশা করি এরূপ সংস্কারের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ টোলঃ

১১.৫. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা বর্তমানে টোল, সংস্কৃত কলেজ ও পালি কলেজে দেওয়া হয়।

১১.৬. হিন্দু ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫টি সংস্কৃত কলেজ ও ৮৭টি টোল ও চতুষ্পাঠী রয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, পৌরোহিত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের ছাত্র সংখ্যা মোট সাত হাজার। এখানে সপ্তম শ্রেণী থেকে ভর্তি আরম্ভ হয় এবং তিনটি কোর্সের মাধ্যমে পড়ানো হয়ঃ

আদ্য কোর্স	....	সপ্তম শ্রেণী থেকে দু বছর
মধ্য কোর্স	...	আদ্য কোর্সের পর চার বছর
উপাধি	...	মধ্য কোর্সের পর চার বছর

১১.৭. পালি ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার জন্য বর্তমানে দেশে মোট ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে ৪৩টি পালি টোল ও ২টি পালি কলেজ। এদের ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এখানেও তিনটি কোর্স প্রচলিত আছেঃ

পালি আদ্য	...	সপ্তম শ্রেণী থেকে তিন বছর
পালি মধ্য	...	আদ্য কোর্সের পর তিন বছর
পালি উপাধি	...	মধ্য কোর্সের পর তিন বছর

১১.৮. আমাদের প্রস্তাবিত আট শ্রেণীর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সংগে সংহতি রেখে টোল শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। টোলের আদ্য কোর্স সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু না করে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে এবং তার মেয়াদ হবে তিন বছর। এ কোর্সে নবম ও দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা অন্যান্যদের মতোই ধর্মশিক্ষার সংগে আবশ্যিক চারটি পাঠ্য বিষয় (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী) পাঠ করবে। পরবর্তী কোর্সগুলির পরিসর হতে হবে ক্রমান্বয়ে ভিন্ন বছরের এবং দু বছরের। এসব কোর্সের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা

সারাংশ

১। মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুর্ণগঠন প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মাদ্রাসাগুলিতে একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সবস্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা যেমন, ইংরেজী, আরবী ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। তবে যারা ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়বে না তারা সপ্তম শ্রেণী থেকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়বে।

২। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে ধর্মশিক্ষা পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। এই স্তরের সাধারণ কোর্সে ও ধর্মশিক্ষা একটি ঐচ্ছিক বিষয়রূপে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। আট বছর বেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদ্রাছার ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী 'বৃত্তিমূলক' ধর্মশিক্ষা কোর্স পড়তে পারবে। এ-কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে তাদেরকে বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী এ চারটি আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করতে হবে। এ শিক্ষার পরবর্তী স্তর বিন্যাস হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং দু'বছরের পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স। (১১.৩.—১১.৪.)

৩। প্রস্তাবিত আট শ্রেণীর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সঙ্গে সংহতি রেখে হিন্দু ও বৌদ্ধ টোল শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। টোলসমূহের আদ্য কোর্স সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু না করে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে এবং তার মেয়াদ হবে তিন বছর। এ কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা অন্যান্যদের মতোই ধর্মশিক্ষার সঙ্গে আবশ্যিক চারটি পাঠ্য বিষয়, বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজী পাঠ করবে। পরবর্তী কোর্সগুলিতে পরিসর হবে ক্রমান্বয়ে তিন বছর এবং দু' বছর। (১১.৫.—১১.৮.)

অধ্যায় ১২

শিক্ষক-শিক্ষণ

শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্বঃ

১২.১. জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা যে একটি পেশা এবং অন্যান্য পেশার ন্যায় এর জন্যও যে উপযুক্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন—এ সত্যটি এখনও আমাদের দেশে পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করেনি। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহ, উপকরণ ও অন্যান্য ব্যাপারে নিয়োজিত সম্পদ সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও মান উন্নয়নকল্পে সুসংবদ্ধ অভিযান চালাতে হবে। একথা স্মরণীয় যে মানুষ গড়ার কারিগররূপে শিক্ষকের যে দায়িত্ব তা সুসম্পন্ন করতে শিক্ষককে যে শুধু প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে তা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য পাঠদানে তাঁর বিশেষ দক্ষতাও থাকতে হবে। সর্বোপরি কোমলমতি বালক-বালিকাদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গুণাবলীর অধিকারী হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে কাজের নিরাপত্তা ও মানসিক তৃপ্তির ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষকতায় যোগ্য ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা কঠিন। এছাড়া উন্নত রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের যে সকল আধুনিক রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলিকে প্রয়োজনমত প্রয়োগ করে আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণের অতীত ও বর্তমানঃ

১২.২. শুরুতে এ উপমহাদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ বলতে শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান না বুঝিয়ে বরং সাধারণ বিষয় যেমন বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাসে জ্ঞানলাভ বুঝাত। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম শিক্ষক-শিক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬৯ ও ১৮৮২ সালে যথাক্রমে কুমিল্লা ও রংপুরে আরো দু'টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। কুমিলাস্থ নর্মাল স্কুলটি ১৮৮৫ সালে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকতা করার জন্যে গ্রাজুয়েটদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেন। ১৯০৯ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা ও শিক্ষা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাইমারী শিক্ষক-শিক্ষণঃ

১২.৩. ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক তৈরীর জন্য দু' প্রকারের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল যথা, প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টার। এদের পূর্বে বলা হত গুরু ট্রেনিং স্কুল এবং মোয়াল্লেম ট্রেনিং স্কুল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল নিম্ন মানের—ভর্তির যোগ্যতা ছিল মধ্য বাংলা পাস।

প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটঃ

১২.৪. প্রাইমারী শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য ১৯৫১ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চারটি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় প্রবেশিকা পাস। ক্রমে ক্রমে এ স্তরের নিম্ন মানের শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুলগুলির অবলুপ্তি

ঘটে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৭টি সরকারী প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট রয়েছে। এছাড়া, ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজেও বি,এড কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে পি, টি, আই কোর্স পড়ানো হয়। নিম্নের সারণীতে ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের ৪৭টি পি, টি, আই-তে মোট শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

সারণী-১২(ক): ১৯৭২-৭৩ সালে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা।

প্রতিষ্ঠান।	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।	স্তর।	শিক্ষার্থী।	শিক্ষক।
প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট	৪৭	প্রাথমিক	৬,৭৫০ (মহিলা : ১,০০০)	৫৮০ (মহিলা : ২০)
কলেজ অব এডুকেশন	*৬	মাধ্যমিক	৬৭৩ (মহিলা : ১০৩)	৩৬ (মহিলা : ৭)
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ..	৬	মাধ্যমিক	১,৫৫০ (মহিলা : ৪২৫)	৯৮ (মহিলা : ২৪)

*ঢাকাস্থ কবি নজরুল কলেজসহ।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষণ:

১২.৫. ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর (৬ষ্ঠ হ'তে ৮ম শ্রেণী) শিক্ষকদের শিক্ষণ নর্মাল স্কুলে দেওয়া হত এবং শিক্ষণ কালের মেয়াদ ছিল দুই বছর। ১৯৫২ সালের পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে নর্মাল স্কুলগুলিকে জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত করা হয়, তবে কোর্সের মেয়াদ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজগুলির টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির ন্যায়ই পাঠক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল এবং এদের প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলা হত "উচ্চতর শিক্ষা সার্টিফিকেট"। ১৯৬৭ সাল হ'তে উক্ত কলেজগুলির পরীক্ষা পরিচালনার ভার শিক্ষাবোর্ডগুলির উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সার্টিফিকেটের নতুন নামকরণ হয় "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট"। ফলে জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজগুলির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে বহিঃপরীক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাগত বৈশিষ্ট্যও বহুলাংশে লোপ পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসার পূর্বে জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজগুলির কোর্স ছিল প্রান্তিক। অপরদিকে সেকেণ্ডেরী স্কুলের নিম্ন ক্লাসের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবধা আকর্ষণীয় ছিল না বলে কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পায়। শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাগত বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে লোপ পেলেও কোর্সটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে কেননা সফলকাম শিক্ষার্থীরা প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ পায়। কিন্তু এতদসত্বেও ইপ্সীত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। মাধ্যমিক স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর জন্য শিক্ষক তৈরী করাই ছিল এ কলেজগুলির মূল উদ্দেশ্য অথচ দেখা গেল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আনার পর হ'তে কোর্সটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলে শিক্ষকতা করার প্রবণতার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা লাভের দিকেই প্রবল ঝোঁক দেখা দেয়। কলেজগুলির নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা—ফ্রি টিউশন, বৃত্তি ও ছাত্রাবাস শুধু উপরোক্ত ঝোঁক

চরিতার্থ করার জন্য ইন্ধন যোগায়। বলা বাহুল্য জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজগুলির বাইরেও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রুপভুক্ত উক্ত কোর্সটির একই দশা ঘটে। ১৯৭২ সাল হ'তে জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজগুলিকে (ঢাকাস্থ কবি নজরুল কলেজসহ) কলেজ অব এডুকেশনে রূপান্তরিত করে তিন বছর মেয়াদী ব্যাচেলার-ইন-এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এ কলেজগুলিতে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হ'ল দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস। এছাড়া ছয়টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক তৈরী করা হয়। এ কলেজগুলির কোর্সের মেয়াদ হ'ল দশ মাস এবং ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হ'ল গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী। সারণী ১২(ক)-তে ১৯৭২-৭৩ সালে কলেজ অব এডুকেশন ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

এছাড়া একটি কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, একটি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণে ব্যাপৃত রয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এদের বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষার্থী সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য সারণী ১২(খ)-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরণী-১২(খ): ১৯৭৩-৭৪ সালে শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও অন্যান্য তথ্য।

প্রতিষ্ঠানের নাম।	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।	কোর্সের নাম।	শিক্ষার্থীর সংখ্যা।	কোর্সের মেয়াদ।	ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা।
শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট।	১	(ক) এম, এড এক বছর মেয়াদী	৪৮	১ বৎসর	বি, এড।
		(খ) এম, এড দুই বছর মেয়াদী	১৫১	২ ,,	গ্রাজুয়েশন।
		পি, এইচ, ডি	১	২ ,,	এম, এড।
কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, ঢাকা।	১	বি, পি, এড	৮৯	১ ,,	গ্রাজুয়েশন।
		ডিপ্লোমা-ইন-ফিজিক্যাল এডুকেশন।	১১৩	১ ,,	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।	১	ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন (টেকনোলজি)	—	১ ,,	পলিটেকনিক ডিপ্লোমা।
		বি, এড (টেকনোলজি)।	৫০	২ ,,	ডিপ, ইন-এড (টেকনোলজি)।

পেশাগত শিক্ষা ও কার্যরত শিক্ষক-শিক্ষিকা:

১২.৬. সারণী-১২(গ) অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে মোট ১,৫৪,০০০ শিক্ষক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৫৫·৩ শতাংশ শিক্ষণপ্রাপ্ত। মাধ্যমিক স্তরে রয়েছেন মোট ৮২,০০০ জন শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত আছেন মাত্র ১৯ শতাংশ।

সারণী-১২(গ)ঃ ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা।

স্তর।	স্কুল।	স্কুলের সংখ্যা।	শিক্ষার্থীর সংখ্যা।	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা।	শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা।	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত।
প্রাথমিক (১ম—৫ম শ্রেণী)	প্রাথমিক	৩৮,০০০ (বালিকা: ১,৬০০)	৭২,০০,০০০	১,৫৪,০০০ (শিক্ষিকা ৪,০০০)	৮৫,১৩৩ (৫৫ ৩%)	১ : ৪৭
	জুনিয়র হাই স্কুল (৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী)।	২,৩০০ (বালিকা: ৩৭৪)	৩,০০,০০০ (ছাত্রী: ৩০,০০০)	১৭,১৮৬ (শিক্ষিকা: ২,২৪৪)	১৫,৬৯৬ (১৯%)	১ : ২৩
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ—১০ম শ্রেণী)	হাই স্কুল (৬ষ্ঠ—১০ম শ্রেণী)	৫,৫০০ (বালিকা: ৫০০)	১৫,৫৯,০০০ (ছাত্রী: ১,৭৫,০০০)	৬৪,৮১৪ (শিক্ষিকা: ৮,১০০)		

শিক্ষক সরবরাহঃ

১২.৭. **প্রক্ষেপণের (প্রজেকশন) অসুবিধাঃ** আমাদের দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক প্রক্ষেপণের পথে নানাবিধ অনিশ্চয়তাজনিত অন্তরায় রয়েছে। এ অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রগুলি হলঃ

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা;
(খ) শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ বিনিয়োগ;
(গ) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সঠিক সময় সীমা নির্ধারণ;
(ঘ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত অনুপাত, এবং
(ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্বাসযোগ্য, তুলনামূলক ও সমকালীন তথ্য।

এতদসত্ত্বেও পূর্বনির্ধারিত জাতীয় লক্ষ্য এবং জনসম্পদের চাহিদার ভিত্তিতে প্রস্তুত মোটামুটি হিসাবও শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা পরিকল্পনার পক্ষে উপযোগী।

১২.৮. **প্রাথমিক স্তরঃ** আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল হতে ১৯৮০ সালের মধ্যে ১ম শ্রেণী হ'তে ৫ম শ্রেণী এবং ১৯৮১ সাল হতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সারা দেশে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১ম হ'তে ৫ম শ্রেণী ও ৬ষ্ঠ হ'তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য পাঁচ বছরে যথাক্রমে প্রায় ৯৬,০০০ ও ৪৫,০০০ অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে।

১২.৯. **প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণঃ** বর্তমানে ৪৭টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বার্ষিক প্রায় আট হাজার শিক্ষক তৈরী করতে সক্ষম। তদ্রূপ ছয়টি কলেজ অব এডুকেশন একযোগে প্রতি বছর দুই হাজারেরও বেশী শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা করতে পারে।

অতএব ১৯৭৬ সাল হতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে (১ম শ্রেণী হ'তে ৮ম শ্রেণী) সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলকরূপে চালু করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে তাঁদের জরুরীভিত্তিক দুই মাস মেয়াদী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেবার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে [সারণী-১২(ঘ) দ্রষ্টব্য]। জরুরীভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষক নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও শারীরিক যোগ্যতা এবং প্রবণতা যথাযথভাবে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন যেন ভবিষ্যতে পুরো শিক্ষণ গ্রহণের পর এঁদের চাকুরিতে স্থায়ী নিযুক্তির ব্যাপারে অসুবিধা না ঘটে।

সারণী-১২(ঘ): প্রাথমিক স্তরে (১ম হতে ৮ম শ্রেণী) অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী (১৯৭৬—৮০) শিক্ষকদের জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী।

শিক্ষা স্তর।	প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শিক্ষকের সংখ্যা (শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ৪০)।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।	প্রতি বছর পাঁচটি দলে বার্ষিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা।	পাঁচ বছরে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা।
১ম—৫ম শ্রেণী ..	৯৬,০০০	পি, টি, আই (৪৭)	৪৭×৮৫×৫ =১৯,৯৭৫	১৯,৯৭৫×৫ =৯৯,৮৭৫
৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী ..	৪৫,০০০	কলেজ অব এডুকেশন (৬)	৬×১০০×৫ =৩,০০০	৩,০০০×৫ =১৫,০০০
		টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (৬)	৬×২০০×৫ =৬,০০০	৬,০০০×৫ =৩০,০০০
		শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র (১)	১×৮০×৫ =৪০০	৪০০×৫ =২,০০০

(ক) ৪৭টি পি, টি, আই-এ ১ম হ'তে ৫ম শ্রেণীর ৯৬,০০০ শিক্ষকের জন্য দু' মাস মেয়াদী সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে। প্রতিটি পি, টি, আই-এ বছরে পাঁচটি দলে (প্রতি দলে ৮৫ জন) মোট ৪২৫ জন শিক্ষক এবং এভাবে ৫ বছরে প্রতি পি, টি, আই-এ ২,১২৫ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। অনুরূপভাবে পি, টি, আইগুলিতে পাঁচ বছরে সর্বমোট ৯৯,৮৭৫ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। স্বাভাবিক অপচয়জনিত শিক্ষক ঘাটতি মেটাবার জন্যও উক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে।

(খ) ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় মোট ৪৫,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে দেশের কলেজ অব এডুকেশন ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিতে এবং বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে দুই মাস মেয়াদী বছরে পাঁচটি করে খণ্ডকালীন/সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে। এভাবে ছয়টি কলেজ অব এডুকেশন, ছয়টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও একটি শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে পাঁচ বছরে যথাক্রমে ১৫,০০০ (প্রতি কলেজে প্রতি দলে ১০০ জন করে বছরে ৫০০ জন), ৩০,০০০ (প্রতি কলেজে প্রতি দলে ২০০ জন করে বছরে ১,০০০ জন) এবং ২,০০০ (প্রতি দলে ৮০ জন করে বছরে ৪০০ জন) জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে।

(গ) জরুরী ভিত্তিতে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণরত শিক্ষকগণ দিনের বেলায় যে সকল স্থানীয় স্কুলে ব্যবহারিক পাঠদানের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকবেন, প্রয়োজনবোধে ঐসব স্কুলে ডবল শিফট চালু করতে হবে। জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে না থাকা বিধায় তাঁদের জন্য স্থানীয় অন্যান্য স্কুল ও কলেজের ছাত্রাবাস, কমিউনিটি সেন্টার এবং স্থানীয় উৎসাহী জনসাধারণের আবাসিক সুবিধা ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের জন্য যে নয়টি রিফ্রেসার্স কোর্স ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে, তাদের শিক্ষক এবং আবাসিক সুবিধা উপরোক্ত জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভবপর। আমাদের প্রস্তাবমতে যে সকল নির্বাচিত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে, সে সব প্রতিষ্ঠানেও জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনঃ

১২.১০. মাধ্যমিক স্কুলের নবম হ'তে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে সকল বৃত্তি প্রবর্তনের জন্য আমরা সুপারিশ করেছি তন্মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ অন্যতম। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন এরূপ কিছু সংখ্যক নির্বাচিত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে। এ-কোর্স সফলতার সঙ্গে পাস করার পর একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্কুলের ১ম হ'তে ৫ম শ্রেণীতে শিক্ষকতা করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে আমাদের নারী সমাজ শিক্ষকতাকে পেশারূপে গ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ পাবেন। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে প্রাইমারী স্তরের শিক্ষকতায় মহিলারাই সংখ্যায় অত্যধিক। অথচ আমাদের দেশে এ সংখ্যা হ'ল মাত্র তিন শতাংশ। বলা বাহুল্য মহিলারা স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ বিধায় এ স্তরে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য পুরুষদের চেয়ে তাঁরাই অধিকতর উপযুক্ত। তদুপরি দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন, উপরোক্ত কোর্স এ চাহিদা মেটাতেও সহায়ক হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৫৭ সালের শিক্ষা কমিশনও অনুরূপ শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নেও সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রাইমারী স্তরের ভাবী শিক্ষিকাদের জন্য তিন হতে চার বছর স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চালু রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রাইমারী স্তরে শিক্ষিকার সংখ্যা বাড়াবার জন্য ইউনেস্কোর (১) নিম্নলিখিত সুপারিশগুলিও গ্রহণ করা উচিতঃ

(ক) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ভর্তির যোগ্যতা ও বয়স হ্রাস করা।
(খ) সমুদয় মহিলা স্কুলে শুধু শিক্ষিকা নিয়োগ করা।
(গ) শিক্ষিকাদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।
(ঘ) শিক্ষণকালে মহিলাদের বেতন/বৃত্তি দেওয়া।

(১) ই, এ, পিয়ারে : প্রাইমারী টিচার ট্রেনিং ইন এশিয়া—পৃষ্ঠা ২৫—২৬।

(ঙ) শিক্ষিকাদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করা।

(চ) অনুন্নত অঞ্চল ও পল্লীগ্রামের শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ বেতনের ব্যবস্থা করা।

(ছ) শারীরিক সুস্থ ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলাদের শিক্ষিকারূপে নিয়োগ করা।

(জ) যদি স্বামী-স্ত্রী চাকুরে হন, তবে তাঁদের একই স্থানে নিয়োগ করা।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক তৈরী:

১২.১১. আমাদের প্রস্তাবিত নূতন পাঠক্রম প্রবর্তনের জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষকদের জরুরী-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উপর ন্যস্ত থাকবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা:

১২.১২. বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষক তৈরী একটি জরুরী ও কঠিন দায়িত্ব। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

(ক) দেশের কতগুলি নির্দিষ্ট পেশাগত কারিগরি প্রতিষ্ঠানে (চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজ, ঢাকাস্থ টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজি, সিরামিক ইনষ্টিটিউট, গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট, সরকারী কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট, হোম ইকনমিকস্ কলেজ, কৃষি কলেজ, চারু ও কারুকলা কলেজ, নির্দিষ্ট পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি) শিক্ষা বিভাগ খুলে শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা।

(খ) বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য যে সকল কোর্স চালু রয়েছে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করা।

(গ) টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কলেজ অব এডুকেশন এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষক তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১২.১৩. ঢাকাস্থ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কারিগরি ইনষ্টিটিউটগুলির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স ও দু' বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স চালু রয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব ভবন, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি না থাকার ফলে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন। সুতরাং কলেজটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে এর কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

১২.১৪. সারা দেশে মাত্র একটি কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন রয়েছে। কলেজটিতে দু'টো কোর্স পড়ানো হয়—গ্রাজুয়েটদের জন্য এক-বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স এবং আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের জন্য একই মেয়াদের ডিপ্লোমা কোর্স। বর্তমানে কলেজটি নানা অসুবিধার সম্মুখীন। নিম্নোক্ত উপায়ে এই অসুবিধাগুলি দূর করা উচিত:

(১) অনতিবিলম্বে একটি সুইমিং পুল নির্মাণ করা;

(২) মিলনায়তন ও প্রোজেকসন রুমের ব্যবস্থা করা;

(৩) ছাত্রীদের জন্য আলাদা জিমনেসিয়াম তৈরী করা।

বর্তমান কলেজের পাশেই জায়গা খরিদ করে মেয়েদের জন্য একই প্রশাসনের অধীনে পৃথক গৃহ নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। এতে একদিকে অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষক ও শিক্ষিকা তৈরী করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে একই প্রশাসনের অধীন থাকায় অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা মিলিতভাবে

ব্যবহার করার ফলে ব্যয় সংকোচ হবে। রাজশাহীতে নির্মীয়মান শারীরিক শিক্ষা কলেজের কাজ ত্বরান্বিত করা উচিত। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনবোধে আরো অনুরূপ দু'টি কলেজ দেশের অন্যত্র স্থাপন করা আবশ্যক।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পাঠক্রমঃ

১২.১৫. যদিও উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হ'ল মাধ্যমিক স্তরের বিবিধ বিষয়ের জন্য শিক্ষক তৈরী করা কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে বর্তমানে তারা তাদের এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বহু-মুখী শিক্ষাক্রম চালু করার ফলে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয় যেমন বিশেষ বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পকলা, বাণিজ্য, গার্হস্থ্যবিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হয় অথচ এ কলেজগুলিতে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষণের সত্যিকার কোন ব্যবস্থাই নাই। উক্ত কলেজে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভের জন্য যে-কোন দু'টি স্কুল বিষয় নির্বাচন করতে হয় কিন্তু এ নির্বাচন এখন পর্যন্তও চিরাচরিত বিষয়গুলি যেমন, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ কলেজগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পদ্ধতি এখনও সাধারণ বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ যদিও স্কুলে বিশেষ বিজ্ঞান, যেমন রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, জীব বিদ্যা এবং নৈর্বাচনিক গণিত পড়ানো হয়। কিন্তু উক্ত কলেজগুলিতে এসব বিষয়ে শিক্ষক তৈরীর কোন ব্যবস্থাই নাই। ময়মনসিংহ মহিলা ট্রেনিং কলেজে শুধু প্রাথমিক গার্হস্থ্যবিদ্যা পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। ইদানিং কমার্স গ্রাজুয়েটরা এ কলেজগুলিতে ভর্তি হচ্ছে অথচ স্কুল পর্যায়ের বাণিজ্য বিষয়াদী—মুদ্রাক্ষর ও সর্টহ্যান্ড, বুক কিপিং, ব্যবসা ও বাণিজ্যলিপি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি শেখাবার কোন ব্যবস্থাই কলেজগুলিতে নাই। অগত্যা কোন প্রকারে শিক্ষক-শিক্ষণে ডিগ্রী লাভের খাতিরে অনন্যোপায় হয়ে এসব কমার্স শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়, যেমন ইতিহাস, বাংলা ইত্যাদিতে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিখতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে একজন শিক্ষার্থী এমন দু'টি বিষয়ে শিক্ষণ পদ্ধতিগত জ্ঞানলাভ করবে যে বিষয় দু'টি সে গ্রাজুয়েশন স্তর পর্যন্ত পড়েছে। কেননা কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ঐ বিষয়ে শুধু শিক্ষণ পদ্ধতি শিখে তার পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। অথচ কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের এমন বিষয়েও শিক্ষণ পদ্ধতি শিখতে অনুমতি দেওয়া হয়, যা তারা গ্রাজুয়েশন পর্যায়ে পড়েনি। এ সম্পর্কে ভূগোলের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সব শিক্ষার্থী ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতি শিখে তাদের অধিকাংশের ভূগোলের জ্ঞান প্রবেশিকা স্তরে সীমাবদ্ধ। অনুরূপ-ভাবে উক্ত কলেজগুলিতে সমাজবিদ্যায়ও শিক্ষক তৈরীর কোন ব্যবস্থা নাই।

কলেজগুলির বর্তমান পাঠক্রমের একটি বড় ত্রুটি হল পেশাগত বিষয়গুলির পাঠ্যসূচী অত্যন্ত সেকেলে ও অবাস্তব। এছাড়া, যেহেতু ভিন্ন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে লেখা বিদেশী পাঠ্য বইগুলিই প্রধানতঃ পড়ানো হয়, সেজন্য এরূপ লব্ধজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিক্ষক জীবনে বিশেষ সহায়তা করে না।

শিক্ষক-শিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বর্ধনঃ

১২.১৬. বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের নিয়মিত পেশাগত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিতঃ

(ক) প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটগুলির সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা, শ্রেণীকক্ষ, হোষ্টেল, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরী, শিক্ষকদের বাসগৃহ ইত্যাদি এরূপভাবে বর্ধিত করা যাতে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভবপর এবং শিক্ষাভবনের ব্যাপারে ব্যয় সংকোচের খাতিরে আধা-স্থায়ী গৃহ তৈরী না করে টিনের চালযুক্ত স্থায়ী একাধিক তল-ভিতবিশিষ্ট ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের উপযোগী পাকাগৃহ নির্মাণ করা।

(খ) শুধু মহিলাদের জন্য কতিপয় প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা এবং অন্যান্য পি. টি. আইগুলিতে তাঁদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ করা।

(গ) যেহেতু বর্তমানে ঢাকা শহরে কোন পি, টি, আই নাই, সেহেতু তথায় একটি পি, টি, আই স্থাপন করা।

(ঘ) টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলি এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা এবং অনতিবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা বিভাগ চালু করা ও কালক্রমে একে একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে পরিণত করা।

(ঙ) প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষণ তত্ত্বকে আধুনিক ও দেশোপযোগী করা; বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষণে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার একান্তই অভাব বিধায়, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করে পাঠ্য বই লেখার সুযোগ দেওয়া।

১২.১৭. ভাবী শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণে তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বহস্তে নানাবিধ শিক্ষা উপকরণ নির্মাণসহ হাতের কাজ শিখতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত শিক্ষক, ওয়ার্কশপ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই পরীক্ষা পাশের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ—চার্ট, মডেল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিজেরা তৈরী না করে বাজারের তৈরী জিনিষ জমা দিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে আমরা সুপারিশ করি যে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা-উপকরণ ও হস্তশিল্প স্বহস্তে তৈরী করতে শিখে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিক্ষক-শিক্ষণে নতুন দিগন্ত:

১২.১৮. এ উপমহাদেশে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভের পর পর্যায়ক্রমিক দশ-মাস স্থায়ী শিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছিল। এ শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সের ত্রুটির জন্য পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় এমনকি ইংল্যাণ্ডেও বহুকাল ধরে তিন-বছর স্থায়ী যুগপৎ বিষয়কেন্দ্রিক ও পেশাভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। এ কোর্সের প্রধান লক্ষ্য হ'ল ভাবী শিক্ষককে পেশাগত জ্ঞান দানের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি বিশেষ স্কুল বিষয়ে শিক্ষণ পদ্ধতিসহ পারদর্শী করে তোলা। এছাড়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষণ লাভের ফলে শুধু যে শিক্ষকতার জন্য তাঁর পক্ষে বাঞ্ছিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব তা নয়, বরং পেশার প্রতি তাঁর অনুরাগও বৃদ্ধি পায়। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য এগার-বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষার পর শিক্ষক শিক্ষণে তিন-বছর স্থায়ী যুগপৎ ডিগ্রি কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। এ সুপারিশের সঙ্গে আমরাও একমত। দেশের পাঁচটি জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজকে ১৯৭২ সাল হ'তে তিন-বছর মেয়াদী ডিগ্রী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সরকারের এ সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের মতে এ কলেজগুলির সামনে, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের শিক্ষক তৈরীর আশু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে এ-কলেজগুলি যথোপযুক্ত গৃহ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরী, ছাত্রাবাস ইত্যাদির অভাবহেতু ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন। সুতরাং আমরা সুপারিশ করি যে দেশে শিক্ষক-শিক্ষণের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়নের খাতিরে অচিরেই উক্ত কলেজগুলিকে পুরোপুরি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করে তাদের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সরকারের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের মতে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরণের আরো শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। এছাড়া টিচার্স

ট্রেনিং কলেজের দশ-মাস স্থায়ী বর্তমান কোর্সটি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বিধায় এর স্থলে ক্রমে ক্রমে কলেজ অব এডুকেশনের ন্যায় তিন-বছর স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

কর্মরতাবস্থায় প্রশিক্ষণঃ

১২.১৯. শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে পেশা-পূর্ব শিক্ষণের ন্যায় কর্মরত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। সাধারণ রীতি হল পুরো শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের অন্ততঃ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেন তাঁরা নিত্য-নতুন জ্ঞান ও পদ্ধতির সংগে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হন। যেহেতু আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পেশা-পূর্ব শিক্ষণ নাই, তাই তাঁদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

প্রাইমারী পর্যায়ঃ বর্তমানে এ পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। বহুদিন পূর্বে স্থাপিত নয়টি রিফ্রেশার কোর্স ট্রেনিং সেন্টারে প্রধানতঃ নন-মেট্রিক ও ট্রেনিংবিহীন শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস নির্ধারিত হওয়ার ফলে এ-সকল সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, অফিস, ষ্টাফ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে এগুলির অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। তাই এ-সব সেন্টারে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত করা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব এ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্বোল্লিখিত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যে ব্যবহার করার পর, পি, টি, আই সংলগ্ন সেন্টারগুলিকে সংশ্লিষ্ট পি, টি, আইগুলির ষ্টাফকে অন্যত্র বদলি করা যায়।

কর্মরত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভার প্রধানতঃ প্রস্তাবিত প্রাইমারী শিক্ষা একাডেমিকেই নিতে হবে। এছাড়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পি, টি, আইগুলিও এ-ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

১২.২০. **মাধ্যমিক পর্যায়ঃ** মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের কর্মরতাবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ হ'ল ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন। ১৯৬০ সাল হতে এ-পর্যন্ত কেন্দ্রের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণী-১২(ঙ)-তে দেওয়া হয়েছে। যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রের সম্প্রসারণ হওয়া উচিত এবং এর কার্যক্রম মহকুমা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তদুপরি রাজশাহী বিভাগে একটি নতুন শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে বর্তমান কেন্দ্রের দু'টি উপ-কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিও যেন এরূপ প্রশিক্ষণ কার্য যথাযথভাবে সমাধা করতে পারে সেজন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের জন্য গ্রীষ্ম ইনষ্টিটিউট, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের সেমিস্টারের ভিত্তিতে ডিগ্রি, অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, অগ্রিম ভাতা, রাহা খরচ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করা উচিত।

সারণী-১২(৬): বাঙলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬০ সাল হ'তে ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণ।

কার্যক্রম।	কার্যক্রমের সংখ্যা।	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক।
স্বল্প মেয়াদী:		
(১) শিক্ষা প্রশাসন (স্কুল, ইনস্পেক্টরেট ও কলেজ)।	৬৮	২,৪৮৩
(২) বিজ্ঞান ও গণিত (স্কুল ও কলেজ) ..	৯৫	১,৯৯১
(৩) বৃত্তিমূলক বিষয়: কৃষি, বানিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, শিল্পকলা; ইত্যাদি।	১২৬	২,২১৮
(৪) বাংলা, ইংরেজী, সমাজ বিজ্ঞান ও অন্যান্য	২০৪	৪,৫৬২
দীর্ঘ মেয়াদী:		
(১) কৃষি	১০	১২৯
(২) কারিগরি শিল্পকলা ও বানিজ্য ..	৫	৪০

জাতীয় প্রশিক্ষণ উপদেষ্টা কমিটি:

১২.২১. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সংযোগ সাধনের জন্য একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা কোন শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক নয় তাই অনেকে এ-ব্যাপারে আগ্রহী নন। সেজন্য নিয়োগের সময় শিক্ষককে এ-মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে যে তিনি অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দিতে বাধ্য থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এ-উদ্দেশ্যে ছুটির ব্যবস্থা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিভাগকেও এ-ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২.২২. **পেশাগত শিক্ষাবিহীন শিক্ষকদের শিক্ষণ:** প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত বহু শিক্ষকের কোন পেশাগত শিক্ষণ নাই। আগামী দশ বছরের মধ্যে এ-সকল শিক্ষকদের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার:

(ক) যাঁদের বয়স চল্লিশের উপর এবং ন্যূনতম পাঁচ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(খ) যাঁদের বয়স চল্লিশের কম এবং ন্যূনতম পাঁচ বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁদের জন্য বিশেষ সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা করা।

(গ) যাঁদের বয়স চল্লিশের নীচে এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা পাঁচ বছরের কম তাঁদের পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন বা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে পুরোপুরি শিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া।

চিঠি-পত্রের মাধ্যমে স্বল্পকালীন শিক্ষক-শিক্ষণঃ

১২.২৩. আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষণবিহীন কর্মরত শিক্ষকদের নিয়মিত কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষণদান করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই, যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁদের পুরোপুরি শিক্ষণের জন্য খণ্ডকালীন ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পি, টি; আই, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কলেজ অব এডুকেশন, শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রকে অনতিবিলম্বে এ দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণাঃ

১২.২৪. আজ যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ন্যানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এবং এ সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান খুঁজতে গিয়ে আমরা হতচকিত ও দিশেহারা তার প্রধান কারণ হল আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার অভাব। অনতিবিলম্বে এ অভাব দূরীভূত করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করিঃ

(১) সোভিয়েত ইউনিয়নের একাডেমী অব পেডাগজিক্যাল সায়েন্সেস-এর অনুরূপ আমাদের দেশেও অনতিলিম্বে একটি জাতীয় শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটি এ কাউন্সিলের কাজে সহায়তা করবে। কাউন্সিল গবেষণা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে এবং জাতীয় ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানিক গবেষণা ও গবেষণা পরিকল্পনাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সুপারিশ করবে। এতদ্ব্যতীত কাউন্সিল বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পসমূহের প্রচারণাও করবে।

(২) গবেষণার বিভিন্ন শাখা, যথা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অপচয়, শিক্ষা-অর্থনীতি, ছাত্র অসন্তোষ, স্কুল বিল্ডিং, শিক্ষা পরিকল্পনা, শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের শিক্ষা, শিক্ষিত জনসম্পদ জরীপ, পাঠ্যক্রম, নির্দেশনা ও পরামর্শদান, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎসাহিত করতে হবে।

(৩) সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, অর্থ পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ব্যাচেলার, মাষ্টার এবং ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে, তাদের প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৫) উন্নতমানের ও বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণার কাজগুলিকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

(৬) যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপর পাঠক্রম ও পাঠ্যবই তৈরীর ভার ন্যস্ত রয়েছে তাদের আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং তাদের কার্যসংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রকল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 'এ্যাকশন রিসার্চ' বা প্রয়োগমুখী গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং গবেষণার ফলাফলকে পত্র-পত্রিকা, পেশাগত সভা, আলোচনা ইত্যাদি মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রচার করা প্রয়োজন।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নঃ

১২.২৫. যে সব প্রতিষ্ঠান পেশাগত শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত, তাদের মানের উন্নতি ব্যতিরেকে শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়।

১২.২৬. **প্রাইমারী স্তরঃ** প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটগুলির উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিতঃ

(ক) এ প্রতিষ্ঠানগুলি কলেজরূপে পারগ্যাণত হওয়া দরকার।

(খ) স্থাপনের পর হতে গত বিশ বছরেরও অধিক কাল ধরে ইনষ্টিটিউটগুলির পাঠক্রমের কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। অনতিবিলম্বে প্রচলিত পাঠক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন।

(গ) বর্তমানে এসব ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকদের যোগ্যতা মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকের সমান—বি, এড্ সহ গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি। এ শিক্ষাগত যোগ তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কাজেই এ যোগ্যতাকে বাড়িয়ে গ্রাজুয়েশন ও বি, এড্ সহ শিক্ষণে অথবা স্কুল বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রি করা প্রয়োজন। এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের বেতন সরকারী আর্টস ও সায়েন্স কলেজের শিক্ষকদের সমান হওয়া উচিত। এছাড়া, শুরুতেই এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষককে দু'টো অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘ) এ সব প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ, চারু ও কারুকলা কক্ষ, ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরির উন্নয়ন আশু প্রয়োজন।

ঙ) সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের অংগনে থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য হোষ্টেল তৈরী করা উচিত।

(চ) শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থাসহ বর্ধিত হারে আরো অধিক সংখ্যক বৃত্তির বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রতোক পাঁচ বছর চাকুরির পর ঋণের ½ বাদ যাবে। কোন উচ্চতর কোর্সে ভর্তির আগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে তিন বছর প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতে হবে।

(ছ) বর্তমান এক বছর মেয়াদী পি, টি, আই, কোর্সটি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বিধায় একে যথাশীঘ্র সম্ভব দু'বছরে উন্নীত করা প্রয়োজন।

(জ) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য তিন বছর প্রাইমারী স্কুলে চাকুরির পর পূর্ণকালীন, খণ্ডকালীন বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে ব্যাচেলার-ইন-এডুকেশন কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(ঝ) দেশে অবিলম্বে একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ একাডেমির দায়িত্ব হবেঃ

(১) পি, টি, আই ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা করা, (২) পি, টি, আই-এর পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মূল্যায়ন, (৩) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা ও গবেষণা। প্রস্তাবিত বোর্ডটি একাডেমির অধীনে থাকবে এবং পি, টি, আইগুলিকে পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এ বোর্ড পি, টি, আই পরীক্ষা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

১২.২৭. **মাধ্যমিক স্তরঃ** বর্তমানে এ স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন। ফলে এদের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরী, হোষ্টেল, বৃত্তি ইত্যাদি ব্যবস্থা না করে প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা উচিত হবে না। এতে শিক্ষণের মান দ্রুত হ্রাস পেতে বাধ্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অবাঞ্ছিত অনুপাত বিদ্যমান। আমাদের মতে এ অনুপাত অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষ ছাড়া ১ঃ ১৫ হওয়া উচিত।

১২.২৮. বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হল স্কুল বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রিসহ বি, এড ডিগ্রি। অথচ শিক্ষকের যোগ্যতা হওয়া উচিত একটি স্কুল বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার ডিগ্রি এবং শিক্ষক-শিক্ষণেও মাষ্টার ডিগ্রি। এছাড়া কিছু সংখ্যক শিক্ষকের ডক্টরেট ডিগ্রিও থাকা প্রয়োজন। তদুপরি শিক্ষকদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এঁদের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমযোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সমান হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষকদের উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্বেও পদোন্নতির সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তাই অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রসহ এ কলেজগুলিতে বর্ধিত সংখ্যায় সিনিয়ার এডুকেশন সার্ভিসের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্তমানে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রফেসারের কোন পদ নাই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন বহু শিক্ষক এসব প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন। তাই অনতিবিলম্বে এসব প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারী কলেজগুলিতে প্রফেসারের পদ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য শুরুতে দুইটি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট ও শিক্ষার্থীদের জন্য বর্ধিত হারে অধিক সংখ্যক বৃত্তি ও ঋণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষকেরই ডক্টরেট ডিগ্রি থাকা উচিত।

১২.২৯. **পোষ্ট-গ্রাজুয়েট স্তরঃ** শিক্ষণে ব্যাচেলার ডিগ্রিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে শিক্ষণে মাষ্টার ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি করা উচিত নয়। তদ্রূপ শিক্ষণে ডক্টরেট কোর্সে ভর্তি হবার জন্য ন্যূনতম পাঁচ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। কোন উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের অবর্তমানে, মাষ্টার বা ডক্টরেট ডিগ্রি কোর্স থাকা উচিত নয়। শিক্ষক-শিক্ষণের মান যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মানের সমকক্ষ হয় সেজন্য শিক্ষণে মাষ্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রি কোর্সে শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীদেরই ভর্তি করা উচিত।

১২.৩০. শিক্ষক-শিক্ষণে গবেষণা ও উচ্চতর জ্ঞান চর্চার জন্য ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রথমে গবেষণাভিত্তিক এম, এড ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, পরে ডক্টরেট কোর্সও খোলা হয়। বর্তমানে ইনষ্টিটিউটে যথাক্রমে এক-বছর ও দু'-বছর মেয়াদী দু'টি এম, এড কোর্স, ডক্টরেট কোর্স এবং দু'-বছর মেয়াদী শিল্পকলায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষক-শিক্ষণে বি, এড কোর্সের অনুরূপ দশ-মাস মেয়াদী একটি ডিপ্লোমা কোর্সও প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচু মানের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির জন্য ইনষ্টিটিউটটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এসব লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তাই প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যসূচীকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাক্রমেরও কিছু রদ-বদল করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স উচুমানের ও সমাজের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য হওয়া উচিত। তাই শুধু বি, এড ডিগ্রিধারী, ন্যূনতম তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেধাবী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের এম, এড কোর্সে ভর্তি করা উচিত। বর্তমানে বি, এড ডিগ্রিধারী নন এরূপ শিক্ষার্থীর জন্য যে দু'-বছর মেয়াদী এম, এড কোর্স চালু রয়েছে অচিরেই তার বিলোপ সাধন করা উচিত। ডক্টরেট কোর্সের ভর্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, যোগ্যতা-সম্পন্ন ও প্রতিভাবান প্রার্থীকে নির্বাচিত করা উচিত। যদিও মাধ্যমিক স্কুলের শিল্পকলার শিক্ষক তৈরীর জন্য দু'বছর মেয়াদী শিল্পকলা কোর্সটি চালু করা হয়েছিল, এতে শিক্ষক-শিক্ষণের কোন বিষয় সন্নিবেশিত না হওয়ায় কোর্সটি ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছে। তাই অধ্যয়নকালে ফ্রি টিউশন, সরকারী বৃত্তি ও আবাসিক সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও ডিপ্লোমা প্রাপ্তির পর মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা না করে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য হল এম, এস, সিতে ভর্তি হওয়া বা অন্য কোন চাকুরী করা। আমরা সুপারিশ করি যে অনতিবিলম্বে বর্তমান ডিপ্লোমা কোর্স দু'টির স্থলে শিক্ষক-শিক্ষণে তিন বছর মেয়াদী বিভিন্ন স্কুল বিষয়ে বি, এড কোর্স চালু করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের সহায়তায় সহজেই উপরোক্ত কোর্স চালু করা সম্ভব। এছাড়া, অন্যান্য কোর্স যেমন বি, এড ডিগ্রিধারী অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য উপদেশ ও নির্দেশনায় ডিপ্লোমা কোর্স ইনষ্টিটিউটে চালু করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য

খণ্ডকালীন ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে শিক্ষণ কোর্স চালু করা উচিত। সর্বোপরি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, উপদেশ ও নির্দেশনা এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার উপর সার্বক্ষণিক ও নিরন্তর ফলপ্রসূ গবেষণা পরিচালনা করার দায়িত্বও এ ইনষ্টিটিউটকে নিতে হবে। এজন্য যথোপযুক্ত ষ্টাফ ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষক-শিক্ষণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

১২.৩১. সকল উন্নত দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান অথচ আমাদের দেশে এ-সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। কেননা আমরা শিক্ষক-শিক্ষণকে শুধু ভাবী শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে ভাবতে অভ্যস্ত, একটি সমাজ বিজ্ঞানরূপে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করিনি। যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় হাতিয়ার, সেজন্য আমাদের দেশেও স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে বিষয়টিকে ডিগ্রি কোর্সরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে প্রবর্তন করা উচিত। প্রথমোক্ত কোর্সটির উদ্দেশ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের সহায়তায় তিন বছর মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে স্কুলের ভাবী শিক্ষকদের দুটি বিশেষ বিষয় ও পেশাগত বিষয় যুগপৎ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে শিক্ষক-শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রি লাভের সুযোগ দেওয়া। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সটির লক্ষ্য হবেঃ

(ক) উপদেশ ও নির্দেশনায় এবং শিশু মনোবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রিধারী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন করা।

(খ) শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রিধারী অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসকের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী এম, এড ও ডক্টরেট কোর্স প্রবর্তন করা।

(গ) আন্তঃ-বিভাগীয় ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষণে গবেষণাকে উৎসাহিত করা।

(ঘ) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য রিফ্রেসার কোর্স ও গ্রীষ্মকালীন ইনষ্টিটিউটের মাধ্যমে বিষয়-কেন্দ্রিক ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের নবায়নে সাহায্য করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ খোলা উচিত বিধায় আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করছি।

শিক্ষক-শিক্ষণে আনুষঙ্গিক বিষয়ঃ

১২.৩২. **স্কুল ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগঃ** বর্তমানে একদিকে প্রাইমারী স্কুলের সঙ্গে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের ও অন্যদিকে মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ এবং ইনষ্টিটিউটের সত্যিকারের সংযোগের অভাব রয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-সম্প্রসারণে কর্মসূচীর মাধ্যমে নিকটস্থ স্কুলগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। এরূপ নিবিড় ও ফলপ্রসূ যোগাযোগের মাধ্যমে স্কুলের কর্ম-সূচীর মান উন্নয়ন সম্ভবপর।

১২.৩৩. **শিক্ষক-শিক্ষণে রেডিও টেলিভিশনঃ** আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষণে প্রস্তাবিত কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে রেডিও এবং টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

১২.৩৪. **প্রাক্তন ছাত্র সমিতিঃ** শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীকে প্রগতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। এতে প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যারা বর্তমানে শিক্ষক তাঁদের এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।

১২.৩৫. **পদ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ঃ** শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী বাস্তবমুখী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে নিয়মিত পদ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ-উদ্দেশ্যে একদিকে মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তা অন্যদিকে যথাক্রমে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপক ও প্রফেসারদের মধ্যে পদ বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২.৩৬. **সঞ্চয় রেকর্ডঃ** শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে সঞ্চয় রেকর্ড (কিউমুলেটিভ রেকর্ড) রাখতে হবে এবং রেকর্ডের পদ্ধতি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে। শিক্ষার্থীরাও অনুশীলন পাঠদানের সময় তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের উপরোক্ত রেকর্ড রাখবে।

১২.৩৭. **ব্যবহারিক পাঠদানঃ** শিক্ষক-শিক্ষণে ব্যবহারিক পাঠদানের গুরুত্ব অত্যধিক অথচ এদিক দিয়ে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মতে ভাবী শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কার্যে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের জন্য পুরোপুরি সুযোগ দেওয়া উচিত। শুরুতে অধ্যাপকবৃন্দ স্ব স্ব বিষয়ে সমবেত শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে আদর্শ পাঠ দেবেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ দিতে হবে যা অন্যান্য শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকবৃন্দ সমালোচনা করবেন। এরূপ প্রাথমিক প্রস্তুতির পর শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে অধ্যাপক ও নিয়মিত শ্রেণী শিক্ষকের পরিচালনায় অনুশীলন পাঠদান করবেন। এজন্য শ্রেণীকক্ষের শিক্ষককে নির্দিষ্ট ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অনুশীলন পাঠদানের মেয়াদ বর্তমান প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টীটিউট ও ট্রেনিং কলেজের ক্ষেত্রে তিন মাস এবং কলেজ অব এডুকেশনে ছয় মাস হওয়া উচিত।

১২.৩৮. **শিক্ষকদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানঃ** পেশাগত উন্নতি, শিক্ষক-শিক্ষণে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন, পেশাগত নীতি সংরক্ষণ, জনসংযোগ ইত্যাদির জন্য সকল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা প্রয়োজন।

১২.৩৯. **মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় আকর্ষণঃ** বর্তমানে মেধাবী ছাত্রেরা শিক্ষকতাকে পেশারূপে নিতে আগ্রহী নয়। সারণী-১২(চ)-এতে একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হয়েছে। মেধাবী শিক্ষক ব্যতিরেকে শিক্ষাদান কার্যের মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক স্তর হতেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সারণী ১২(চ)ঃ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নমুনা (১৯৭৩-৭৪)।*

শিক্ষাগত যোগ্যতা।	প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	তৃতীয় শ্রেণী।	মোট।
বি, এ ..		৪৯	১৫৪	২০৩
বি, এস, সি	৭	৫১	৬৯	১২৭
বি, কম	..	১৭	৩১	৪৮
বি, এ (অনার্স) ..	..	২	..	২
বি, কম (অনার্স) ..	..	..	..	..
বি, এস, সি (অনার্স) ..	..	..	..	..
এম, এ, ...	..	৬	১	৭
এম, এস, সি	১	৩	..	৪
এম, কম, ...	..	..	..	..
মোট ..	৮	১২৮	২৫৫	৩৯১

১২.৪০. প্রাক-প্রাথমিক স্তর ও বাধাগ্রস্তদের জন্য শিক্ষক তৈরীঃ বর্তমানে দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক তৈরির কোন ব্যবস্থা নাই। এজন্য আমরা সুপারিশ করি যে শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা বিভাগে শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য শিক্ষক এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিদর্শক তৈরির ব্যবস্থা করা উচিত। তদুপরি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রাক-প্রাথমিক পরিদর্শক তৈরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া কয়েকটি নির্দিষ্ট পি, টি, আই-এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষিকা তৈরির জন্য এক-বছর মেয়াদী শিক্ষণ কোর্স চালু করা দরকার।

১২.৪১. টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহঃ ১৯৪৮ সালে ষ্টাফ ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানরূপে প্রাইমারী ট্রেনিং কলেজ নামে এ-কলেজটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভাবী প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটগুলির শিক্ষক ও প্রাইমারী স্তরের স্কুল পরিদর্শক তৈরি করা এবং প্রাইমারী শিক্ষা সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করা। প্রাইমারী টেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কয়েক বছর পর্যন্ত এ-কলেজটিই ইন্সটিটিউটগুলির ফাইনাল পরীক্ষা পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পরিদর্শনের দায়িত্বও পালন করে। ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর অভাবে পরীক্ষা পরিচালনা ও পরিদর্শনের কার্য নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব বিভাগীয় উপ-জনশিক্ষা পরিচালকের উপর ন্যস্ত করা হয়। বলা বাহুল্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক, বই-পুস্তক এবং অর্থের অভাবে কলেজটির পক্ষে নির্ধারিত গবেষণা কার্যও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা সুপারিশ করি যে বর্তমান কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে কলেজটিতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হোক।

১২.৪২. শিক্ষক-শিক্ষণে পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমঃ শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম সম্পর্কে জ্ঞানদান নয় বরং পাঠক্রম বহির্ভূত বিষয়েও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। তাই ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সার্থক সংযোগ সাধিত

হয় সে সম্পর্কে ভাবী শিক্ষকদের শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য প্রতি স্কুলে অভিভাবক-শিক্ষক সমূহ গঠন এবং বয়স্ক শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিশেষ 'দিবস' ও 'সপ্তাহ' সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন সম্পর্কে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবেঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয় দিবস;
মাধ্যমিক বিদ্যালয় দিবস;
গ্রামীণ যুব দিবস;
ভাবী কৃষক সপ্তাহ;
ভাবী শিক্ষক সপ্তাহ;
ভাবী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানী সপ্তাহ;
ভাবী রোগ-সেবিকা সপ্তাহ;
শিক্ষা সপ্তাহ;
নব-কৃষক সপ্তাহ;
জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ;
জাতীয় শিশু পুস্তক সপ্তাহ;
জাতীয় অগ্নি নিবারণ সপ্তাহ;
জাতীয় যুব বিজ্ঞানী মাস।

১২.৪৩. শিক্ষক-শিক্ষণে অর্থ বরাদ্দঃ শিক্ষক-শিক্ষণের খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছাড়া দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়। সারণী-১২(ছ)-এ গত কয়েক বছরের মধ্যে এ-খাতে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। সুতরাং আমরা সুপারিশ করি যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষণের অত্যধিক গুরুত্ব হেতু এ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত।

সারণী—১২ (ছ)ঃ শিক্ষা খাতের বার্ষিক সামগ্রিক খরচের অংশরূপে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যয়।

আর্থিক ব্যয়।	শিক্ষাখাতে মোট সরকারী ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)।	শিক্ষক-শিক্ষণে ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)।	শতাংশ।
১৯৪৮-৪৯	২৪	২·১	৮·৯০
১৯৫৯-৬০	৭৯	১·২	১·৫০
১৯৬৭-৬৮	৩৭১	৫·৬	১·৫০
১৯৬৯-৭০	২১১·৯৩৭	৪·০২	১·৯০
১৯৭০-৭১	৩৫৫·৬২২	৩·১৬	০·৯০
১৯৭১-৭২	৩৬৬·৯১৬	৪·৮৩	১·৩০
১৯৭২-৭৩	৪৩৭·২০২	৫·৬৬	১·৩০
১৯৭৩-৭৪	৫৮৪·৪৪৮	৬·৮৩	১·২০

১২.৪৪. জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ উপদেষ্টা কাউন্সিলঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষক-শিক্ষণের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা উচিত। নিম্নোক্ত সংস্থার প্রতিনিধিগণ এ কাউন্সিলের সভ্য থাকবেনঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা বিভাগ;
শিক্ষা বোর্ডসমূহ;
শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট;
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ;
কলেজ অব এডুকেশন;
প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট;
বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র;
প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী;
সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমিতিসমূহ।

এ কাউন্সিলের কার্যক্রমের অন্যতম দিক হবে প্রতি কয়েক বছর অন্তর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সরজমিনে তদন্তের ব্যবস্থা করা যাতে এদের যথাযথ মান-রক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

শিক্ষক-শিক্ষণ

সারাংশ

১। জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহ, উপকরণ ও অন্যান্য ব্যাপারে নিয়োজিত সম্পদ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় যদি শিক্ষকের মান উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও মান উন্নয়নকল্পে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। উন্নত রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের যে সকল আধুনিক নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলিকে প্রয়োজনমত প্রয়োগ করে আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষণব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। (১২.১.)

২। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৭৬ সাল হতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলকরূপে চালু করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন তাঁদের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবেঃ

(ক) ৪৭টি পি, টি, আই-এতে দু'-মাস মেয়াদী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে। প্রতি পি, টি, আই বছরে পাঁচ বার (প্রতি বারে ৮৫ জন শিক্ষকের জন্য) এ কোর্সের আয়োজন করবে। এভাবে ৪৭টি পি, টি, আই-এ প্রায় এক লাখ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে।

(খ) গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ প্রশিক্ষণ কোর্স দেশের কলেজ অব এডুকেশন, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে চালু করতে হবে। দেশের ছয়টি কলেজ অব এডুকেশন, ছয়টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও একটি শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে পাঁচ বছরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হবে।

(গ) দেশের রিফ্রেসার কোর্স ট্রেনিং সেন্টারসমূহে এবং যে সকল নির্বাচিত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে সে সব প্রতিষ্ঠানেও জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে। (১২.২—৯.)

৩। কিছু সংখ্যক নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলে বৃত্তিমূলক শিক্ষক-শিক্ষণ (নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী) কোর্স চালু করতে হবে। এর ফলে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষকতাকে পেশারূপে গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। (১২·১০·)

৪। প্রস্তাবিত নতুন পাঠক্রম প্রবর্তনের জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষকের জরুরীভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উপর ন্যস্ত থাকবে। (১২.১১.)

৫। মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের শিক্ষক তৈরীর জন্য দেশের সকল পেশাগত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণের যে কোর্স চালু রয়েছে সেগুলিতে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। (১২.১২.)

৬। ঢাকাস্থ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে কলেজের নিজস্ব ভবন, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির ব্যবস্থাসহ পাঠক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। (১২.১৩.)

৭। বর্তমান ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজকে প্রয়োজনানুযায়ী সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করতে হবে। তথায় মেয়েদের জন্য পৃথক গৃহ নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। রাজশাহীতে নির্মীয়মান শরীর

শিক্ষা কলেজের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে দেশের অন্যত্র অনুরূপ আরো দু'টি কলেজ স্থাপন করতে হবে। (১২. ১৪.)

৮। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান পাঠক্রমের সংস্কার করে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। (১২. ১৫.)

৯। বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের নিয়মিত পেশাগত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিতঃ

(ক) শুধু মহিলাদের জন্য কয়েকটি পি, টি, আই স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য পি,টি, আইগুলিতে তাঁদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

(খ) যেহেতু ঢাকা শহরে কোন পি, টি, আই নাই, সেহেতু এখানে একটি পি, টি, আই স্থাপন করা প্রয়োজন।

(গ) পি, টি, আইগুলির সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা এরূপভাবে বর্ধিত করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

(ঘ) অনতিবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা বিভাগ চালু করে কালক্রমে একে একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে পরিণত করতে হবে। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা প্রয়োজন।

(ঙ) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করতে হবে। এদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, ওয়ার্কশপসহ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। (১২.১৬.—১৭.)

১০। দেশের যে পাঁচটি জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজকে কলেজ অব এডুকেশনে রূপান্তরিত করে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে তাদের নানা সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলির দশ-মাস স্থায়ী বর্তমান কোর্সটি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বিধায় এর স্থলে ক্রমে ক্রমে তিন-বছর মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা উচিত। (১২. ১৮.)

১১। কর্মরত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির উপরই ন্যস্ত থাকিবে। এ ছাড়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পি, টি, আইগুলিও এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। (১২.১৯.)

১২। কর্মরত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমান বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রের আরো উন্নয়ন এবং এর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। রাজশাহী বিভাগে একটি নতুন শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে বর্তমান কেন্দ্রের দু'টি উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা আবশ্যক। শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিকেও এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সেমিষ্টারের ভিত্তিতে ডিগ্রী, অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, অগ্রিম ভাতা, রাহা খরচ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে কর্মরত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করা উচিত। (১২.২০.)

১৩। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সংযোগ সাধনের জন্য একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। (১২. ২১.)

১৪। পেশাগত শিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ শিক্ষণের জন্য খণ্ডকালীন ও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা যায়। এসবের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পি, টি, আই, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কলেজ অব এডুকেশন, শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। (১২.২২.—২৩.)

১৫। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং গবেষণা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল স্থাপন করা প্রয়োজন। (১২. ২৪.)

১৬। প্রাইমারী স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিতঃ

(ক) প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত এবং এদের পাঠক্রমের পরিবর্তন করা।

(খ) ইনস্টিটিউটগুলির শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন।

(গ) শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে থাকার ব্যবস্থা করা ও মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থাসহ অধিক সংখ্যক বৃত্তির বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) বর্তমান এক-বছর মেয়াদী পি, টি, আই কোর্সকে দুই বছরে উন্নীত করা।

(চ) উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য তিন বছর প্রাইমারী স্কুলে চাকুরীর পর বি, এড কোর্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া। (১২.২৫.—২৬.)

১৭। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবাঞ্ছিত অনুপাতের হার বিদ্যমান। অনুপাত অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষ ছাড়া ১ঃ১৫ হওয়া উচিত। (১২.২৭.)

১৮। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীত করা এবং ডিগ্রি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রফেসারের পদসহ অধিক সংখ্যক সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের পদ সৃষ্টি করা দরকার। (১২. ২৮.)

১৯। শুধুমাত্র উচ্চতর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ন্যূনতম তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে এম, এড কোর্সে এবং পাঁচ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে ডক্টরেট কোর্সে ভর্তি করা যেতে পারে। (১২. ২৯.)

২০। দেশের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রমসমূহের পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। (১২. ৩০.)

২১। শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করা উচিত। (১২. ৩১.)

২২। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-সম্প্রসারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে নিকটস্থ স্কুলগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত। (১২. ৩২.)

২৩। শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীর সম্প্রসারণে রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। (১২. ৩৩.)

২৪। শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীকে প্রগতিশীল রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। (১২. ৩৪.)

২৫। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী বাস্তবমুখী করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং পরিদর্শক বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে নিয়মিত পদ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (১২. ৩৫.)

২৬। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়নকল্পে শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে সঞ্চয় রেকর্ড রাখা এবং ব্যবহারিক পাঠদানের রীতিনীতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। (১২.৩৬.—৩৭.)

২৭। পেশাগত উন্নতির জন্য সকল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। (১২. ৩৮.)

২৮। মাধ্যমিক স্তর হতেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। (১২. ৩৯.)

২৯। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পরিদর্শক ও বাধাগ্রস্তদের জন্য শিক্ষক তৈরীর দায়িত্ব শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে নিতে হবে। কয়েকটি নির্দিষ্ট পি, টি, আই-এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষিকা তৈরীর জন্য এক-বৎসর মেয়াদী কোর্স চালু করা দরকার। ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (১২.৪০.—৪১.)

৩০। বিভিন্ন শিক্ষামূলক সংঘ গঠন ও বিশেষ বিশেষ 'দিবস' ও 'সপ্তাহ' পালনের মাধ্যমে সমাজের সংগে যাতে বিদ্যালয়ের সার্থক সংযোগ সাধিত হয় সে সম্পর্কে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (১২. ৪২.)

৩১। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষণের অত্যধিক গুরুত্ব হেতু এ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। (১২.৪৩.)

৩২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষক-শিক্ষণের যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষণ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা উচিত। (১২.. ৪৪.)

অধ্যায় ১৩

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১৩.১. আধুনিক সমাজের অগ্রগতি উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও মানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ উচ্চশিক্ষার ভূমিকা হচ্ছেঃ (ক) বিভিন্ন উচ্চতর কাজের জন্য সুনিপুণ, জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরী করা, (খ) এমন শিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যাঁদের কর্মানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্যক বিকশিত হয়েছে, (গ) গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করা এবং (ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা।

১৩.২. আধুনিক কালে উচ্চশিক্ষাকে অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ ধারায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন বেড়ে যায়। তেমনি সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এজন্য শিক্ষা কোর্সসমূহের পরিধি সম্প্রসারণ করা, অধিকতর সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার মান উন্নত করা ও উন্নত মান বজায় রাখা প্রয়োজন।

১৩.৩. জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় শিক্ষাদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার আরও একটি দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ অর্থে শিক্ষিত মানুষ বলতে যা বোঝায়, সেই শিক্ষিত মানুষ গড়ে তুলতে উচ্চশিক্ষা সাহায্য করে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা তাদের মধ্যে নিরলস কর্মাভ্যাস, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানাকাঙ্খা, সক্রিয় উদ্যোগ, সততা, ন্যায়বোধ, স্বাধীন চিন্তাশীলতা এবং সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা ও তার সমস্যা সমাধানের আকাঙ্খা জাগ্রত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞানার্জন এবং চরিত্র গঠনে উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৩.৪. উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা কেবল সমাজের বর্তমান প্রয়োজনই মিটায় না, তা জাতির অগ্রগতির দিক নির্দেশ এবং প্রেরণা সঞ্চার করে থাকে। মানুষের জীবনধারা ও প্রকৃতির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা ও ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারে জ্ঞানের সীমা বিস্তার করার জন্য উচ্চশিক্ষা সাহায্য করে। উচ্চশিক্ষা বাস্তব সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে অধীত বিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে দিক নির্দেশ এবং তা প্রণয়নে সহায়তাও করে থাকে।

১৩.৫. উন্নত মানের শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশই আজ পর্যন্ত দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারেনি। জনগণের কর্মদক্ষতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। কিভাবে আমরা এই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন সাধন করব, তার উপর আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি নির্ভর করছে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, যাঁরা উচ্চশিক্ষা থেকে লাভবান হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, তারা সমাজের যে স্তরেরই হোক না কেন, তাঁদের সকলের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অবশ্যই প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে এবং তার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১৩.৬. উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ প্রদানের সংগে সংগে গবেষণাকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। গবেষণার ফলে শিক্ষা দানের ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হয়, গবেষণার অবদানে জ্ঞানের ক্ষেত্র পরিপুষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ আবিষ্কারসমূহ আমাদের জীবনকে

সমৃদ্ধ করে। সুতরাং শিক্ষা উন্নয়নের কথা চিন্তা করার সংগে সংগে আমাদের অবশ্যই শিক্ষাদান ও গবেষণা উভয় বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার মৌলিক নীতি এই দ্বৈত ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান উচ্চশিক্ষাঃ

১৩.৭. উচ্চশিক্ষার উক্ত ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে আমাদের দেশে চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে—ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাংগীরনগর এবং প্রথমোক্ত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজসমূহে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে যে শিক্ষা দেয়া হয় তাই এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য।

১৩.৮. দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষা আজ এক বিরাট সংকটের সম্মুখীন। সমাজের সংগে প্রয়োজনীয় যোগসূত্রবিহীন এ শিক্ষা সমাজের বর্তমান চাহিদা মিটাতে অক্ষম। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা সরকারী চাকুরী লাভের ছাড়পত্র মাত্র। কাজেই চাকুরীর সংস্থান হবার বা সম্ভাবনা ফুরাবার সংগে সংগে এ শিক্ষার কার্যকরতাও নিঃশেষিত হয়ে যায়। অনেকের জন্য অবশিষ্ট থাকে শুধু বেকারত্বের অভিশাপ। যে সমাজে শতকরা প্রায় আশি জন নিরক্ষর সে সমাজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের অস্তিত্ব সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার চরম ব্যর্থতারই পরিচায়ক।

১৩.৯. সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা প্রভূত বিস্তার লাভ করেছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করেই নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চালু কলেজগুলির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অপরিকল্পিত এরূপ সম্প্রসারণ কার্যের ফল হয়েছে শিক্ষার উন্নত মান অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় যন্ত্র সরঞ্জামের অভাব, লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অভাব রয়েছে। সুতরাং উচ্চশিক্ষার মানের যে অবনতি হচ্ছে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই।

১৩.১০. বর্তমানে সারা দেশে প্রথম ডিগ্রী (আণ্ডার-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে) শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। এর মধ্যে বিজ্ঞানে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার, বাণিজ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার এবং অবশিষ্ট কলা বিভাগে শিক্ষারত। অথচ সমাজ ও জাতীয় জীবনের চাহিদার সংগে এটা মোটেই সুসমঞ্জস নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ আত্মঘাতী অবস্থা যে কোন সমাজের পক্ষে অপরিসীম দুশ্চিন্তার কারণ হতে বাধ্য।

১৩.১১. শুধু বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যা সমতার দিক দিয়ে নয়, বরং মান ও গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়েও বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য এক ভীষণ উদ্বেগের কারণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তুলনায় তাদের অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীর ভিড় অধিক। অথচ মানদণ্ডের দিক থেকে এ কলেজগুলির অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৭০ সালে যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ২২ সেখানেও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলিতে অনুপাত ছিল ১ঃ৫০। শুধু তাই নয়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিজন শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয় হয়েছে গড়পড়তা ৯৩০ টাকা, সেখানে অনুমোদিত কলেজগুলিতে ব্যয়ের অংক হল মাত্র ২২০ টাকা।

১৩.১২. আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত এই পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভের অন্যান্য উপায় বাদ দিয়ে মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীর গুণগত উৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা হয়, যার ফলে শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু যাচাই করা যায় না। তৃতীয়ত, উচ্চশিক্ষা দ্বারা লাভবান হতে পারে, এরূপ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় সাধারণভাবে শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। চতুর্থত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে

খুব কম সংখ্যক শিক্ষক গবেষণা কর্মে রত থাকেন বলে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সংগে শিক্ষা দানের কার্য সম্পর্কিত হয় না। এছাড়া, শিক্ষার পরিবেশের অনুপযোগিতা, শিক্ষার উপকরণের অভাব এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের অসন্তোষজনক অবস্থা আদর্শ উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায়। ফলে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার মান শোচনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

১৩.১৩. বর্তমানে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা সামাজিক চাহিদার সংগে সামঞ্জস্যবিহীন হওয়ার, ফলে উচ্চশিক্ষার মানের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বেকারের দল অনন্যোপায় হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অহেতুক ভিড় জমাচ্ছে। অধিকন্তু তাদের অধিকাংশ কলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিত্তশালী ও উন্নত দেশগুলিতেও এরূপ নজীর মেলা ভার। অন্যদিকে সাম্প্রতিক কালে বহু নীচু মানের কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীর প্রচণ্ড ভিড়ের ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে। উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি ও তার অপচয় রোধের জন্য অনুমোদিত কলেজসমূহের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং কলেজসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি অবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার, শিক্ষা ভবন ও শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসস্থান, খেলাধূলার মাঠ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় উক্ত তদন্তের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ডিগ্রী কলেজে অনার্স ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কেও কমিটিকে তদন্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য, উচ্চশিক্ষার আশু উন্নতি বিধানের জন্য তদন্তের ভিত্তিতে কলেজগুলির ব্যাপারে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

১৩.১৪. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা প্রতীয়মান হয় যে আমাদের উচ্চশিক্ষার আমূল পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। এ কারণে ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব ব্যবস্থাদি এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যয়নযোগ্য বিষয়ঃ

১৩.১৫. জাতির ভাগ্য ও জাতির অর্থনীতির সংগে উচ্চশিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষিত জনসম্পদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংগে অবশ্যই সুসমন্বিত করতে হবে। আমাদের জীবনে অর্থনীতির তাৎপর্য বিপুল। সুতরাং আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষভাবে পল্লীর অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমস্যাবলীর সম্যক পর্যালোচনা করতে হবে। শুষ্ক অথবা উর্বর এবং আর্দ্র এলাকাসমূহের ভূগোল পর্যালোচনা করতে হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ব, সমুদ্র প্রাণীতত্ত্ব এবং খনিতত্ত্বের অধ্যয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ ছাড়াও শিল্প উন্নয়নের ব্যাপারে সৌরশক্তি, বাত্যাশক্তি এবং মহাসাগরীয় জলশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে হবে। আজিকার এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অবশ্যই সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের যথাযথভাবে অবহিত থাকতে হবে। সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, গণ-সংযোগ সকল ক্ষেত্রে কাজের জন্য এমন ধরণের লোকের প্রয়োজন যারা কেবল সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন নৈপুণ্যের অধিকারী হবে না, উপরন্তু ব্যাপক সাধারণ শিক্ষার অধিকারীও হবে। এছাড়া জনসংযোগ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরও আমাদের প্রয়োজন। এসব কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য পৃথক বিভাগ এবং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রভূত সমর্থন প্রদান করা উচিত হবে। শাসন নীতি, ব্যবসা পরিচালনা, সমাজ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান এবং সমাজ কর্ম প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আশ্বাস বহন করে আনে বলে কোন কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের দেশে বেশ কিছুটা উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দর্শন শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের কথা বলা যেতে

পারে। আমাদের এমন ধরণের দার্শনিক সৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে; বিষয় ও বিষয়-পরিক্রমার মধ্যকার কৃত্রিম সীমারেখা অতিক্রম করে যাঁরা চিন্তা ও বিকাশ সাধনের ব্যাপারে অগ্রণী হবেন। আমাদের যেমন পদার্থবিদ ও গণিতবিদ প্রয়োজন, তেমনি দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরও প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজন চিরদিনই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যথাযথভাবে আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলা শিক্ষাদান এবং এর বিশেষ অনুশীলন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাতীয় ভাষা বাংলা শিক্ষাদানের ব্যাপারে উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং এ সম্পর্কে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা উচিত হবে। প্রধান প্রধান আধুনিক বিদেশী ভাষাগুলি অধ্যয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনও রয়েছে। মোটামুটিভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দেশের বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মৌলিক নীতি ও মৌলিক গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

১৩.১৬. আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নতমানের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কয়েক হাজার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিগ্রীধারীর প্রয়োজন হবে। এর চাহিদা মিটাবার জন্য বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্ত অকিঞ্চিতকর। কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডিগ্রী-উত্তর প্রশিক্ষণের একটি ডিপ্লোমা এবং একটি মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স রয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের চাহিদা মিটাবার জন্য দেশের সকল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী-উত্তর ডিপ্লোমা ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

১৩.১৭. আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের কোন কোন বিষয়ের সিলেবাসসমূহ কয়েক বছর যাবৎ অপরিবর্তিত রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি যুগের অনুপযোগী। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিকুলাম ও সিলেবাস যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তীত না থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা অতীব প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে সর্বদা তাদের কারিকুলাম ও সিলেবাসসমূহ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মিটতে পারে, বুদ্ধিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিশ্বের সর্বত্র আমাদের শিক্ষার সুনাম হতে পারে, এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কি করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের অপচয় পরিহার করতে হলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ভর্তির যোগ্যতা ও ডিগ্রী কোর্স ঃ

১৩.১৮. শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জাতির অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সুনির্বাচন হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সাধারণত প্রার্থীর মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উৎপাদনশীল বা সমাজকল্যাণমূলক কর্ম অভিজ্ঞতা এবং ভর্তি পরীক্ষায় তার ফলাফল ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হবে। এও গুরুত্বপূর্ণ যে যে সব ছাত্র প্রতিভাবান, সক্ষম ও পরিশ্রমী বলে প্রমাণিত হবে তাদের উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে। প্রতিভাবান ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর সন্তান যেন কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভর্তির জন্য ছাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে পরস্পর সমঝোতার সাহায্যে উপায় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার পূর্বতন পর্যায়ে শিক্ষার্থী যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে সে সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং তার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষকগণ যে সব অভিমত প্রদান করেছেন ভর্তির ব্যাপারে সেগুলিও বিবেচনা করে দেখতে হবে। কোন এক বা একাধিক ধরণের উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রার্থীর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে কিনা সতর্কভাবে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

১৩.১৯. ডিগ্রী কলেজগুলিতে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স দু'টি কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে শুধু অনার্স কোর্স চালু থাকবে। তবে মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষামূলক একাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত কলেজে তিন বছর মেয়াদী প্রথম ডিগ্রীর জন্য উচ্চমানের কোর্সের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হবে। পাস ডিগ্রী কোর্স দু'বছরের এবং অনার্স ডিগ্রী কোর্স তিন বছরের হবে। পাস কোর্স এমন হতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তা হতে পরস্পর সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের পরিক্রমা সম্পর্কে সাধারণভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারে। বিষয়গুলির প্রত্যেকটির উপর মোটামুটিভাবে সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সাধারণত পাস কোর্সে তিনটি বিষয়ের পরিক্রমার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন কোন বিষয় নিয়ে পরিক্রমা গঠিত হবে তা' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন। অধিকতর সমর্থ যে সব ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হতে অধ্যয়নের অগ্রবর্তী ক্ষেত্রে ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রী পর্যায়ে বিশেষ অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা প্রত্যাশা করা যায়, তাদের জন্য অনার্স কোর্স চালু থাকবে। এতে একটি মুখ্য বিষয় এবং দু'টি গৌণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। প্রথম বছরের শেষে সুদৃঢ় পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও উন্নতি পরিমাপ করে দেখতে হবে। প্রথম বছরের শেষে শিক্ষার্থীদের অনার্স কোর্স হতে পাস কোর্সে স্থানান্তর গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা থাকা উচিত হবে।

১৩.২০. মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স এক বা দুই বছরের হবে। অনার্স ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স এক বছরের এবং পাস ডিগ্রীধারীদের বেলায় উক্ত কোর্স দু' বছরের হবে। মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য যে কোর্স থাকবে তাতে একটি মাত্র বিষয়ে এক বা দুই বছর মেয়াদী অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রথম ডিগ্রী কোর্সে যে যে বিষয়ে অধ্যয়ন করেছে, তারা কেবল সে সব বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রীর পড়াশুনা করতে পারবে। যাদের যে যে বিষয়ে অনার্স ডিগ্রী থাকবে তারা স্বাভাবিকভাবে সে সব বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে পড়াশুনা করার অধিকারী হবে। পাস কোর্স ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রী মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে পড়তে চাইলে যে বিষয়ে সে বিশেষ অনুশীলন করতে ইচ্ছা করবে, তাকে সে বিষয়ে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে অন্তত পক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ অর্জন করতে হবে।

১৩.২১. মাষ্টার ডিগ্রীর পর পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে। পি, এইচ, ডির অধ্যয়নকাল সাধারণভাবে তিন বছর হবে। প্রার্থী অবশ্যই তার পরিচালক ও বহিঃপরীক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য থিসিস রচনা করবে এবং তাঁদের নিকট নির্বাচিত বিষয়ে পূর্ণ পান্ডিত্য ও মৌলিকতা প্রদর্শন করবে। ডক্টর ডিগ্রীর প্রার্থী তার বিশেষ গবেষণা ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষা জানে কিনা এবং গবেষণা যোগ্য বিষয়টি সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা রয়েছে কিনা, তার যোগ্যতা বিচার প্রসঙ্গে এসব বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে ডক্টর ডিগ্রীগুলির (পি, এইচ, ডি; ডি,লিট; ডি, এস, সি) জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রামাণ্যমান সৃষ্টি হলে বিপুল সুবিধা হবে। এর ফলে দেশের সর্বত্রই এই ডিগ্রীগুলি সম অর্থবোধক হবে এবং অন্যান্য দেশে সহজে এইগুলির সংজ্ঞা প্রদান করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রার্থীর উভয়ের স্বার্থে গৃহীত সকল থিসিসের প্রতিলিপি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতরণ করা উচিত হবে।

১৩.২২. বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়। আবার বিচ্ছিন্ন কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা যাতে এক শ্রেণীর শিক্ষিত অংশকে যান্ত্রিক করে তুলতে না পারে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যাতে সম্ভব হয় সে উদ্দেশ্যে মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে।

১৩.২৩. প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে উঠতে হবে। প্রকৌশল ও ফলিত বিজ্ঞান প্রসারের জন্য প্রত্যেক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েই কৃষি, কারিগরি ও চিকিৎসা বিষয়ক ফ্যাকালটি থাকা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা উচিত। অবশ্য এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট বা প্রবণতা থাকতে পারে। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও তাদের পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার ছাত্র ও শিক্ষকদের সান্নিধ্য থেকে সামগ্রিক ও সুসমন্বিত জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়।

১৩.২৪. উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যয় সংকোচের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানে বিশেষ পেশাভিত্তিক একমুখী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুসমন্বিত পাঠক্রমের মাধ্যমে কতিপয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়, যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ও মৃত্তিকা রসায়ন প্রভৃতি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যা ও অঙ্ক শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অনার্স ও পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা যেতে পারে।

১৩.২৫. পূর্ণকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সংগে সংগে খণ্ডকালীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়তন বহির্ভূত শিক্ষা উন্মুখ ব্যক্তিদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। তারা যেন অন্যান্যের সংগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন উচ্চশিক্ষা চালু করা বাঞ্ছনীয়। বৃত্তিমুখী এবং কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষার্থী খণ্ডকালীন বিদ্যার্থীরূপে উচ্চশিক্ষা লাভ করে। খণ্ডকালীন উচ্চ-শিক্ষার প্রসারের জন্য যুক্তরাজ্যের "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের" অনুরূপ প্রকল্প চালু করার প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

পরীক্ষাঃ

১৩.২৬. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে তার বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে। অনেকের মতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহের অনেকগুলির জন্য পরীক্ষা-পদ্ধতিই দায়ী। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষা অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ কর্ম শিক্ষা ও গবেষণাকে বিপজ্জনক-ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ ছাড়া বর্তমানে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিশেষ কোন মূল্য নাই, একমাত্র সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত থাকে। সুতরাং শিক্ষকদের অধ্যাপনা ভাষণে যোগদানের জন্য অথবা ব্যক্তিগতভাবে অর্থবা টিউটোরিয়াল অধিবেশনে শিক্ষকদের নির্দেশনা লাভের জন্য তাদের মনে কোন আগ্রহ তাগিদ থাকে না। তাই সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে নিয়মিত আন্তঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা এবং সে আন্তঃপরীক্ষার গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

১৩.২৭. অবশ্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের ও অনুমোদিত কলেজসমূহের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করবে। পরীক্ষা, পরীক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে এ রিপোর্টের 'পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাঃ

১৩.২৮. গবেষণা উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ইহা কেবলমাত্র উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়, উপরন্তু শিক্ষককে আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী করে। গবেষণার মাধ্যমে শুধু জ্ঞানের পরিধিই বর্ধিত হয় না বরং শিক্ষাদান কার্যেও দক্ষতা জন্মে। প্রধানত গবেষণার মাধ্যমেই শিক্ষকমণ্ডলী তাদের মানসিক সজীবতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। ছাত্রগণকে শক্তি ও প্রেরণা দানে সক্ষম করার ব্যাপারে গবেষণার মূল্য রয়েছে। কোন দেশ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল হতে চাইলে সে দেশকে অপরিহার্যরূপে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.২৯. সুতরাং শিক্ষাদান ও গবেষণা উভয় কার্যই প্রাধান্য লাভ করতে পারে এরূপ বিভাগসমূহকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংগে ডিগ্রী কলেজগুলিতেও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশ গ্রহণ করতে হবে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের ও কলার মৌলিক বিষয়সমূহে গবেষণা ও শিক্ষাদান ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচিত। অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, নিরর্থক প্রতিযোগিতা এবং আমাদের অল্প সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অপব্যবহার পরিহার করার জন্য সতর্ক সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে, কোন বিশেষ বিষয়ে কয়েকটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না করে একটি অথবা দুটি শক্তিশালী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত। বেশী সংখ্যক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সেগুলি দুর্বল হতে পারে।

১৩.৩০. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রধানত মৌলিক গবেষণার কাজ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব অক্ষুন্ন রেখে গবেষণার বিষয়বস্তু যথাসম্ভব দেশের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধীত প্রত্যেক বিষয় ও ক্ষেত্রের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তথাপি প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। জাতীয় উন্নয়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে গবেষণার ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। বাংলাদেশের অন্যতম জরুরী প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও তার সদ্ব্যবহার এবং এ জন্য কৃষি ও ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির জন্য খাদ্য সরবরাহের নতুন উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলির প্রতি আমাদের ঘনিষ্ঠ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া দরকার, যেমন অর্থনীতি, সরকারী শাসন, ব্যবসা পরিচালনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা চালাবে, তা তাঁরা নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একই বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৩১. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ঔষধ, খাদ্য, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের গবেষণা জাতীয় দায়িত্ব, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাইরেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃতি লাভ করে। দেশে বর্তমানে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, আণবিক শক্তি কমিশন প্রভৃতি এ দায়িত্ব পালন করছে। এ সকল পরিষদের কাজ প্রধানত ফলিত গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ যাবত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মৌলিক গবেষণাকে অবহেলা করে বিদেশী গবেষণার ফলাফলের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে আসছে। কোন দেশের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন এবং দৃষ্টিভংগীর উপর সেই দেশের গবেষণা কার্যসূচী নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। অতএব আমাদের জাতি হিসাবে উন্নতি লাভ করতে হলে আমাদের নিজস্ব শিক্ষাবিদ এবং গবেষকের প্রয়োজন। একথাও আমাদের অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে জাতি হিসাবে উন্নতি করতে হলে এবং অপরাপর দেশের উন্নয়নের সংগে সমতা রক্ষা করে চলতে হলে মৌলিক গবেষণাকে অবহেলা করলে চলবে না। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক গবেষণার উপরই যে-কোন দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল।

১৩.৩২. এম, এ; এম, কম ও এম, এস-সি কোর্সে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা গবেষণা কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদেরকে গবেষণাকার্যে নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এম, এ; এম, কম; এম, এস-সি ডিগ্রীধারী ছাত্রদের মধ্যে যারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে এবং যাদের মধ্যে মৌলিকতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাদের ফেলোশিপ এবং যে সব পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীধারীর যোগ্যতা স্বীকৃতি লাভ

করেছে, তাদের ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ প্রদান করা উচিত হবে। মেধা ও যোগ্যতা স্বীকৃতি লাভ করেছে, এমন প্রতিভাসম্পন্ন ও প্রতিশ্রুতিশীল এম,এ; এম,কম; এম,এস-সি এবং পি,এইচ,ডি, ডিগ্রীধারীগণকে যাতে ফেলোশিপ প্রদান করা সম্ভব হয়, তজ্জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফেলোশিপ ও ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করে গবেষণার কাজ শুরু করা উচিত হবে না। কার্যকরী পরিচালন ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যয়ন বোর্ড এ মর্মে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কোন বিভাগের কোন বিষয়ে পি,এইচ,ডি পর্যায়ের গবেষণা কার্য শুরু করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষক ও সরঞ্জামাদি রয়েছে কিনা এবং উচ্চমান সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা, সে সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য উপরোক্ত অধ্যয়ন বোর্ড পূর্ব হতে পি,এইচ,ডি পর্যায়ে যে কার্যাদি চলে আসছে সে কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন। ভাইস-চ্যান্সেলারদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজেদের মধ্যে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ের উচ্চতর অধ্যয়ন কার্যসূচীর সমন্বয় সাধন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ ব্যাপারে স্ব স্ব শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এ কমিটি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর অধ্যয়ন কার্যসূচী পর্যালোচনা করে ফেলোশিপ ও ঊর্ধ্বতন ফেলোশিপ প্রদানের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করবেন।

গবেষণাগার ঃ

১৩.৩৩. বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও গবেষণাগার ব্যতীত উচ্চশিক্ষার কাজ চলতে পারে না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিজ্ঞান বিভাগের সংগে একটি গবেষণাগার যুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞান শিক্ষাদান উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা ব্যয় করা অবশ্যম্ভাবী। তবে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বেছে নেওয়া প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে উচিত হবে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রত্যেকটিকে সব বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ করতে না হয় সেজন্য এই বাছাই কার্যের প্রয়োজন। আরও উন্নত পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ,গবেষণাগারগুলি বাছাইভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফলিত গবেষণাকার্যের অধিকাংশ কাজ পেশা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে করতে হবে। প্রাথমিক ও মৌলিক গবেষণাকার্যে নিযুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে উপকরণাদি সরবরাহ করতে হবে। এ সমস্ত উপকরণ যদি গবেষণাগারের নিয়মিত উপকরণের বহির্ভূত হয় তা হলে বিশেষ উপায় নির্ধারণপূর্বক নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী এসব সরবরাহ করতে হবে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাভের জন্য যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তাতে কোন বিজ্ঞান বিভাগ কদাচিৎ সন্তুষ্ট থাকবে, কারণ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ক্রমবর্ধমান গতি সব সময় নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করবে। সংগে সংগে এও সত্য যে নতুন যন্ত্রের মত পুরাতন যন্ত্র দিয়েও একটি মৌলিক তথ্য ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে-কোন প্রকার গবেষণা চালাবার জন্য মৌলিক উপকরণাদির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে এ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয়বাহুল্য পরিহার করা উচিত। সস্তা এবং স্থানীয় উপকরণ সঠিক ব্যবহারের উপায় বের করা যেতে পারে। মূলত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদির সংগে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে শিক্ষক যা কিছুর প্রয়োজন বোধ করবেন তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত। এ সমস্ত যন্ত্রপাতি যেন কেবল সাজসজ্জামূলক না হয়। গবেষণামূলক বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য গবেষণাগারসমূহে অতীব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা উচিত।

গ্রন্থাগার ঃ

১৩.৩৪. প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উপযুক্ত ও অধিক সময়ের জন্য খোলা রাখা ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রন্থাগার থাকা উচিত। যাতে শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে ও ছুটির পরবর্তী সময়ে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে গ্রন্থাগার হৃৎপিন্ডসদৃশ এবং গ্রন্থাগারে মওজুদ বইপত্র, কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষার্থীদের বইপত্র ব্যবহারের ধরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত গ্রন্থাগার জ্ঞানের শক্তি বিকীরণগৃহ হিসাবে সঠিক কর্তব্য কতদূর পালন করছে তা বোঝা যাবে। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রায়

গ্রন্থাগারগুলিতে বইপত্রের সংখ্যা কম এবং যে সমস্ত বইপত্র আছে সেগুলি প্রায়ই কালোপযোগী নয়। বই, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি ক্রয়ের বাৎসরিক বরাদ্দ বর্ধিত করা উচিত এবং ক্রয়ের বেলায় বই নির্বাচন খুব সতর্কতার সংগে করতে হবে। বই নির্বাচন একটি সাবধানী কাজ। অধিকতর বাজেট বরাদ্দের দাবীই এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই কাজে সেই সকল শিক্ষকদের প্রয়োজন যাঁরা নিজ বিষয়ের অত্যাধুনিক অগ্রগতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষকে সীমাবদ্ধ সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বই পাঠে যতদূর উৎসাহিত এবং পরিচালিত করতে পারবেন ততদূর পর্যন্তই গ্রন্থাগারের সদ্ব্যবহার নির্ভর করবে। আমাদের গ্রন্থাগারসমূহ সজীবতা হারিয়ে ফেলেছে কারণ শিক্ষা বলতে প্রধানত পাঠ্যপুস্তক এবং ব্যাখ্যা পুস্তক মুখস্থ করণের প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। যদি শিক্ষক বিদ্যার্জনের সঠিক রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চান তা হলে তাঁকে সর্বদা বই পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে যাবার জন্য অভ্যস্থ হয়। উন্মুক্ত তাকের প্রচলন করে স্বেচ্ছামত বইপত্রাদি পড়ার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশ্য এমন অনেক বই আছে যেগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং অত্যন্ত মূল্যবান। তবুও এমন একটি সূত্র খুঁজে বের করতে হবে যদ্বারা দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান বইও সত্যিকার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট সহজলভ্য হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষকগণ যদি নিজেরাই গ্রন্থাগারে যান তবে তাঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানের উন্নতি বিধান করতে সফল হবেন।

অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

১৩.৩৫. বাংলাদেশে বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা প্রায় ৬০০ এবং ছাত্র সংখ্যা চার লাখের মত। তার মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুমোদিত ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা প্রায় ৩০০ এবং ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা এবং যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ৩০০। অবশ্য ডিগ্রী কলেজসমূহের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগগুলিও উপরোক্ত শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এবং তাদের দ্বারা অনুমোদিত। ডিগ্রী কলেজের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা এক লাখেরও উপর এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ এ দুটির একত্রে ছাত্র সংখ্যা তিন লাখের মত। সাধারণত ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের অধিকাংশই ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অনুমোদনের প্রচেষ্টায় থাকে। বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তার চেয়েও বেশী সংখ্যক নতুন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই পরিস্থিতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিক্ষা বোর্ডগুলির জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে এখানে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমস্যার আলোচনা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশের চেষ্টা করব।

১৩.৩৬. ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। অনুমোদিত কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিযুক্তি, পরীক্ষা পরিচালনা এবং তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কলেজগুলিতে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং ছাত্রদের মধ্যে আজ যে অসন্তুষ্টি বিরাজমান ইহা তার একটি বিশেষ কারণ।

১৩.৩৭. সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা ছাড়াই কলেজের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অথচ বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল ও কারিগরি এবং চিকিৎসা শিক্ষার তুলনায় মানবিক শাখায় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার

বহুগুণে বেড়ে গেছে বলে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় প্রয়োজন এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ব্যবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষার মান ও ব্যবস্থার শুধু আরো অবনতি যে ঘটবে তা নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের উন্নতি সাধন কঠিন হয়ে পড়বে এবং দেশের সর্বাংগীন উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হবে।

১৩.৩৮. অনার্স এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশের ছাত্রছাত্রীদের মাত্র কয়েকটি স্থানে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এসে ভিড় জমাবার ব্যবস্থা চালু থাকলে তাদের লেখাপড়ায় উন্নতি তথা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য গড়পড়তা খরচের হার কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য গড়পড়তা খরচের হারের যে কয়েকগুণ বেশী তার কারণ বর্তমান অনার্স এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং দেশের বিভিন্ন অংশে অনার্স এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এতদুদ্দেশ্যে বর্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের অনুরূপ দেশের বিভিন্ন অংশে আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে সমস্যার সমাধান হবে না। দেশের ক্ষতায়াতের বর্তমান ব্যবস্থা, যানবাহনের পরিস্থিতি, বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থিতি, চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা, সর্বোপরি জনসাধারণের আর্থিক সমস্যা এই সব বিষয় বিবেচনা করে দেখলে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যায় আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেননা শিক্ষক, ছাত্রাবাস ও শিক্ষকের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা অর্থাৎ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা প্রয়োজন তা সব বর্তমানে কত বাড়ানো যাবে তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে দেশের বিভিন্ন অংশের কয়েকটি উঁচুমানের কলেজগুলিতে, যেখানে অনার্স এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু রাখতে হবে এবং খোলারও ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৩৯. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের সংগে কলেজগুলির শিক্ষাদানের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আশেপাশে অবস্থিত কলেজগুলির সংগেও শিক্ষাদানের বিষয়ে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে অনুমোদন দান এবং অনুমোদন সম্প্রসারণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কলেজগুলিতে শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনা এবং অনুমোদিত কলেজগুলির চূড়ান্ত পরীক্ষা পরিচালনা করেন। অনুমোদিত কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা, প্রধান পরীক্ষকরূপে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তাঁদের গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক কলেজগুলির বর্তমান পরিদর্শন ব্যবস্থাও খুব সন্তোষজনক নয়। বছরের পর বছর অনু-মোদিত কলেজগুলির সরেজমিনে পরিদর্শন হয় না। এমন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থারও প্রবর্তন হয়নি যার ফলে কলেজগুলির মান প্রতি বছর অন্তত একবার করে যাচাই করা যায়। প্রতি বছর কলেজ-গুলির চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল কলেজের শিক্ষার মানের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা গত কয়েক বছরের অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করেছে। সুতরাং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের অবনতি প্রতিরোধ করতে পারছেন না, উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দকে কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাঁদের গবেষণা ও শিক্ষাদানের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

১৩.৪০. এই পরিস্থিতিতে আমাদের সুপারিশ হল যে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগে অনুমোদিত কলেজগুলিকে সংযুক্ত না রেখে তাদের এমন সংস্থা-সমূহের আওতায় নেবার ব্যবস্থা করা উচিত যাদের দ্বারা কলেজগুলির সমস্যাবলী যথার্থরূপে দেখা ও সমাধান করা সম্ভব হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল যে দেশের চারটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে একটি করে চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

করা অতীব প্রয়োজন। বাংলাদেশে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা প্রায় ৩০০, ছাত্রসংখ্যা এক লাখের উপর এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজসহ কলেজের সংখ্যা ৬০০ এবং ছাত্রসংখ্যা চার লাখের মত। তদুপরি আবাসিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল শিক্ষায়তন, অর্থাৎ কলেজ প্রকৌশল ও কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষায়তনগুলি প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীনে নিয়ে আসা দরকার। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধনের জন্য এ প্রয়োজন। চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া উপরোক্ত শিক্ষায়তনগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং এদের শিক্ষার যথোপযুক্ত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ভারাক্রান্ত করলে ফল খারাপ হতে বাধ্য।

১৩.৪১. এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯১৭-১৯) যুক্তির অবতারণা প্রাসঙ্গিক হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের উপরে চলে যাওয়াতে উক্ত কমিশন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রসংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই উক্ত কমিশন কলিকাতার বাইরে অন্যান্য স্থানের কয়েকটি কলেজকে ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তদুপরি ঢাকাতে একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে ইউরোপে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী পাঁচের সংখ্যায় পৌঁছাতে কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিলেন যে ছাত্র-সংখ্যা খুবই বেশী বেড়ে গেছে যদিও কলেজগুলির সবই বার্লিন শহরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং একটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কতটি শিক্ষায়তন রাখা যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সীমা কি হওয়া উচিত তা সহজে অনুমেয়।

১৩.৪২. অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনুমোদিত কলেজগুলি এবং তাদের ছাত্রদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হতে পারবেন। ফলে তাদের আওতাভুক্ত কলেজ-গুলিতে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পঠন এবং পরীক্ষা পদ্ধতির মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গভীরভাবে গবেষণা ও শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। এতে দেশের শিক্ষার মান বাড়বে।

১৩.৪৩. বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুমোদিত কলেজগুলি এবং নতুন যেসব কলেজ অনুমোদন লাভ করবে সেগুলি যে শুধু প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন হবে তা নয়, মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী উপরের পর্যায়ের প্রকৌশল ও কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদির শিক্ষায়তনগুলিও প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে আসবে। বর্তমানে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া মানবিক শাখার কলেজ বেড়েই চলেছে অথচ অতি প্রয়োজনীয় প্রকৌশল, কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদির শিক্ষার ব্যবস্থা সে অনুপাতে কমই থেকে যাচ্ছে। এ সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখা অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে সম্ভব হবে। দেশের চাহিদা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সকল শিক্ষায়তনগুলি দেশের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনানুযায়ী বন্টন এবং স্থাপনের ব্যাপারে প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সক্রিয়ভাবে সাহায্য এবং ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে।

১৩.৪৪. আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জন, আবাসিক ব্যবস্থা, যৌথ বা সমষ্টিগত জীবন-যাত্রা ইত্যাদি ব্যবস্থা, অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনগুলিতে করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আবার দেশের জন্য যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন তার সবগুলি আবাসিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্থাপন করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে বর্তমানে একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন, এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করলেও সে সমস্যার সমাধান হবে না। এ

পরিপ্রেক্ষিতে মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে দেশের সকল অংশের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষা-দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়া করার সুযোগের ব্যবস্থা থাকা উচিত, অবশ্য আবাসিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-মানের কলেজগুলিতে অনার্স ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্সের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত ব্যবস্থায় অধুনা একই সঙ্গে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শুধু আবাসিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে তাদের অনুমোদিত কলেজগুলিকে প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগে সংযুক্ত করা যায়।

১৩.৪৫. অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হবে বলে কেউ কেউ যে ধারণা পোষণ করেন তার কোন ভিত্তি নেই। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের আরো অবনতি ঘটবে বলে যে আশংকা করা হয় তারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। বর্তমান শিক্ষা-দান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুরূপ অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিন্ডিকেট বা একজিকিউটিভ কাউন্সিল, সিনেট বা কোর্ট, একাডেমিক কাউন্সিল, ডীনদের অফিস, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি, এগজামিনেশান কমিটি, ডিসিপ্লিন বোর্ড ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় সংসদ এবং পরিষদসমূহ অবশ্যই থাকবে। এদের সংগঠনে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আওতাধীন কলেজগুলির প্রতিনিধি যেমন থাকবেন, তেমনি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের (বিশেষ করে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের) প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি এবং বাইরের থেকে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য এই সকল সংসদ ও পরিষদে থাকবেন। অতএব একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের অবনতি ঘটার সম্ভাবনা নাই এবং প্রস্তাবিত অনুমোদন-কারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী এরূপ আশংকার কোন ভিত্তি নাই। অনুমোদনকারী বিশ্বাবদ্যালয়সমূহে সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে না সত্যি, কিন্তু বর্তমান শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সরাসরি শিক্ষাদানের থেকে অনুমোদিত কলেজগুলিরও লাভবান ও প্রভাবান্বিত হওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন সংসদ ও পরিষদ (যাদের সংগঠনের কিছুটা ইংগিত উপরে দেওয়া হয়েছে) অনুমোদিত কলেজগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে না এবং কলেজগুলি তাদের পক্ষপাতিত্বমূলক সুযোগ-সুবিধা হাসিলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রভাবান্বিত করতেও পারবে না।

১৩.৪৬. যে দিক থেকেই বিবেচনা করে দেখা যাক না কেন, দেশে চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যত সত্বর প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করা যায় ততই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মঙ্গল হবে।

১৩.৪৭. অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এ উপমহাদেশে নতুন কোন পদক্ষেপ নয়। বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ) অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী কাল অতিবাহিত হবার পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরাসরি শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছেন। বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবং ভাইস-চ্যান্সেলারদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটিও অনুমোদন-কারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অতএব অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবং ভাইস-চ্যান্সেলারদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটি সকলে একমত।

১৩.৪৮. বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগে একটি করে চারটি প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হবেঃ

(ক) তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব এলাকাভুক্ত সাধারণ কলেজ, প্রকৌশল ও কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষায়তনগুলিকে অনুমোদন দান করে নিজেদের আওতাধীনে আনা যাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন হয়;

(খ) তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আওতাধীন শিক্ষায়তনগুলির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষায়তনগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করা যায় এবং শিক্ষার যথোপযুক্ত মান বজায় থাকে;

(গ) তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব এলাকাধীন শিক্ষায়তনগুলিতে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা;

(ঘ) তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আওতাধীন শিক্ষায়তনের সকল স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা পরিচালনা করা, মূল্যায়ন করা এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ইত্যাদি প্রদান করা;

(ঙ) তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আওতাধীন শিক্ষায়তনগুলিতে অনার্স ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এমনভাবে করা, যাতে এক দিকে ব্যয় সংকোচ হয়, অন্য দিকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মান ও তাদের প্রদত্ত ডিগ্রীর মানের মধ্যে যেন তারতম্য না ঘটে;

(চ) তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আওতাধীন সব স্তরের শিক্ষায়তনগুলিতে যাতে যথোপযুক্ত শিক্ষার মান বজায় থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা; এবং

(ছ) সর্বোপরি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে এক দিকে তাদের আওতাধীন শিক্ষায়তনগুলির শিক্ষাদানের মানের ক্রমোন্নতি ঘটে, অপর দিকে উক্ত শিক্ষায়তনগুলির শিক্ষার মান শিক্ষার জাতীয় মানের চেয়ে নীচু বলে পরিগণিত না হয় বরং যাতে জাতীয় শিক্ষার মানের উন্নয়নের ব্যাপারে সহায়ক হয়।

১৩.৪৯. প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ভাইস-চ্যান্সেলার, রেজিষ্ট্রার, কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশনস এবং অন্যান্য অফিসার থাকবেন। কলা বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন, কৃষি, শিক্ষা, প্রকৌশল ও কারিগরি চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডীন রাখার বন্দোবস্তও করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত ইন্সপেক্টর নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩.৫০. প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে সিণ্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল; প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডীনদের অফিস, উপযুক্ত সংখ্যক কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি, এগজামিনেশন কমিটি, ডিসিপ্লিন বোর্ড, পরিদর্শন কমিটি, অনুমোদন কমিটি ইত্যাদি পরিষদ ও সংসদসমূহ থাকবে। এসব সংসদ ও পরিষদের সংগঠনে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, অনুমোদিত কলেজসমূহের প্রতিনিধি, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের (বিশেষ করে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের) প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি এবং বাইরের থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য সদস্য থাকবেন। সংসদ এবং পরিষদগুলি এমনিভাবে গঠিত হবে যাতে এসব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজসমূহের শিক্ষার মান উন্নত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কাজে সহায়ক হতে পারে।

১৩.৫১. প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। এদের আয়ের উৎস হবে অনুমোদন ফিস, রেজিস্ট্রেশান ফিস, পরীক্ষার ফিস, সার্টিফিকেট ফিস ইত্যাদি। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুমোদিত কলেজগুলি প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীনে আসবে। সুতরাং এই সকল কলেজ থেকে যা আয় তা' অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পাবে। তদুপরি বর্তমান সুপারিশ অনুযায়ী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষায়তন ব্যতিত অন্যান্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন প্রকৌশল ও কারিগরি, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষায়তনগুলি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীনে আসবে। উপরোক্ত অন্যান্য শিক্ষায়তনগুলিও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীনে আনার পর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আয় আরো বেড়ে যাবে। তদুপরি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাবে বলে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আয়ও বেড়ে যাবে। সুতরাং অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করতে পারবে এবং কয়েক বছর পরে তারা অনুমোদিত শিক্ষায়তনগুলির উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্যও করতে পারবে আশা করা যায়।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

১৩.৫২. দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সংগতি রক্ষা করে শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেশের সকল অংশের জনগণের নিকট সমভাবে সহজলভ্য করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে এই শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোটামুটি সমভাবে বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রধানতঃ সরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল বলে এ পর্যায়ের শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাতে সকলে সমভাবে লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়টি তার মধ্যে চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, ও খুলনা এ চারটি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে। উপরি উক্ত ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ঢাকা বিভাগে, একটি রাজশাহী বিভাগে এবং একটি চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। খুলনা বিভাগে এখনও কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে ঢাকা বিভাগে অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে খুলনা বিভাগে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের অধিবাস, এখানে আমরা ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজঃ

১৩.৫৩. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রী ভর্তির যে ভিড় তা কমাবার জন্য এবং উচ্চশিক্ষা অভিলাষী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থার জন্য কেউ কেউ দেশের কিছুসংখ্যক কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ" নিজেরাই ডিগ্রী প্রদান করবে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রত্যেকটি মোটামুটিভাবে ছোট খাট বিশ্ববিদ্যালয়রূপে কাজ করবে।

১৩.৫৪. বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে উচ্চশিক্ষা অভিলাষী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের চাপ থেকে ভারমুক্ত করার জন্য উপরোক্ত প্রস্তাবনা। দেশের বেশ কিছুসংখ্যক কলেজে অনার্স কোর্স দানের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি কলেজে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সও খোলা হয়েছে, প্রয়োজনবশত তা তুলে দেওয়া যাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বর্তমানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করার, যারা নিজেরাই ডিগ্রী প্রদান করবে, ফলাফল কি হতে পারে তা গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। গত কয়েক বছরের শিক্ষাদানের খতিয়ান এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেশের বিশেষ কয়েকটি কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করার কথা বর্তমানে চিন্তা করা যায় না।

প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন উচ্চমানের কলেজসমূহে অনার্স এবং মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স চালু করা যাবে এবং যে সব উচ্চমানের কলেজে এখন অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স আছে সে সব কলেজে তা চালু থাকবে। প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ স্থাপনের দশ বছর পরে এদের আওতাধীন কলেজগুলির কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এ কলেজগুলির মধ্যে উচ্চমানের কয়েকটি কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করা যায় কিনা। সে ক্ষেত্রেও "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ" সরাসরি ডিগ্রী প্রদান করবে না। এসব কলেজগুলি স্ব স্ব কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিয়ম-কানুন তৈরী করবে, তাদের স্ব স্ব কলেজের জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবে এবং নিজেরা স্ব স্ব কলেজে পরীক্ষা পরিচালনা করবে। আর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণভাবে তত্বাবধান করবে এবং ডিগ্রী প্রদান করবে। বর্তমানে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের স্বল্পতাও "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ" স্থাপনের দিকে নির্দেশ করে না। আমাদের শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ এবং যে সব কলেজগুলিতে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী ক্লাস রয়েছে তাদের জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা দরকার।

১৩.৫৫. উপরিউক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সম্পূর্ণ-ভাবে আবাসিক শিক্ষায়তনে রূপান্তরিত করা, প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, যাদের আওতাধীনে উচ্চমানের কলেজসমূহে অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সও থাকবে, এবং কয়েকটি উচ্চমানের কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করা এই সব একই সংগে হাতে নেওয়া উচিত হবে না।

১৩.৫৬. "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ" সম্পর্কে আমাদের অভিমত হল যে আগামী দশ বছরের মধ্যে এই জাতীয় কলেজ নতুনভাবে স্থাপন করা অথবা বর্তমানের কয়েকটি উচ্চমানের কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করা উচিত হবে না। দশ বছর পরে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনবশত কয়েকটি উচ্চমানের কলেজকে উপরোক্ত মতে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" উন্নীত করার জন্য জাতীয় তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাভুক্ত করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

কলেজঃ

১৩.৫৭. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজগুলি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং আমরা চাই যে ভবিষ্যতেও এই সমস্ত কলেজ অবিরাম গতিতে তাদের কর্তব্য পালন করে চলুক। তবে প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যতীত কোন নতুন কলেজকে কাজ করতে দেওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি। দুর্ভাগ্যবশত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করেই বহুসংখ্যক কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বাইরের চাপের ফলে অথবা জনপ্রিয়তা লাভের ব্যগ্রতার দরুণ স্বীকৃতিদানের শর্তাদি কার্যকরকরণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ এবং শিক্ষা বোর্ডগুলি শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষক, গৃহ ও শ্রেণী-কক্ষ, জায়গা, লাইব্রেরী ইত্যাদির অভাব রয়েছে এমন কলেজকে স্বীকৃতি দেওয়া জাতি এবং ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর। এরূপ কলেজসমূহের ব্যাপারে পূর্ণ বিবেচনার দরকার। প্রয়োজন হলে স্বীকৃতিদান স্থগিত রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কলেজগুলির স্বীকৃতিদান বাতিল করা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

১৩.৫৮. বেসরকারী কলেজসমূহ কঠোর বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই কলেজ-সমূহকে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সত্যিকার শিক্ষামূলক প্রয়োজন মিটাবার বদলে কেবল গৌরব বৃদ্ধির জন্যই বহু ক্ষেত্রে বেসরকারী কলেজ-গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবার প্রতিষ্ঠা করার পর কলেজগুলির কর্তৃপক্ষ এদের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে আর কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। সরকারও প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারী কলেজসমূহে সীমাবদ্ধ সম্পদ ব্যয় করেছেন এবং এই সম্পদ কলেজগুলিকে দৃঢ়করণে ব্যয়িত না হয়ে সম্প্রসারণেই ব্যয়িত হয়েছে বেশী।

১৩.৫৯. আমরা দেখতে চাই যে বেসরকারী কলেজগুলি জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদের উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নতুন কলেজকে স্বীকৃতি দানের সময়ে কর্তৃপক্ষকে এ মর্মে বোর্ড এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সন্তুষ্ট করতে হবে যে ইহা নিজস্ব সম্পদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচের মোটা অংশ বহন করতে সক্ষম। শিক্ষকদের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত নির্দিষ্ট আয়ের তহবিল গঠনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। একবার স্বীকৃতি লাভের পর যাতে কলেজ উচ্চমান বজায় রেখে চলে সে দিকে শিক্ষাবোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত। সময়ে সময়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থাও থাকা অত্যাবশ্যক। পরিদর্শনের রিপোর্ট যদি সন্তোষজনক না হয় ত'হলে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে শিক্ষাবোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতস্তত করা উচিত নয়।

১৩.৬০. কলেজগুলিতে সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ওপর আমরা অত্যন্ত জোর দিচ্ছি। ক্রমাগত খরচ বৃদ্ধির এবং জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই এই ব্যয়সমূহ যুক্তিসংগত অনুপাতে ছাত্রদের বেতন, কলেজ পরিচালকদের দেয় অর্থ ও চাঁদা এবং সরকারী সাহায্য হতে নির্বাহ করা বাঞ্ছনীয়। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে ক্রমিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি এই ব্যয়সমূহ আরও বেড়ে যায়, তবে এই অতিরিক্ত আর্থিক বোঝাও উল্লিখিত উৎসের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। কলেজগুলি যদি ব্যবসাভিত্তিক না হয় তবে যুক্তিসংগতভাবে আশা করা যায় যে তাদের পরিচালকগণ উল্লিখিত উৎসসমূহ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

১৩.৬১. বেসরকারী কলেজসমূহকে সরকারের পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা উচিত। অধিক সংখ্যক ছাত্র থাকাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথেষ্ট নয়; ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দানের ক্ষমতার মাধ্যমেই একটি প্রতিষ্ঠান তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে। যেসব কলেজের পরিচালন ব্যবস্থা সন্তোষজনক এবং যারা বেসরকারী দানের মারফত যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম, সেই সমস্ত কলেজকে সরকারের পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দান করা উচিত। জনসাধারণের নিকট হতে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে কলেজের শিক্ষকবৃন্দের কর্তৃপক্ষের সংগে সহায়তা করা উচিত। শিক্ষকগণ যদি শিক্ষার উচ্চমান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং কলেজ যে সমাজের সেবা করে সেই সমাজের সংগে যদি তাঁরা কার্যকর যোগাযোগ রাখতে পারেন তা' হলে এই কাজ করা তাঁদের পক্ষে সহজ হবে।

১৩.৬২. শুধু কলেজের আয়তন বা ছাত্রসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সরকারী সাহায্য দেওয়া উচিত নয়। বস্তুত সাহায্যমূলক বরাদ্দের নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করার পূর্বে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করার প্রয়োজন হবে—এগুলি হল কলেজ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী, শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং কলেজের সুনাম। এই রিপোর্টে আমরা শিক্ষার উৎকর্ষের ওপর এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছি। কাজেই কোন কলেজকে সাহায্য মঞ্জুর করার পূর্বে সেই কলেজে কি প্রকার কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে সব কলেজের দেশের নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনগুলি পূরণের ক্ষমতা নাই সে সব কলেজকে সাহায্য করতে গিয়ে সরকারের সীমাবদ্ধ সম্পদ ব্যয় করা অপেক্ষা ক্ষতিকর কাজ আর কিছুই হতে পারে না। অধিকন্তু সরকারী সাহায্য তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের ভিত্তিতে ধার্য হওয়া উচিত, যাতে কলেজসমূহ তদনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারে। সংগে সংগে বেসরকারী কলেজসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়া উচিত।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

সারাংশ

১। আধুনিক সমাজের অগ্রগতি উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও মানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ উচ্চশিক্ষার ভূমিকা হচ্ছেঃ (ক) বিভিন্ন উচ্চতর কাজের জন্য সুনিপুন, জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরী করা, (খ) এমন শিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যাঁদের কর্মানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্যক বিকশিত হয়েছে, (গ) গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করা এবং (ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা। (১৩.১—১৩.৬.)

২। আমাদের উচ্চশিক্ষা আজ এক বিরাট সংকটের সম্মুখীন। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। সমাজের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র বিহীন এ শিক্ষা সমাজের চাহিদা মিটাতে অক্ষম। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা সরকারী চাকুরীলাভের ছাড়পত্র মাত্র। কাজেই চাকুরীর সংস্থান হবার বা সম্ভাবনা ফুরাবার সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষার কার্যকরতাও নিঃশেষিত হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু বেকারত্বের অভিশাপ। যে সমাজে প্রায় আশিজন নিরক্ষর সে সমাজে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বেকারের অস্তিত্ব গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভূত বিস্তারলাভ করেছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা না করেই নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চালু কলেজগুলির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অপরিকল্পিত এরূপ সম্প্রসারণ কার্যের ফল হয়েছে শিক্ষার উন্নতমান অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি। (১৩·৭—১৩·৯)

৩। বর্তমানে সারাদেশে প্রথম ডিগ্রী (আণ্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে) শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। এর মধ্যে বিজ্ঞানে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার, বাণিজ্যে প্রায় ত্রিশ হাজার এবং অবশিষ্ট কলা বিভাগে শিক্ষারত। অথচ সমাজ ও জাতীয় জীবনের চাহিদার সঙ্গে এটা মোটেই সুসামঞ্জস নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ আত্মঘাতী অবস্থা যে কোন সমাজের পক্ষে অপরিসীম দুশ্চিন্তার কারণ হতে বাধ্য। শুধু বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যা সমতার দিক দিয়ে নয়, বরং মান ও গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়েও বর্তমান উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা জাতির জন্য এক ভীষণ উদ্বেগের কারণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় তাদের অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীর ভিড় অধিক। অথচ মানদণ্ডের দিক থেকে এ কলেজগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি, নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভের অন্যান্য উপায় বাদ দিয়ে মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর গুণগত উৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা হয়। উচ্চশিক্ষা দ্বারা লাভবান হতে পারে এমন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় সাধারণভাবে শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে খুব কম সংখ্যক শিক্ষক গবেষণা কর্মে রত থকেন বলে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাদানের কার্য সম্পর্কিত হয় না। এছাড়া, শিক্ষার্থীর পরিবেশের অনুপযোগিতা, শিক্ষার উপকরণের অভাব এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের অসন্তোষজনক অবস্থা আদর্শ উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায়। ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান শোচনীয় পর্যায়ে রয়েছে। (১৩·১০—১৩.১২.)

৪। উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে একথা প্রতীয়মান যে আমাদের উচ্চশিক্ষার আমূল পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। তাই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫। বর্তমানে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিহীন হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষার মানের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বেকারের দল অনন্যোপায় হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অহেতুক ভিড় জমাচ্ছে। অধিকন্তু তাদের অধিকাংশই

কলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিত্তশালী, উন্নত দেশগুলিতেও এরূপ নজীর মেলা ভার। অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে বহু নীচুমানের কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীর প্রচণ্ড ভিড়ের ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি ও তার অপচয় রোধের জন্য অনুমোদিত কলেজসমূহের অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং কলেজসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি অবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন। (১৩.১৩.—১৩.১৪.)

৬। জাতির ভাগ্য ও জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে উচ্চশিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষিত জনসম্পদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সুসমন্বিত করতে হবে। আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দেশের বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মৌলিক নীতি ও মৌলিক গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের বাস্তব সমস্যাবলীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (১৩.১৫.)

৭। আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের কোন কোন বিষয়ের সিলেবাসসমূহ অনেক বছর যাবত অপরিবর্তিত রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি যুগের অনুপযোগী। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিকুলাম ও সিলেবাস যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তিত না থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা অতীব প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে সর্বদা তাদের কারিকুলাম ও সিলেবাসসমূহ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। (১৩.১৭.)

৮। যেহেতু শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জাতির অন্যতম লক্ষ্য সেহেতু সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা, এবং ভর্তি পরীক্ষায় তার ফলাফল হবে ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি। (১৩.১৮.)

৯। ডিগ্রী কলেজগুলিতে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে শুধু অনার্স কোর্স চালু থাকবে। তবে মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষামূলক একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত কলেজে তিন বছর মেয়াদী প্রথম ডিগ্রীর জন্য উচ্চমানের কোর্সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে। (১৩.১৯.)

১০। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ব্যতীত পূর্ণোদ্যম ও ফলপ্রসূ বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়। আবার বিচ্ছিন্ন কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা যাতে এক শ্রেণীর শিক্ষিত অংশকে যান্ত্রিক করে তুলতে না পারে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যাতে সম্ভব হয় সে উদ্দেশ্যে মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজন আছে। তদুপরি উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যয় সংকোচের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানে বিশেষ পেশাভিত্তিক একমুখী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুসমন্বিত পাঠক্রমের মাধ্যমে কতিপয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়। এসব কারণে প্রত্যেক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, কারিগরি ও চিকিৎসা বিষয়ক ফ্যাকালটি থাকা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও অংক শাস্ত্র এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা রসায়ন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ও পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়। (১৩.২২.—১৩.২৪.)

১১। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গণগ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কয়েক হাজার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিগ্রীধারীর প্রয়োজন হবে। এর চাহিদা মিটাবার জন্য বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী-উত্তর প্রশিক্ষণের একটি ডিপ্লোমা

এবং একটি মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স রয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গণগ্রন্থাগারের চাহিদা মিটাবার জন্য দেশের সকল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী-উত্তর ডিপ্লোমা ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন। (১৩.১৬.)

১২। পূর্ণকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডকালীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়তন-বহির্ভূত শিক্ষা উন্মুখ ব্যক্তিদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। খণ্ডকালীন উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য যুক্তরাজ্যের "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের" অনুরূপ প্রকল্প চালু করার প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। (১৩. ২৫.)

১৩। সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে নিয়মিত অন্তঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা এবং সে অন্তঃপরীক্ষার গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। (১৩.২৬.—১৩.২৭.)

১৪। গবেষণার মাধ্যমে শুধু জ্ঞানের পরিধিই বর্ধিত হয়না বরং শিক্ষাদান কার্যেও দক্ষতা জন্মে। প্রধানত গবেষণার মাধ্যমেই শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের মানসিক সজীবতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রী কলেজগুলিতেও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে গবেষণার বিষয়বস্তু যথাসম্ভব দেশের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একই বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধীত প্রত্যেক বিষয় ও ক্ষেত্রের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে তথাপি প্রয়োজনবোধে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বা বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণা কার্যে নিয়োগের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চমূল্যের গবেষণা ফেলোশীপের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৩.২৮.—১৩.৩২.)

১৫। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী ও গবেষণাগার থাকা অত্যাবশ্যক। (১৩.৩৩.)

১৬। প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। (১৩. ৩৪.)

১৭। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির সমস্যা ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে কলেজগুলিতে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং ছাত্রদের মধ্যে আজ যে অসন্তুষ্টি বিরাজমান ইহা তার একটি বিশেষ কারণ। বর্তমানে দেশের কলেজের এবং তাদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও শিক্ষাবোর্ডগুলির জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এসব কারণে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে পরিপূর্ণভাবে আবাসিক শিক্ষায়তনে রূপান্তরিত করে কলেজগুলির অনুমোদন দান, তত্ত্বাবধান, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা, ডিগ্রী প্রদান ইত্যাদির জন্য দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগের প্রত্যেকটিতে একটি করে চারটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন। শিক্ষাদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল শিক্ষায়তনকে প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতায় নিয়ে আসা অত্যাবশ্যক। (১৩.৩৫.—১৩.৫১.)

১৮। খুলনা বিভাগে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের অধিবাস, এখানে ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন। (১৩.৫২.)

১৯। প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের দশ বছর পরে এদের আওতাধীন কলেজগুলির কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এ কলেজগুলির মধ্যে উচ্চমানের কয়েকটি কলেজকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে" পরিণত করা যায় কিনা।

সেক্ষেত্রেও "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ"-সমূহ সরাসরি ডিগ্রী প্রদান করবেনা। এরা ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিজস্ব নিয়ম কানুন তৈরী করবে। নিজস্ব পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করবে এবং নিজেরা পরীক্ষা পরিচালনা করবে। আর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সাধারণভাবে এসবের তত্ত্বাবধান করবে ও ডিগ্রী প্রদান করবে। (১৩.৫৩.—১৩.৫৬.)

২০। সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নাই এমন কোন নতুন কলেজকে অনুমোদন দান করা উচিত হবেনা। প্রয়োজন হলে স্বীকৃতিদান স্থগিত রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কলেজগুলির স্বীকৃতি বাতিল করা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবোর্ডসমূহের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। (১৩.৫৭.)

২১। প্রত্যেক কলেজে নির্দিষ্ট অংকের সংরক্ষিত তহবিল থাকা দরকার। শিক্ষকদের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতে আয়ের ব্যাংক তহবিল এবং পর্যাপ্ত সাধারণ তহবিল রক্ষার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। (১৩.৫৮.—১৩.৫৯.)

২২। শুধু কলেজের আয়তন বা ছাত্র সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সরকারী সাহায্য প্রদান করা উচিত নয়। সাহায্যদানের পূর্বে কলেজ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষার মান এবং কলেজের সুনাম বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থ সাহায্য তিন বছর বা পাঁচ বছরের ভিত্তিতে প্রদান করা উচিত, যাতে কলেজগুলি তদনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী কলেজসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়া উচিত। (১৩.৬০.—১৩.৬২.)

অধ্যায় ১৪

ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা

১৪.১. ডিগ্রী স্তরের কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী-সম্পন্ন এবং বাস্তবধর্মী এমন এক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় কর্মী তৈরী করা যাঁরা তাদের গভীর পেশাগত জ্ঞানের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম, যাঁরা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যাদির সমাধান করতে সক্ষম, যাঁরা নতুন নতুন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন প্রকার কাঁচা-মালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন কাঁচামাল ও শ্রম শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার, শিল্প কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করতে সক্ষম।

১৪.২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সাধারণ-ভাবে অদূরভবিষ্যতে এ দেশের সামাজিক জীবন ধারায় সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ মূলতঃ দেশে বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন বৃদ্ধির এবং দৈনন্দিন জীবনের সহায়ক ব্যবস্থাদির বিস্তৃতি ও নির্ভরযোগ্যতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই জন্য দেশে যথেষ্ট সংখ্যক সুযোগ্য প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজন। অধিকন্তু মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাদি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পথ-ঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে সেগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে এবং প্রয়োজনানুসারে উন্নত করতে হলে এ দেশে প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া দরকার।

বর্তমান ব্যবস্থাঃ

১৪.৩. ডিগ্রী স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে একটি করে কলেজ এবং ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ আছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুর কৌশল, তড়িত কৌশল, যন্ত্র কৌশল, কেমি কৌশল, ধাতব কৌশল, জলযান কৌশল, পানি সম্পদ কৌশলে চার বছর মেয়াদী এবং স্থাপত্য বিভাগে পাঁচ বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স দেওয়া হয়। ডিগ্রী পর্যায়ে চারশত বিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা আছে। পুর কৌশল, তড়িত কৌশল, যন্ত্র কৌশল, কেমি কৌশল, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ বিষয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে চার বছর মেয়াদী কৃষি প্রকৌশল কোর্সে আশি জন শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা আছে। ডিগ্রী-উত্তর পর্যায়ে তিরিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা আছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম কলেজে, পুর কৌশল, তড়িত কৌশল এবং যন্ত্র কৌশলে ডিগ্রী পর্যায়ে একশত আশি জন করে শিক্ষার্থী নেওয়া হয়। খুলনা কলেজে এখনও ছাত্র ভর্তি করা হয়নি। এখানেও পুর কৌশল, তড়িত কৌশল এবং যন্ত্র কৌশলে একশত বিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় সাত শত জন শিক্ষার্থী প্রথম ডিগ্রী কোর্স এবং অল্প সংখ্যক পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স সমাপ্ত করে বেরুচ্ছে। খুলনা কলেজ চালু হলে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে প্রতি বছর প্রায় আটশ জন শিক্ষা সমাপন করে বেরুবে।

সুপারিশসমূহঃ

১৪.৪. দেশে প্রচলিত ডিগ্রীস্তরের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে তার মানের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

(ক) দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংগে প্রকৌশল শিক্ষার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের শিল্প কারখানা এবং কারিগরি সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের প্রকৌশলীদের সংখ্যানুযায়ী ছাত্র ভর্তির সংখ্যা

নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের জনশক্তি বিভাগ দেশের বিভিন্ন স্তরের কারিগরি জনশক্তির বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা নির্ণয় করবেন এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করবেন।

(খ) প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের বিজ্ঞান ও গণিতের যোগ্যতার সাথে তাদের প্রকৌশল শিক্ষার প্রতি প্রবণতা আছে কিনা, বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী নির্বাচন পরীক্ষায় ব্যবহার উপযোগী নির্ভরযোগ্য প্রবণতা টেষ্ট তৈরী করা প্রয়োজন।

(গ) প্রকৌশল শিক্ষা ফলপ্রসূ করার জন্য একদিকে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক, স্থান, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি অপরিহার্য, তেমনি অন্যদিকে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি সংস্থাগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এরূপে ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য হবে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে করা যেতে পারে। গ্রীষ্মকালীন অবকাশের সময় শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যবহারিক শিক্ষাক্রম কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে হলে শিল্প কারখানায় শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার্থীদের তদারকীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) শিক্ষকদের তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে অধিকতর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। দেশের শিল্প কারখানার সমস্যাবলী ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাঁদের অবহিত হওয়া দরকার। এজন্য তাঁদের দেশের শিল্প কারখানা ও প্রকৌশল সংস্থাসমূহে উপদেষ্টা প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকগণ দেশের বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাঁদের অধ্যাপনা অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হবেন, শিল্প কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হবে এবং দেশের কারিগরি সমস্যা সমাধানে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

(ঙ) প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নীত করার জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রকৌশল কলেজগুলিতে সাজসরঞ্জাম এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ, সাজসরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে কলেজগুলি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই আমরা মনে করি যে, এ কলেজগুলিকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার। আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবেন। এ কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্সটিটুয়েন্ট কলেজ হিসাবে গণ্য হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদকে বিভিন্ন বিষয়ের অনুষদে বিভক্ত করে সেগুলির সম্প্রসারণ করতে হবে। কারিগরি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজকেও স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা প্রয়োজন।

(চ) প্রকৌশল ও স্থাপত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটাতে না পারলে তা পরিণামে বন্ধ্যাত্ব লাভ করে। এ কারণে সকল বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে সৃজনশীলতা উন্মেষের প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে। বিজ্ঞানের মৌলিকত্বে অধিক ব্যুৎপত্তি এবং আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ্যসূচীতে গণিত, মৌলিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা এ বন্ধ্যাত্ব নিরসনের অন্যতম উপায় বলে উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক ও গভীর গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করাও আশু কর্তব্য।

(ছ) প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পাঠক্রমে কিছু সংখ্যক ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। যেসব শিক্ষার্থী প্রথম ডিগ্রী কোর্স সমাপ্ত করেই কর্মক্ষেত্রে চলে যেতে চায় তাদের প্রকৌশল বিজ্ঞানের সাথে সাথে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। অপর-দিকে যেসব শিক্ষার্থী গবেষণাভিত্তিক পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির অভিলাষী, তাদের ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে মৌলিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়াদি পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) দেশের সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা এবং ডিগ্রী ও ডিগ্রী-উত্তর পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য উচ্চ শিক্ষিত প্রকৌশলীদের অভাব রয়েছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণাভিত্তিক উচ্চতর প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের উপর অধিক মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা হ্রাস করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে প্রকৌশলী তৈরীর দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রকৌশল কলেজগুলির উপর ছেড়ে দিয়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার পীঠস্থানে পরিণত করার ব্যবস্থা করা দরকার।

(ঝ) প্রকৌশল শিক্ষায় সংখ্যার চেয়ে মানের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষকের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। আমরা মনে করি যে প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ডিগ্রী স্তরে গড়ে ১ঃ১০-এর অধিক হওয়া উচিত নয়।

(ঞ) বর্তমানে যে কয়েকটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে ডিগ্রী স্তরে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়াও দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এসব নতুন ক্ষেত্রের মধ্যে বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পের প্রয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্প আমাদের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড। তাই এদের সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ মানের প্রযুক্তিবিদ ও প্রকৌশলী সরবরাহের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা স্তরের প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ এবং বিদেশে শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তির উপর নির্ভর করে এ শিল্পগুলি বর্তমানে চলছে। এ শিল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য ডিগ্রী স্তরে শিক্ষিত অনেক কারিগরি ব্যক্তির দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষিত করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই আমরা সুপারিশ করি যে বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক (গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নসহ) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী গ্রহণ করে কার্পাস বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় চার বছর মেয়াদী ডিগ্রী পর্যায়ের কোর্সসমূহ অবিলম্বে চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। এরূপ কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী ও ল্যাবরেটরী কক্ষ, ওয়ার্কশপ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশ বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটে বিদ্যমান বলে এসব কোর্স সেখানে চালু করা যেতে পারে। এ ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের পরও ডিপ্লোমা মানের কোর্সগুলির প্রয়োজন থাকবে। তাই আমরা আরও সুপারিশ করি যে বর্তমান ডিপ্লোমা কোর্সে উপরোল্লিখিত উচ্চ মাধ্যমিক পাস মানের ছাত্র ভর্তি করা হোক এবং ডিপ্লোমা কোর্সে যারা মেধার পরিচয় দেবে তাদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বাছাই করে ডিগ্রী কোর্সে নেবার ব্যবস্থা করা হোক।

(ট) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদিতে অনার্স ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

১৪.৫. প্রকৌশল, প্রযুক্তি, স্থাপত্য ইত্যাদি পেশাগত শিক্ষার মান উন্নীত করার এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উপরে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিবরণ দেওয়া হল।

কিন্তু এসব পদক্ষেপ গ্রহণের পথে যেসব প্রতিবন্ধক রয়েছে তা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রধান প্রতিবন্ধক হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, কেননা নানা কারণে শিক্ষকতায় উৎসাহী প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ পাওয়া দুরূহ। এ কারণে প্রথমতঃ যোগ্য প্রকৌশলী ও স্থপতিদেরকে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন উৎসাহদায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকতায়রত নতুন ও পুরাতন শিক্ষকগণের পালাক্রমে শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষণে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতির সাথে পরিচয় সাধন এবং গবেষণা কার্যে উৎসাহ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ একটা শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

১৪.৬. গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উপযুক্ত পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁদেরকেও কলেজের অন্যান্য শিক্ষকদের সমপর্যায়ের পদ ও মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন।

১৪.৭. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নিষ্ঠাবান, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন, আদর্শে উদ্বুদ্ধ পরিশ্রমী প্রকৌশলী সৃষ্টি এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে প্রতিস্তরেই পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থীদের মনে সমাজতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয়। সেজন্য সমাজতন্ত্রের ইতিহাস, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। দেশের কর্মরত জনগণ ও তাদের সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য কৃষি ও শিল্পাঞ্চলে শিক্ষা ভ্রমণ, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা বাঞ্ছনীয়।

১৪.৮. প্রচলিত বিভিন্ন স্তরের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ও মানে আরও ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার তা নির্ধারণের জন্য একটি 'কারিগরি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা প্রয়োজন। এ পরিষদ দেশের বিভিন্ন প্রকার শিল্প কারখানা, কারিগর এবং প্রকৌশলী নিয়োগকারী সংস্থা, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত।

১৪.৯. প্রকৌশলীদের কর্মক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন, তার বাস্তবায়ন, প্রশাসন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা, শ্রম সম্পর্ক, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় নানা সমস্যা এবং পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে অসমর্থ হলে তাদের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় এবং সম্পদের অপচয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে শিক্ষাকালে এসব বিষয়ে তারা যে জ্ঞান লাভ করে, কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সীমিত। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রকৌশল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে প্রকৌশলীরা এসব উন্নততর পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত এবং প্রশিক্ষিত হওয়ার সময় ও সুযোগ পায় না। তাই উন্নত দেশসমূহে প্রকৌশলীদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ-এর মাধ্যমে এসব উন্নততর পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। আমাদের প্রকৌশলীদেরও এরূপ ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ-এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ প্রশিক্ষণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই।

১৯৬৪ সালে স্থাপিত কাপ্তাই ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমীতে ওয়াপদায় কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কিছুটা ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু যোগ্য শিক্ষক ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির অভাবে একাডেমীর শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা খুবই সীমিত। আমরা প্রস্তাব করি যে দেশের প্রকৌশলীদের জন্য 'ইন-সার্ভিস' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে এই একাডেমীকে উন্নীত করা হোক।

ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা

সারাংশ

১। ডিগ্রী স্তরের কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন এবং বাস্তবধর্মী এমন এক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় কর্মী তৈরী করা যাঁরা তাঁদের গভীর পেশাগত জ্ঞানের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম, যাঁরা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার, দেশে বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপন্ন কাঁচামাল ও শ্রম শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার, শিল্প কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে সক্ষম। (১৪.১.)

২। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংগে প্রকৌশল শিক্ষার পরিপূর্ণ সামন্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন। দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রকৌশল শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সংখ্যা নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (১৪.৪-ক)

৩। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা কোর্সগুলিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে শিল্প কারখানা এবং কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (১৪.৪-গ)

৪। দেশের সম্পদ উন্নয়ন, বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান এবং উঁচুমানের প্রকৌশলী তৈরীর জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রকৌশল শিক্ষায় সংখ্যার চেয়ে মানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। (১৪.৪-জ-ঝ)

৫। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের অনার্স ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়। (১৪.৪-ট)

৬। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প, বস্ত্র শিল্প ও পাট শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরীর উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ডিগ্রী কোর্সসমূহ চালু করা প্রয়োজন। মান উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে কলেজগুলিকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার। (১৪.৪-ঙ)

৭। প্রকৌশল কলেজগুলি এবং কারিগরি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার মান উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে কলেজগুলিকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার। (১৪.৪-ঙ)

৮। দেশের শিল্প কারখানাসমূহের কারিগরি সমস্যা সমাধানকল্পে প্রকৌশল শিক্ষকদের উপদেষ্টা-প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হবে এবং বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। (১৪.৪-ঘ)

৯। দেশে প্রচলিত বিভিন্ন স্তরের কারিগরি শিক্ষার মূল্যায়ন এবং চাহিদা সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে একটি "কারিগরি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করা প্রয়োজন। (১৪.৮.)

১০। কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (১৪.৯.)

অধ্যায় ১৫

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বঃ

১৫.১. আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। এর উপর মানব সমাজের নির্ভরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের সমস্যাবলীর সমাধানে মানুষ বিজ্ঞানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই সকল উন্নত দেশেই বিজ্ঞানের সমাদর। বিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করছে।

১৫.২. বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে এক শ্রেণীর মানুষকে শক্তিশালী করে তোলা তা নয়, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই এরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। বিজ্ঞানের শিক্ষা এমন খাতে প্রবাহিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মন এর কল্যাণকর দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা উক্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে। জগতের বিভিন্ন দেশ বিজ্ঞান শিক্ষার যে অগ্রগতি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে আমরা তার তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়ে আছি। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর ব্যাপক এবং অন্যান্য দেশের মানের সমকক্ষ করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানঃ

১৫.৩. প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে (যেমন গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, মাটিপাথর, নদীনালা, জলবায়ু, মেঘবৃষ্টি ইত্যাদি) জ্ঞান দান করতে হবে। এছাড়াও দৈনিন্দন জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ যন্ত্রাদি, তাপ, শব্দ, চুম্বক, তড়িত ইত্যাদি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানও তাদের থাকা দরকার। প্রাইমারী স্তরের জন্য বিজ্ঞান পাঠ্যসূচী প্রণয়নের-সময় এও খেয়াল রাখতে হবে যে (ক) আমাদের দেশ কৃষি ভিত্তিক, তাই কৃষি সম্পর্কে ছাত্র-মনে আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করতে হবে এবং (খ) বর্তমানে দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, প্রায় সবাই অপুষ্টিতে ভুগছে। তাই পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রায় সবার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এসব কারণে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান সিলেবাসে আমরা প্রকৃতিপাঠ, কৃষি বিদ্যা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও পুষ্টি-বিজ্ঞানের উপর জোর দিতে বলেছি। পঞ্চম শ্রেণীতে জীব বিজ্ঞানের সূচনা হওয়া প্রয়োজন। এসব কথা মনে রেখে আমরা বিজ্ঞানের শিক্ষাকে ক্রমে উন্নততর মানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। সিলেবাস প্রণয়ন কালে আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সবগুলি উন্নত দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যে উচ্চমান এখন বিদ্যমান রয়েছে আমাদের যথাশীঘ্র সে মান অর্জন করতে হবে। অন্যথায় আমাদের শিক্ষার মানের নিন্দাতো হবেই, তদুপরি যে সব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করবে তাদেরকে দীর্ঘতর সময় বিদেশে অবস্থান করতে হবে, এতে অতিরিক্ত কালক্ষয় ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার প্রচুর অপচয় ঘটবে।

১৫.৪. ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে এবং এই কোর্সে জীববিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা প্রাধান্য লাভ করবে। তবে এই কোর্স এমন হবে যেন দৈনিন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার্থীরা লাভ করে। এজন্য পঞ্চম শ্রেণী হতেই উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে এবং গণিতের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞান শক্ষার পাঠক্রম অন্য দেশের সঙ্গে যতদূর সম্ভব একই মানের করতে হবে।

১৫.৫. বিজ্ঞান শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, চার্ট, মডেল ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। এ স্তরের পাঠ্য পুস্তক হবে সহজ ভাষায় লিখিত এবং আকর্ষণীয় চিত্রে সমৃদ্ধ। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রিপোর্টের 'শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক' অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানঃ

১৫.৬. মাধ্যমিক স্তরেও কলা বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রীকে সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয়রূপে পড়তে হবে এবং এতে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করার ব্যবস্থা থাকবে।

১৫.৭. মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও গণিত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়বে এবং আরো তিনটি বিষয় ঐচ্ছিক হিসাবে নেবে। নবম ও দশম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঐচ্ছিক হিসাবে থাকবেঃ

বিশেষ গণিত, জীব বিদ্যা, জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, জ্যোতির্বিদ্যা, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিদ্যা, প্রাথমিক অর্থনীতি, গৃহ ব্যবস্থাপনা, বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, সাধারণ কৃষি বিজ্ঞান, পশু পালন, ভূগোল, ইতিহাস অথবা পৌর বিজ্ঞান।

১৫.৮. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিশেষ কোর্স প্রবর্তিত হবে। বিজ্ঞান বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্য থেকে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও গণিতসহ চারটি বিষয় অধ্যয়ন করতে হবে। চতুর্থ বিষয়টি নিম্নের যে কোন একটি হতে পারেঃ জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহাওয়া বিদ্যা, অর্থনীতি, পুষ্টি বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, প্রকৌশলী অংকন, ওয়ার্কশপ প্রাকটিস, সামরিক বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য ও শরীর বিজ্ঞান। গণিতের বেলায় এই স্তরে ক্যালকুলাস এবং সাধারণ পরিসংখ্যান প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গণিতের উদাহরণগুলি বাস্তবমুখী ও বর্তমান কালোপযোগী হওয়া দরকার। এমন উদাহরণ থাকবে যা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় প্রয়োগ করা যায়।

১৫.৯. বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমাদের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক সেকেলে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞানের কোর্সে নতুন ভাবধারা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের খুব উন্নত পাঠক্রমের প্রবর্তন হয়তো আপাততঃ সম্ভব হয়ে উঠবে না। তা সত্ত্বেও মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরে বিজ্ঞান সিলেবাসকে বিশেষভাবে উন্নীত করতে হবে যাতে অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর উন্নত দেশের মানের সমকক্ষতা অর্জন করা যায়।

১৫.১০. আজকাল বিজ্ঞান শিক্ষায় নতুন নতুন প্রণালী সকল উন্নত দেশেই প্রবর্তন করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তর হতেই অসংলগ্ন ধারণা বা জ্ঞান দানের পরিবর্তে এখন মৌলিক সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়। ভ্যালেন্সি বা পরমাণবিক গঠন প্রভৃতির জ্ঞান প্রয়োগ করে রসায়ন বিদ্যায় প্রথম হতেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আবার সংখ্যা তত্ত্বের প্রয়োজনীয় ধারণার অন্তর্ভুক্তিতে এবং জ্যামিতিক ভেকটর ইত্যাদির ধারণা প্রদানে ও বীজগণিতের দল ও তত্ব (গ্রুপ থিউরী), ম্যাট্রিকস ইত্যাদির প্রয়োগে গণিতের আধুনিক পাঠ্যসূচী নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে ও পূর্ণতর জ্ঞান দানের সহায়ক হয়েছে। আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রণালীর উপর গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজতর ও উন্নততর করতে হবে।

১৫.১১. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্কুল-কলেজের বই-পুস্তক, সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে অনেক স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের শিক্ষোপকরণ বলতে কিছু নাই। এসব শিক্ষায়তনে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের বই সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজটি অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, তবে এই খাতে বৈদেশিক সাহায্য আমাদের বিশেষভাবে উপকৃত করতে পারে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য দুনিয়ার সব দেশে বর্তমানে গভীর সহমর্মিতা বিদ্যমান। এ অবস্থায় জাতিসংঘ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, জার্মান রিপাবলিক ও ভারত প্রভৃতি দেশে সরকার সাহায্যের প্রস্তাব পাঠালে তা বিশেষ সহানুভূতির সাথে বিবেচিত হবে বলেই আমাদের ধারণা।

ডিগ্রী এবং উচ্চস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাঃ

১৫.১২. স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার স্তরে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিগত দু' বছরে বেশ কিছু নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কতকগুলি কলেজে অনার্স ও মাষ্টার কোর্স চালু হয়েছে অথচ সেখানে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ এবং বই-পুস্তক দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও প্রাকটিক্যাল ক্লাশ এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। তদুপরি বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়, বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরী লুণ্ঠিত হয়। এসব কারণে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক চরম সংকট বিরাজ করছে। নতুন কলেজগুলি শিক্ষোপকরণে সমৃদ্ধ না হলে তারা বাঞ্ছিত ফল দেখাতে পারবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বিস্তারিত অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি শিক্ষায়তনকে হয়তো নিম্নস্তরভুক্ত করার প্রয়োজন ঘটবে। যে সব কলেজ ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কয়েছে, সর্বাগ্রে সেগুলিকেই উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হবে। যে সব কলেজে অনার্স এবং মাষ্টারস কোর্স খোলা হয়েছে সেগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। সংখ্যার পরিবর্তে গুণগত উৎকর্ষতার প্রয়োজন এখন সর্বাধিক। অনার্স কোর্সের সাথে সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলির সিলেবাস নিরূপিত হওয়া দরকার এবং অনার্স ও সাবসিডিয়ারীর ফল সমন্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখাসমূহের কোর্স থাকতে পারেঃ

পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, ফার্মাকলোজী ইত্যাদি।

১৫.১৩. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের সংগত অনুপাতের তুলনায় অতিরিক্ত ছাত্র সংখ্যা এবং ব্যবহারিক শিক্ষোপকরণের স্বল্পতার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা উপযুক্ত মানের হতে পারছে না। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্র ভর্তির সংখ্যা, তার যোগ্যতা এবং দেশের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া দরকার।

১৫.১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেখানে সম্ভব ফলিত গবেষণাও কিছু কিছু চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজন ফলিত গবেষণার বিষয় নির্বাচনে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৫.১৫. বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সংগে শিক্ষকগণ যাতে তাল রেখে চলতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত সঞ্জীবনী (রিফ্রেসার্স) কোর্স প্রবর্তন করা উচিত এবং এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

১৫.১৬. উচ্চ স্তরেও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে বলে বিজ্ঞানের বই-পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রণয়ন ও অনুবাদের কাজে অনতিবিলম্বে হাত দিতে হবে। সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং শিক্ষকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় এ দুরূহ কাজটি যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রিপোর্টের 'শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক' অধ্যায়ে রয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

সারাংশ

১। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করছে। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই এরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। বিজ্ঞানের শিক্ষা এমন খাতে প্রবাহিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মন এর কল্যাণকর দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা উক্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে। (১৫.১.—১৫.২.)

২। প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান সিলেবাসে প্রকৃতি পাঠ, কৃষি বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও সৃষ্টি বিজ্ঞানের উপর জোর দিতে হবে এবং পঞ্চম শ্রেণীতে জীব বিজ্ঞানের সূচনা করতে হবে। (১৫.৩.)

৩। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে এবং এই কোর্সে জীব বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন প্রধান্য লাভ করবে। (১৫.৪.)

৪। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, চার্ট, মডেল ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। এ স্তরের পাঠ্যপুস্তক হবে সহজ ভাষায় লিখিত এবং আকর্ষণীয় চিত্রে সমৃদ্ধ। (১৫.৫.)

৫। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়বে। কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সকল শিক্ষার্থীকে সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয়রূপে পড়তে হবে। (১৫.৬.—১৫.৭.)

৬। মাধ্যমিক ও তদূর্ধ স্তরে বিজ্ঞান সিলেবাসকে বিশেষভাবে উন্নীত করতে হবে যাতে অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর সব উন্নত দেশের মানের সমকক্ষতা অর্জন করা যায়। (১৫.৯.)

৭। বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজতর ও উন্নততর করতে হবে। (১৫.১০.)

৮। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্কুল-কলেজের বই-পুস্তক, সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফলে অনেক শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ বলতে কিছুই নাই। জরুরী ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের বই সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৫.১১.)

৯। যে সব কলেজে বিজ্ঞান অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স খোলা হয়েছে সেগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে। (১৫.১২.)

১০। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষকগণ যাতে তাল রেখে চলতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত "সঞ্জীবনী" (রিফ্রেসার্স) কোর্স প্রবর্তন করা উচিত এবং এ সব স্বল্প মেয়াদী কোর্সের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। ১৫.১৫.)

অধ্যায় ১৬

কৃষি শিক্ষা

১৬.১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কৃষির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সার্বিক উৎকর্ষসাধন কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করে। কৃষির উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে উপকরণ সরবরাহের উপর, কিন্তু উপকরণসমূহের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার ও কৃষিতে লাভজনক উৎপাদন তখনই সম্ভব হয় যখন কৃষককুল নিজ নিজ পেশায় সুচারুরূপে শিক্ষিত হয়ে লাভজনক উৎপাদনের জন্য নিজেদের ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে সক্ষম হয়। তাই কৃষি ব্যবস্থাপক হিসাবে কৃষকের প্রতিষ্ঠা লাভই দেশজ কৃষির উন্নতি। বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে সামগ্রিকভাবে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার সঙ্গে কৃষির সার্বিক উন্নতির যেরূপ প্রত্যক্ষ যোগসূত্র, মূলধন বিনিয়োগ, কৃষি সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক প্রাচুর্য, অথবা অন্য কোন বিশেষ উপকরণ সরবরাহ, ইত্যাদির কোনটির সঙ্গেই তেমনটি নেই। কৃষির উন্নতি নির্ভর করে উন্নত মানের জ্ঞান আহরণ ও তার স্বার্থক প্রয়োগের উপর। বলাবাহুল্য এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার এমন বিন্যাস প্রয়োজন যেন তাতে কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার স্থান সংগত ও সুনির্দিষ্ট থাকে। কৃষিতে নিয়োজিত দেশের বিরাট জনসংখ্যাকে সচেতন, সুদক্ষ উৎপাদনক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা এই শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদিকে করতে হবে সার্বজনীন, অপরদিকে করতে হবে কৃষি শিক্ষা প্রভাবিত।

১৬.২. কৃষি বলতে অবশ্য শুধু জমিতে ফসল উৎপাদন করাই বুঝায় না, পশুপাখী, মৎস্য ফলবান ও সারবান বৃক্ষ প্রভৃতির উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতিও বুঝায়। তাই এসবের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, প্রকৌশল এবং অর্থনীতি ও কৃষি শিক্ষার আওতাভুক্ত। কৃষি একাধারে যেমন একটি বিজ্ঞান, তেমনি ইহা একটি পেশামূলক শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসাও বটে। এর পরিধি ও ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী। আধুনিক কৃষি শিক্ষায় এসব সকল দিকেই সুষম দৃষ্টি দিতে হয়।

কৃষি শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাঃ

১৬.৩. (ক) আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে গাছপালা, মাটি ও আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশনের বন্দোবস্ত আছে। যেহেতু পাঠ্যসূচী আকর্ষণীয় নয় এবং উপযুক্ত শিক্ষক ও বর্তমানে নাই, তাই এ শিক্ষা শিশু-শিক্ষার্থীদের মনে তেমন রেখাপাত করে না।

(খ) মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম হিসাবে আছে বটে কিন্তু উহা মোটেই ফলপ্রসূ নয়। যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণের অপ্রতুলতা এর প্রধান কারণ। সরকারী স্কুলগুলিতে এ শিক্ষার প্রচলন নাই বললেই চলে। তাছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে কৃষি শিক্ষার প্রচলন আজও হয়নি। বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলা চলে।

(গ) কিছু সংখ্যক কৃষি কলাকুশলী এক সময়ে কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ দেশে তৈরী হত। তার জন্য ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান হতে এস, এস, সি পাস করা শিক্ষার্থীদের দু বছর অধ্যয়নের পর স টিফিকেট দেওয়া হত। এ শিক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন সরকারী চাকুরীরত গ্রামকর্মীদের সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। ফলে আজকাল আর কোন কৃষি কলাকুশলী তৈরী হচ্ছে না, এবং কৃষি সংক্রান্ত সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলি দক্ষ কর্মী সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

(ঘ) ডিগ্রী স্তরে কৃষি শিক্ষার জন্য এ দেশে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি কলেজ আছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি প্রকৌশল, মৎস্য বিজ্ঞান, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা এই ছয়টি অনুষদে বার্ষিক প্রায় পাঁচশত ছাত্র ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী ও ডিগ্রী-উত্তর পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। ঢাকাস্থ কৃষি কলেজের ডিগ্রী কোর্সে বার্ষিক একশত বিশ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। এ স্তরের শিক্ষা সংখ্যাগতভাবে অতি অল্প এবং ইহা দেশের প্রয়োজন ও কৃষি উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট বাস্তবানুগও নয়।

১৬.৪, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কৃষি শিক্ষার সুষ্ঠু প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করছিঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাঃ

১৬.৫. এ পর্যায়ের পাঠ্য-তালিকায় আবশ্যই কৃষিবিষয়ক সাধারণ তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাষা শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে, আর পরবর্তী শ্রেণীসমূহে মুখ্যতঃ বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের মাধ্যমে এবং গৌণতঃ ভূগোল, বাংলা, এমনকি গণিতের মাধ্যমে কৃষির মোটামুটি তথ্যসমূহ পরিবেশিত হবে। এখানে আমাদের লক্ষ্য থাকবে কোমলমতি বালক-বালিকাদের মনে প্রথম থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে একটা অনুরাগ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাদের স্বাভাবিক কৌতূহলের পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে এবং মাঝে-মাঝে শ্রেণীকক্ষের বাইরে অভিজ্ঞ শিক্ষকের নেতৃত্বে মাঠে, বাগানে, খামারে সত্যি-কারের প্রকৃতি পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা রকম শখের উন্মেষ ঘটাতে হবে, যেমন নানা প্রকারের পাতা, বীজ, পাখী, মাছ, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতির নাম, ছবি ও নমুনা সংগ্রহ।

আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। তাই শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই পঠিতব্য বিষয়াদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দৃষ্টিতে কৃষি কার্যের প্রতি যে একটা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোভাব বিদ্যমান, তাও দূরীকরণের জন্য সকল শিক্ষার্থীদের কৃষি-সম্প্রসারণ কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং স্কুলভিত্তিক প্রদর্শনী ও প্রচারব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষাঃ

১৬.৬. (ক) বৃত্তিমূলক কৃষি শিক্ষায় (১) শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, (২) মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, (৩) হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, (৪) কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত এবং (৫) খাদ্য সংরক্ষণ ও পুষ্টি বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে কোন একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে সম্যক জ্ঞানদান করা যাতে সে এ শিক্ষা সমাপনের পর ইহাকে ভিত্তি করে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়।

(খ) সাধারণমুখী শিক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞান ও পশুপালন দুটি বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে এ গ্রুপের শিক্ষার্থীরাও কৃষি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ নিতে পারে।

(গ) পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার কোন সুষ্ঠুব্যবস্থা নাই বললেই চলে, অথচ এ পর্যায়ে উপযুক্ত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। তাই বিজ্ঞান গ্রুপে মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তি করে এ পর্যায়ের উপযুক্ত কোর্স দিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে যারা বৃত্তিমূলক কৃষি শিক্ষাগ্রহণ করবে তারাও ইহাতে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং কৃষি বিজ্ঞান বিষয়গুলি বাধ্যতামূলকভাবে এ গ্রুপের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হবে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে কৃষিসংক্রান্ত ব্যবহারিক কাজ করাবার জন্য প্রত্যেক কলেজে যে জমি ও পুকুর থাকবে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ সংযোজন করে এ কোর্স চালু করা সম্ভব। আমরা সুপারিশ করি যে প্রত্যেকটি সরকারী কলেজে এ কোর্স চালু করা হোক।

স্কুল পরিত্যাগকারীদের জন্য কৃষি শিক্ষা:

১৬.৭. আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক ছাত্র আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে লেখাপড়া শেষ না করেই স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা তাদের অভিভাবকদের তথা সমাজের সকলের জন্যই এক সমস্যাস্বরূপ হয়ে থাকে। এ অসমাপ্ত শিক্ষা কর্মজীবনে তাদের কোন কাজে আসে না এবং তারা পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাতে এদের কর্মসংস্থান করা যায়। এ সংখ্যার কিয়দাংশ কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারদর্শী করান হলে, তারা স্বনির্ভর হতে পারবে এবং আত্মমর্যাদার সাথে জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এসব প্রশিক্ষণে মুখ্যতঃ হাতে-কলমে কৃষি কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

বাংলাদেশের প্রত্যেক থানায় একটি করে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। প্রতিটি কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক কৃষি শিক্ষা দেবার উপযোগী শিক্ষোপকরণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করলে এ সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণক্ষম শিক্ষার্থীদের একাংশেরও স্থান সংকুলান হবে না। তাই আমরা সুপারিশ করি যে থানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন করে এক একটি কৃষি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হোক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ পরিকল্পনা সর্বজনাদৃত হবে। প্রস্তাবিত কৃষি পলিটেকনিকগুলিতেও সান্ধ্যকালীন কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে কৃষি বৃত্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া উপযুক্ত ব্যবস্থাসম্বলিত স্কুল কলেজগুলিতেও কৃষিভিত্তিক সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।

কৃষি কলাকুশলী (ডিপ্লোমা স্তর):

১৬.৮. (ক) ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে আমাদের দেশে কোন কৃষি কলা-কুশলী তৈরী করার ব্যবস্থা চালু নাই। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত কৃষি বিভাগের অধীনে যে ছয়টি কৃষি স্কুল চালু ছিল সেগুলিকে গত কয়েক বছর যাবত চাকুরীরত গ্রাম কর্মীদের সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশে এখন আর নতুন করে কোন কৃষি কলাকুশলী তৈরী করা হচ্ছে না, ফলে বহু সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চিনি কল সংস্থা, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, চা উন্নয়ন বোর্ড, আণবিক শক্তি কমিশন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বন, পশু ও মৎস্য মন্ত্রণালয়, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, কৃষি ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থার কৃষি কলাকুশলীর চাহিদা পূরণের কোন বন্দোবস্তই নাই। তাই দেশে যথেষ্ট কৃষি কলাকুশলী সৃষ্টি করার ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে।

(খ) কৃষি সংক্রান্ত কলাকুশলী তৈরী করার জন্য কোর্সে মাধ্যমিক স্তরে কৃষিসহ বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র অথবা বৃত্তিমূলক কৃষি গ্রুপের ছাত্র ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এ শিক্ষাক্রম তিন বছর মেয়াদী হবে। দুই বছর ধরে একটি মৌল শিক্ষাক্রম থাকবে তারপর কর্মসংস্থানের সংগে সংহতি রেখে এক বছর কাল বিভিন্ন শাখায় বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে। শিক্ষা সমাপনান্তে কৃষিতে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশে দুটি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে (ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা) তিন বছর মেয়াদী ফার্ম টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। দেশে কৃষি কলাকুশলী তৈরী করার আশু প্রয়োজন বিবেচনায় আমরা সুপারিশ করি যে প্রতি বিভাগে একটি কৃষি পলিটেকনিক স্থাপন না করা পর্যন্ত প্রত্যেক পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে যথাযোগ্য কৃষি ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করা হোক।

(গ) উপরোক্ত পদ্ধতিতে দেশে কৃষি কলাকুশলী পেতে কয়েক বছর লাগবে অথচ এদের আশু প্রয়োজন। তাই আমরা সুপারিশ করি যে কৃষি গ্রুপে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস ছাত্রগণকে নিয়ে দু' একটি নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে এক বছর মেয়াদী বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কৃষি কলাকুশলী তৈরী করার জরুরীব্যবস্থা করা হোক।

কৃষি উচ্চ শিক্ষা ঃ

১৬.৯. বর্তমানে কৃষি উচ্চশিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত অপ্রতুল। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী করার জন্য কৃষি সম্পর্কিত উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ, যেমন জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, কোরিয়া ইত্যাদি দেশ যে ভাবে তাদের কৃষি শিক্ষার উৎকর্ষসাধন করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করেছে সে দিকে দৃষ্টি দিলে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে কৃষিতে উন্নতি করতে হলে দেশে কৃষি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত বহু ব্যক্তির প্রয়োজন।

১৬.১০. বার্ষিক প্রায় পাঁচশত আসনবিশিষ্ট দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও একশত বিশ আসনবিশিষ্ট একমাত্র কৃষি কলেজ দেশের বর্ণিত চাহিদা মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। ডিগ্রী পর্যায়ে বার্ষিক প্রায় দু হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির আশু প্রয়োজন রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রসারিত করা হোক এবং সেখানে বন উৎপাদন ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে ডিগ্রী কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। এ ছাড়া প্রতিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞানের অনুষদ এবং প্রতি বিভাগে একটি করে কৃষি কলেজ খোলা দরকার। তদুপরি প্রকৌশল কলেজগুলিতে কৃষি প্রকৌশল পাঠক্রম চালু করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৬.১১. (ক) রাজশাহী বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত কৃষি কলেজ দিনাজপুরে স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ করা যায় যে জাতীয় প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় দিনাজপুরে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতি অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরণের। এ অঞ্চল বিশেষ করে দিনাজপুর উত্তম মানের ধান ও ইক্ষুর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এতদ্ব্যতীত এ অঞ্চলে সুগার বীট, সূর্যমুখী, সয়াবিন ও কার্পাস চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ এলাকার কৃষি উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। আমরা সুপারিশ করি যে প্রস্তাবিত দিনাজপুর কৃষি কলেজ জরুরী ভিত্তিতে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্থাপন করা হোক। এখানে শিক্ষাদান এবং কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নততর গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে এ কলেজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনষ্টিটিউয়েন্ট কলেজ করা যেতে পারে। দিনাজপুর জিলায় পাট বীজ ও ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের সন্নিকটে প্রচুর জায়গা অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে। তাই উক্ত কলেজের স্থান এখানে নির্বাচিত করা যায়। কৃষি কলেজের জন্য জায়গা সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা মনে করি এখনই সাতশত একর পরিমাণ জমি বরাদ্দ করে রাখা হোক যাতে পরবর্তী কালে এই কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ কৃষি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা সহজতর হয়।

(খ) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত কৃষি কলেজে এ অঞ্চলের উপযোগী কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত কলেজে সামুদ্রিক জীবজ বিজ্ঞান, মৎস্য ও বন সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ফলোৎপাদন ও সংরক্ষণ, চা শিল্প ও রাবার চাষের উন্নয়ন, কফি ও কোকো উৎপাদন ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৬.১২. ডিগ্রী স্তরে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই কৃষি বিজ্ঞান অথবা সাধারণ বিজ্ঞানে বর্তমান উচ্চ-মাধ্যমিক সার্টিফিকেট মানের জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। ডিগ্রী দেওয়া হবে কৃষি বিজ্ঞান, মৎস্য বিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পশু-পালন ও পশু চিকিৎসা, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান, বন বিজ্ঞান ইত্যাদিতে। ডিগ্রী কোর্সের পাঠক্রম চার বছর মেয়াদি হবে। ডিগ্রী-উত্তর পর্বের পাঠক্রম এক বছর মেয়াদি থাকা উচিত। তাত্ত্বিক জ্ঞান ও গবেষণা দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। প্রতিটি ছাত্রের গবেষণা পরিচালনার জন্য মূল ও সহায়ক বিভাগ মিলে অন্ততঃ তিন জন শিক্ষকসম্বলিত একটি কমিটি থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৬.১৩. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, মৃত্তিকা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে অনার্স এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক-শিক্ষণঃ

১৬.১৪. প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীতে কৃষি সম্পর্কে জ্ঞান দানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রাথমিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে কৃষি পড়তে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী হতে মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যন্ত কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা হবে কৃষি শিক্ষায় ডিগ্রী, অথবা কৃষিতে ডিপ্লোমাসহ এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণ, অথবা মৃত্তিকা রসায়ন ও জীব বিজ্ঞানসহ ডিগ্রী এবং কৃষিতে এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণ। মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক কৃষি কোর্স এবং কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পড়াবার জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা হবে কৃষি শিক্ষায় ডিগ্রী অথবা কৃষিতে ডিপ্লোমাসহ এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণ। ডিপ্লোমা কোর্সের কৃষি বিষয়ক শিক্ষকদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০% ডিগ্রীপ্রাপ্ত হতে হবে।

উপরে উল্লিখিত এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কৃষি কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে করা যেতে পারে। এ কোর্সের শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হতে নেওয়া যেতে পারে। ডিগ্রী পর্যায়ে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা-দানের জন্য শিক্ষককে এক বৎসরের ডিগ্রী-উত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি ডিগ্রী-উত্তর বিশেষ কোর্স চালু করা দরকার।

১৬.১৫. বিভিন্ন দেশে কৃষি শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে। উদাহরণ-স্বরূপ, ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নাম করা যেতে পারে। রীতিসিদ্ধ সকল শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার সুষম প্রসারলাভ হবে। কৃষি শিক্ষা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য না হওয়ায় এবং নানা প্রতিবন্ধকতার দরুণ কৃষি শিক্ষা প্রসার লাভ করতে পারেনি। তাই, আমরা সুপারিশ করি যে, কৃষি শিক্ষার সকল স্কুল, কলেজ এবং কৃষি-সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি শিক্ষা বিভাগের আওতাধীনে আনা হোক।

কৃষি শিক্ষা

সারাংশ

১। আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। কৃষির উন্নতির জন্য বহু সংখ্যক শিক্ষিত কৃষিকর্মী, কৃষিকলাকুশলী এবং উচ্চশিক্ষিত কৃষিবিদ তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কৃষি শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এর বিস্তারসাধন করতে হবে। (১৬.১.)

২। শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই পঠিতব্য বিষয়াদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে। সমাজের দৃষ্টিতে কৃষিকার্যের প্রতি যে অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোভাব বিদ্যমান তা দূরীকরণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে কৃষি সম্প্রসারণকার্যে অংশগ্রহণ করতে হবে। (১৬.৫.)

৩। মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার বিস্তারসাধন করতে হবে। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (১৬.৬.)

৪। গ্রামাঞ্চলের যে সব ছাত্র লেখাপড়া শেষ না করেই স্কুল পরিত্যাগ করে চলে যায় তাদের হাতে-কলমে কৃষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা করতে হবে। (১৬.৭.)

৫। কৃষি কলাকুশলী তৈরী করার জন্য পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটগুলিতে কৃষি শিক্ষায় ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স চালু করতে হবে। (১৬.৮.)

৬। ডিগ্রী ও ডিগ্রী-উত্তর পর্যায়ে কৃষি শিক্ষার বিস্তার ও উৎকর্ষসাধন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে কৃষি কলেজ খুলতে হবে। রাজশাহী বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত কলেজটি দিনাজপুরে স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই কলেজকে যাতে ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত কৃষি কলেজগুলিতে এসব অঞ্চলের উপযোগী কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ খুলতে হবে এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সম্প্রসারণ করতে হবে। কৃষি গবেষণার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (১৬.১০. ও ১৬.১১.)

৭। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, মৃত্তিকা রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে অনার্স এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়। (১৬.১৩.)

৮। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী পর্যায়ের কৃষি শিক্ষকদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৬.১৪.)

৯। কৃষি শিক্ষার বিস্তার এবং উৎকর্ষসাধনের জন্য কৃষি শিক্ষাব্যবস্থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা প্রয়োজন। (১৬.১৫.)

অধ্যায় ১৭

চিকিৎসা শিক্ষা

১৭.১. বাংলাদেশের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা অসন্তোষজনক এবং দেশের স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণেও এই চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা অক্ষম। বর্তমান ব্যবস্থায় হাসপাতাল কেন্দ্রিক নিরাময়মূলক চিকিৎসা শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ সে তুলনায় কমিউনিটি মেডিসিন এবং তদসম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাবলীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। ডিগ্রীপূর্ব পর্যায়ে ও রেজিষ্ট্রেশনের আগে যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে তাও সন্তোষজনক নয়। ব্যাপক জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনে বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিধি ও মানের পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৭.২. বর্তমানে দেশে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, চিকিৎসা কৌশলী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর দারুণ স্বল্পতা রয়েছে। এ-কারণে কোনরূপ ব্যাপক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও অপ্রতুল!

১৭.৩. নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান হতেই পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বর্তমানে দেশে সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মোট সংখ্যা ২৪৭ জন। চিকিৎসক আছেন প্রতি ১০,৭০০ অধিবাসীর জন্য ১ জন। দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ৩২ জন এবং সেবাকর্মী আছেন প্রতি এক লাখের জন্য ১ জন। এ ছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসা কৌশলীদেরও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র সংখ্যাস্বল্পতা আছে।

১৭.৪. পরবর্তী সারণী হতে আগামী পাঁচ বছরে আমাদের দেশে চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

সারণী ১৭(ক)—বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা

বিষয়।	১৯৭৮ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের সংখ্যা।	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের বর্তমান সংখ্যা।	বর্তমানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষারতদের সংখ্যা।	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের ঘাটতি সংখ্যা।
১	২	৩	৪	৫
এ্যানাটমি	৪৭	৯	৩	৩৫
ফিজিওলজি	৩১	১২	৩	১৬
প্রাণ রসায়ন বিদ্যা (বায়োকেমিষ্ট্রি)। ..	২৩	৪	১	১৮
ফার্মাকোলজি	৩০	১৩	৩	১৪

বিষয়।	১৯৭৮ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের সংখ্যা।	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের বর্তমান সংখ্যা।	বর্তমানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষারতদের সংখ্যা।	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের ঘাটতি সংখ্যা।
১	২	৩	৪	৫
প্যাথলজি	১১৪	২০	৯	৮৫
মাইক্রোবায়োলজি ..	২৬	৮	৩	১৫
ভাইরোলজি	৭	..	..	৭
প্যারসাইটোলজি ..	৪	..	১	৩
মেডিসিন	১৩৭	৩২	৩৮	৬৭
শল্যবিদ্যা (সার্জারী) ..	১৩১	৩৯	১৪	৭৮
গ্যাইনেকোলজি	৮৫	২১	১১	৫৩
শিশু চিকিৎসা বিদ্যা (পেডিয়াট্রিকস)।	৪০	৮	১৪	১৮
চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যা (অপথালমলজি)।	৪৬	২১	৬	১৯
নাক, কান, গলা চিকিৎসা বিদ্যা	৩০	৭	৪	১৯
অর্থপেডিক সার্জারী ..	১০	১	৪	৫
এ্যানাসথেসিয়া ..	৮৫	৬	১৯	৬০
ব্লাড ট্রানসফিউশন ..	২৯	৫	৭	১৭
রেডিওলজি	৮৫	২০	৯	৫৬
রেডিওথেরাপী	৩০	১০	৭	১৩
ফিজিওথেরাপী	৮	২	..	৬
রেডিও আইসোটোপ ..	৮	১	২	৫
ডারমাটোলজি	৯	২	৭	..

বিষয়।	১৯৭৮ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের সংখ্যা।	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের বর্তমান সংখ্যা।	বর্তমানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষারতদের সংখ্যা।	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের ঘাটতি সংখ্যা।
১	২	৩	৪	৫
ডেনটিস্ট্রি (দন্ত চিকিৎসা বিদ্যা)	৩২	..	৪	২৮
সাইকিয়াট্রি	১৭	৫	৮	৪
নিউরোসার্জারী ..	৮	..	..	৮
নিউরোমেডিসিন ..	৮	..	..	৮
নিউরোরেডিওলজি ..	৮	..	..	৮
নিউরোএ্যানাসথেসিয়া ..	৮	..	..	৮
কার্ডিয়াক সার্জারী ..	৮	..	..	৮
কার্ডিয়াক মেডিসিন ..	৮	..	..	৮
কার্ডিয়াক ফিজিওলজি ..	৮	..	..	৮
কার্ডিয়াক এ্যানাসথেসিয়া ..	৮	..	..	৮
ইউরোলজি	৮	১	..	৭
হেমাটোলজি	১	..	..	১
ব্লাড ডিজিজেস (রক্ত সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা বিদ্যা)।	২	..	..	২
গ্যাসট্রো এনটারোলজি ..	২	..	..	২
এনটমোলজি ..	২	..	..	
এপিডেমিওলজি ..	২	..	১	১

এতদ্ব্যতীত বর্তমানে দেশে সাত হাজার প্রথম ডিগ্রীধারী চিকিৎসক রয়েছেন অথচ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এরূপ তের হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। কাজেই আরো ছয় হাজার চিকিৎসক তৈরী করতে হবে।

সারণী ১৭(খ)—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৭৩-৭৮) প্যারামেডিক্যাল কর্মী সৃষ্টির আনুমানিক হিসাব

কর্মী।	১৯৭২-৭৩ এর সংখ্যা।	পরিকল্পনাকালে কর্মী সৃষ্টির আনুমানিক হিসাব।	১৯৭৭-৭৮ সালে লক্ষ্য
স্বাস্থ্য পরিদর্শক ..	৯৮০	১,২৪০	২,২২০
কম্পাউণ্ডার ফার্মাসিষ্ট ..	১,৫০০	২,০০০	৩,৫০০
গবেষণাগার কৌশলী ..	২৭০	১,৫০০	১,৭৭০
রঞ্জনবিদ্যা কৌশলী ..	১৩০	৩৭০	৫০০
ব্লাড ব্যাংক কৌশলী ..	২০	২৫০	২৭০
রশ্মি চিকিৎসা কৌশলী ..	১০	২৫০	২৬০
ফিজিওথেরাপী কৌশলী ..	২০	২৫০	২৭০
দন্ত চিকিৎসা কৌশলী ..	২০	২৫০	২৭০
মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক * ..	৮০০	৩,২০০	৪,০০০
ধাত্রী ..	২৫০	৫০০	৭৫০
বহুবিধ কার্যের জন্য মৌলিক পরিবার কল্যাণ কর্মী।	নাই	২৫,০০০	২৫,০০০

* এই জাতীয় কর্মীদের নতুন নামকরণ হচ্ছে পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিদর্শক।

সারণী ১৭(গ)—সেবক-সেবিকাদের সংখ্যা

	১৯৭৪-এর সংখ্যা।	১৯৮০ সালে প্রয়োজনীয় সংখ্যা।
বর্তমানে চাকুরি ও প্রথম ডিগ্রীধারী সেবক-সেবিকার সংখ্যা।	৫৪৯	৩,০০০
বর্তমানে চাকুররত জুনিয়র নার্সদের সংখ্যা	৫০	এই কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সদের সংখ্যা (শিক্ষকতা ও পরিচালনায়)।	৪০	৩৬০

সহকারী সেবিকা, ধাত্রী, মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক, মহিলা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ইত্যাদি প্রকারভেদ তুলে দিয়ে এক নতুন প্রকারের কর্মী "পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিদর্শক"-এর সৃষ্টি করা হয়েছে। এ-নতুন কর্মীরা পূর্বোক্ত সকল প্রকার কর্মীর স্থান গ্রহণ করবে।

১৭.৫. সারনী ১৭(গ) হতে প্রতীয়মান হয় যে আগামী পাঁচ বছরে বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা এবং এই সমস্ত কর্মীর বর্তমান সংখ্যা এ দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

১৭.৬. বর্তমান চিকিৎসা বিদ্যা ও আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহের শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, সে ব্যবস্থায় এ বিপুল সংখ্যক কর্মী তৈরীর জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী তৈরী ছাড়া কোন ব্যাপক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। কাজেই এই ব্যবধান দূর করার জন্য জরুরী কর্মসূচীর প্রয়োজন রয়েছে।

১৭.৭. দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামবাসী। কিন্তু গ্রাম্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। বতমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরাময়মূলক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সে তুলনায় প্রতিরোধমূলক শিক্ষা এবং কমিউনিটি মেডিসিন শিক্ষাদান বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন গুরুত্ব পায়নি। ফলে শিক্ষা কালে চিকিৎসকগণ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের মৌলিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম নন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে এ অজ্ঞতার জন্য গ্রামে চিকিৎসকদের একটি ভিন্নতর ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যে সম্পর্কে তাঁরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাননি। চিকিৎসকের গ্রামে যাওয়ার বর্তমান অনীহার এটা একটা অন্যতম কারণ।

১৭.৮. চিকিৎসা শিক্ষার বর্তমান কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচীর সঙ্গে দেশের সত্যিকারের প্রয়োজন ও সমস্যার কোন সংযোগ নাই। আমাদের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা সাধারণভাবে বিদেশী চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, আমাদের দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির উপর বিশেষভাবে ভিত্তি করে নয়। কাজেই বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। এ কার্যক্রম দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির উপর ভিত্তি করে তৈরী হলে দেশের চিকিৎসা সমস্যা সমাধানে চিকিৎসকদের সম্যকভাবে কাজে লাগানো যাবে। চিকিৎসকেরা যদি অন্যান্য দেশের বিশেষ রোগসমূহ ও স্বাস্থ্য সমস্যাদি সম্পর্কে বেশী শিক্ষা পেতে থাকেন, তবে চিকিৎসকদের রপ্তানীযোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়ার আশংখা আছে।

১৭.৯. গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটাবার জন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যা, প্রতিরোধমূলক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, ব্যাধি সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় যাতে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমে যথোপযুক্ত গুরুত্ব পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৭.১০. চিকিৎসা শিক্ষার প্রথম থেকে প্রশিক্ষণ কাল পর্যন্ত যদি আমাদের সমাজের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয় ও প্রত্যক্ষভাবে এসব সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়, তাহলে ভবিষ্যত চিকিৎসকদের গ্রামের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রযোজ্য। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা যে বিভিন্ন রোগের অন্যতম কারণ সে সম্পর্কে যথাযথ বক্তব্য শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মোটের উপর, চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব ভিত্তিক করতে হবে যেন আমরা সমাজ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ দক্ষ ও বুদ্ধিমান স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টি করতে পারি।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঃ

১৭.১১. চিকিৎসা শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হওয়া উচিত ঃ

(১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমন চিকিৎসক তৈরী করা যারা দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ-সমূহ ও সমাজের স্বাস্থ্য সমস্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকবেন এবং আপন পেশার আর্তসেবা ও সমাজকল্যাণ দিককেই গুরুত্ব দেবেন।

(২) যথোপযুক্ত মান বজায় রেখে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবক-সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টি করতে হবে।

(৩) কাজে আগ্রহ বাড়াবার জন্য সেবক-সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর স্ব স্ব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৪) প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির প্রয়োজনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যথাযথ সম্প্রসারণ করতে হবে।

১৭.১২. এম, বি, বি, এস, কোর্স ঃ ভর্তির যোগ্যতা ঃ চিকিৎসা কলেজগুলিতে শুধুমাত্র মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে।

প্রার্থীকে অবশ্যই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং অঙ্ক শাস্ত্রসহ বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অথবা প্রস্তাবিত একাদশ শ্রেণীর শেষে গৃহীতব্য পরীক্ষা অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রস্তাবিত এগার বছর মেয়াদী স্কুল শিক্ষার মান বর্তমান দ্বাদশ বছর স্থায়ী শিক্ষার মানের সমান হবে। এ ছাড়া, চিকিৎসা ও সমাজ সেবার প্রতি ছাত্রদের প্রবণতা যাচাই করার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কোর্স এবং শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

১৭.১৩. বর্তমানে কোর্স এবং শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্য পুস্তকের উপর বেশী নির্ভরশীল, দেশের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম এমন হওয়া উচিত যেন সংক্ষিপ্ত অথচ দেশের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যা ও বিশেষ রোগসমূহ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব বর্তমানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন বায়োকেমিষ্ট্রি, মাইক্রো-বায়োলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, আচরণ বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এম, বি, বি, এস, কোর্সের দৈর্ঘ্য পূর্ণ পাঁচ বছর হতে হবে। সম্পূর্ণ কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে ঃ দুই বছর প্রি-ক্লিনিক্যাল এবং তিন বছর ক্লিনিক্যাল।

প্রি-ক্লিনিক্যাল কোর্সে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পড়ানো হবে ঃ

এ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিষ্ট্রি, সাইকোলজি, সমাজবিজ্ঞান ও প্রাথমিক বায়ো-ষ্ট্যাটিস্টিকস বিষয়সমূহ পড়ানো হবে। এ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং বায়োকেমিষ্ট্রি শিক্ষাদান কোর্সের দুই বছর চলবে। তবে উক্ত বিষয়গুলি ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। সাইকোলজি ও সমাজবিজ্ঞান এবং প্রাথমিক বায়ো-ষ্ট্যাটিস্টিকস শিক্ষাদান প্রথম বর্ষে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রাথমিক বায়ো-ষ্ট্যাটি-স্টিকসের শিক্ষামান কমিউনিটি মেডিসিনের শিক্ষকদের তত্বাবধানে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে কত সময় শিক্ষাদান করা হবে তা বিষয়গুলির গুরুত্বের সঙ্গে সমতা রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

ক্লিনিক্যাল কোর্সের পঠিতব্য বিষয়সমূহ ঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে ঃ (ক) ফার্মাকলজি, (খ) মাইক্রোবায়োলজি, (গ) প্যাথলজি, (ঘ) প্রতিরোধমূলক মেডিসিন ও কমিউনিটি মেডিসিন, (ঙ) টক্সিকোলজি এবং ফরেনসিক মেডিসিন, (চ) মেডিসিন, (ছ) সার্জারি।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে ঃ (ক) মেডিসিন, (খ) সার্জারি, (গ) স্ত্রী রোগবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা, (ঘ) প্রতিরোধমূলক মেডিসিন ও কমিউনিটি মেডিসিন।

এ্যানাটমি ঃ

১৭.১৪. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে এ্যানাটমি শিক্ষা দিতে হবে। পাঠক্রমের মধ্যে মানবদেহের গঠন ও স্নায়ুতন্ত্রাদির গঠন, এমব্রায়োলজি ও হিসটোলজি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বিষয়গুলির শিক্ষার জন্য বক্তৃতা, আলোচনা, প্রতিপাদন (ডেমোনষ্ট্রেশন) ও ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে। মানব শরীরের গঠন সম্পর্কে ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ করে শিখবে। প্রতিটি ছাত্রকে একটি সম্পূর্ণ মানবদেহের শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। বর্তমানে তাত্ত্বিক আলোচনার উপরই অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিষয়টির হাতে কলমে শিক্ষাদান এবং ব্যবহারিক দিকের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই রীতি পরিবর্তন করে হাতে কলমে শিক্ষাদান ও ব্যবহারিক এবং প্রয়োগগত দিকের উপর অধিক জোর দিতে হবে।

ফিজিওলজিঃ

১৭.১৫. এ বিষয়টিতে শিক্ষাদান প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষেই সম্পূর্ণ করা হবে। বিষয়টির পাঠ্যসূচীতে মানবদেহের ফিজিওলজি ও তার প্রয়োগগত দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাত্ত্বিক শিক্ষাকে যথাসম্ভব জীবজন্তু ও মানবদেহের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সম্পূর্ণ করে তোলা প্রয়োজন। মানুষের বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত ফিজিওলজি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নীতিগর্ভ বক্তৃতা এবং হাতে কলমে শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষামূলক আলোচনা ও ডেমোনষ্ট্রেশন-এর সাহায্যে শিক্ষাকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

প্রাণ-রসায়ন (বায়োকেমিষ্ট্রি) ঃ

১৭.১৬. আধুনিক রোগবিদ্যা যথাযথভাবে উপলব্ধি এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রাণ-রসায়ন জানার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, পৃথিবীর উন্নত দেশের চিকিৎসা শিক্ষায়তনগুলিতে পৃথক ও স্বনির্ভর প্রাণ-রসায়ন বিভাগ রয়েছে। আমাদের দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলিতেও তা থাকা উচিত।

প্রাণ-রসায়নের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রয়োজন। এ ছাড়াও রোগ-ব্যাধির সঙ্গে প্রাণ-রসায়নের সম্পর্ক সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা দরকার। বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তির কারণ সেই ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে দেহে যে সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে প্রতিফলিত। কাজেই মানবদেহের অভ্যন্তরে স্বাভাবিক রাসায়নিক সম্বন্ধে জ্ঞানদান না করলে ব্যাধির উৎপত্তির কারণ অনুধাবন করা ছাত্রদের পক্ষে কষ্টকর। এযাবত খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষাদান অবহেলিত হয়ে এসেছে। এগুলির উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাণ-রসায়ন শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে বিস্তৃত থাকবে। দ্বিতীয় বর্ষের শেষে ছাত্রদের মূল্যায়ন হতে পারে। এই মূল্যায়ন ফিজিওলজি ও প্রাণ-রসায়নে দ্বিতীয় বর্ষের শেষে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আচরণ বিজ্ঞান ঃ

১৭.১৭. বর্তমান যুগে আচরণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতঃ একজন স্বাস্থ্য কর্মীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে মানবদেহ, মন ও পারিপার্শ্বিকতার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে তার জ্ঞানের উপর। কাজেই মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে ছাত্রদের যথোপযুক্ত জ্ঞানদানকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এই বিষয়গুলি প্রথম বর্ষে শিক্ষাদান করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম বর্ষের শেষে এ শিক্ষার মূল্যায়ন হতে পারে।

প্রতিরোধমূলক এবং কমিউনিটি মেডিসিনঃ

১৭.১৮. আমাদের মত উন্নতিশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্য পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত রোগ প্রতিরোধ। সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এই বিষয়গুলিকে এম, বি, বি, এস, কোর্সে পাঠক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই শিক্ষাদান যদি কোর্সের শেষ তিন বছরে দেওয়া হয় তবে তা সর্বাধিক ফলপ্রসূ হবে।

কমিউনিটি মেডিসিনঃ

১৭.১৯. জনস্বাস্থ্য পরিচালনা, জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান এই বিষয়গুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাত্ত্বিক শিক্ষা যথাসম্ভব সীমিত করে বাস্তবমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এজন্য সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও হাতে কলমে কাজে অংশ গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে। পঞ্চম বর্ষের শেষে মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

প্যাথলজিঃ

১৭.২০. সাধারণ প্যাথলজি, বিশেষ প্যাথলজি, হেমাটোলজি ও ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি এ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে এ শিক্ষা-সম্পন্ন করা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যাধিতে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবর্তন ঘটে এবং সেজন্য মানবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের বৈকল্য ঘটে এ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানদান করা প্রয়োজন। সে জ্ঞানদানের জন্য বক্তৃতা, প্রতিপাদন ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অংশগ্রহণ ছাড়াও ছাত্রদের ক্লিনিকো-প্যাথলজিক্যাল কনফারেন্স, পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষা, সেমিনার ইত্যাদিও শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আমাদের দেশে যে সমস্ত রোগ বেশী দেখা যায় সে সমস্ত রোগের প্যাথলজি শিক্ষাদানই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।

মাইক্রোবায়োলজিঃ

১৭.২১. বিগত কয়েক দশকে এ বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধিগুলির বিস্তার ও তা নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে জানতে হলে মাইক্রোবায়োলজিতে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেহেতু এই বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রগতি ও বিস্তৃতি ঘটেছে, সেহেতু এ বিষয়টিকে প্যাথলজি থেকে পৃথক করে আলাদা বিষয় হিসাবে চিকিৎসা কলেজগুলিতে শিক্ষাদান করা উচিত। আমাদের দেশে যেসব ব্যাধির প্রকোপ বেশী, সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত মাইক্রোবায়োলজিই শিক্ষার ভিত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষাদানের উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।

ব্যাকটেরিওলজি, ইমিউনোলজি ও প্যারাসাইটোলজি তৃতীয় বর্ষে এবং ভাইরোলজি ও মাইকোলজি চতুর্থ বর্ষে শিক্ষাদান করা উচিত।

রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত মাইক্রোবায়োলজিতে ছাত্ররা যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা চতুর্থ বর্ষে থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে ছাত্ররা বিভিন্ন মাইক্রোবায়োলজি সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন করতে শিখবে এবং বিষয়টির প্রয়োগগত দিক সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করবে।

টক্সিকোলজি ও ফরেনসিক মেডিসিনঃ

১৭.২২. বর্তমানে যে পাঠ্যসূচী আছে তা যথেষ্ট। তবে এই বিষয়ে ছাত্রদের আরও হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। ছাত্রদের আরও অধিক সংখ্যক মেডিকো-লিগ্যাল পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষায় উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ফার্মাকোলজিঃ

১৭.২৩. বিভিন্ন ধরণের ঔষধাদির রাসায়নিক রূপ ও গুণাগুণ, দেহের অভ্যন্তরে ঔষধাদির পরিবর্তন, ক্রিয়াকলাপ ও দেহপ্রক্রিয়ার উপর প্রভাব, বিভিন্ন রোগে ঔষধাদির প্রয়োগরীতি (সাধারণ ফার্মাকোলজি, ফার্মাকো ডিনামিকস, ফার্মাকোথেরাপিউটিকস) এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ফিজিওলজি, প্রাণ-রসায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার আলোকে এই বিষয় শিক্ষাদান করা উচিত। তাতে ছাত্রদের মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর না করে ঔষধাদির কার্য ও ফলাফল বুঝতে সুবিধা হবে। ঔষধাদির কার্য সম্বন্ধে উপলব্ধি সহজতর করার জন্য ঔষুধাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাত্রদের প্রদর্শন করা এবং তাদের নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাদানের উপকরণ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঔষধাদি সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান হয়।

মেডিসিনঃ

১৭.২৪. নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মেডিসিনের অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) সাধারণ মেডিসিন, (খ) শিশু রোগ বিদ্যা, (গ) মানসিক রোগ বিদ্যা, (ঘ) চর্ম ও যৌন ব্যাধি।

দেশের চাহিদা মিটানোই চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই দেশে যে সমস্ত রোগ বেশী দেখা দেয় সে সব রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। যে সব রোগ এদেশে কম সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে শিক্ষাদান করতে হবে যাতে ছাত্ররা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ব্যাধি সম্পর্কে জানতে পারে। দেশের বাস্তব সমস্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখে মেডিসিন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। রোগীদের শয্যাপার্শ্বে, রোগ সম্বন্ধে ও আনুসাঙ্গিক অনুসন্ধানসমূহের শিক্ষাদান, ক্লিনিকো প্যাথলজিক্যাল কনফারেন্স, বৈঠক ও সেমিনার ইত্যাদির উপর আরও জোর দিতে হবে। সামাজিক পরিবেশে মেডিসিন শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রদের কিছুদিন নিকটস্থ গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রের বহির্বিভাগে কাজ শিখার ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য।

মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ছাত্রদের সজাগ করা ও সে সম্বন্ধে তাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি চিকিৎসা কলেজ হাসপাতালে মানসিক ব্যাধি বহির্বিভাগ ও হাসপাতালে রেখে মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক রোগ মানসিক সমস্যা উদ্ভূদ এবং অন্যান্য অনেক রোগে মানসিক সমস্যার দৈহিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাধারণ চিকিৎসকরাও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরণের অনেক রোগীর সম্মুখীন হন। সে কারণে মানসিক ও সাইকোম্যাটিক ব্যাধিসমূহ সম্বন্ধে ছাত্রদের যথোপযুক্ত জ্ঞানদান করা প্রয়োজন এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে সমতা রেখে মানসিক ব্যাধি বিভাগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষা (থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল), ক্লিনিক্যাল বৈঠক, ক্লিনিকো প্যাথলজিক্যাল কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদি ব্যবস্থা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষব্যাপী থাকা উচিত। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। প্র্যাকটিক্যাল, ক্লিনিক্যাল বৈঠক, সেমিনার ইত্যাদিকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সব বিষয়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৭.২৫. **সার্জারিঃ** নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সার্জারির অন্তর্ভুক্তঃ

(১) সাধারণ সার্জারি, (২) অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত সার্জারি, (৩) বিশেষ বিভাগসমূহ, যেমন চক্ষুব্যাধির সার্জারি, নাক, কান ও গলার সার্জারি।

সার্জারি শিক্ষা দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির উপর ভিত্তি করে হতে হবে। এজন্য সার্জারি চিকিৎসার উপযোগী রোগীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত সার্জারির উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। শল্যচিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম পরিচিতি ও তাদের ব্যবহার

প্রণালী শিক্ষার উপরও জোর দেওয়া উচিত। ক্লিনিক্যাল বৈঠক, সমন্বিত সিম্পোজিয়াম, ক্লিনিকো প্যাথলজিক্যাল কনফারেন্স ইত্যাদিও সার্জারি চিকিৎসা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হওয়া উচিত। ব্যাপক সামাজিক পরিবেশে সার্জারি চিকিৎসার বিশেষ দিকগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে কারণে সার্জারি চিকিৎসার বহির্বিভাগে ছাত্রদের কার্যকালের অর্ধেক সময় নিকটস্থ গ্রাম্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাটানো উচিত। সেখানে বাস্তব সামাজিক পারিপার্শ্বিকে সার্জারি চিকিৎসার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তারা শিক্ষালাভ করবে।

সার্জারি চিকিৎসার প্রতিটি বিভাগে ছাত্রদের হাতে কলমে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য সার্জারি চিকিৎসকদের সাহায্য করার মাধ্যমে অস্ত্রোপচারসমূহে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করা উচিত। ছোট খাট অস্ত্রোপচার, যেগুলো সাধারণ চিকিৎসকদের প্রায়ই করতে হয়, সেগুলো হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রোগসমূহের জরুরী অবস্থা বিশেষতঃ আমাদের দেশে যেসব জরুরী অবস্থা বেশী দেখা যায়, সেগুলি নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য জরুরী রোগ বিভাগে ছাত্রদের কিছুকাল বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হবে।

চক্ষুব্যাধির সার্জারি এবং নাক, কান ও গলার রোগের সার্জারি শিক্ষাদানের পৃথক ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ সব বিভাগে শিক্ষাদানের অধিকাংশ সময়ই ছাত্রদের হাতে কলমে শেখার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে সমন্বিত আলোচনা সভা ও সেমিনার করে যুক্তভাবে মেডিসিন ও সার্জারি শিক্ষাদান করা যায়।

১৭.২৬. **রেডিওলোজিঃ** রোগ নির্ণয় বিষয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছাত্রদের যথেষ্ট জ্ঞানদান করা প্রয়োজন, যাতে তারা এই বিদ্যার সাহায্যে সাধারণ রোগসমূহ নির্ণয়ে সক্ষম হয় এবং রেডিওগ্রাফ মূল্যায়নের মাধ্যমে রোগ নির্দেশ করতে পারে।

১৭.২৭. **স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যাঃ** স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষাদান চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ এ দুবছর ব্যাপী হওয়া উচিত। এই বিষয়ে শিক্ষাদান যথাসম্ভব মৌলিক বিষয়সমূহ, মেডিসিন ও সার্জারি শিক্ষাদানের সঙ্গে সমন্বিত হওয়া উচিত।

হাতে কলমে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপর আরও জোর দেওয়া উচিত। এজন্য স্ত্রীরোগ চিকিৎসার বহির্বিভাগে ও প্রসব কক্ষে ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে। সমাজের বাস্তব পরিবেশে চিকিৎসা করতে গেলে চিকিৎসকেরা বহু সংখ্যায় স্ত্রীরোগ ও প্রসবের জটিলতা সম্পর্কিত রোগীনির সম্মুখীন হবেন। এসব রোগের সঠিক চিকিৎসার জন্য ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।

মানুষের বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিটি দিক সম্বন্ধেও ছাত্রদের ভালভাবে শিক্ষিত করা উচিত। এজন্য চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছাড়াও বায়োলজিক্যাল কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী, ডেমোগ্রাফকারী ও পরিসংখ্যানবিদদের নিয়ে সমন্বিত শিক্ষাদান করা উচিত।

গ্রামীণ ব্যবহারিক চিকিৎসা শিক্ষার উপর আরও জোর দেওয়া উচিত। এ সময় স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে সার্জারি চিকিৎসা, মেডিসিন, শিশুরোগ ও সোশাল মেডিসিন-এর সমন্বিত শিক্ষাদান করতে হবে।

বর্তমানে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় ছাত্রদের হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যাপারে কম গুরুত্ব আরোপিত হয় এটা অনেকদিন যাবত অনুভূত হচ্ছে। সঠিক গুরুত্ব সহকারে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্ত্রীরোগ বহির্বিভাগে ছাত্রদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকাল বর্ধিত করা প্রয়োজন। ডায়াগনষ্টিক, রেডিওলজি, এ্যানেসথেসিয়া, ব্লাড ট্রান্সফিউশন হাতে কলমে শিক্ষাদানের দিকে দৃষ্টি রেখে ডায়াগনষ্টিক, রেডিওলজি, এ্যানেসথেসিয়া ও প্র্যাকটিক্যাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রতিপাদনের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার তালিকা

(ক) **প্রাক-ক্লিনিক্যাল কোর্স ঃ**

প্রথম বর্ষ ঃ
(১) এ্যানাটমি।
(২) ফিজিওলজি।
(৩) প্রাণরসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি)।
(৪) আচরণ বিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান)।

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ
(১) এ্যানাটমি।
(২) ফিজিওলজি।
(৩) প্রাণরসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি)।

(খ) **ক্লিনিক্যাল কোর্স ঃ**

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ ঃ
(১) ফার্মাকোলজি।
(২) প্যাথলজি।
(৩) মাইক্রোবায়োলজি।
(৪) প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিন।
(৫) টক্সিকোলজি ও ফরেনসিক মেডিসিন।
(৬) মেডিসিন।
(৭) শল্যবিদ্যা (সার্জারী)।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ ঃ
(১) মেডিসিন।
(২) শল্যবিদ্যা (সার্জারী)।
(৩) স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা।
(৪) প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিন।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ ঃ গ্রামীণ ব্যবহারিক চিকিৎসা শিক্ষা (ফিল্ড সার্ভিস)—(তিন মাস)।

↓

স্নাতক ডিগ্রী (এম, বি, বি, এস,)।

↓

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকাল এক বছর।

(মেধার ভিত্তিতে পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে ৬ মাস, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয়সমূহে ৬ মাস)

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা ঃ

	ডিগ্রী	মেম্বর শিপ	ফেলোশিপ
ডিপ্লোমা	মৌলিক বিষয়সমূহে	পরীক্ষা—	পরীক্ষা—
বিশেষ বিষয়সমূহে	এম. ফিল.	কলেজ অব ফিজিসিয়ানস	কলেজ অব ফিজিসিয়ানস
	ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে	ও সার্জন্স	ও সার্জন্স
	মাষ্টার ডিগ্রী		

গ্রামীণ ব্যবহারিক চিকিৎসা শিক্ষা (ফিল্ড সার্ভিস) ঃ

১৭.২৮. চিকিৎসা শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত যাতে গ্রামের ব্যাপক জনসমাজ তার সুফল পেতে পারে। এজন্য গ্রামের চিকিৎসা সমস্যাদি সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

ছাত্রদের শিক্ষাকালের একটি নির্দিষ্ট সময় ক্লিনিক্যাল শিক্ষকের তত্ত্বধানে তাদের গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করা উচিত। সেখানে মেডিসিন, শল্যবিদ্যা, শিশু চিকিৎসাবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, কমিউনিটি মেডিসিন ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত শিক্ষা দিতে হবে। এ কার্যকালে ছাত্ররা সমাজ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যেমন প্রতিষেধক টিকাদান ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। এ সমন্বিত কার্যক্রম ন্যূনতম তিন মাস কাল হওয়া উচিত। এই কার্যক্রমের জন্য চিকিৎসা কলেজগুলির নিকটে অবস্থিত এক বা একাধিক গ্রাম্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব গ্রাম্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নির্দিষ্ট কালের জন্য যেসব ছাত্র ও শিক্ষক কাজ করবেন, তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা:

১৭.২৯. বর্তমানে যে মূল্যায়নে ব্যবস্থা চালু আছে তা ত্রুটিপূর্ণ এবং তাতে ছাত্রদের মেধা সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। ছাত্রদের মেধা ও জ্ঞান সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ছাত্রদের সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন করতে পারলে তা আদর্শ হতো; কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছে না এজন্য যে এতে শিক্ষক-ছাত্রের বাঞ্ছনীয় অনুপাতের অভাব। যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন বর্তমান পদ্ধতিকে সংশোধন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য লিখিত পরীক্ষা ন্যূনতম মাত্রায় থাকবে এবং তা অবজেকটিভ ও সমস্যা সমাধান ধরণের হতে হবে। মৌখিক, প্র্যাকটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সব পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন সমভাবে করার জন্য মৌখিক পরীক্ষায় পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালা থাকা উচিত।

বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের পরিশ্রম ও মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের পদক, প্রশংসাপত্র ও অন্যান্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকাল (ইন্টার্নশিপ):

১৭.৩০. ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকাল এক বছরের হওয়া উচিত। এর মধ্যে ছয় মাস সদ্য ডিগ্রী-প্রাপ্ত চিকিৎসকগণ মেধার ভিত্তিতে স্ব-স্ব নির্বাচিত বিভাগে প্রশিক্ষণ লাভ করবে এবং বাকী ছয় মাস পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার মাধ্যম:

জাতীয় ভাষা বাংলাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যদিও অন্তর্বর্তীকালে ইংরেজীর সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। এজন্য উপযুক্ত মানের ও আধুনিক তথ্য-সম্বলিত পাঠ্য-পুস্তক ও সাময়িকীর প্রয়োজন। আমাদের দেশের চিকিৎসা বিদ্যা আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং পরিবর্তনশীল, এ বিধায় পরিভাষা একই ধরণের হওয়া উচিত। পাঠ্য-পুস্তক তৈরী করার সময় একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ:

বর্তমানে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের অধীন—সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল কাউন্সিল। অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষক নির্বাচন, ছাত্র ভর্তি এবং সাধারণ পরিচালনার ভার সরকারের হাতে। এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালগুলিকে সাধারণ চিকিৎসার হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এতে শিক্ষাদানের উপযোগী উপকরণের অভাব ঘটছে এবং শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কারণ রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসাবেও তাঁদের কাজ করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকেরা তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য অর্থাৎ শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যে খুব কম সময় দিতে সক্ষম। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষকের

তুলনায় ছাত্রের অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক্য ও হাসপাতালগুলিতে সাধারণ রোগীর অত্যধিক ভীড়ের চাপের সম্মুখীন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বনির্ভরতার অভাব সকল শিক্ষাদানের পথে প্রবল বিঘ্নের সৃষ্টি করছে। এজন্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দসহ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের হাসপাতালগুলির পরিচালনা শিক্ষার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির হাসপাতালসমূহকে সাধারণ চিকিৎসার হাসপাতাল থেকে পৃথক করা উচিত। সাধারণ চিকিৎসা হাসপাতালের লক্ষ্য হবে রোগীদের চিকিৎসা যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করে তাদের ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালের লক্ষ্য হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত দিক সম্বন্ধে শিক্ষাদান করার জন্য শুধু নির্বাচিত রোগী থাকবে। এইসব নির্বাচিত রোগীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষাদান করা যাবে। এ পৃথকীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল বলে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। প্রকৌশল শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষার শিক্ষায়তনসমূহের মত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার হাসপাতালগুলিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে আনতে হবে।

১৭.৩১. চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসিত হলেও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা অনুষদকে বিভিন্ন বিষয়ের অনুষদে বিভক্ত ও সম্প্রসারিত করে এগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনষ্টিটুয়েন্ট কলেজ হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন।

আন্তঃমেডিক্যাল কলেজ বোর্ড: বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এম, বি, বি, এস, ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হয়, অথচ এ কলেজগুলির পরস্পরের মধ্যে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী, প্রশাসনিক ইত্যাদি ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নাই। অতএব মানের দিক দিয়ে উপরোক্ত ডিগ্রীর কিছুটা তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই আমরা সুপারিশ করি যে অনতিবিলম্বে সারা দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলির সমন্বয়ে একটি আন্তঃমেডিক্যাল কলেজ বোর্ড গঠিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও মেডিক্যাল কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি এ বোর্ডের সভ্য হবেন। প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ পালাক্রমে এক বছরের জন্য বোর্ডের সভাপতি থাকবেন। বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হবে।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:

১৭.৩২. যেহেতু দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতা আছে; সেহেতু পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষার উপযুক্ত সম্প্রসারণ এবং এই শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিতে সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। চিকিৎসা কলেজগুলির বিভিন্ন বিভাগে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স শিক্ষাদানের উপযুক্ততা যাচাই করে সেগুলিতে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করার উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা হতে এটা স্পষ্ট যে চিকিৎসা শিক্ষায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অবর্তমানে মানের সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই পৃথিবীর অনেক দেশে এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা চালু রয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়েও চিকিৎসা বিদ্যার সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত প্রার্থীর উপযুক্ত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ আছে তাদের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া

প্রয়োজন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষাকে অন্যান্য স্তরের শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাছাড়া সার্থক পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা কার্যের জন্য যে পরিবেশ এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণ দরকার তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করার সময় পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকারের কথা বিবেচনা করা দরকার এবং অদূর ভবিষ্যতে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রী অত্যাবশ্যকীয় হওয়া উচিত।

ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মেডিসিন এণ্ড রিসার্চ:

দেশের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মেডিসিনের স্থান অনস্বীকার্য। ১৯৬৫ সালে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একাংশে স্থাপিত হয়। পরে ইনষ্টিটিউটকে বর্তমান জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে মেডিসিন, সার্জারী, ধাত্রিবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিদ্যা, এনাটমী, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং বায়োকেমিষ্ট্রি, নেফ্রোলজি, কার্ডিওলজি, ইউরোলজি, নিউরোলজি, সাইকিয়াট্রি প্রভৃতি বিভাগ রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করতে হবে এবং এর যথেষ্ট উন্নয়ন করা প্রয়োজন যাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ অবদান রাখতে পারে:

(ক) পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল শিক্ষা, (খ) অন্য হাসপাতালে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় এরূপ রোগের নিদান ও চিকিৎসা করা, (গ) স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা, (ঘ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষক বিনিময়, (ঙ) সাধারণ চিকিৎসকের সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, (চ) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মেডিক্যাল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

জাতীয়ভিত্তিক এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য রাজধানীতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য মেডিক্যাল শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার এবং নানাবিধ গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জ্ঞানের আদান-প্রদান পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য অপরিহার্য।

চিকিৎসা সহকারী (মেডিক্যাল এ্যাসিষ্টাণ্ট):

১৭.৩৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথাযথ পরিচালনার জন্য বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর নিদারুণ অভাব রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষাদান একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক তৈরী করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব নয় তাই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অধিক সংখ্যায় এক শ্রেণীর চিকিৎসা সহকারী সৃষ্টি ফলপ্রসূ হতে পারে। অনুরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা এবং চীনেও চালু আছে। এ সহকারীরা চিকিৎসকদের কাজে সহায়তা করেন। বিশেষতঃ গ্রাম্য এলাকাগুলিতে। একাদশ/দ্বাদশ বর্ষব্যাপী শিক্ষার পর দু'বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে এই চিকিৎসা সহকারীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায়।

চিকিৎসা কলেজগুলিতে শিক্ষকের অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব, স্থান সংকুলানের অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা সমষ্টিগতভাবে বিবেচনা করে চিকিৎসা সহকারী শিক্ষা কোর্স চিকিৎসা কলেজগুলি থেকে পৃথক স্থানে চালু করতে হবে। এছাড়া চিকিৎসা সহকারী শিক্ষা কোর্স ও চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রী কোর্স সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। চিকিৎসা সহকারীদের গ্রামীণ সাধারণ চিকিৎসা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানদান করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জেলা হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা সহকারী শিক্ষা কোর্স চালু করা যায়।

দন্ত চিকিৎসা শিক্ষাঃ

১৭.৩৪. দন্ত চিকিৎসা শিক্ষায় বর্তমানে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা চালু আছে তা মোটামুটি সন্তোষজনক। দেশে দন্ত চিকিৎসকদের নিদারুণ স্বল্পতা আছে। সেজন্য আরো দন্ত চিকিৎসা কলেজ স্থাপনসহ দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অন্তবর্তী কালীন সময়ে চিকিৎসা কলেজগুলির দন্ত চিকিৎসা বিভাগগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের দন্তরোগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা উচিত যাতে তারা সাধারণ দন্ত-রোগসমূহের চিকিৎসা করতে পারে।

সেবা বিদ্যা শিক্ষা (নার্সিং)ঃ

১৭.৩৫. জন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে-কোন দেশের উন্নতির অন্যতম নির্ধারক। কাজেই জনসাধারণ, বিশেষতঃ গ্রাম্য এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যকল্যাণের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্বাস্থ্যকল্যাণ ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষাদান এ দুইটি পরস্পর নির্ভরশীল এবং একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত। সেবাকর্মে নিযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কার্যক্রম প্রয়োজনীয়ঃ

(১) সেবাকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের প্রতিটি স্তরের কাজ ও ভূমিকার মধ্যে পরিষ্কার বিভাগ থাকা উচিত।

(২) সেবক-সেবিকাদের চাকরি ব্যবস্থা ও শিক্ষায় সেবাকর্মীদেরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।

(৩) যোগ্য সেবাকর্মীদের শিক্ষাদান ত্বরান্বিত করা উচিত।

সেবা শিক্ষা ও চাকরি ব্যবস্থা বিভিন্ন সেবাকর্মের উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমিকভাবে কার্যকর করা যায়। নীচে একটি নক্সায় ইহা দেখানো হয়েছে। একজন সেবাকর্মী যখন সাফল্যের সঙ্গে একটি স্তর উত্তীর্ণ হবে তখনই তার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু সেবাকর্মের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, সেহেতু উপযুক্ত পাঠক্রম নির্ধারণ কমক্ষেত্রের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করবে।

প্রস্তাবিত সেবাবিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থার নক্সাঃ

স্তর-১।	নবম ও দশম শ্রেণী।	নির্বাচিত সেবাবিদ্যা।	বিষয়সমূহ।
		প্রতি সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা।	(১) এ্যানাটমি ও ফিজিওলজি।
		প্র্যাকটিক্যাল ও বৃত্তিমূলক পাঠক্রম।	(২) কমিউনিটি মেডিসিন; পারিবারিক স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান।
			(৩) সেবার কলাকৌশল।
			(৪) সেবাবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত মৌলিক পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন।

আমাদের মতে উপরোক্ত কার্যক্রমের জন্য বাংলায় অবিলম্বে পুস্তক তৈরী করা প্রয়োজন। যে সমস্ত স্থানে অন্ততঃপক্ষে জেলা হাসপাতাল আছে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাওয়া যাবে সে সব স্থানের স্কুলগুলিতে এ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

স্তর–২। প্রস্তাবিত একাদশ শ্রেণী।	বিষয়।	সময়কাল।
	(১) মানুষের দৈহিক কাঠামোর জটিলতা।	
	(২) সেবাকর্মের কলাকৌশল	এক বছর।
	(৩) হাতে কলমে শিক্ষাসহ সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান।	

রেজিষ্টার্ড নার্স

উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত অগ্রবর্তী স্তরের প্রয়োজন। এ স্তরগুলি সেবাবিদ্যায় সার্টিফিকেট লাভ করার পরে (যে যোগ্যতা বলে সেবিকা হিসাবে রেজিষ্টার্ড হওয়া যাবে) শুরু হবে।

স্তর–৩। **সেবাবিদ্যায় সার্টিফিকেট**

৯ মাস।	সেবাকর্মের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে : প্রশিক্ষণ লাভ যেমন, ধাত্রী-বিদ্যা, মানসিক রোগীর সেবা।	১ বছর। নিম্নলিখিত যে-কোন বিষয়ে প্রারম্ভিক দক্ষতা : (১) প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা অথবা (২) ছোট-খাট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় দক্ষতা অথবা (৩) সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা।
	সার্টিফিকেট	সেবাবিদ্যায় স্নাতক (বি. এন. এস.সি)

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে উচ্চশিক্ষা :

স্তর-৪

২ বছর | (১ তৃতীয় স্তরে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা।
অথবা (২) বড় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যেমন চিকিৎসা কলেজ পরিচালনার দক্ষতা।
অথবা (৩) সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা।

সেবাবিদ্যায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রী।

তিন এবং চার স্তরের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হওয়া উচিত।

প্যারা-মেডিক্যাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:

১৭.৩৬. প্যারা মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবিত নকশা :

স্তর-১ : নবম ও দশম শ্রেণী। প্যারা মেডিক্যাল পূর্ব-নির্বাচিত বিষয়গুলি প্রতি সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা প্র্যাকটিকাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠক্রম।
(ক) সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক-সমহ।
(খ) পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা।
(গ) সংক্রামক ব্যাধিসমহ ও স্বাস্থ্যবিদ্যা।

স্তর-২ : যে-কোন একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভ :

(১) রেডিওলজি কৌশলী কোর্স।
(২) রেডিওথেরাপি কৌশলী কোর্স।
(৩) দন্ত চিকিৎসা বিদ্যা কৌশলী কোর্স।
(৪) কম্পাউণ্ডারদের জন্য কোর্স।
(৫) স্বাস্থ্য রক্ষা পরিদর্শকদের জন্য কোর্স।
(৬) ব্লাড ব্যাংক কৌশলী কোর্স।
(৭) যন্ত্রপাতি কিউরেটর।
(৮) গবেষণাগার কৌশলী কোর্স।

সময় দৈর্ঘ্য.....১ বছর (একাদশ), (পুস্তকভিত্তিক ও হাতে কলমে শিক্ষাসহ)।

চিকিৎসা কৌশলে সার্টিফিকেট।

প্রত্যেক বিষয়ে আরও বিশেষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা রাখার জন্য সেবাবিদ্যা শিক্ষার **ন্যায় উচ্চ-**শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার বিস্তারিত নক্সা **নিম্নরূপ হওয়া** উচিতঃ

স্তর-৩ : কোর্সের সময় দৈর্ঘ্য—৩ বছর।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রারম্ভিক দক্ষতা :
(১) প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা।
(২) বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ।

↓

চিকিৎসা কৌশলে বি, এস-সি ডিগ্রী।

স্তর-৪ :

(১) তৃতীয় স্তরে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা।	সময় দৈর্ঘ্য
(২) বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভ।	২ বছর।

↓

চিকিৎসা কৌশলে এম, এস-সি ডিগ্রী।

প্যারা-মেডিক্যাল কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ যেমন কৃষি বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদির সমপর্যায়ের কোর্সের ব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে করা উচিত।

আমরা আরও মনে করি যে, সেবা বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসা কৌশলীদেরও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত। অন্যথায় এদের কাজের কোন উৎসাহ থাকবে না। বর্তমানে মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে চিকিৎসা প্রকৌশলীদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত।

১৭.৩৭. বর্তমান রিপোর্টে আমরা প্রধানতঃ আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালী যেমন হোমিওপ্যাথি, ইউনানী এবং আয়ুর্বেদী এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য আমরা মনে করি উপরোক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি যথাযথ মূল্যায়নের জন্য সরকার কর্তৃক একটা বিশেষ কমিটি গঠিত হওয়া উচিত।

চিকিৎসা শিক্ষা

সারাংশ

১। গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণে আমাদের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা অক্ষম। বর্তমান ব্যবস্থায় হাসপাতাল কেন্দ্রিক নিরাময়মূলক চিকিৎসা শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে, অথচ সে তুলনায় প্রতিরোধমূলক শিক্ষা এবং কমিউনিটি মেডিসিন এবং তদ্-সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই। বর্তমানে দেশে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, চিকিৎসা-কৌশলী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও অপ্রতুল। তাই ব্যাপক জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনে বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিধি ও মানের পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে "গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার" প্রয়োজন পরিপূরণে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে নিরাময়মূলক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা শিক্ষা এবং কমিউনিটি মেডিসিনের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সমাজ পরিবেশে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রামীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এ প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবে। (১৭.১—১৭.১০.)

২। বর্তমান কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যপুস্তকের উপর বেশী নির্ভরশীল, দেশের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম এমন হওয়া উচিত যেন দেশের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যা ও বিশেষ রোগসমূহ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। (১৭.১৩.)

৩। বর্তমান যুগে আচরণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতঃ একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে মানবদেহ, মন ও পারিপার্শ্বিকতার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে তার জ্ঞানের উপর। কাজেই শিক্ষার্থীদের মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের যথোপযুক্ত জ্ঞানদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। (১৭.১৭.)

৪। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্য পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত রোগ প্রতিরোধ। সে লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রেখে প্রতিরোধমূলক ও কমিনিউটি মেডিসিনকে চিকিৎসা শিক্ষার পাঠক্রম ও কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। (১৭.১৮.)

৫। জনস্বাস্থ্য পরিচালনা, জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান এসব বিষয়গুলিকে পাঠ-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তাত্ত্বিক শিক্ষা যথাসম্ভব সীমিত করে বাস্তবমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এজন্য সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও হাতে-কলমে কাজে অংশ গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে। (১৭.১৯.)

৬। দেশের চাহিদা মিটানোই চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই দেশে যে সমস্ত রোগ বেশী দেখা দেয় সেসব রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। সামাজিক পরিবেশে মেডিসিন শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীদের কিছুদিন গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রের বহির্বিভাগে কাজ শিখার ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য। মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ রাখা ও সে সম্বন্ধে তাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি চিকিৎসা কলেজ হাসপাতালে মানসিক ব্যাধি বহির্বিভাগ ও হাসপাতালে রেখে মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা উচিত। (১৭.২৪.)

৭। সার্জারি শিক্ষা দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির উপর ভিত্তি করে করতে হবে। এজন্য সার্জারি চিকিৎসার উপযোগী রোগীদের নিয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত সার্জারির উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সার্জারি চিকিৎসার প্রতিটি বিভাগে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য সার্জারি চিকিৎসকদের সাহায্য করার মাধ্যমে অস্ত্রোপচারসমূহে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। (১৭.২৫.)

৮। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষাদান দু' বছরব্যাপী হওয়া উচিত। এ বিষয়ে শিক্ষাদান যথাসম্ভব মৌলিক বিষয়সমূহ, মেডিসিন ও সার্জারি শিক্ষাদানের সঙ্গে সমন্বিত হওয়া উচিত। হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপরও অধিকতর জোর দেওয়া উচিত। (১৭.২৭.)

৯। চিকিৎসা শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত যাতে গ্রামের ব্যাপক জনসমাজ তার সুফল পেতে পারে। এজন্য গ্রামের চিকিৎসা সমস্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালের একটি নির্দিষ্ট সময় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রে ন্যস্ত করা উচিত। (১৭.২৮.)

১০। লিখিত পরীক্ষা ন্যূনতম মাত্রায় থাকবে এবং তা অবজেকটিভ ও সমস্যা সমাধান ধরণের হতে হবে। মৌখিক, প্রাকটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সব পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন সমভাবে করার জন্য মৌখিক পরীক্ষার জন্য পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালা থাকা উচিত। (১৭.২৯.)

১১। নব্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার (ইন্টার্নিশিপ) ক্ষেত্রে ছয় মাস কাল কোন বিশেষ বিষয়ে এবং বাকী ছয় মাস বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। (১৭.৩০.)

১২। মেডিক্যাল কলেজগুলিকে পরিচালনা ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে এবং এরা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কনষ্টিটিউয়েন্ট কলেজ হিসাবে পরিগণিত হবে। এসব কলেজের সাথে পৃথক হাসপাতাল থাকবে। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে আনতে হবে। মেডিক্যাল কলেজগুলি পরস্পরের মধ্যে পাঠক্রম পাঠ্যসূচী, প্রশাসনিক ইত্যাদি ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময়ের ও পারস্পারিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্য একটি আন্তঃমেডিক্যাল কলেজ বোর্ড গঠন করা উচিত। (১৭.৩০.—১৭.৩১.)

১৩। বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক সৃষ্টির প্রয়োজনে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা সম্প্রসারিত করতে হবে। জাতীয়ভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্স, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য রাজধানীতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য মেডিক্যাল শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার এবং নানাবিধ গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জ্ঞানের আদান-প্রদান পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। (১৭.৩২.)

১৪। চিকিৎসকদের সহায়তা করার জন্য "চিকিৎসা সহকারী" প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বার বছরব্যাপী শিক্ষার পর এ উদ্দেশ্যে জেলা হাসপাতালগুলিতে দু' বছরের চিকিৎসা কোর্স চালু করা যায়। এ কোর্সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের উপর জোর থাকবে। (১৭.৩৩.)

১৫। দেশে দন্ত চিকিৎসকদের অভাব রয়েছে। সেজন্য আরো দন্ত চিকিৎসা কলেজ স্থাপন-সহ দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। (১৭.৩৪.)

১৬। সেবা কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের প্রতিটি স্তরের কাজ ও ভূমিকার মধ্যে পৃথক বিভাগ থাকা উচিত। সেবক-সেবিকাদের চাকরী ব্যবস্থা ও শিক্ষায় সেবাকর্মীদেরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। যোগ্য সেবাকর্মীদের শিক্ষাদান ত্বরান্বিত করা উচিত। (১৭.৩৫.)

১৭। প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৭.৩৬.)

১৮। হোমিওপ্যাথি, ইউনানী এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসা শিক্ষা প্রণালীর মূল্যায়নের জন্য বিশেষ কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। (১৭.৩৭.)

অধ্যায় ১৮

বাণিজ্য শিক্ষা

১৮.১. আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। দৈনন্দিন সাধারণ শাসনকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বীমা, আমদানী রফতানী, শ্রম সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিজ্ঞাপন; বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান এবং এ সব বিষয় পরিচালনার যোগ্যতা বাণিজ্য শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। বিভিন্ন স্তরের বাণিজ্য শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি না থাকলে শিল্প কারখানা এবং কৃষি ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা বহুলাংশে নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন ব্যতিরেকে শিল্প উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ, এবং সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্য শিক্ষা এ সব ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বলে পৃথিবীর সকল দেশেই বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উন্নত দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাণিজ্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে।

১৮.২. বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত তিন স্তরের দক্ষ জনশক্তি তৈরী করাঃ

(ক) **অফিস সহকারীঃ** এঁরা দ্রুত, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করার যোগ্যতার অধিকারী হবেন। অফিস সহকারী, টাইপিষ্ট, ষ্টেনোগ্রাফার, হিসাব রক্ষক, বুক-কীপার, নথি রক্ষক, ক্রয়-বিক্রয় সহকারী প্রভৃতি দক্ষ কর্মচারী এ স্তরে পড়ে।

(খ) **তত্ত্বাবধায়কঃ** এঁরা যে সব সহকারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করবেন তাঁরা হবেন সেই সহকারীদের দক্ষতার অনেকখানিরই অধিকারী। তাছাড়া তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের যোগ্যতা ও সহৃদয়তার সংগে পরিচালনা করতে এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ব্যাখ্যা করতে তাঁরা সমর্থ হবেন। সাধারণ তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এ স্তরে পড়েন।

(গ) **উচ্চ স্তরের কার্য নির্বাহকগণঃ** এঁরা হবেন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতিসমূহ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত এবং উৎপাদন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সক্ষম। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালকগণ এ স্তরের আওতায় পড়েন।

১৮.৩. এ তিন স্তরের প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। দক্ষ সহকারী হিসাবে গড়ে উঠার জন্য অফিসের কাজে দক্ষতা সংক্রান্ত একটি সাধারণ কোর্স সকলকেই অধ্যয়ন করতে হবে এবং সংগে সংগে বিশেষ কোর্স যেমন টাইপিং বা ষ্টেনোগ্রাফী বা হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দক্ষ সহকারীর মধ্যে যাঁরা নেতৃত্বের গুণাবলী, পরিশ্রমশীলতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেবেন সাধারণতঃ তাঁরাই তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা পদে নিয়োজিত হবেন। সর্বোচ্চ স্তরে শিল্প ও বাণিজ্যিক পরিচালকগণকে অর্থ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত মূল নীতিসমূহ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাণিজ্য ও অর্থনীতি শিক্ষার কোর্সসমূহ এমনভাবে রচিত হতে হবে যাতে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের ভবিষ্যত পরিচালকগণের শিক্ষার ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত হয় এবং তাঁদের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও উদ্যমশীলতা পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়।

বাণিজ্য শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাঃ

১৮.৪. (ক) দেশের কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বাণিজ্য শিক্ষায় বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও পত্র বিনিময়, বাণিজ্যিক গণিত ও বুক-কিপিং,

টাইপরাইটিং ও বাণিজ্যিক ভূগোল পড়ানোর ব্যবস্থা আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ও টাইপ মেশিনের অভাবে অধিকাংশ স্কুলেই বাণিজ্যিক গ্রুপের বিষয়গুলি ঠিক মত পড়ান হয় না। শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ পুঁথিগত, শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের কোন ব্যবস্থা নাই, ফলে এ কোর্স সমাপ্ত করেও শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

(খ) উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে দুটো ধারা রয়েছে। একটি হচ্ছে কমার্স কলেজগুলি ও সাধারণ কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক সার্টিফিকেট কোর্স এবং অপরটি হচ্ছে কারিগরি পরিচালনালয়ের অধীনে সরকারী কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটগুলিতে দু'বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স।

উচ্চ-মাধ্যমিক সার্টিফিকেট কোর্সের আবশ্যিক পাঠ্যের মধ্যে বাংলা, ইংরেজী, হিসাব রক্ষণ, বাণিজ্যনীতি, টাইপ ও সাঁটলিপি, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ভূগোল এবং ব্যাংকিং পড়ানো হয়। ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পৌরনীতি, ইতিহাস, গণিত, পরিসংখ্যান এবং টাইপ ও সাঁটলিপির মধ্যে যে কোন একটি নিতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষক ও সাজসরঞ্জামের অভাবে সাধারণ কলেজগুলিতে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক।

ডিপ্লোমা কোর্সে বাংলা, ইংরেজী, সাঁটলিপি, টাইপিং, অর্থনীতি, নথিপত্র ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকের হিসাব পদ্ধতি, হিসাব রক্ষণ, বাণিজ্যিক পত্র বিনিময়, অফিস মেশিন চালনা, বাণিজ্যিক অংক, অফিস ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক সংগঠন ও বাণিজ্যিক ভূগোল পড়ানো হয়। ডিপ্লোমা-ইন কমার্স কোর্স বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক।

দেশে ১৬টি কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এর মধ্যে ১৫টি বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট-এর সংগে সংযুক্ত এবং একটি ঢাকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক এবং মেশিনের একান্ত অভাব রয়েছে। তাছাড়া পলিটেকনিক সংযুক্ত ইনষ্টিটিউটগুলিতে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের বাসস্থান নাই। কোন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ নাই। পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ একজন ইনষ্ট্রাকটরের সাহায্যে কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করেন। এ ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়নি।

(গ) উচ্চ-মাধ্যমিক কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম ডিগ্রী বি, কম এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ের এম,কম কোর্স পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে বি,কম (পাস) ও বি,কম (অনার্স) কোর্সে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। দেশের কয়েকটি সরকারী এবং বেসরকারী কলেজে বি,কম কোর্স এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,কম অনার্স ও এম,কম কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।

১৮.৫. পেশাগত শিক্ষা ব্যবস্থাঃ পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউটে এম,বি,এ কোর্স চালু আছে। বাংলাদেশ সরকারের অধীনে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কোর্স দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউনটেন্সি এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইন্ডাষ্ট্রিয়েল একাউনটেন্সি নামে দুটো পৃথক প্রতিষ্ঠান পেশাগত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

সুপারিশসমূহঃ

১৮.৬. বিভিন্ন পর্যায়ে বাণিজ্য শিক্ষার দোষত্রুটি দূর করে তাকে সুসংবদ্ধ এবং ফলপ্রসূ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করিঃ

(ক) স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্য শিক্ষার যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এ স্তরের বাণিজ্য শিক্ষা বাস্তবভিত্তিক এবং বৃত্তিমূলক করার জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। বর্তমানে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে স্কুল পর্যায়ে

কৃত্রিম ব্যাংক, বাণিজ্যিক মিউজিয়াম, শিক্ষার সাজসরঞ্জাম (যথা টাইপরাইটার) ক্রয়, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রভৃতি সম্ভব হচ্ছে না যদিও বাণিজ্য শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ করে তুলতে এগুলি একান্ত আবশ্যক।

(খ) মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবহারিক দিক আরো জোরদার এবং কার্যকরী করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা কোর্স সমাপনান্তে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য উপযোগী বিবেচিত হতে পারে এবং আকর্ষণীয় পারিশ্রমিকে চাকরির সংস্থান করতে পারে। বাণিজ্যিক বিষয়গুলি সঠিকভাবে পড়বার জন্য প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং টাইপ মেশিন ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অফিস, আদালত, ব্যাংক, শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়মাবলী ও কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) পলিটেকনিক সংযুক্ত ১৫টি কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটকে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা প্রয়োজন। সংযুক্ত কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা বৃত্তি, বাসস্থান, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে পলিটেকনিক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সমমর্যাদা পায় না বলে এদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান এবং এ কারণে ইনষ্টিটিউটের কার্যকারিতা ব্যাহত হচ্ছে। এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা প্রয়োজন। প্রয়োজনের খাতিরে এবং যোগ্য শিক্ষক আকৃষ্ট করার জন্য কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকদের পদোন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটগুলিতে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য দু' বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এর সংগে আমাদের প্রস্তাবিত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর বৃত্তিমূলক কোর্সের প্রবর্তনের বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঘ) বাণিজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব। টাইপিং এবং ষ্টেনোগ্রাফি ক্ষেত্রে এ অভাব খুবই প্রকট। ঢাকাস্থ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটে অবিলম্বে টাইপিং এবং ষ্টেনোগ্রাফি ক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বাণিজ্যিক শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজে চালু করা প্রয়োজন। এ কোর্সে টাইপ-রাইটিং এবং শর্টহ্যান্ডসহ বাণিজ্যিক বিষয়সমূহ পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটগুলিতে বর্তমানে শুধু একাউন্টিং এবং সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, এ দুটি বিভাগে দু' বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স দেওয়া হচ্ছে। বীমা, ব্যাংকিং এবং বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও সেলসম্যানশিপেও পৃথক পৃথক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হোক, কারণ এ সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব আমাদের দেশে রয়েছে।

(চ) কার্যরত লোকদের উন্নততর বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদানের জন্য প্রত্যেক কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটে সান্ধ্যকালীন শিক্ষাক্রম চালু করা প্রয়োজন।

(ছ) কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটগুলির শিক্ষাক্রম সমাপনী ধরণের এবং এর মূল উদ্দেশ্য সরকারী ও বেসরকারী অফিস, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির জন্য টাইপিষ্ট, সার্টিলিপি-কার, অফিস সহকারী, হিসাব রক্ষক, ক্রয়-বিক্রয় সহকারী শ্রেণীর পদসমূহের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরী করা। এসব ইনষ্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপরোক্ত পদসমূহে নিয়োজিত হতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত বর্তমান নিয়মাবলীর সংশোধন করা প্রয়োজন। এতে ইনষ্টিটিউটগুলির কার্যকারিতা এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

(জ) অফিস, ব্যাংক, বীমা এবং বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নিয়োগের প্রস্তুতির জন্য যেখানে সম্ভব মহিলা কলেজে বাণিজ্য শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

১৮.৭. ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কতিপয় বিশেষ পেশাগত ক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ দিতে হবে। এ পর্যায়ে হিসাব রক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, কোম্পানী সচিব, কারবারী অর্থনীতি, ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, পরিসংখ্যান, পণ্য বাজারজাতকরণ ও বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিচার শক্তি বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং কার্যবিষয়ক দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুপারভাইজার, হিসাব নবিস পরীক্ষক, ম্যানেজার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতে পারে।

ডিগ্রী পর্যায়ে বাণিজ্য শিক্ষাদানকে অধ্যাপকদের বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বাণিজ্য শিক্ষায় বাস্তবতার ছাপ দেবার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত ধরণের বাণিজ্য মিউজিয়াম, ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী এবং শিক্ষা সফরের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮.৮. ডিগ্রী উত্তর পর্যায়ে হিসাব রক্ষণ, সাধারণ ব্যবস্থাপনা, অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং, বীমা, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের শিক্ষার সুযোগ রাখতে হবে। ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি বর্ধনের সংগে সংগে সমস্যাটি চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধিকরণ এবং সমস্যার সমাধানের জন্য সম্ভাব্য বিকল্প কার্যক্রমগুলির গুণাগুণ বিচার করে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকৃষ্ট বিকল্পটি নির্বাচনকরণ এবং তার কার্যায়নের জন্য দক্ষতা বাড়াতে হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর দক্ষতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা আবশ্যক হবে—কারিগরি দক্ষতা, সামাজিক বা মানব সম্পর্ক বিষয়ক এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক প্রতিচ্ছবি অংকনের ক্ষমতা। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী কর্মজীবনে যে পেশা অবলম্বন করা স্থির করেছেন, সে বিষয়ে তাকে কারিগরি দক্ষতা দিতে হবে, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় যে সকল লোকের সংশ্রবে তাকে আসতে হবে ও যাদের সহায়তায় তাকে কাজ করতে হবে বা কাজ করিয়ে নিতে হবে, তাদের সাহায্য, অনুমোদন ও সমর্থন পাবার জন্য যে ধরণের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়, সে ধরণের ব্যবহারের অধিকারী করে গড়ে তোলার মত প্রশিক্ষণ তাকে দিতে হবে। সর্বোপরি, ব্যক্তিগত স্বার্থকে উচ্চ স্থান না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ ও সার্বিক উন্নতির জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভাব যাতে গড়ে ওঠে সেরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ ব্যবস্থার ফলে বাণিজ্যের শিক্ষার্থীগণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অফিসার, ম্যানেজার, একজিকিউটিভ ও প্রশাসক পদে নিযুক্ত হয়ে তাদের দায়িত্ব, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।

ডিগ্রী-উত্তর পর্যায়ে একটি সুচিন্তিত ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। প্রত্যেক ছাত্র যাতে এ পর্যায়ে অন্তত দুই মাস সময় একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থেকে হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে এবং শ্রেণীকক্ষে লব্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দেবার সুযোগ পায় সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবসা ও শিল্প কারখানা সমিতি এবং সরকারী অফিসসমূহের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১৮.৯. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কি পরিমাণ বাণিজ্য শিক্ষায় প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত জনসম্পদের প্রয়োজন তা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করা এবং ভর্তিকৃত ছাত্রের সংখ্যা মোতাবেক বাণিজ্য ফ্যাকালটিতে প্রয়োজনীয় নতুন বিভাগ খোলা ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা উচিত।

১৮.১০. বাণিজ্য শিক্ষা একটি বাস্তবধর্মী এবং কার্যভিত্তিক শিক্ষা বলে বাণিজ্য শিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্রদের স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা এবং সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক অবগত হতে হবে। বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পণ্যোৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও অর্থ সংস্থানে যে সব অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং

যেভাবে তারা সেগুলির মোকাবেলা করছে সে সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের জ্ঞানদান করতে হবে। আমাদের উৎপাদন সমস্যা, পণ্য বিক্রয় সমস্যা, পণ্য রপ্তানী সমস্যা, প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি জোগাড় করার পথে উদ্ভূত সমস্যা, পণ্যের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সমস্যা, পণ্য পরিবহন সমস্যা, কারবারীদের ঝুঁকি লাঘব করার উদ্দেশ্যে বীমা প্রথা প্রভৃতির সাথে ছাত্রদের গভীরভাবে পরিচিত হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী, সুপারভাইজার, ম্যানেজার ও প্রশাসকগণের আশা-আকাঙ্খা কি তা না জানলে প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুগত ও নিঃস্বার্থ কর্মী এবং ব্যবস্থাপনায় বলিষ্ঠতা আনয়ন করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের এ শ্রেণীর জ্ঞানদান করতে হলে শিক্ষকদের নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পুস্তক ও পাঠক্রম প্রণয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য গবেষণা ব্যুরো নাই। কিন্তু এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

১৮.১১. সকল উন্নত দেশেই বাণিজ্য শিক্ষকগণ পরামর্শদান কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন, যার ফলে তাদের শিক্ষাদান কার্য বাস্তবধর্মী ও বলিষ্ঠ হয়। আমাদের দেশেও বাণিজ্য শিক্ষকদের এরূপ কার্যক্রমে নিয়োজিত হবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা উচিত। এতে ব্যবসা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র রচিত হবে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি বাস্তবভিত্তিক হবে। কার্যরত, দক্ষ ও খ্যাতিমান ম্যানেজার ও প্রশাসকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

১৮.১২. বাণিজ্য শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য শিক্ষা ইনষ্টিটিউটের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য হবে বাণিজ্য শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা করা। এর অপর উদ্দেশ্য হবে কর্মরত ম্যানেজারদের জন্য স্বল্পকালীন সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা যাতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ হয়।

১৮.১৩. উন্নত দেশগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাণিজ্যের ছাত্রদের শিক্ষা এবং ডিগ্রী প্রদান করে ক্ষান্ত হয় না। ছাত্ররা যাতে তাদের মানসিক কাঠামো, প্রশিক্ষণের পটভূমি এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ অনুযায়ী উপযুক্ত চাকরি পায় তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ জন্য প্রত্যেক বাণিজ্য ফ্যাকাল্টিতে চাকরি সংস্থান ব্যুরো দেখা যায়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের ছাত্রদের কর্ম সংগ্রহে সহায়তা করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা চালায় না। কিন্তু তা করা দরকার। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারের অধীনে এবং শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় একটি চাকরি সংস্থান ব্যুরো স্থাপন করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হতে পারে। এতে ছাত্রদের চাকরি পাওয়ার কাজ যেমন সহজতর হবে, তেমনি কর্মপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারী বাছাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়াও বলিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত হবে।

১৮.১৪. বাণিজ্য শিক্ষার উচ্চস্তরে একই ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউট শুধু পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর জোর দিলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ, বাণিজ্য শিক্ষা ও গবেষণার উপর জোর দিলে দীর্ঘ-মেয়াদী ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার পথ সুগম হবে। ডিগ্রী পর্যায়ে একই ধরণের কোর্স চালু থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের মতে এ পর্যায়ে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় নতুন কোন কোর্স চালু করলে জাতির সীমিত সম্পদের অপচয় হবে।

বি, বি, এ, কোর্স চালু করার প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। বি, কম, কোর্সের উৎকর্ষ সাধন ও আধুনিকীকরণের যে সব সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে প্রস্তাবিত বি, বি, এ

কোর্সের সকল বিষয় স্থান পেয়েছে। কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট প্রদত্ত ডিপ্লোমা কোর্স একটা সমাপণী কার্যক্রম। এর উদ্দেশ্য দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সাঁট-লিপিকার, টাইপিষ্ট, হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী, ইত্যাদি শ্রেণীর দক্ষ কর্মী তৈরী করা। দেশে এ জাতীয় দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটগুলি এ জাতীয় প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টির উপর চেষ্টা নিবন্ধ রাখলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সহজতর হবে। ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের জন্য বি,কম (পাস) ও বি,কম (অনার্স) কোর্সে ভর্তির প্রদত্ত বর্তমান সুযোগ তাদের মধ্যে মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম রাখবে।

১৮.১৫. পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে প্রত্যেক শিক্ষার যেমন একটা দর্শন ও উদ্দেশ্য থাকে, বাণিজ্য শিক্ষারও তেমন একটা দর্শন ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এ দর্শন ও উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলির বাস্তবায়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় এগুলির প্রতিফলন। এতদিন বাণিজ্য শিক্ষা ধনতন্ত্রবাদের দর্শনে চলেছে যার লক্ষ্য ছিল পুঁজি বিনিয়োগকারীদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, যার ব্যবস্থাপনা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, বহুলাংশে স্বৈরতান্ত্রিক। বর্তমানে রাষ্ট্রের মূলনীতি সামনে রেখে বাণিজ্য শিক্ষার কোর্স এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে ব্যবস্থাপনা প্রগতিশীল ও গণতন্ত্র সম্মত হয়। কারবারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হবে জনগণের জীবিকার মান উন্নীত করার জন্য স্বল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন এবং ন্যায্যমূল্যে বন্টনের ব্যবস্থা কায়েম করে জাতির সীমিত সম্পদের সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা। সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়নে এ বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে যেন এমন জনসম্পদ তৈরী হয় যার লক্ষ্য হবে জাতির খেদমত করা। আগত দিনের বাণিজ্য শিক্ষায় এমন মননশীলতা আনতে হবে যাতে ছাত্রগণ মানসিক ও চারিত্রিক দিক হতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য শিক্ষা

সারাংশ

১। আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানা পরিচালনার জ্ঞান ও যোগ্যতা বাণিজ্য শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। বিভিন্ন স্তরের অফিস সহকারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং উচ্চ পর্যায়ের কার্যনির্বাহকগণ তৈরীর জন্য বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তার এবং উৎকর্ষ সাধন অত্যাবশ্যক। (১৮.১., ১৮.২.)

২। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তার সাধন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় টাইপ মেশিন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। (১৮.৬.-ক)

৩। অফিস, আদালত, ব্যাংক, শিল্প-কারখানা প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (১৮.৬.-খ)

৪। পলিটেকনিকের সঙ্গে সংযুক্ত কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটগুলিকে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার। কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটগুলিতে বীমা, ব্যাংকিং, বাণিজ্যিক পদ্ধতি **এবং সেলস্‌ম্যানশিপেও** ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা প্রয়োজন। **কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য সান্ধ্যকালীন** কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়। (১৮.৬.-গ-ঙ)

৫। দক্ষ শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শিক্ষক-দের রিফ্রেসার কোর্স দেওয়ার জন্য গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য শিক্ষা ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। (১৮.৬.-ঘ, ১৮.১২.)

৬। বৃত্তিমূলক বাণিজ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাতে সরকারী ও বেসরকারী অফিস, এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরী পেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করা প্রয়োজন। (১৮.৬-ছ)

৭। যেখানে সম্ভব মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। (১৮.৬.-জ)

৮। ডিগ্রী ও ডিগ্রীউত্তর পর্যায়ের বাণিজ্য শিক্ষাক্রম অধিকতর বাস্তবভিত্তিক করার জন্য **শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের** জন্য **ইন্টার্নি-**শিপের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৮.৮.)

৯। উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য শিক্ষকদের শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টারূপে কাজ করার সুযোগ দিলে তাদের শিক্ষাদান কার্য বাস্তবভিত্তিক হবে এবং শিক্ষার্থী-দের কর্মসংস্থানের সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ফ্যাকালটিতে এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো থাকা বাঞ্ছনীয়। (১৮.১১., ১৮.১৩.)

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ, বাণিজ্য, শিক্ষা ও গবেষণার উপর এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট' পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর অধিকতর জোর দিবে। (১৮.১৪.)

১১। বাণিজ্য শিক্ষা পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। (১৮.১৫.)

অধ্যায় ১৯

আইন শিক্ষা

১৯.১. আইন শিক্ষাকে তার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করার এবং এ শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের আইন গ্রাজুয়েট তৈরী করা আমাদের কাম্য তৎসম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে বলা যায় উচ্চতম যোগ্যতা এবং উন্নত চরিত্রসম্পন্ন এমন লোকের আমাদের দরকার যাঁরা দেশের সংবিধান সংরক্ষণে এবং এর উৎকর্ষ বিধানে সাহায্য করতে পারেন। আমরা এমন সব লোক চাই যাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে ও তার উন্নতি সাধনে সক্ষম হবেন। আমরা এমন সমর্থ এবং ধীশক্তি সম্পন্ন লোক চাই যাঁরা ন্যায় বিচার প্রদর্শন করতে পারবেন। সমসাময়িক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত শক্তির প্রভাব অনুধাবন করার মত আইন ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং উদার শিক্ষাপ্রাপ্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজন। জনসাধারণের এমন আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রয়োজন যাঁরা তাদের ন্যায় বিচার লাভে সাহায্য করতে পারেন। আইন শিক্ষা দেশের আইনের শাসন বহাল রাখার ব্যাপারে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন যাঁরা আইনের জ্ঞান ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন এবং পেশাগত নৈতিকতার উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করবেন।

১৯.২. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং আইনজীবি সকলেই অনেক সমালোচনা করেছেন। বস্তুতঃ গত কয়েক বছরে আইন শিক্ষার মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আইন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা প্রধানতঃ আইন শিক্ষার অবনতির কারণ। এসব আইন কলেজের অনেক-গুলিতে যোগ্য পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা বা দক্ষ শিক্ষকের অভাব। বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন কলেজ-গুলিতে ছাত্র সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে এবং কলেজগুলি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। অপর পক্ষে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করেই বিগত কয়েক বছর বহু কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বাইরের চাপের ফলে অথবা জনপ্রিয়তা লাভের ব্যগ্রতার দরুণ স্বীকৃতি দানের শর্তাদি কার্যকরী করণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। শিক্ষক, জায়গা ও বই-পুস্তকের অভাব রয়েছে এমন কলেজকে স্বীকৃতি দেওয়া জাতি এবং ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানোই যদি কোন প্রতিষ্ঠানের মূল্য লক্ষ্য হয় পুঞ্জীভূত তথ্য মুখস্থ করানোর মধ্যেই যদি সে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার স্বার্থকতা খুঁজে পায় তবে আইন ব্যবসায়ে যে সব গুণ এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তির আমরা প্রত্যাশা করি ঐ প্রতিষ্ঠান সে-ধরনের লোক তৈরী করতে পারবে না।

১৯.৩. বর্তমান আইন কলেজগুলির প্রধান দুর্বলতা এই যে সেখানে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার কোন ব্যবস্থা নাই। এমন কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন ফ্যাকাল্টি-গুলিতেও গবেষণার কাজ হচ্ছে না। বিচার বিভাগ এবং আইন ব্যবসায়ের জন্য আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং কলেজগুলি আইনজ্ঞ তৈরী করছেন কিন্তু আইন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন তা সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই। আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা নাই। সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সংগে আইন শিক্ষা ও এর ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গবেষনার প্রয়োজন। এ পর্যন্ত আমরা শুধু উকিল বা আইনজীবী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি, আইনবিদ তৈরী করতে পারিনি।

১৯.৪. আইন শিক্ষার দুটি দিক আছে—শিক্ষাগত ও গবেষণামুখী দিক এবং ব্যবহারিক ও প্রয়োগমুখী দিক। আইন কলেজগুলিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোন দিকই সন্তোষজনক-ভাবে পূরণ হচ্ছে না। "বার কাউন্সিল" গঠনের পরে আশা করা হয়েছিল যে আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিক পূরণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উক্ত কাউন্সিল গ্রহণ করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-

সমূহের উপর শিক্ষাগত ও গবেষণামুখী দিক পূরণের দায়িত্ব বর্তাবে। আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উন্নতি বা সমন্বয়ের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার সুযোগে অত্যধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করে প্রয়োজনাতিরিক্ত আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন শিক্ষা যদিও মাষ্টার ডিগ্রীর মত একটি ডিগ্রী-উত্তর কোর্স তবুও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সের মত মেধা পরীক্ষা করে আইন কোর্সে ভর্তি করা হয় না বলে নিম্ন মানের ছাত্রেরাও আইন শিক্ষার সুযোগ পায়। এসব নিম্ন মানের ছাত্রদের অনেকে পরবর্তী পর্যায়ে পাসের জন্য নীতি বহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করে এবং আইন শিক্ষার মানের অবনতি ঘটায়। আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনানুসারে সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ্ এবং বিচারক তৈরী করা। অথচ এজন্য চিকিৎসা বা প্রকৌশলী শিক্ষার ন্যায় বাছাই করে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা নাই।

১৯.৫. বর্তমানে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে সরাসরিভাবে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আইন কলেজগুলিতে আইন শিক্ষার যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা অধ্যায়নকালের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের এবং তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীও ঠিক এক নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের আইন কলেজগুলিতে বর্তমানে প্রথম ডিগ্রীর পরে দুই বছরের আইন কোর্সের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরিভাবে আইন শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বি জুর (অনার্স)-এর অধ্যয়ন কাল উচ্চ মাধ্যমিকের পর তিন বছর, এম, জুরের অধ্যয়ন কাল বি, জুরের (অনার্স) পর এক বছর এবং এল, এল, এম, ডিগ্রীর অধ্যয়ন কাল এম, জুরের পর দুই বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি-ভাবে আইন শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে এল, এল, বি (অনার্স) ডিগ্রীর অধ্যয়ন কাল উচ্চ মাধ্যমিকের পর তিন বছর এবং এল, এল, এম, ডিগ্রীর অধ্যয়ন কাল এল, এল, বি (অনার্স)-পর এক বছর, অর্থাৎ যেখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, এল, এম ডিগ্রীর জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছয় বছরের প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, এম ডিগ্রীর জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের পর মাত্র চার বছরের দরকার। যদিও বি, জুর (অনার্স) ও এল এল, বি (অনার্স) ডিগ্রীর অধ্যয়নকাল উভয় ক্ষেত্রেই তিন বছরেরই তথাপি এই দুইটি কোর্সের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, জুর ডিগ্রীর জন্য যা পাঠ্যসূচী করা হয়েছে, মোটামুটিভাবে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, বি (অনার্স) ডিগ্রী কোর্সের পাঠ্যসূচীর মধ্যে রাখা হয়েছে। সংক্ষেপে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উচ্চ মাধ্যমিকের পর চার বছর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উচ্চ মাধ্যমিকের পর তিন বছর আইন অধ্যয়ন করে প্রাকটিস করার উপযুক্ততা অর্জন করবে। অপর দিকে দেশের বিভিন্ন স্থানের আইন কলেজগুলির ডিগ্রীধারী ছাত্রেরা দুই বছর আইন কোর্স অধ্যয়নের পরে প্রাকটিস করার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

১৯.৬. উপরের বিষয়গুলি বিবেচনা করে আইন শিক্ষাকে এর যথাযোগ্য মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা বিশ্বাস করি। কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন বিভাগের প্রথম ডিগ্রীই আইন কলেজের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হওয়া উচিত। ভর্তির যোগ্যতা হ্রাস করলে, শিক্ষাদান কার্য এবং শিক্ষার্থীর ব্যুৎপত্তির মানই অবনমিত হবে। জ্ঞানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষা এমনভাবে দৃঢ় হওয়া দরকার যাতে আইনের টেকনিক্যাল দিক অধ্যয়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। আইন ব্যবসায়ী এবং আইন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ প্রথম ডিগ্রীকে আইন কলেজসমূহে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা রাখার অনুকূলে দৃঢ় মত পোষণ করেন এবং আমরাও এ বিষয়টি সমর্থন করি। আইন কলেজে ভর্তি প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে।

১৯.৭. আমাদের দেশের আইন কলেজগুলিতে আইন শিক্ষার মানোন্নয়নের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে শিক্ষার যুক্তি ভিত্তিক পুনর্গঠন এবং আইন কোর্সের মেয়াদ দু' বছরের স্থলে তিন বছরে সম্প্রসারণ। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তিন বছরই আইনের ন্যূনতম, যুক্তিসংগত মেয়াদ বলে গৃহীত হয়েছে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের

আইন কোর্স চালু ছিল। কিন্তু সাবেক পাকিস্তানের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স হ্রাস করে দু' বছরে সীমিত করে। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯৪৯ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এবং ১৯৫৯ সালে সাবেক পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন আইন কোর্সের মেয়াদ দু' বছর হতে তিন বছরে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করেন। ডিগ্রীর এই কোর্স যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে হলে তা তিন বছরের কমে সম্ভব হবে না। আমাদের আইন শিক্ষার্থীগণকে যে শুধু সাধারণ আইন পদ্ধতিই পাঠ করতে হয় তা নয়। প্রয়োজনের কারণে মুসলিম আইন, হিন্দু আইন ইত্যাদিও পড়তে হয়। ফলে দু' বছর সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আইনের যত বেশী সম্ভব তথ্য শেখাবার চেষ্টা করা হয়। এসব আইনের অন্তর্নিহিত আদর্শের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আইনে প্রাজ্ঞতা অর্জন করতে হলে দেশের প্রচলিত আইন পদ্ধতির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত আইন-ডিগ্রী আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করার ছাড়পত্ররূপে গণ্য হবে ততদিন 'এ্যাডজেকটিভ' বা কার্যবিধি আইনের মূল সূত্রগুলিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। এ্যাডজেকটিভ বা কার্যবিধি আইন এবং সাবস্টেনটিভ বা মৌলিক আইন উভয়েরই প্রাথমিক নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আইন কলেজগুলিতে একমাত্র তিন বছরের কোর্সের মাধ্যমে এইসব মৌলিক আদর্শের ওপর জোর দেওয়ার মত সময় পাওয়া যাবে। এসব কারণে আইন কলেজগুলিতে এল, এল, বি, কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করার জন্য আমরা সুপারিশ করছি। এই কোর্স সমাপ্তির পর আইন ব্যবসায়ে যোগদান করা যাবে। অবশ্য আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সুপ্রীম কোর্ট/বার কাউন্সিল নির্ধারণ করবেন।

১৯.৮. আইন কলেজগুলিতে উপরোক্ত এল, এল, বি, কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশের মেয়াদ দুই ও দ্বিতীয় অংশের মেয়াদ এক বছরের হবে এবং প্রতি অংশের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। প্রথম অংশের প্রথম বর্ষ সমাপ্তির পর এল, এল, বি, প্রথম বর্ষ পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষে প্রমোশন পাবে। প্রথম দু বছর আইনের ইতিহাস, মৌলিক বিষয়সমূহ এবং সূত্রপাঠে ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বর্ষে দলিল প্রণয়ন, সওয়াল-জওয়াব, আর্জি-মুসাবেদা, মামলা পরিচালনাবিধি ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তা' ছাড়া সাপ্তাহিক বিতর্ক সভা, নিয়মিত আদালতে গমন, মামলার ইতিহাস লিখন, মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত, পেশাগত নৈতিকতা এবং চিকিৎসা আইন ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তৃতার মাধ্যমে এই পেশার ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে তার যথাযোগ্য পরিচয় বিধান করতে হবে। যারা শুধু জ্ঞান আহরণের জন্যই আইন পড়তে চায় তাদের কোর্সের প্রথমাংশ সমাপ্তির পর একাডেমিক বা শিক্ষাগত ডিগ্রীদানের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তবে, যারা আইনকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে চায় তাদের কোর্সের দ্বিতীয়াংশ অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে এবং এ অংশের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের ডিপ্লোমা-ইন-এ্যাডভোকেটশীপ প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতির সুবিধা এই যে সমাপ্তি বর্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা তুলনামূলক-ভাবে কম হবে এবং এতে সাপ্তাহিক আইন বিতর্ক সভা, মামলার বৃত্তান্ত প্রণয়ন, আদালতে হাজিরা ইত্যাদির আয়োজন এবং সক্রিয়ভাবে তত্ত্বাবধান করা শিক্ষকদের পক্ষে সহজ হবে। শিক্ষা দানের এই দিকটার ওপর গুরুত্ব আরোপকল্পে আইন কলেজগুলিতে পরীক্ষার্থীদের এসব কাজের যথাযোগ্য রেকর্ড রাখা উচিত এবং আইনের চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে এই রেকর্ডের শতকরা ১০ (দশ) নম্বর যোগ করা উচিত। ওপরে বলা হয়েছে যে আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট বার কাউন্সিল নির্ধারণ করবেন। তবে আমরা মনে করি যে আইনের গ্রাজুয়েটগণ যদি কোর্সের দ্বিতীয়াংশের জন্য প্রস্তাবিত ট্রেনিং সমাপ্ত করে বর্তমানে যে সব বিধিনিষেধ রয়েছে সেগুলো আরোপ না করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের আইন ব্যবসা করার অনুমতি দানের কথা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

১৯.৯. প্রথম ডিগ্রীর পরে আইন কলেজগুলিতে দু' বছর আইন অধ্যয়ন কাল যেমন উপযুক্ত আইনবিদ তৈরীর জন্য যথেষ্ট নয় তেমনি আমাদের দৃঢ় অভিমত যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ মাধ্যমিকের পরে তিন বছর আইন অধ্যয়নকালও উপযুক্ত আইনবিদ তৈরী করার জন্য পর্যাপ্ত

নয়। জ্ঞানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষা এমনভাবে দৃঢ় হওয়া দরকার, যাতে আইনের টেকনিক্যাল দিক অধ্যয়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। ওপরে ১৯.৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণসমূহ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তদুপরি উচ্চ মাধ্যমিকের পরে এল, এল, বি, (অনার্স) কোর্স অধ্যয়ন করার সময় ছয় শত নম্বরের সাবসিডিয়ারী বা অন্যান্য বিষয়ও অধ্যয়ন এবং পাস করতে হবে। সুতরাং উচ্চ মাধ্যমিকের পরে তিন বছর আইন এল এল, বি (অনার্স) অধ্যয়নকাল উপযুক্ত আইনবিদ তৈরীর জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও দৃঢ় অভিমত যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরাসরিভাবে আইন শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার অধ্যয়ন কাল একই হওয়া উচিত এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যেও মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত হল যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী-দের জন্য বর্তমানে দেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের যে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে তার অধ্যয়নকাল চার বছরের করতে হবে। এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এল, বি (অনার্স) কোর্সের অধ্যয়নকাল তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর করা উচিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের বি, জুর (অনার্স) কোর্সের নাম বদলিয়ে চার বছরের এল এল, বি (অনার্স) কোর্স নামে চালু করা বাঞ্ছনীয়। এই চার বছরের এল এল, বি (অনার্স) কোর্সের সঙ্গে বর্তমান এম, জুর-এর এক বছর অধ্যয়নকালও যুক্ত হবে, অর্থাৎ এম, জুর নামে পৃথক কোন ডিগ্রীর ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হবে না। এতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অধ্যয়নকাল ও মান দেশে এবং বিদেশে সমপর্যায়ের বলে বিবেচিত হবে। তদুপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, এম, ডিগ্রীর অধ্যয়নকাল এক বছরের পরিবর্তে দু' বছরের করা উচিত। এতে ঢাকা এবং রাজশাহী দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, এল, এম, ডিগ্রীর অধ্যয়নকাল এল এল, বি (অনার্স) ডিগ্রীর পর দু বছর হবে। এই দু' বছরের এল, এল, এম, ডিগ্রী অধ্যয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন আইন কলেজ থেকে এল এল, বি, ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যখন সরাসরি আইন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে তখন অধ্যয়নকাল এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুরূপ করা উচিত হবে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল, এল, বি, (অনার্স) ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আইন প্রাকটিস করার পূর্বে তাদের জন্য আর্টিকল পিরিয়ড নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নাই, এই আর্টিকলের সময়কাল এবং পদ্ধতি সুপ্রীম কোর্ট/বার কাউন্সিল স্থির করবেন। তবে এই বিষয়ে ওপরের অনুচ্ছেদে আইন কলেজগুলিতে এল এল, বি, কোর্স অধ্যয়নকারীদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষাদান সম্বন্ধে যা মন্তব্য করা হয়েছে তা এখানেও চতুর্থ বর্ষে প্রযোজ্য হবে।

১৯.১০. আমাদের দৃঢ় অভিমত যে দেশের বিভিন্ন স্থানের আইন কলেজগুলিতে প্রদত্ত আইন শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সরাসরিভাবে আইন শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। তেমনি আমাদের আরও দৃঢ় অভিমত যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সরাসরিভাবে আইন শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার অধ্যয়নকাল যেমন একই হওয়া উচিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যেও মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। আইনে প্রাজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রচলিত আইন পদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ্যাডজেকটিভ বা কার্যবিধি আইনের মূল সূত্রগুলিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। সুতরাং এ্যাডজেকটিভ বা কার্যবিধি আইন এবং সাবস্টেনটিভ বা অধিকারমূলক আইন উভয়েরই প্রাথমিক নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রচলিত আইনের ইতিহাস ও আদর্শ, স্টেটুট বা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা, সংবিধানের উৎপত্তি, প্রশাসনিক বিধি, বীমা আইন, আয়কর আইন, মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স বা চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি বিষয়ও আইনের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

১৯.১১. আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করবে না এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তিও আইনের কোন কোন বিষয় পাঠ করবে। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ শাসনতন্ত্রমূলক আইন আর একজন একাউন্ট্যান্ট কন্ট্রাক্ট আইন পাঠ করতে পারেন। আইনকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ না করেও বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য অথবা গবেষণার জন্যও ইহা পঠিত হতে পারে। আইন শিক্ষা কোর্স প্রণয়নকালে

এসব কথা বিবেচনা করে দেখা উচিত। কোন কোন দেশে আইনের শিক্ষাগত এবং পেশাগত অধ্যয়নকে পৃথক করে দেখা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে আইন শিক্ষার পেশাগত দিক কাউন্সিল অব লিগেল এডুকেশন এবং শিক্ষাগত দিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই উপমহাদেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এই উভয় দিকই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আইন শিক্ষায় আইনের টেকনিক্যাল ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দিকের সঙ্গে শিক্ষাগত দিকও একত্রে পড়াতে হয়, ফলে দু'টি কঠিন কার্য একত্রে সম্পাদন করতে হয়।

১৯.১২. আইন এবং তার কার্যকারিতার ওপর বর্তমান সভ্য সমাজ নির্ভরশীল। কাজেই যাঁদের ওপর আইনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পিত হবে, তাঁদের প্রতিটি কাজে থাকতে হবে ন্যায় ও নীতিশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মানের স্বাক্ষর যাতে এই আইন জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে আইন ব্যবসায়ে নৈতিকতার ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

১৯.১৩. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইনে মাষ্টার ও ডক্টর ডিগ্রীর জন্য উচ্চতর কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। ওপরে সুপারিশ করা হয়েছে যে আইনে এল, এল, এম অর্থাৎ মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স হবে দু'বছরের। এল এল, বি, (অনার্স) এবং আইন কলেজসমূহে অধ্যয়ন করে এল, এল, বি ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ উভয়েই এল, এল, এম, কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। আইন কলেজগুলিতে অধ্যয়নকারী এল, এল, বি'র প্রথমাংশ (দু বছরের কোর্স) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণও এল, এল, এম কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। এই দু'বছরের মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স দু'ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশ হবে কোর্স কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় অংশ হবে কোর্স কার্যক্রম অথবা থিসিস কার্যক্রম। যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অংশেই কোর্স কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এল, এল, এম, ডিগ্রী প্রদান করা হবে। যাঁরা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এম, ফিল ডিগ্রী প্রদান করা হবে। আইনে মাষ্টার ডিগ্রী লাভের পর যাঁরা সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়কের অধীনে দু/তিন বছর গবেষণা কার্য সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করবেন তাঁদের 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী প্রদান করা হবে।

১৯.১৪. আইন ও বিচারের পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি এবং বিকাশের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে। আইন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন তা সৃষ্টির প্রয়াস পেতে হবে। এসবের জন্য এবং সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গবেষণার প্রয়োজন। আইন শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন ছাড়া আমাদের আইন কলেজগুলির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সৃষ্টিও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আমাদের অভিমত এই যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রধান কর্মের মধ্যে হবে গবেষণা পরিচালনা এবং এই কাজে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশদান। গবেষণা কাজে আগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে বিভাগীয় অধ্যাপকদের অধীনে আইন ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করার জন্য শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা প্রয়োজন। আইনের যে-সব সমস্যার সঙ্গে জাতি ও জনসাধারণ সরাসরিভাবে জড়িত সে সব এবং আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। সংগতভাবে আশা করা যায় যে এসব ব্যবস্থা গৃহীত হলে আইন শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলি কালক্রমে অন্যান্য উন্নত দেশের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রগুলির সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

১৯.১৫. গত কয়েক বছরে বেশ কিছু সংখ্যক নিম্নমানের আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এসব কলেজে যথাযোগ্য মান রক্ষিত হচ্ছে কিনা তৎসম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এগুলিকে অনুমোদন দান করেছেন। যে সব কলেজ প্রকৃতই পান্ডিত্য ও সুস্থ শিক্ষার কেন্দ্র শুধু সেগুলিকেই অনুমোদন দান করা উচিত। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে আইন কলেজের অনুমোদনের ব্যাপারে শিক্ষক, কলেজ গৃহ ও স্থান, অন্যান্য সুবিধা এবং টিউটোরিয়াল

ও প্রাকটিক্যাল কার্য সম্পর্কে অন্যান্য কলেজের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি আইন কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হোক এবং এগুলি কঠোরভাবে বলবৎ করা হোক। যে সব কলেজে প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষক রয়েছেন এবং যাদের সার্বিক কর্মসূচী প্রকৃত শিক্ষাদানের অনুকূল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কেবল সে সব কলেজকেই অনুমোদন দান করবেন।

১৯.১৬. আইন কলেজের শিক্ষকগণ শুধু পূর্ণকালীন ও নিয়মিত শিক্ষক বা শুধু খণ্ডকালীন শিক্ষক হবেন না বরং এই উভয় শ্রেণীর মিশ্রণে শিক্ষক মণ্ডলী গঠিত হবে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীদেরও কলেজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে এবং আইনের পেশাগত ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে ওয়াকিফহাল রাখতে হবে। বিশেষ করে মোকদ্দমা পরিচালন বিধি সম্পর্কে তাঁরা শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য অধ্যাপকমণ্ডলীর অধিকাংশই নিয়মিত ও পূর্ণকালীন শিক্ষক হবেন। কারণ তাছাড়া উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

১৯.১৭. আইন কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা যেমন মাত্রাতিরিক্ত, শিক্ষকদের সংখ্যা তেমনি নগন্য। এর ফলে যোগ্যতা, নিয়ম, শৃঙ্খলার মানের অধোগতি হচ্ছে। শিক্ষাগত কারণেই এ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। একই সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে ছাত্র বাছাই এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতা কার্যে আকৃষ্ট করতে হলে এসব শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে। আইনের অধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক নিয়োগ কালে তাঁদের প্রকাশিত গবেষণা কর্ম এবং গবেষণা পরিচালনা ও তত্বাবধানে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে দেখতে হবে।

১৯.১৮. অল্প সময়ের মধ্যে আইন গ্রাজুয়েট তৈরীই আইন কলেজগুলির লক্ষ্য বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী মানের শিক্ষা সেখানে হয় না। এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। টিউটোরিয়াল, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, ছাত্রদের পরিচালনা, অধ্যয়ন, গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার কলা বিষয়ক ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য আইন শিক্ষার বেলায়ও সেগুলি কার্যকর করা উচিত।

১৯.১৯. আমাদের আইন কলেজগুলির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত না হলে আইন কলেজের শিক্ষার মানের অধোগতি রোধ করা কঠিন হবে। বস্তুতঃপক্ষে আইন শিক্ষার মানের অবনতির কারণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অনটনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর্থিক কারণে আইন কলেজগুলি যথোপযুক্ত কলেজগৃহ ও স্থানের সংকুলান করতে অক্ষম, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করতে পারছে না, যথেষ্ট সংখ্যক বই, সাময়িকী, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উন্নত মানের শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত হচ্ছে। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সরকার পেশাগত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয় করলেও আইন শিক্ষার জন্য তেমন কিছু অর্থ বরাদ্দ বা ব্যয় করেন না। বস্তুতঃপক্ষে দেশে আইন শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল পেশাগত শিক্ষার জন্য সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের সমস্ত খরচের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেন। আমাদের যেমন সুযোগ্য শিক্ষক, উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার, ভাল ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনি উপযুক্ত আইনবিদেরও আবশ্যক। সুতরাং উপযুক্ত আইন শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত অর্থের সংস্থানের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। উল্লেখযোগ্য যে বেসরকারী কলেজসমূহে যে সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় সে রকমের কোন সাহায্যও আইন কলেজগুলিতে দেওয়া হয় না। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সুপারিশ হল যে অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার ন্যায় আইন শিক্ষার জন্যও দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। উপযুক্ত আইন শিক্ষা কলেজগুলিকে অন্যান্য বেসরকারী সাধারণ কলেজের ন্যায় অনতিবিলম্বে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি।

১৯.২০. আইন কলেজগুলির পরিচলানা ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেকটি আইন কলেজ এলাকাস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অনুমোদিত কলেজ হিসাবে সংযুক্ত। আইন কলেজ অনুমোদনের পূর্বে বা অনুমোদনের মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য কলেজ পরিদর্শন

করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি অনুমোদিত কলেজের একটি গবর্ণিং বডি রয়েছে। সুতরাং প্রশাসন, পরিচালনা, উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নাই, সরকারের তরফ থেকেও সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে এসব বিষয়ের দায়িত্ব কলেজের শুধু গভর্ণিং বডির। কিন্তু যেভাবে গভর্ণিং বডি গঠিত হয় এবং যেভাবে তার কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা সন্তোষজনক নয়। অতএব আইন কলেজসমূহের প্রশাসন, পরিচালনা ও উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য দায়িত্বশীল ও কর্মঠ গভর্ণিং বডি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১৯.২১. বিশিষ্ট কোন স্থানীয় আইনজীবী বা আইনবিদ অথবা অবসর প্রাপ্ত কোন বিচারক বা বিচার বিভাগের কোন উচ্চ পদস্থ অফিসার অথবা উচ্চ পদস্থ কোন সরকারী অফিসারকে সভাপতি এবং কলেজের অধ্যক্ষকে সদস্য সচিব করে প্রত্যেক আইন কলেজের জন্য একটি গভর্ণিং বডি গঠন করা উচিত। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে থাকবেন শিক্ষক প্রতিনিধি, স্থানীয় আইনজীবীদের প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাদরদীদের থেকে মনোনীত প্রতিনিধি। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাদরদীদের থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। কলেজের অনুমোদনকারী সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় উপরোক্ত ব্যক্তিদের থেকে সভাপতি মনোনীত করবেন। এই গভর্ণিং বডি কলেজের প্রশাসন, পরিচালনা, উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করবেন।

১৯.২২. এ ছাড়াও নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ সত্বর কার্যকরী করা দরকারঃ

(ক) ব্যবহারিক বা প্রয়োগমুখী আইন শিক্ষাদানের দায়িত্ব অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যতদিন উক্ত কাউন্সিল তা' না নিতে পারবেন ততদিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পালন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে আইনের মাধ্যমে এ কর্তব্য পালনের জন্য কাউন্সিল অব লিগেল এডুকেশন নামে একটি নতুন সংস্থা স্থাপন করতে হবে।

(খ) আইন কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক মণ্ডলী, গৃহ ও স্থান এবং পাঠাগার ইত্যাদির ভিত্তিতে আনুপাতিকভাবে ছাত্র সংখ্যা সীমিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক, আইন বিভাগের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী বা আইনবিদ নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত আইন কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা তদারক করবেন এবং যে সকল কলেজ তিন বছরের মধ্যে ব্যবস্থাপনার নিয়ম পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে পারবেন না সে সকল কলেজের অনুমোদন উক্ত তিন বছর সময় সীমা শেষে আর বর্ধিত করা হবে না এবং অনুমোদন ভবিষ্যতের জন্য বাতিল করা হবে।

(গ) বর্তমানে প্রচলিত দুবছরের আইন কোর্সের (এল, এল, বি ক্লাস) জন্য আগামী শিক্ষা বর্ষ হতে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুট কোর্ট এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষায় বর্তমানে যে অনার্স কোর্স ও মাষ্টার কোর্স চালু আছে তাদের অধ্যয়নকাল, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং মান একরূপ করতে হবে। এ বিষয়ে উপরে ১৯.৯. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যকর পন্থা সত্বর অবলম্বন করতে হবে।

(ঙ) চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও সরাসরিভাবে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) আইন শিক্ষাকে গবেষণামুখী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইনে ডিগ্রী-উত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ আইন ও

আন্তর্জাতিক বিষয়ক ইনষ্টিটিউটকে পাঠাগার এবং অন্যান্য শিক্ষাগত ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা একান্ত দরকার।

(ছ) প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে আইনকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। উক্ত ব্যবস্থায় ছাত্রগণ তাদের পাস ডিগ্রী কোর্সের একটি বিষয় হিসাবে বা অনার্সে 'সাবসিডিয়ারী' বিষয় হিসাবে "আইন" নিতে পারে।

(জ) বর্তমানের দু'বছর মেয়াদী এল, এল, বি ডিগ্রী প্রাপ্ত বা আইনে তিন বছর মেয়াদী অনার্স বা অনুরূপ ডিগ্রী প্রাপ্ত গ্রাজুয়েটকে আইন ব্যবসায় যোগ দিতে হলে এক বছর মেয়াদী একটি ব্যবহারিক (প্রফেসানেল) কোর্স করতে হবে এবং এই কোর্সের পর বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তাদের আদালতে এড্‌ভোকেটরূপে যোগ দিতে দেওয়া হবে। যতদিন পর্যন্ত বার কাউন্সিল উপরোক্ত এক বছর মেয়াদী ব্যবহারিক আইন শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন।

আইন শিক্ষা

সারাংশ

১। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং আইনজীবী সকলেই অনেক সমালোচনা করেছেন। গত কয়েক বছরে আইন শিক্ষার মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আইন শিক্ষা দেবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা প্রধানতঃ আইন শিক্ষার অবনতির কারণ। এ সব আইন কলেজের অনেকগুলিতে যোগ্য পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ শিক্ষকের অভাব। আইন কলেজগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। আইন কলেজগুলিতে গবেষণার কোন ব্যবস্থা নাই। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন ফ্যাকাল্টিগুলিতে গবেষণার কাজ হচ্ছে না। বিচার বিভাগ এবং আইন ব্যবসায়ের জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি আইনজ্ঞ তৈরী করছেন কিন্তু আইন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন তা সৃষ্টির কোন প্রয়াস নাই। আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা নাই। কলেজগুলিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইন শিক্ষার শিক্ষাগত ও গবেষণামুখী দিক এবং ব্যবহারিক ও প্রয়োগমুখী দিক, কোন দিকই সন্তোষজনকভাবে পূরণ হচ্ছে না। (১৯.১—১৯.৪)

২। আইন শিক্ষা যদিও মাষ্টার ডিগ্রীর মত একটি ডিগ্রী-উত্তর কোর্স তবুও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সের মত মেধা পরীক্ষা করে আইন কোর্সে ভর্ত্তি করা হয় না বলে নিম্নমানের শিক্ষার্থীরাও আইন শিক্ষার সুযোগ নেয়। এসব নিম্নমানের শিক্ষার্থীদের অনেকেই পরবর্তী পর্যায়ে পাশের জন্য নীতিবহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করে এবং আইন শিক্ষার মানের অবনতি ঘটায়। বর্তমানে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আইন কলেজগুলিতে আইন শিক্ষার যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা অধ্যয়নকালের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের এবং তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীও ঠিক এক নয়। (১৯.৪—১৯.৫)

৩। উপরের বিষয়গুলি বিবেচনা করে আইন শিক্ষাকে এর যথাযোগ্য মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন বিভাগের প্রথম ডিগ্রীর পর আইন কলেজগুলিতে এল, এল, বি কোর্সের মেয়াদ বর্তমান দু'বছরের স্থলে তিন বছর হওয়া আবশ্যক। আইন কলেজগুলিতে এল, এল, বি কোর্স দু'ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশের মেয়াদ দুই ও দ্বিতীয় অংশের মেয়াদ এক বছরের হবে এবং প্রতি অংশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। প্রথম দু' বছর আইনের ইতিহাস, মৌলিক বিষয়সমূহ এবং সূত্র পাঠে ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বর্ষে দলিল প্রণয়ন, সওয়াল জওয়াব, আর্জি-মুসাবিদা, মামলা পরিচালনা বিধি ইত্যাদির ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। যারা শুধু জ্ঞান আহরণের জন্যই আইন পড়তে চায় তাদের কোর্সের প্রথমাংশ সমাপ্তির পর একাডেমিক বা শিক্ষাগত ডিগ্রীদানের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিবেচনা করতে পারেন। তবে যারা আইনকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে চায় তাদের কোর্সের দ্বিতীয় অংশ অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে এবং এ অংশের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের ডিপ্লোমা-ইন-এড্‌ভোকেটশীপ প্রদান করা হবে। এই কোর্স সমাপ্তির পর আইন ব্যবসায়ে যোগদান করা যাবে। অবশ্য আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা সুপ্রীম কোর্ট/বার কাউন্সিল নির্ধারণ করবেন। (১৯.৬—১৯.৮)

৪। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইন শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার অধ্যয়নকাল একই হওয়া উচিত এবং আইন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে দেশে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য তিন বছরের যে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে তার অধ্যয়ন কাল চার বছর

করতে হবে। এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, বি (অনার্স) কোর্সের অধ্যয়ন কাল তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর করা উচিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের বি, জুরু (অনার্স) কোর্সের নাম বদলিয়ে তাকে চার বছরের এল, এল, বি (অনার্স) কোর্স নামে চালু করতে হবে। এই চার বছরের এল, এল, বি (অনার্স) কোর্সের সঙ্গে বর্তমান এম, জুরের এক বছর অধ্যয়ন কালও যুক্ত হবে অর্থাৎ এম, জুর নামে পৃথক কোন ডিগ্রীর ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, এম ডিগ্রীর অধ্যয়ন কাল এক বছরের স্থলে দু' বছরের করা উচিত। এতে ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, এল, এম ডিগ্রীর অধ্যয়ন কাল এল, এল, বি (অনার্স) ডিগ্রীর পর দু' বছর হবে। এ দু'বছরের এল, এল, এম ডিগ্রীর অধ্যয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন আইন কলেজ থেকে এল, এল, বি ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও উপযুক্ত বিবেচিত হবে। দু বছরের মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স দু ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশ হবে কোর্স কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় অংশ হবে কোর্স কার্যক্রম অথবা থিসিস কার্যক্রম। যারা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অংশেই কোর্স কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এল, এল, এম ডিগ্রী প্রদান করা হবে. যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রম এ যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এম, ফিল ডিগ্রী প্রদান করা হবে। (১৯.৯—১৯.১৩).

৫। আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশ, আইন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ এবং সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আইন গবেষণা প্রয়োজন। (১৯.১৪.)

৬। যে সব আইন কলেজ প্রকৃতই পাণ্ডিত্য ও সুষ্ঠু শিক্ষার কেন্দ্র শুধু সেগুলিকেই অনুমোদন দান করা উচিত। কলেজের অনুমোদনের ব্যাপারে শিক্ষক, কলেজ গৃহ ও স্থান, লাইব্রেরী, অন্যান্য সুবিধা এবং টিউটোরিয়াল ও প্রাকটিক্যাল কার্য সম্পর্কে অন্যান্য সাধারণ কলেজের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং এগুলি কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে।

৭। আইন কলেজের শিক্ষকগণ শুধু পূর্ণকালীন ও নিয়মিত শিক্ষক বা শুধু খণ্ডকালীন শিক্ষক হবেন না বরং উভয় শ্রেণীর মিশ্রণে শিক্ষকমণ্ডলী গঠিত হবে। (১৯.১৬.)

৮। একই সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে ছাত্র বাছাই এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আইনের শিক্ষক নিয়োগকালে তাঁদের প্রকাশিত গবেষণা কর্ম এবং গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে তাদের যোগ্যতা বিচার করে দেখতে হবে। (১৯.১৭.)

৯। আইন শিক্ষার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। যোগ্য আইন শিক্ষা কলেজগুলিকে অন্যান্য বেসরকারী সাধারণ কলেজের ন্যায় অনতিবিলম্বে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা প্রয়োজন। (১৯.১৯.)

১০। আইন কলেজসমূহের প্রশাসন, পরিচালনা ও উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য দায়িত্বশীল ও কর্মঠ গভর্ণিং বডি গঠন করা দরকার (১৯.২০.—১৯.২১.)

১১। এ ছাড়াও নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ সত্বর কার্যকরী করা দরকারঃ

(ক) ব্যবহারিক বা প্রয়োগমুখী আইন শিক্ষাদানের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে গ্রহণ করতে হবে এবং যতদিন উক্ত কাউন্সিল তা না নিতে পারবেন ততদিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পালন করতে হবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, আইন বিভাগের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট আইনজীবি বা আইনবিদ নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত আইন কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা তদারক করবেন এবং যে সকল কলেজ তিন বছরের মধ্যে

ব্যবস্থাপনার নিয়ম পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে পারবে না সে সকল কলেজের অনুমোদন উক্ত তিন বছর সময়সীমা শেষে আর বর্ধিত হবে না।

(গ) প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ে আইনকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বর্তমানের দু' বছর মেয়াদী এল-এল, বি, ডিগ্রীপ্রাপ্ত বা আইনে তিন বছর মেয়াদী অনার্স বা অনুরূপ ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটকে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতে হলে এক বছর মেয়াদী একটি ব্যবহারিক (প্রফেসনাল) কোর্স পাস করতে হবে। (১৯.২২.)

অধ্যায় ২০

ললিতকলা শিক্ষা

২০.১. দেশের সামগ্রিক শিক্ষা প্রকল্পে ললিতকলা শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ ললিতকলা শিক্ষা একটি জাতিকে অধিকতর সংস্কৃতিবান জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, দ্বিতীয়তঃ দেশের মানুষের ভেতর সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত ও বর্ধিত করার মাধ্যমে তার সর্বাংগীন বিকাশে সাহায্য করে। এই সর্বাংগীন বিকাশ বলতে আমরা যেমন বুঝি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ, তেমনি সৌন্দর্যবোধের বিকাশও।

২০.২. জন্মের পর থেকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশপ্রাপ্তি হতে থাকে এবং তা সর্বদা স্বকীয় ধারায় চলে। কিন্তু যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, এ সম্পর্কে সমাজেরও একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সমাজকে দেখতে হবে, তার অপরিহার্য অংশ হিসেবে মানুষ যেন নিজস্ব উন্নতির সংগে সংগে সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এর অর্থ হল, ব্যক্তির উন্নতি ছাড়া যেমন সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়, তেমনি সুস্থ ও উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ ছাড়াও ব্যক্তির উন্নতি দুঃসাধ্য। সামাজিক গঠন, বিবর্তন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে হলেও প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব রয়েছে অভিন্ন প্রকৃতির। মানুষ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট বজায় রেখেও তার ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একক এবং সমবেতভাবে সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে। এর জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় সমবেতভাবে মানুষের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

২০.৩. একটি মানুষের শিক্ষাকাল তার জন্ম মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আর একে ফলপ্রসূ করবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুকূল সামাজিক পরিবেশ। একদিকে সমাজ যেমন জাতীয় দর্শন, ঐতিহ্য, প্রেরণা ও মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে দেশবাসীকে উপযুক্ত ও কার্যকরী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থাপন করবে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেমন অপর দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা, কার্যকারিতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে উপযোগিতার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশকে করে তুলবে অধিকতর উন্নত ও সমৃদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততা কেবলমাত্র শিক্ষায়তনের উপযোগী ও কার্যকরী গৃহের ওপর নির্ভর করবে না, বরং এর চাইতেও অধিক পরিমাণে নির্ভর করবে একটি বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচী, কুশলী শিক্ষকমণ্ডলী এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থার ওপর। সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ললিতকলার শিক্ষার স্থান কি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২০.৪. আমরা জানি সৌন্দর্যবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মানুষের সকল মৌলিক চাহিদার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ বিকাশের চাহিদাও অন্যতম এবং এই কারণেই শৈশব থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষের মনে সুন্দরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বিরাজমান। সুন্দরের প্রতি মানুষের এই যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাকে অবহেলিত না রেখে তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যই একটি সুস্থ সাবলীল ও উপযুক্ত পরিবেশ এবং সঠিক কার্যক্রম গড়ে তোলা একান্তভাবে প্রয়োজন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বিকাশপ্রাপ্তি মানের দিক থেকে বিভিন্ন হয়ে থাকে, তবু প্রত্যেকের শক্তি ও সম্ভাবনা অনুযায়ী যতখানি বিকাশপ্রাপ্তি সম্ভব, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই হল যে কোন শিক্ষা প্রকল্পের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার জন্যেই মেধা, সামর্থ ও রুচি অনুযায়ী সমপর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটামুটি একই মানের

একটি শিক্ষাসূচী প্রণয়ন করা দরকার, যার মধ্যে অবশ্যই ললিতকলা শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রীড়া ও ললিতকলা শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থী বহুলাংশে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রসংগে একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন, ললিতকলা শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ ও সঠিক কার্যক্রমের গুরুত্ব সর্বাধিক।

২০.৫. উপযুক্ত পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি, এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিক্ষার্থীরা সুন্দরকে দেখার, তার সংস্পর্শে আসার এবং তাকে উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করতে পারে, যেমন সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, সুসমঞ্জস গৃহ পরিকল্পনা, উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত পুষ্পোদ্যান, বিদ্যালয়গৃহের সুন্দর আসবাবপত্র ও যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। এইসবের পরিপূরকরূপে রয়েছে শরীর চর্চা ও খেলাধূলার জন্য উপযুক্ত আবহসংগীত, বিদ্যালয়ের নিজস্ব যাদুঘর, চিত্রশালা, সংগীত পাঠাগার এবং সযত্নে রক্ষিত 'সৌন্দর্যকোণ'।

২০.৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে একটি উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুললেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। সৌন্দর্যবোধের ন্যায় শিশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে বিকশিত করতে হলে একটি সঠিক কার্যক্রমের প্রয়োজন হবে। এই কার্যক্রমের আওতায় পড়বেঃ

(ক) ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স, সামর্থ ও রুচী অনুযায়ী একটি বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচী,

(খ) বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী,

(গ) কার্যকরী শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপযুক্ত শিক্ষার উপকরণ,

(ঘ) অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ, যা চারু বা ললিত কলাকে সামগ্রিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

পাঠ্যসূচীঃ

২০.৭. ললিতকলা বা সুকুমার শিল্পকলার আওতায় বিভিন্ন বিষয়াবলী শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কাব্য ও স্থাপত্য এই দুটি বিষয় এই আলোচনার পরিধি থেকে বাদ রাখলেও সুকুমার শিল্পকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ

১। সংগীত (গীতি ও বাদ্য),

২। নৃত্যকলা,

৩। অভিনয় (আবৃত্তিসহ),

৪। চিত্রাংকন (নক্সা অংকনসহ),

৫। কারু শিল্প বা হাতের কাজ,

৬। ভাস্কর্য।

২০.৮. পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

(১) বিষয়বস্তু ও আংগিকের ক্ষেত্র দেশের ঐতিহ্য বজায় রাখার সংগে সংগে বহির্বিশ্বের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠির সাথে একটি শৈল্পিক যোগাযোগ রক্ষা করা,

(২) দেশের পল্লী অঞ্চলে যে বৃহত্তর জন সমাজ অবস্থান করছেন তাঁদের উপেক্ষা করে কেবল নাগরিক সংস্কৃতি প্রতিফলন না ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা,

(৩) স্বকীয় সৌন্দর্য উপলব্ধি, পরিচ্ছন্নরুচি ও শৃংখলাবোধ এবং সামাজিক ও মানসিক চেতনা যাতে জাগ্রত হয় সে দিকে সাহায্য করা,

(৪) শিক্ষা লাভের সংগে যাতে জীবিকার্জনের পথ সুগম হয় তার ব্যবস্থা থাকা,

(৫) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানতঃ ক্রীড়া ও ললিতকলার মাধ্যমেই শিক্ষাদান কার্য চলার ব্যবস্থা করা,

(৬) প্রাথমিক পর্যায়ে সাপ্তাহিক কার্যসূচীতে ললিতকলা শিক্ষা কার্যের জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ডের ব্যবস্থা থাকা,

(৭) নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর সাপ্তাহিক কার্যসূচীতে ললিতকলা শিক্ষাদান কার্যের জন্য পিরিয়ডগুলি নিম্নলিখিতরূপ হবেঃ

নবম ও দশম শ্রেণী।		একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।	
বৃত্তিমূলক গ্রুপ।	সাপ্তাহিক পিরীয়ড সংখ্যা।	পঠিতব্য বিষয়।	সাপ্তাহিক পিরীয়ড সংখ্যা।
(ক) কণ্ঠ সংগীত	১৮	মাধ্যমিক অধ্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ললিত কলা বিভাগের তালিকায় প্রদত্ত বিষয় হতে ৪টি	২৬
(খ) যন্ত্র সংগীত	১৮		
(গ) নৃত্য কলা	১৮		
(ঘ) অভিনয় ও আবৃত্তি	১৮		
(ঙ) চিত্রাংকন	১৮		

বিশেষ ললিতকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যথা সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিনয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পকলা (চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেক বিষয়ে ডিগ্রী ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়েও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ললিতকলা অনুষদের ব্যবস্থা থাকা।

(৯) দেশের প্রতি প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে ললিতকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা থাকা।

(১০) বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে, ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা।

উপরিউক্ত সুপারিশগুলি পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা যেতে পারে এবং এর জন্য সরকারী সাহায্য, অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

২০.৯. পাঠ্যসূচী সঠিকভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর, এবং তার জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা অপরিহার্যঃ

(১) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিতে ললিতকলায় শিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য এক বছরের শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করা এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে ললিতকলায় সঞ্জীবনী কোর্স চালু করা।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন শিক্ষক নিযুক্ত করা, যাঁরা শিক্ষকতাকে কেবল পেশারূপে গ্রহণ করবেন না, বরং সুকুমার শিল্পের প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় ভালবাসা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, তার প্রকাশ বা উপস্থাপনার ব্যবহারিক কুশলতা, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি, গভীর সমঝোতা, সর্বোপরি বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে।

(৩) ললিতকলার জ্ঞান ও কুশলতা সম্পন্ন ব্যক্তি যাতে শিক্ষকতা পেশার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন, তার জন্যে চাকুরীর অর্থনৈতিক মান ও তাদের সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করতে হবে।

শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষার উপকরণঃ

২০.১০. ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্যসূচী ও উপযুক্ত শিক্ষক থাকলেও অনেক সময় স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন না করার ফলে শিক্ষা কার্যকরী হয় না। পাঠক্রমের সংগে শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সেজন্য ললিতকলা শিক্ষায়তনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যতদূর সম্ভব বিদেশী উপকরণ, সরঞ্জাম, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি কম ব্যবহার করে দেশীয় ও স্বল্পমূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলিকে মানের দিক থেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে করে সকল পর্যায়ের বিদ্যালয়ের জন্য ও সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সেগুলি উপযুক্ত ও সহজলভ্য হতে পারে।

অন্যান্য ব্যবস্থাঃ

২০.১১. ললিতকলাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তভাবে প্রয়োজনঃ

(১) সরকারী উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, শিল্পকলা, যাদুঘর, সংগীত পাঠাগার ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি জেলা শহরে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের চিত্রশালা, যাদুঘর, সঙ্গীত-পাঠাগার ও রঙ্গমঞ্চ স্থাপন;

(২) সরকারী অর্থানুকূল্যে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী এবং সঙ্গীত ও নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলা;

(৩) অবিলম্বে একটি জাতীয় ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে দেশের ঐতিহ্যবাহী সুকুমার কলা সম্পর্কে গবেষণা এবং তার প্রসারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) ললিতকলার বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন ধরণের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ;

(৫) ললিতকলা বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যাতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সসম্মানে জীবিকা অর্জন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) ললিতকলার বিভিন্ন শাখায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন;

(৭) ললিতকলা বিষয়ে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রী এবং দুঃস্থ শিল্পীদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র, ভাস্কর্য ও কারু শিল্পের নিদর্শন-সমূহের আনয়ন এবং আমাদের দেশের অনুরূপ শিল্পকর্ম বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যশিল্পী সমন্বয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক দল বিদেশে প্রেরণ এবং বিদেশ থেকে অনুরূপ প্রতিনিধিদল আনয়ন করা উচিত।

(৯) বাইরে দেশের ললিতকলার এবং দেশে বিদেশের ললিতকলার প্রদর্শনীর আয়োজন;

(১০) প্রতি বছর কিছুসংখ্যক নির্বাচিত শিল্পী ও ললিতকলার ছাত্র ও শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ;

(১১) বর্তমানে যে সকল উপকরণ ও সরঞ্জাম সহজলভ্য নয়, যেমন চলচ্চিত্র প্রজেক্টর, এপিডায়াস্কোপ, টেপরেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, ট্রানজিস্টার, বিদেশে প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র, রং, তুলি ইত্যাদি সরকারী উদ্যোগে কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক আনয়ন ও বিতরণের ব্যবস্থা;

(১২) চারু কলা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য সান্ধ্য এবং খণ্ডকালীন ক্লাসের ব্যবস্থা।

ললিতকলা শিক্ষা

সারাংশ

১। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা প্রকল্পে ললিতকলা শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ ললিতকলা শিক্ষা একটি জাতিকে অধিকতর সংস্কৃতিবান জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, দ্বিতীয়তঃ দেশের মানুষের ভেতর সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত ও বর্ধিত করার মাধ্যমে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করে। মানুষ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একক এবং সমবেতভাবে সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ললিতকলা শিক্ষার স্থান কি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। (২০.১—২০.৩.)

২। সৌন্দর্যবোধ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের সকল মৌলিক চাহিদার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ বিকাশের চাহিদাও অন্যতম। মানুষের মনে সুন্দরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বিরাজমান। তাকে অবহেলিত না রেখে পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যই একটি সুস্থ, সাবলিল ও উপযুক্ত পরিবেশ ও সঠিক কার্যক্রম গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ললিতকলা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের অর্থাৎ সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, সুসমঞ্জস গৃহ পরিকল্পনা, পরিকল্পিত পুষ্পোদ্যান, বিদ্যালয়ের নিজস্ব যাদুঘর, চিত্রশালা, সঙ্গীত পাঠাগার, সযত্ন রক্ষিত সৌন্দর্য কোণ ইত্যাদির গুরুত্ব দিতে হবে। সঠিক কার্যক্রম বলতে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচী, পারদর্শী শিক্ষকমণ্ডলী, উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ, ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ বুঝায়। (২০.৪.—২০.৫.)

৩। পাঠ্যসূচী প্রধাণতঃ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে পড়াবার ব্যবস্থা করা যেতে পারেঃ

১। সঙ্গীত (গীত ও বাদ্য)
২। নৃত্যকলা;
৩। অভিনয় (আবৃত্তিসহ)
৪। চিত্রাঙ্কন (নক্‌শা অঙ্কনসহ)
৫। কারু শিল্প বা হাতের কাজ;
৬। ভাস্কর্য।

পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে দেশের ঐতিহ্যের, বিশেষ করে পল্লীঅঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে মৌলিক যোগাযোগ রক্ষিত হয়। শিক্ষালাভের সঙ্গে যাতে জীবিকা অর্জনের পথ সুগম হয় তার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। (২০.৭.—২০.৮.)

৪। **সুপারিশসমূহঃ**

(ক) বিশেষ বিশেষ ললিতকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথা, সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অভিনয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি বিষয়ে ডিগ্রী ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়েও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ললিতকলা অনুষদ খোলার ব্যবস্থা করতে হবে;

(গ) দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে ললিতকলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) সকল প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে ললিতকলার সঞ্জীবনী কোর্স চালু করতে হবে;

(ঙ) জাতীয় চিত্রশালা, শিল্পকলা যাদুঘর, সঙ্গীত পাঠাগার, রঙ্গ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি জেলা শহরে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের চিত্রশালা, যাদুঘর, সঙ্গীত পাঠাগার ও রঙ্গ মঞ্চ স্থাপন করতে হবে;

(চ) ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী এবং সঙ্গীত ও নাট্য গোষ্ঠি গড়ে তুলতে হবে;

(ছ) অবিলম্বে একটি জাতীয় ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে দেশের ঐতিহ্যবাহী সুকুমার কলা সম্পর্কে গবেষণা এবং তার প্রসারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(জ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র, ভাস্কর্য ও কারু শিল্পের নিদর্শন-সমূহের আনয়ন এবং আমাদের দেশের অনুরূপ শিল্পকর্ম বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যশিল্পী সমন্বয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক দল বিদেশে প্রেরণ এবং বিদেশ থেকে অনুরূপ দল আনয়ন করা উচিৎ;

(ঝ) নিয়মিত শিক্ষাকোর্সের বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য সান্ধ্য ও খণ্ডকালীন ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঞ) চাকুরীর অর্থনৈতিক মান ও তাদের সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করতে হবে;

(ট) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির এবং দুস্থ শিল্পীদের জন্য যথেষ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঠ) ললিতকলার বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(ড) ললিতকলার বিভিন্ন শাখায় জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

অধ্যায় ২১

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

পরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

২১.১. শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে কোনও শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর সংগে ঐ সমস্ত স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠব্যবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে উন্নত মানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা বহুলাংশে নিরূপণ করা সম্ভব।

২১.২. পরীক্ষার উদ্দেশ্য বহুবিধ। উদ্দেশ্যের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন প্রণালী এবং পরিচালন ব্যবস্থার তারতম্য হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাসমূহের প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন ঃ

(ক) একটি স্তরের শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী যে পরিমাণে জ্ঞানলাভ বা সফলতা অর্জন করলো তা নিরূপণ ও তার মূল্যায়ন।

(খ) উচ্চতর স্তরে শিক্ষার্থীর সফল অধ্যয়নের অনুকূলে কতটা প্রবণতা, আগ্রহ, সহজাত বুদ্ধি ও শক্তি আছে তা নির্ধারণ।

(গ) শিক্ষাদানের মান নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ।

(ঘ) শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নে প্রেরণা ও উৎসাহ দান।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা কি, তার দুর্বলতা ও সবলতা কোথায় এবং কোন ব্যবস্থায় তার সুপ্ত শক্তিসমূহের প্রকৃত বিকাশ হবে তা নির্ধারণ।

(চ) কোন সামাজিক কাজ ও পেশায় শিক্ষার্থীর কতটা যোগ্যতা আছে এবং কোন কাজে বা পেশায় কোন্ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করলে সমাজের ও ব্যক্তির সার্বিক উপকার হবে তা নির্ধারণ।

২১.৩. সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাকে আগের থেকেই কোন উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারপর পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন এবং পরীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে উক্ত পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা আদর্শ স্থানীয় হয়। সর্বোপরি পরীক্ষার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ যোগ্যতা বিচার করতে হবে। পরীক্ষার সফল প্রয়োগের জন্য কি প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন, কত সময় ও অর্থ ব্যয় হবে, কি কি বিধি-নিষেধ থাকতে হবে, কোন অবস্থায় কাহাকে তা গ্রহণ করতে দেওয়া হবে ইত্যাদি খুটিনাটি বিষয় বিবেচনা করে পরীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২১.৪. অবস্থা ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের গঠন বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যথা (ক) অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা, (খ) লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা, (গ) রচনামূলক ও অবজেকটিভ পরীক্ষা, (ঘ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরীক্ষা, (ঙ) কার্যনির্ভর ও বাক্যনির্ভর পরীক্ষা, (চ) সফলতা, প্রবণতা, বুদ্ধি, আগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পরীক্ষা এবং (ছ) উপরে উল্লিখিত কয়েকটি পদ্ধতির সমবায়ে গঠিত পদ্ধতির পরীক্ষা।

আবার পরিবেশের তারতম্য সাধন করে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি পদ্ধতির ব্যবহারেও বিভিন্নতা প্রদান করা যেতে পারে। পরীক্ষা পরিচালন সংস্থা সঠিক গবেষণার মাধ্যমে স্থির করতে পারেন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে পরীক্ষাটি বেশী উদ্দেশ্যনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য হবে।

২১.৫. আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষাসমূহ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যুক্তিসংগত হবে। যাঁরা এ মনোভাব ব্যক্ত করছেন তাঁরা সম্ভবত পরীক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাপনাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করছেন না। একটির জন্য অন্যটিকে কিংবা দুইয়ের যৌথ ত্রুটির জন্য যে-কোন একটিকে তাঁরা দায়ী করছেন। সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যদি সামাজিক ন্যায় নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার বিধান থাকতেই হবে।

২১.৬. আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে লিখিত, রচনামূলক, বাক্যনির্ভর বহিঃপরীক্ষার উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমাগত বহিঃপরীক্ষা কেন্দ্রিক হওয়ার দরুণ বর্তমানে এক চরম সংকটের সম্মুখীন। যদিও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তঃপরীক্ষারও প্রচলন আছে এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের শিক্ষকদের উপরই এইরূপ পরীক্ষা পরিচালনের দায়িত্ব অর্পিত আছে তবুও সে সকল পরীক্ষার ফলের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিচ্ছে এবং নানাবিধ অন্যায় আচরণ শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে যুক্ত হচ্ছে। তদুপরি একই পরীক্ষাকে বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মেধাবী, প্রতিভাবান ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিটি বহিঃপরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষা-সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োগে এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। তখন প্রচলিত ব্যবস্থাপনা আরও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। অনতিবিলম্বে বহিঃপরীক্ষা সর্বস্ব আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার না হলে জাতীয় উন্নতির সকল প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

২১.৭. আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফেলের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি শিক্ষাদান পদ্ধতির অবনতিই প্রমাণ করে। এ অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষকগণ যদি নিজেদের কাজে কর্মে একাগ্র হন, তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই এ অবস্থার অবসান হবে। শিক্ষকেরা ক্লাসরুমে বা তার বাইরে, বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল দেখে প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। যে শিক্ষার্থী তার পাঠ্য বিষয়ের কোনো অংশ সঠিক বুঝতে না পারে, শিক্ষক বিশেষ যত্ন সহকারে তা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। কোন শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ পেলেই সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষক তা দূর করতে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষকের এই মুখ্য ভূমিকা আমাদের বিদ্যালয়গুলির সকল রকম মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে। কালক্রমে দেখা যাবে যে বিদ্যালয়গুলিতে ফেল বা অনুত্তীর্ণ ছাত্রের কথা সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে যাচ্ছে।

২১.৮. সম্প্রতিকালে পরীক্ষায় ব্যাপক আকারে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষার কোন কোন স্তরে এই সংকট অত্যন্ত প্রকট। এই দুর্নীতি পরীক্ষাসমূহকে প্রহসনে পরিণত করছে। সবচেয়ে পীড়াদায়ক বিষয়টি হলো, শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হতে চলেছে। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অবনতির এই চরম অবস্থা থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্তি লাভ করতে হবে।

অন্তঃপরীক্ষাঃ

২১.৯. সচরাচর আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অন্তঃপরীক্ষার যে ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাতে শ্রেণীকক্ষে বা শিক্ষায়তনে শিক্ষক পরিচিত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বছরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধীত

বিষয়াদিতে কতটা পারদর্শিতা লাভ হয়েছে শিক্ষক তা যাচাই করেন। শিক্ষক নিজেই প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী, পরীক্ষা গ্রহণকারী এবং তিনি নিজেই পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশনের জন্য সাধারণতঃ এরূপ পরীক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত। এই প্রচলিত পরীক্ষাগুলি স্বভাবতঃই পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিবেশের অন্যবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল পরিমাপের সুযোগ এ ক্ষেত্রে অতি অল্প। শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের বিকাশভঙ্গি পরিমাপের জন্য একই অবস্থায় শ্রেণী-কক্ষে আরও বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের গতিধারা বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত শিক্ষা ও কর্মধারা নির্ধারণে পরামর্শদাতার ভূমিকাও পালন করতে পারেন। এ ভূমিকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের প্রেরণা দান করার সুযোগ পাবেন। ফলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হবে তা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মানকে দিন দিন উন্নত করবে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বন্ধুর মর্যাদা লাভ করবেন এবং সমাজ ও জাতির প্রভূত উপকার সাধন করবেন।

২১.১০. শিক্ষায়তনের পরিচিত ও স্বাভাবিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মনে কৃত্রিমতা ও ভীতি সঞ্চার করে না বলে এরূপ পরিবেশে প্রদত্ত অন্তঃপরীক্ষা প্রভূত পরিমাণে নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে যথেষ্ট ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলে তাদের অবস্থা, জ্ঞান, মানসিক উন্নতি ইত্যাদির মান যাচাইয়ে এরূপ অন্তঃপরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যথোপযুক্ত প্রয়োগের সুযোগ পান। এতে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

২১.১১. অন্তঃপরীক্ষার সঠিক প্রয়োগকল্পে কয়েকটি বিষয়ে অবশ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের গভীর ও নির্ভুল ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিষয়ে তার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। যে সমস্ত বিশেষ পরীক্ষা, যেমন বুদ্ধির পরীক্ষা, ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা, প্রবণতার পরীক্ষা ইত্যাদি শিক্ষক স্বয়ং প্রণয়ন করতে অথবা প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম নন সেরূপ পরীক্ষার জন্য তিনি অবশ্যই উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন। সর্বোপরি অন্তঃপরীক্ষার ফল যাতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত শিক্ষা বা জীবনের কর্মধারা নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত তার নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কিংবা শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় রিপোর্টে এ ফলের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের বা কোর্সের শেষে শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে উক্ত স্তরের শেষ বর্ষের বা কোর্সের অন্তঃপরীক্ষার তথ্যসার মূল্যায়িত মানরূপে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির উপর গৃহীত নিয়মিত অন্তঃপরীক্ষার মূল্যায়িত তথ্যসার প্রদর্শিত হবে।

বহিঃপরীক্ষাঃ

২১.১২. পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বে যা বলা হয়েছে তা আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মূলতঃ দুটি প্রধান লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা করা হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করে তাকে সঠিক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণে কিংবা সুষ্ঠু জীবন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য পরীক্ষা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কিংবা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ভঙ্গীতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তুলনামূলক মানবিচারের জন্য পরীক্ষা করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। যে ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিপুলতা, সামাজিক জীবনে জটলতা এবং জ্ঞানের প্রসারতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আনুষ্ঠানিক বহিঃ-পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আনুষ্ঠানিক বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষক স্বতীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে সঠিক যাচাই করতে পারলেও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনার জন্য যদি এই পরীক্ষার ফল ব্যবহৃত হয় তা হলে তাঁর যাচাই তুলনামূলকভাবে সঠিক নাও হতে পারে এবং

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তিনি কখনও কখনও পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা যতই বেশী হবে ততই যাচাইয়ের মানে বিভিন্নতা দেখা দিবে এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতিত্বেরও পরিমাণ ও সম্ভাবনা বাড়বে। তা ছাড়া একই স্তরে বা কোর্সে শিক্ষারত সারা দেশের বা অঞ্চলের একই ধরণের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান বা জ্ঞানের মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এবং এরূপ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারস্পারিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশব্যাপী বা অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাসমূহ নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষায়তন বহির্ভূত সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়। আমাদের দেশে প্রধানতঃ শিক্ষা পরিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২১.১৩. সুতরাং বলা যায় যে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবন নির্দেশনার জন্য এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মান যাচাইয়ে অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার সুষম বিধান থাকতে হবে।

অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বয় সাধনঃ

২১.১৪. অন্তঃপরীক্ষার গুণাগুণ সম্বন্ধে পূর্ণোস্থার অভাববশতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার কোন কোন স্তরে এমন পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে যে সেখানে পরীক্ষার্থীর আপন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নাই। কেবলমাত্র বিষয়ভিত্তিক বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী আজীবন চিহ্নিত থেকে যায়। পরীক্ষক, পরীক্ষা পরিচালনা, সংস্থা, সময়, পরিবেশ, পরীক্ষাকেন্দ্র অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ ইত্যাদির বিভিন্নতার দরুণ বহিঃপরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং উল্লিখিত উপকরণগুলির সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। বহিঃপরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষাকেও মর্যাদা ও গুরুত্ব দিলে এবং উভয় পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা হলে অর্থাৎ এদের নির্ভরযোগ্যতা, উদ্দেশ্যনিষ্ঠতা ও ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

২১.১৫. এটা অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র অন্তঃপরীক্ষা বা বহিঃপরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সকল গুণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এ দুটির সমন্বিত ব্যবহারের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ও মানের উন্নতি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই অনতিবিলম্বে এই দুটির সমন্বিত ব্যবহার প্রচলিত হওয়া উচিত। অন্তঃপরীক্ষা ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদূরিত করার পন্থা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত গবেষণা সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে হবে। এই গবেষণা সংস্থা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন এবং শিক্ষকদের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা প্রদানের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবেন। এই উভয় পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য পরীক্ষা পদ্ধতিরও যেন সমন্বয় সাধন করা হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান পরিমাপ করা খুবই দুরূহ। কোন বিশেষ ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে এর সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

২১.১৬. শিক্ষার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং আমাদের দেশে প্রচলিত প্রায় সকল পরীক্ষাই প্রধানতঃ লিখিত পরীক্ষা। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিষয়াদিতে জ্ঞান পরীক্ষার জন্য কিছু পরিমাণে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। স্তর বিশেষেও বিশেষ প্রয়োজনে কোন কোন সময় সীমিত মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। বিষয় জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষাসমূহ প্রধানতঃ স্মৃতিশক্তির প্রখরতারই পরিমাপ করে। স্মৃতিশক্তি মানসিক বিকাশের অনুকূল ক্ষমতা দান করলেও তার পরিমাপ দ্বারা মানসিক বিকাশের মাত্রা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণেই পরীক্ষার গঠনেও

প্রয়োজন অনুযায়ী বৈচিত্র দান করা উচিত। রচনামূলক ও লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক, ব্যবহারিক, অবজেকটিভ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২১.১৭. উপরোক্ত সমস্যাবলী এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা নীচে কয়েকটি সুপারিশ করছি।

প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ঃ

২১.১৮. বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান প্রাইমারী শিক্ষা স্তরের শেষ বর্ষের অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীর শেষে এবং নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীর শেষ বর্ষের অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর শেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোন সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে আজকাল প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীসমূহে লেখাপড়া হচ্ছে না। বছরের পর বছর এক শ্রেণী থেকে তার উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন হচ্ছে অথচ শিক্ষকের শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীর গ্রহণের সীমা পরিমাপ ও মূল্যায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। তদুপরি পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে স্কুলসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য কোন প্রচেষ্টাও নাই বলা যায়। ফলে এসব স্তরে শিক্ষার মানের ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে এবং এই নীচু মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চ স্তরের শিক্ষায় লাভবান হতে পারছে না। এতে সর্বস্তরে শিক্ষার মানের অধোগতি হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের সুপারিশ হল যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে এসব স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য বহিঃপরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক যাতে শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা সদা সজাগ থাকে এবং সুষ্ঠু শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু হয়।

২১.১৯. আমরা শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের উপরোক্ত সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা ও পরীক্ষা করেছি। সবদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সুপারিশ হল যে, প্রথমতঃ প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ে তার বছরব্যাপী লেখাপড়া, শ্রেণীকক্ষে কর্মদক্ষতা এবং আচার-আচরণের উপর নির্ভর করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ক্লাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বছরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা ছাড়াও প্রতি বছরে অন্ততঃ তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত হবে। তা ছাড়াও সময়ে সময়ে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, প্রবণতা এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মূল্যায়নের বিভিন্ন ফল সঞ্চয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এসব পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমূল্যায়ন, উৎসাহ ও তৃপ্তি সৃষ্টি করা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীর বিশেষ মেধা ও দুর্বল শিক্ষার্থীর দুর্বলতা আবিষ্কার করে সময়োচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে প্রথমোক্তদের মেধা আরও বিকশিত এবং শেষোক্তদের দুর্বলতা অপসৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রচলিত বৃত্তি পরীক্ষা চালু রাখা আমরা সমীচিন মনে করি। তবে অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যেক স্কুল থেকে এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। উপরোক্ত দুটি শ্রেণীর শেষে সকল ছাত্রের জন্য বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন জেলা-ভিত্তিক হবে, তবে পরীক্ষা হবে স্কুলভিত্তিক অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্কুলের পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব স্কুলেই পরীক্ষা দেবে এবং ঐ স্কলের শিক্ষকেরাই পরীক্ষার মূল্যায়ন করবেন। এই পরীক্ষার মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি গঠিত হবে ঐ স্কুলের শিক্ষক, পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষক এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে। এই কমিটির কাজ হবে পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষক কর্তৃক পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নের মান ঠিক আছে কি না তা দেখা। অষ্টম শ্রেণীর শেষে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় সার্টিফিকেট

দেওয়া হবে এবং ঐ স্কুলই এই সার্টিফিকেট দেবে। পরীক্ষা ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত যাতে পরীক্ষার্থীরা আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে সময়মত ভর্তি হতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষাঃ

২১.২০. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত মান বা মূল্য নিরূপণের বর্তমান পদ্ধতি ধীশক্তির উৎকর্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রত্যেক শিক্ষা বর্ষের শেষে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে তা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে প্রমোশন দেওয়া হয় তাকে সারা বছরের ব্যবহারিক ও ব্যাপক জরিপের ভিত্তিতে পরিচালিত করার কোনরূপ প্রচেষ্টা নাই। অপর পক্ষে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পর সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের যাবতীয় দৃষ্টি উক্ত পরীক্ষাসমূহের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি মারাত্মক, যেমন সম্পূর্ণরূপে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা হেতু স্মৃতিশক্তির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় না এবং সে সংগে পাঠ্য বিষয়াদিসহ দুই বছরব্যাপী কোর্সে যা কিছু শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে তার কোনরূপ মূল্যও দেওয়া হয় না। এতে পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে না আসার পূর্ব পর্যন্ত পড়াশুনা করার বিশেষ কোন আগ্রহ এবং চেষ্টা থাকে না। কারণ, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে উৎসাহদানের ক্ষেত্রে এ একটি অত্যন্ত দূরবর্তী লক্ষ্যস্থল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে সব কিছু করা হয়ে থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়ের নিয়ম ও শৃংখলা এবং শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারটিকে ক্ষুন্ন করা হয়।

২১.২১. কারো কারো মতে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থাকে বাতিল করে তার স্থলে ঘন ঘন বিরতির পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতাও দিতে হবে। যে সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ ক্ষমতার আওতায় অবস্থিত এবং যার পর্যায়ক্রমিক উৎকর্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে থাকে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চারের ক্ষেত্রে সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাদি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকরী। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার ব্যাপারে সারা বছর ধরে ব্যস্ত থাকবে এবং এর ফলে তাদের একটি স্থায়ী অভ্যাস এবং চরিত্রও গড়ে উঠবে।

২১.২২. উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হলেও তা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার বিকল্পরূপে গৃহীত হতে পারে না। কারণ, শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহ কতদূর অনুধাবন করেছে তা এবং তাদের মানসিক তৎপরতার উচ্চমান নিরূপণের ক্ষেত্রে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এরূপ পরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করার জন্য একটি পরিমাপ দণ্ডবিশেষ এবং এতে পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব গড়ে উঠে। কাজেই মাধ্যমিক স্তরে আমরা অন্তঃ-পরীক্ষার সংগে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষপাতি।

২১.২৩. সারা বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়নের সুপারিশও আমরা করছি, অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরেও প্রাথমিক স্তরের ন্যায় অন্তঃপরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বাড়ির কাজ, টিউটোরিয়াল, শ্রেণীকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়াও এই স্তরে প্রতি বছর অন্ততঃ চারটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন যে, অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্যের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ তথা পরীক্ষকগণের দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হবে।

কারণ, তাঁরা সাময়িক অর্থাৎ অন্তঃপরীক্ষায় নিজ নিজ ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, শিক্ষকগণ তাঁদের এই দায়িত্বের অবমাননা করবেন না। কোন ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণতঃ উক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস অর্জনে উৎসাহিত করে থাকে। উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রোধের রক্ষাকবচ হিসাবে আমরা শিক্ষকগণকে সাময়িক বা অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করার এবং শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করার সুপারিশ করছি। আমাদের মতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এ কাজ করবে। কারণ ক্লাসের ছাত্রগণ যে ছাত্রকে দুর্বল বলে জানে তাকে বেশী নম্বর দিয়ে কোন শিক্ষকই ক্লাসের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবেন না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি তাঁদের নিজেদের ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাঁদের মূল্যায়ন সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার মূল্যায়নের সংগে পুনঃপুনঃ সামঞ্জস্যহীন হয় তা হলে তাঁদের মূল্যায়নের উপর সংশ্লিষ্ট কারো আস্থা থাকতে পারে না। এমন কি তাতে সর্বসাধারণেরও আস্থা থাকবে না। ফলে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে। তাই নিজেদের সুনাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য হয়ে তাঁদের শিক্ষার্থীগণকে অন্তঃপরীক্ষায় উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষাঃ

২১.২৪. আমাদের বিবেচনায় দশম শ্রেণীর শেষে বর্তমানে প্রচলি (এস, এস, সি) পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে উচ্চ-মাধ্যমিক (এই সাপেক্ষে চালু থাকবে। এ সব পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের শতকরা দশ ভাগ সংরক্ষিত হবে। এ মৌখিক নিজ স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সমন্বিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এক এ সব পরীক্ষার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড অর্থাৎ পরিচালনা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষায় নম্বর প্রদর্শিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত অন্তঃপরী প্রাপ্ত নম্বরও এই সার্টিফিকেটে সন্নিবেশিত হবে। সাধারণ বা বহিঃপ অন্তঃপরীক্ষার নম্বরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাকে যথাসময়ে কারণ অনুসন্ধান করে দেখা হবে। শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা শিক্ষা পরীক্ষায় ভর্তির জন্য কাগজপত্রাদি পাঠাবার সময় সার্টিফিকেটের ফরমও প প্রতিষ্ঠানসমূহ সার্টিফিকেটের ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় শিক্ষার্থীদের অন্ত সন্নিবেশিত করবেন এবং পরীক্ষায় ভর্তির জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সংগে পাঠাবেন। শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাসমূহকে ভর্তির জন্য কাগজপত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে গ্রহণ করার সময় নিশ্চিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষার ফলের সার্টিফিকেট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের গেছে। শিক্ষাবোর্ড অথবা সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা উক্ত নির্দিষ্ট জায়গায় বহিঃপরীক্ষার ফল অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সন্নিবেশি মন্তব্যের ঘরে যে সকল পরীক্ষার্থী পাস্ করে যাবে তাদের ক্ষেত্রে "উত্তীর্ণ", করতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে "অনুত্তীর্ণ" লিখা থাকবে। শতকরা চল্লিশ নম্ পরীক্ষার্থী "অনুত্তীর্ণ" বলে পরিগণিত হবে।

উচ্চশিক্ষা স্তরে পরীক্ষাঃ

২১.২৫. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য শিক্ষাকর্ম ও গবেষণা কর্মকে বিপজ্জনকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ ছাড়া অনার্স ডিগ্রী এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রীর জন্য সামান্য গুরুত্ব ছাড়া

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অন্তঃপরীক্ষার কোন মূল্য নাই, একমাত্র সাধারণ পরীক্ষা নিয়েই শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত থাকে। সুতরাং শিক্ষকদের অধ্যাপনা ভাষণে যোগদানের জন্য অথবা ব্যক্তিগত-ভাবে বা টিউটোরিয়াল ক্লাসে শিক্ষকদের নির্দেশনা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের মনে কোন আগ্রহ তাগিদ থাকে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠে না। বিষয়ের উপর অধিকার অর্জন, তার মৌলিক নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ এবং প্রকৃত পরিস্থিতিতে সেই জ্ঞান প্রয়োগে শিক্ষালাভ কষ্টসাধ্য হলেও তৃপ্তিদায়ক হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের উপর জোর না দিয়ে বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলি তথ্য সাফল্যের সঙ্গে অধিগত করে রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

২১.২৬. কারো কারো মতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ পরীক্ষা পুরোপুরিভাবে রহিত করে তার স্থলে সম্পূর্ণভাবে অন্তঃপরীক্ষা প্রবর্তন করা হোক। এই অভিমতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে সর্বাধিক জানেন। অপর দিকে অনেকে বলেন যে অন্তঃপরীক্ষায় যে ফল লাভ করা যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়; কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সমতা আনার ব্যাপারে কোন হাত নাই। এমন কি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও পক্ষপাতিত্ব ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের বিপদ থাকতে পারে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

২১.২৭. কমিশন উপরোক্ত অভিমতগুলি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। সাধারণ পরীক্ষা প্রথায় একটি সুবিধা রয়েছে। এ পরিচিত ও গৃহীত প্রথা। সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করলে সাধারণ পরীক্ষা শিক্ষকের আনুকূল্য, অনুগ্রহ প্রদর্শন, অলসতা অথবা অযোগ্যতা রোধ করে থাকে। সাধারণ পরীক্ষার পরীক্ষকগণ যোগ্যতাসম্পন্ন হলে এই প্রথা শিক্ষককে সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বর্তমান প্রথা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করার জন্য সঠিক মনোভাব সৃষ্টির সহায়ক নয়।

২১.২৮. আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের বিপদ সম্পর্কে আমরা পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে যদি নিয়মিত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, উত্তর পত্রসমূহ ছাত্রদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়, তা হলে এ ধরণের বিপদ কমে যাবে। এই প্রথা শিক্ষকদের মধ্যে যে-কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শনের মনোভাবের বিরুদ্ধে রক্ষা-করচস্বরূপ হবে এবং তাঁদের বিচার বোধের উপর শিক্ষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত অন্য সকল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবের সম্ভাবনা হ্রাস করবে। এভাবে আমরা অবশ্যই আমাদের শিক্ষকদের উপর আস্থা স্থাপন করতে শুরু করব। তা না করলে শেষে তাঁদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নীতিবোধ সৃষ্টি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তাদের অনুমোদিত কলেজগুলি নিজেদের শিক্ষকদের মধ্যে সততার অভ্যাস বৃদ্ধি করতে সক্ষম না হলে তাদের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হবে বলে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং আমাদের সুপারিশ এই যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সাধারণ পরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে নিয়মিত অন্তঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত হবে।

পাস ডিগ্রী স্তরে পরীক্ষাঃ

২১.২৯. মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় পাস ডিগ্রী পর্যায়েও অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, অর্থাৎ সারা বছর কলেজসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়ন কলেজসমূহে করা অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। নিয়মিত টিউটোরিয়াল, বাড়ীর কাজ, শ্রেণীকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়া এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর চারটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত হবে। শিক্ষকবৃন্দকে এ ক্ষেত্রে অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করার সুপারিশও আমরা করছি। পাস ডিগ্রী কোর্স সমাপনের পরে অন্তঃপরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে যে সকল প্রার্থীর সাফল্যের কারণসংগত সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিবেচিত হবে, কলেজসমূহ সেই সকল প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীতব্য

সাধারণ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবে বলে আশা করা যায়। পাস ডিগ্রী পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে এবং সেজন্য প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের শতকরা দশ ভাগ সংরক্ষিত হবে। এ মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অন্য কলেজ হতে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের সমন্বিত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এক বছর আগে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সব পরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সাধারণ বহিঃপরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর প্রদর্শিত হবে। কলেজের অন্তঃপরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরও এই ডিপ্লোমাতে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিতে পরীক্ষায় ভর্তির জন্য কাগজপত্রাদি পাঠাবার সময় ডিপ্লোমার ফরমও পাঠাবেন। কলেজগুলি ডিপ্লোমার নির্দিষ্ট জায়গায় পরীক্ষার্থীদের অন্তঃপরীক্ষার ফল সন্নিবেশিত করবে এবং পরীক্ষায় ভর্তির জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরীক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য কাগজপত্র কলেজগুলি থেকে গ্রহণ করার সময় নিশ্চিত হতে হবে যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষার ফলের ডিপ্লোমা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া গেছে। সাধারণ পরীক্ষার নম্বর এবং অন্তঃ-পরীক্ষার নম্বরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাসময়ে কারণ অনুসন্ধান করে দেখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত ডিপ্লোমার নির্দিষ্ট জায়গায় বহিঃপরীক্ষার ফল অর্থাৎ পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে কত নম্বর পেল তাও লিপিবদ্ধ করবেন। মন্তব্যের স্থলে যে সকল পরীক্ষার্থী পাস করে যাবে তাদের ক্ষেত্রে "উত্তীর্ণ" এবং যারা পাস করতে পারবে না তাদের বেলায় "অনুত্তীর্ণ" লিখা থাকবে। যে পরীক্ষার্থী শতকরা ৬০ বা তার বেশী নম্বর পাবে তাকে ডিষ্টিংকশন দেবেন। শতকরা চল্লিশ নম্বরের কম পেলে পরীক্ষার্থী "অনুত্তীর্ণ" বলে পরিগণিত হবে। দেশের সর্বত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের মতেও উপরোক্ত ব্যবস্থা বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত পন্থা হবে।

অনার্স ডিগ্রী ও মাষ্টার ডিগ্রী স্তরে পরীক্ষাঃ

২১.৩০. অনার্স ডিগ্রী এবং মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃ-পরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে টিউটোরিয়াল ক্লাস, প্রয়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদান করা ছাড়াও তিনটি আনুষ্ঠানিক অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করে নম্বর প্রদান করবেন। আমাদের প্রস্তাব এই যে মানবিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর শিক্ষকের এই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত হবে। আর বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ১৫ নম্বর শিক্ষকের উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর প্রাকটিক্যাল কাজের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। অনার্স ডিগ্রী এবং মাষ্টার ডিগ্রীর প্রার্থীগণকে একটি মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং তার জন্য পূর্ণ নম্বরের শতকরা ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখতে হবে। চূড়ান্ত মান নিরূপণের ব্যাপারে মৌখিক পরীক্ষার ফল যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করবে। মানবিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে অবশিষ্ট শতকরা ৬৫ নম্বর এবং বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে বাকী শতকরা ৫০ নম্বরের উপর বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অনার্স ডিগ্রী এবং মাষ্টার ডিগ্রী প্রার্থীগণকে উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃ উভয় পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পরীক্ষায় প্রার্থীর স্থান ও বিভাগ তার আভ্যন্তরীণ, মৌখিক এবং বহিঃপরীক্ষার ফলের সমষ্টি নিয়ে নির্ণয় করতে হবে। অনার্স ডিগ্রী এবং মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য যে ডিপ্লোমা প্রদান করা হবে তাতে বহিঃপরীক্ষার ফল, মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং পৃথকভাবে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রদর্শন করতে হবে। উল্লিখিত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ বা তার বেশী, দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর শতকরা ৫০ থেকে ৫৯ এবং শতকরা ৪০ থেকে ৪৯ নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের শুধুমাত্র 'পাস' বলে পরিগণিত হবে। শতকরা ৪০ এর নীচে যারা নম্বর পাবে তারা অনুত্তীর্ণ পরিগণিত হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নঃ

২১.৩১. এখানে পরীক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবনের সমস্যা রয়েছে। পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক, নোট এবং ভাষণ উপাদান মুখস্থ করাই প্রয়োজন নয়। উপরন্তু পরীক্ষা প্রকৃত শিক্ষাদান ও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। একজন শিক্ষার্থী তার পাঠিত বিষয়ে অধিকার লাভ করেছে কিনা এবং সাফল্যজনকভাবে লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে সমর্থ কিনা, পরীক্ষার মাধ্যমে তাই নির্ণয় করতে হবে। এর জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় পক্ষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা প্রয়োজন। নতুন ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার্থীদের উপযোগী প্রামাণ্য পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের অন্যতম কর্তব্য হবে। এই ব্যাপারে শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহকে ছাত্র নির্বাচনে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ছাত্রপরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষা সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে উপদেশ দানের জন্য প্রতি শিক্ষাবোর্ড এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা আবশ্যক হবে। তদুপরি আন্তঃশিক্ষাবোর্ড এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা সংস্কার কাউন্সিল গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও আমরা মনে করি।

উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তির পরীক্ষাঃ

২১.৩২. উচ্চশিক্ষার ভর্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ভর্তি-পরীক্ষা গ্রহণ করবে। ভর্তির ব্যাপারে পূর্ববর্তী সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ভর্তি-পরীক্ষার ফল বিবেচনা করতে হবে। ভর্তি-পরীক্ষা শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, বুদ্ধি, বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিকের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন ও পরিচালনা করতে হবে।

চাকরির জন্য পরীক্ষাঃ

২১.৩৩. চাকরি, বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্তির জন্য কর্ম সংস্থাসমূহ সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাতে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করবেন এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই কর্মপ্রবণতার উপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিযোগিতামূলক পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

উপসংহারঃ

২১.৩৪. ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কতদূরে পরিপূরিত হয় এবং শিক্ষকগণের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করা হয়েছে, তার মর্যাদা তাঁরা কতটুকু রক্ষা করলেন তা লক্ষ্য করার জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতির ফলাফলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে গুরুত্ব দানের ভারসাম্য রক্ষিত হয় তজ্জন্য গোটা পদ্ধতিটিকে অব্যাহত পর্যবেক্ষণাধীন রাখতে হবে। উপরে প্রস্তাবিত সকল শিক্ষাবোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কমিটিসমূহ উপরোক্ত দায়িত্ব বহন করবেন।

২১.৩৫. এ ছাড়া শিক্ষাদান ও পরীক্ষাসমূহের মধ্যে আরও একটি অধিকতর বাস্তব সম্পর্ক অবশ্যই স্থাপন করতে হবে। পরীক্ষাসমূহ শিক্ষাদান থেকে উদ্ভূত এবং তার একটি স্বাভাবিক চূড়ান্ত অবস্থা মাত্র। পরীক্ষার্থীদের যে পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা হয় তা যথাযথ-ভাবে বিবেচনা করা হল কিনা, শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি, বোধগম্যের ক্ষমতা এবং তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার পেছনে কি কি কারণ রয়েছে, সে সকল বিষয়ে কতদূর পরীক্ষা করা হয় তা যাচাই করে দেখার জন্য অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের সুষ্ঠু আলোচনা করা উচিত। আমাদের মতে সকল শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ পরীক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

সারাংশ

১। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতির মান বা মূল্য নিরূপণ যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে ঐসমস্ত স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পাঠব্যবস্থা এবং তার ফলাফল কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে উন্নতমানের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তা বহুলাংশে নিরূপণ করা সম্ভব। (২১.১.)

২। পরীক্ষার উদ্দেশ্য বহুবিধ। উদ্দেশ্যের তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন প্রণালী এবং পরিচালন ব্যবস্থার তারতম্য হয়। সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থাকে আগে থেকেই কোন উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারপর পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার গঠন এবং পরীক্ষার পরিচালন ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে উক্ত পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা আদর্শস্থানীয় হয়। পরীক্ষার সফল প্রয়োগের জন্য কি প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন, কত সময় ও অর্থ ব্যয় হবে, কি কি বিধি নিষেধ থাকতে হবে কোন অবস্থায় তা গ্রহণ করতে দেওয়া হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনা করে পরীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। (২১.২.—২১.৩.)

৩। অবস্থা ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের গঠন বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। আবার পরিবেশের তারতম্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি পদ্ধতির ব্যবহারেও বিভিন্নতা প্রদান করা যেতে পারে। পরীক্ষা পরিচালন সংস্থা সঠিক গবেষণার মাধ্যমে স্থির করতে পারেন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করলে পরীক্ষাটি বেশী উদ্দেশ্যনিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য হবে। (২১.৪.)

৪। আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষাসমূহ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যুক্তিসংগত হবে। যাঁরা এ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাঁরা সম্ভবতঃ পরীক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাপনকে পৃথকভাবে বিবেচনা করছেন না। একটির জন্য অন্যটিকে কিংবা দুইয়ের যৌথ ত্রুটির জন্য যে-কোন একটিকে তাঁরা দায়ী করছেন। সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যদি সামাজিক ন্যায় নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থার বিধান থাকতেই হবে। (২১.৫.)

৫। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে এতে বহিঃপরীক্ষার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তঃপরীক্ষারও প্রচলন আছে তবুও এ জাতীয় পরীক্ষার ফলের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিচ্ছে এবং নানাবিধ অন্যায় আচরণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পরীক্ষা সমূহে শিক্ষার্থীদের ফেলের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি শিক্ষাদান পদ্ধতির অবনতিই প্রমাণ করে। সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে দুর্নীতি প্রবেশ করে যে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার অবসান ঘটিয়ে পরীক্ষাকে পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য পরিমাপক করে তুলতে হলে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার আবশ্যক। (২১.৬.—২১.৮.)

৬। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও মূল্যায়নে অন্তঃপরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মন থেকে বহিঃপরীক্ষার ভীতি দূরীভূত করে তাদের মধ্যে সারা বছর ধরে রীতিমত পড়াশুনা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে ঘন ঘন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার সঠিক প্রয়োগকল্পে কয়েকটি বিষয়ে অবশ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের গভীর ও নির্ভুল ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। অন্তঃ-

পরীক্ষার ফল যাতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত শিক্ষা বা জীবনের কর্মধারা নির্বাচনে ব্যবহৃত হয় সেজন্য শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কিংবা শিক্ষার্থীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় রিপোর্টে এ ফলের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। (২১.৯.—২১.১১.)

৭। আনুষ্ঠানিক বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষক স্বীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে সঠিক যাচাই করতে পারলেও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ শিক্ষার্থীর সংগে তুলনার জন্য যদি এই পরীক্ষার ফল ব্যবহৃত হয় তা হলে তাঁর যাচাই তুলনামূলকভাবে সঠিক নাও হতে পারে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা যতই বেশী হবে ততই যাচাইয়ের মানে বিভিন্নতা দেখা দিবে। তা ছাড়া একই স্তরে বা কোর্সে শিক্ষারত দেশের বা কোন অঞ্চলের একই ধরণের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান বা জ্ঞানের মাত্রা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই দেশ-ব্যাপী বা অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাসমূহ নেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষায়তন বহির্ভূত সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়। (২১.১২.)

৮। উপরি উক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বহিঃকেন্দ্রিক পরীক্ষা পদ্ধতির স্থলে অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বিত পদ্ধতি চালু করতে হবে। (২১.১৩.-২১.১৫.)

৯। পরীক্ষা গঠনেও প্রয়োজন অনুযায়ী বৈচিত্র্যদান করা উচিত। রচনামূলক ও লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক, ব্যবহারিক, অবজেকটিভ ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (২১.১৬.)

১০। প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বিদ্যালয়ে তার বছরব্যাপী লেখাপড়া, শ্রেণীকক্ষে কর্মদক্ষতা এবং আচার আচরণের উপর নির্ভর করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ক্লাশ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বছরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা ছাড়াও প্রতি বছরে অন্ততঃ তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। মূল্যায়নের বিভিন্ন ফল সঞ্চয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী শেষে বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন জেলাভিত্তিক হতে হবে। তবে পরীক্ষা হবে স্কুলভিত্তিক।

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে বর্তমান বৃত্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে। প্রত্যেক স্কুল থেকে অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ শিক্ষার্থী যাতে এ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। (২১.১৯.)

১১। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরেও প্রাথমিক স্তরের ন্যায় অন্তঃপরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বাড়ীর কাজ, টিউটোরিয়াল, শ্রেণীকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়াও এ স্তরে প্রতি বছর অন্ততঃ চারটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং প্রোগ্রেস রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দশম শ্রেণীর শেষে বর্তমানে প্রচলিত এস, এস, সি পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে এইচ, এস, সি, পরীক্ষা সংস্কার সাপেক্ষে চালু থাকবে। এ সকল পরীক্ষাতে প্রত্যেক বিষয়ের ১০% নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সার্টিফিকেটে প্রত্যেক বিষয়ের অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার নম্বর প্রদর্শিত হবে। সার্টিফিকেটের মন্তব্যের ঘরে "উত্তীর্ণ"/"অনুত্তীর্ণ" চিহ্নিত হবে। ৪০%-এর কম নম্বর পেলে "অনুত্তীর্ণ" বলে বিবেচিত হবে। বৃত্তি দেওয়া হবে বহিঃপরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে। (২১.২০.—২১.২৪.)

১২। মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় প্রথম ডিগ্রী পর্যায়ের পাস কোর্সেও অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়মিত বাড়ীর কাজ, টিউটোরিয়াল, শ্রেণীকক্ষে সাময়িক পরীক্ষা, প্রাকটিক্যাল ও প্রয়োগমূলক ইত্যাদি কাজ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর চারটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অন্তঃপরীক্ষার ফল প্রোগ্রেস রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পাস ডিগ্রী পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং এজন্য প্রতি বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের শতকরা দশভাগ সংরক্ষিত হবে। ডিপ্লোমাতে প্রত্যেক বিষয়ের অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার নম্বর প্রদর্শিত হবে। সার্টিফিকেটের মন্তব্যের ঘরে "উত্তীর্ণ"/"অনুত্তীর্ণ" চিহ্নিত হবে। ৬০% নম্বর পেলে ডিষ্টিংশান দেওয়া হবে। ৪০%-এর কম নম্বর পেলে "অনুত্তীর্ণ" বিবেচিত হবে। (২১.২৫.—২১.২৯.)

১৩। অনার্স ডিগ্রী এবং মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষকগণ টিউটোরিয়াল ক্লাস, প্রয়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদান করা ছাড়াও প্রতি বছরে তিনটি আনুষ্ঠানিক অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করে নম্বর প্রদান করবেন। মানবিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়-সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর শিক্ষকের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত হবে। আর বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে শতকরা ১৫ নম্বর শিক্ষকের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং প্রত্যেক পেপারে শতকরা ২৫ নম্বর প্রাকটিক্যাল কাজের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। অনার্স ডিগ্রী ও মাষ্টার ডিগ্রীর প্রার্থীগণকে একটি মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং তার জন্য পূর্ণ নম্বরের শতকরা ১০ নম্বর বরাদ্দ রাখতে হবে। মানবিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে অবশিষ্ট শতকরা ৬৫ নম্বর এবং বিজ্ঞান বিষয়সমূহের প্রত্যেক পেপারে বাকী শতকরা ৫০ নম্বরের উপর বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীগণকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ উভয় পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পরীক্ষায় প্রার্থীর স্থান ও বিভাগ তার আভ্যন্তরীণ, মৌখিক এবং বহিঃপরীক্ষার ফলের সমষ্টি নিয়ে নির্ণয় করতে হবে। ডিপ্লোমাতে বহিঃপরীক্ষার নম্বর, মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং পৃথকভাবে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রদর্শন করতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ বা তার বেশী, দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর হবে শতকরা ৬০ থেকে কম অথচ শতকরা ৫০ নম্বর বা তার অধিক। শতকরা ৫০ নম্বরের কম অথচ শতকরা ৪০ নম্বর বা তার অধিক নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের শুধু মাত্র "পাস" বলে পরিগণিত হবে। শতকরা ৪০-এর নীচে যারা নম্বর পাবে তারা "অনুত্তীর্ণ" বলে পরিগণিত হবে। (২১.৩০.)

১৪। পরীক্ষা সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য প্রতি শিক্ষা-বোর্ড এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা আবশ্যক। তদুপরি আন্তঃশিক্ষাবোর্ড এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা সংস্কার কাউন্সিল গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে। (২১.৩১.)

১৫। উচ্চশিক্ষার ভর্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ভর্তি-পরীক্ষা গ্রহণ করবে। ভর্তির ব্যাপারে পূর্ববর্তী সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ভর্তি-পরীক্ষার ফল বিবেচনা করতে হবে। ভর্তি-পরীক্ষা শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, বুদ্ধি, বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন ও পরিচালনা করতে হবে। (২১.৩২.)

১৬। চাকরি, বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্তির জন্য কর্মসংস্থানসমূহ সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাতে প্রদর্শিত পরীক্ষার ফল বিবেচনা করবেন এবং সেই সংগে অবশ্যই কর্ম প্রবণতার উপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিযোগিতামূলক পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। (২১.৩৩.)

অধ্যায় ২২

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা

শিক্ষকদের দায়িত্বঃ

২২.১. শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকই হচ্ছেন যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র এবং শিক্ষার মান চূড়ান্তভাবে শিক্ষকের মান ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা একটি প্রত্যক্ষ জাতিগঠনমূলক কার্যক্রম। তাই সর্বত্র শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আমরা জোর দিয়ে বলেছি। এখানে আমরা এ কথাই আরো জোরালো ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা আবশ্যক মনে করি যে শিক্ষার সকল স্তরে নরনারী নির্বিশেষে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বাছাই করে নিতে না পারলে এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষকেরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবীদার সমাজ তাঁদের সে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করলে আমাদের সুপারিশকৃত কোন শিক্ষা সংস্কারই সফল হবে না।

২২.২. শিক্ষার মান শিক্ষকদের মানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের শিক্ষকদের নিকট হতে শিক্ষার যে মান আমরা আশা করি তা হতে তাঁরা যত নিম্নে থাকবেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁছাতে ততদূর পশ্চাতে পড়ে থাকবে।এক্ষেত্রে মান বলতে আমরা শুধু উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া আরও অনেক কিছু বুঝি। আমাদের শিক্ষকদের নিজ পেশা ও জাতির প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা, গঠনমূলক কাজে সহায়তার ইচ্ছা, বিদেশাগত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বীয় পারিপার্শ্বিকতায় সহজলভ্য বস্তুনিচয় ও তাদের সাহায্যে শিক্ষাদানের সংকল্প এবং পেশাগত উচ্চ নীতিজ্ঞান ও সম্মানবোধ ইত্যাদির অধিকারী হওয়া উচিত। যদি আমরা শিক্ষকদের গুরুত্ব স্বীকার করি, যেমন সাধারণতঃ আমরা করে থাকি, তবে শিক্ষকদের পক্ষেও তেমনি উপরোক্ত গুণাবলীর গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

২২.৩. শিক্ষকদের নিকট জাতি ন্যায়সংগতভাবে অনেক কিছু আশা করে। এ প্রত্যাশাসমূহ কতটুকু পূর্ণ হচ্ছে এবং অপূর্ণ প্রত্যাশাসমূহ অর্জন করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা বিবেচনার যোগ্য।

২২.৪. শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন করা এবং অনুসন্ধান ও সমালোচনার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা শিক্ষকদের প্রাথমিক কাজ। স্বীয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষক এসব করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কিভাবে সময় অতিবাহিত করবে তা শিক্ষকদের নিজেদের সময় যাপনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের দায়িত্বঃ

২২.৫. শিক্ষকেরা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নির্দিষ্ট সময় নিয়োগ করবেন। অন্যান্য দেশে এ সকল স্তরে একজন শিক্ষকের উপর গড়ে যে পরিমাণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, তা আমাদের দেশেও একজন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। শিক্ষকদের উপর যে কাজ ন্যস্ত হবে, শিক্ষাদান, অনুশীলনী তৈরী, শিক্ষার্থীদের পরিচালনা এবং পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কাজ তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণী এবং ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষকের স্কুলে সাপ্তাহিক কার্য সময়ের মেয়াদ যথাক্রমে ৪০ ঘণ্টা ও ৪৫ ঘণ্টা নির্ধারিত হওয়া উচিত। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের শিক্ষাকার্যে ১৮ ঘণ্টা, অনুশীলনী তৈরীর জন্য ১০ ঘণ্টা

শিক্ষার্থীদের পরিচালন করা ও সংশোধনী বাবত ৭ ঘন্টা এবং পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য ৫ ঘণ্টা নিয়োগ করতে হবে। ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কার্য সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান কার্যে ২১ ঘন্টা, অনুশীলনী তৈরীর জন্য ১০ ঘন্টা, ছাত্রদের পরিচালন করা ও সংশোধনী বাবত ৮ ঘন্টা এবং পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য ৬ ঘন্টা শিক্ষকেরা নিয়োগ করবেন। স্কুল জীবনে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিচয় শিক্ষকগণ লিপিবদ্ধ করবেন। বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষায়, শ্রেণীর কাজে, টিউটোরিয়ালে, খেলাধুলায় ইত্যাদি ও স্কুল জীবনের নানান পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষকগণ যথাযথভাবে সঞ্চয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন।

২২.৬. শিক্ষকগণ আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কসপ, লাইব্রেরী, বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদির যাতে যথাসময়ে ব্যবস্থা হয় তার জন্য শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে। স্কুলের শিক্ষা সমস্যাসমূহের সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষার ক্রমাগত উন্নতির জন্য শিক্ষকদের কাজ করে যেতে হবে। কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রেও, যেমন, বাগানের কাজ, হাতের কাজ, স্কুলের পরিচ্ছন্নতা ও মেরামত ইত্যাদি ব্যাপারে, শিক্ষার্থীদের সম্মুখে শিক্ষকগণকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সরঞ্জাম হিসাবে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

২২.৭. স্কুলের ছেলেমেয়েদের জীবনে বয়োবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যা আছে এবং সেসব অসুবিধা উপলব্ধি ও অপসারণে সাহায্য করা শিক্ষকদের কর্তব্য। বয়ঃসন্ধির পূর্ব ও পরবর্তী স্তরে পরিচালন কার্য অবশ্যই দ্বিবিধ হবেঃ শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিগত, ভাবাবেগজনিত ও সামাজিক প্রয়োজনাদি উপলব্ধি করতে হবে এবং সহানুভূতি ও হৃদ্যতার মাধ্যমে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করতে হবে। শৈশব জীবনের এ স্তরে বছর হতে বছরান্তরে ছেলেমেয়েদের সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটে। জীবনে নিত্যনতুন আবেগের উন্মেষ হতে থাকে এবং প্রায়শঃ পরিবার ও প্রতিবেশ এমন কি স্কুল ও ছেলেমেয়েদের মনে এমন ধারা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত শিথিলতর পর্যায়ে স্কুল হতে এ আশা করা হয় যে স্কুল জীবনের শৃংখলা ও নির্দেশাবলীর সংগে শিক্ষার্থী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিবে কিন্তু যদি তার ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছন্দ বিকাশই কাম্য হয় তবে এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের দায়িত্ব অবশ্য উভয়ের উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এভাবে সামঞ্জস্য বিধান ও পরিচালনার সুসমন্বয় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষাগত সাফল্য গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং এভাবে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে তাল মিলিয়ে এমন একজন স্থিতিশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠবে যে সমাজে সে সত্যিকার প্রয়োজনীয় কিছু দান করতে সমর্থ।

২২.৮. শিশুর সামাজিক সম্পর্ক ও মনোভংগীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশেষ অনুরাগ বিরাগ উপলব্ধ হলে যে-সব কাজ সে দক্ষতা ও যোগ্যতার সংগে সম্পন্ন করতে সক্ষম শুধু এমন ধারা কাজের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ এবং তার উপযোগী শিক্ষা কোর্স নির্বাচনে তাকে সাহায্য করা শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ অবগতির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী স্তরে বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারেও পরামর্শ দেবেন। প্রস্তাবিত বিভিন্নমুখী শিক্ষা কোর্স, শিক্ষার্থীর জীবনে অভীষ্ট সিদ্ধিরও প্রয়োজন মিটাবার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষকের পক্ষে ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে শিক্ষার্থীকে পরামর্শদানের অধিকতর সুবিধা হবে। বৃত্তিমূলক ব্যাপারে পরামর্শদান যাতে যুক্তিসংগত হয় সেজন্য প্রত্যেক মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর একজনকে বৃত্তি নির্বাচনে পরামর্শদানকারীরূপে কাজ করতে হবে।

২২.৯. শিক্ষকদের আচরণ যাতে নিজেদের উপদেশাবলীর সংগে সংগতি রেখে চলে সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে সতর্ক থাকতে হবে। উপদেশ ও আচরণের অসংগতি তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশঃ শিথিল করে তোলে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্বঃ

২২.১০. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল বক্তৃতা প্রদান করাই শিক্ষকদের কাজ বলে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে এবং কার্যতঃ অধিকাংশ শিক্ষক তাই করে থাকেন। এই ধারণা পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বক্তৃতা প্রদান শিক্ষকদের কর্তব্য কর্মসমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশ। অন্যান্য কর্তব্যসমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে।

২২.১১. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের সময়ের একটি বৃহৎ অংশ শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ ও টিউটোরিয়াল কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং এই কাজের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যসমূহ পুরাপুরি প্রণিধান করা হয় না। কার্যতঃ টিউটোরিয়াল প্রথা শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষার্থীদের জানবার একটি সুযোগ, এ হল শিক্ষার্থীদের সুপ্তশক্তিসমূহ আবিষ্কার করার, আলোচনার সাহায্যে সেই শক্তি উজ্জীবিত করার, শিক্ষার্থীরা যা অধ্যয়ন করেছে তা পরীক্ষা করার এবং তাদের অধ্যয়নের ব্যাপারে প্রত্যেককে পৃথকভাবে উপদেশ প্রদান করার অতিরিক্ত উপায়। টিউটোরিয়ালের সাহায্যে একজন শিক্ষার্থী যাতে মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তার মনকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও আকর্ষণ নিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত। টিউটোরিয়ালের ফলে শিক্ষার্থী চিন্তা করতে উৎসাহ পাবে এবং নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলতে ও তা ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হবে। টিউটোরিয়ালের সাধারণ প্রণালী হল শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে মূল রচনাসমূহ পাঠ করে এবং শিক্ষকদের পরিচালনায় দলগতভাবে এগুলি আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় এবং এর মূল্য নির্ণয় করা হয়। টিউটোরিয়ালের আর একটি সুবিধা এই যে এ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণকে সাহায্য করে থাকে। টিউটোরিয়ালের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধানী স্পৃহা স্ফুরণ করার উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং এই অনুসন্ধান স্পৃহাই হল উচ্চশিক্ষার সার অংশ। কাজেই বক্তৃতা প্রদানের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও আমাদের বক্তব্য হল যে শিক্ষাদানি পরিকল্পনাসমূহ রচনাকালে টিউটোরিয়ালের উপর জোর দেওয়া হোক এবং আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত সাপ্তাহিক টিউটোরিয়াল ক্লাসের একটি সার্বজনীন ব্যবস্থা করা হোক।

২২.১২. শিক্ষকদের অধ্যাপনা যাতে নৈর্ব্যক্তিক ও গতানুগতিক রুটিনে পর্যবসিত না হয়, তাঁরা অধ্যাপনায় যাতে তাঁদের সময় ও যোগ্যতা পূর্ণরূপে নিয়োগ করেন এবং তাঁদের অধ্যাপনা যাতে আনন্দদায়ক ও লাভজনক অনুসন্ধান কার্য হয়, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষকদের জন্য অবশ্যই কার্য-তালিকা সম্বলিত সুস্পষ্ট তপশীল থাকতে হবে। একজন শিক্ষক এক শিক্ষা বছরে বিভিন্ন কর্তব্যে কতখানি সময় ব্যয় করবেন, তপশীলে সে সম্পর্কে অবশ্যই বিধান থাকবে। এই কার্যসূচী বস্তুতঃ পালন করা হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষকদের পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হচ্ছে কিনা, তা তদারক করার দায়িত্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত হবে।

২২.১৩. আমাদের বিশ্বাস যে অল্পসংখ্যক আত্মোৎসর্গীকৃত শিক্ষক ছাড়া অন্য সকল শিক্ষকই তাঁদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অথবা তাঁদের বিষয়ের সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য অতি অল্প সময় ব্যয় করে থাকেন। প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর ব্যক্তিগত বা শিক্ষায়তনের পাঠাগারে পড়াশুনা করে দৈনিক তিন চার ঘণ্টা ব্যয় করা উচিত বলে আমরা মনে করি। শিক্ষকগণ যত দীর্ঘ সময় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে থাকবেন ততই মঙ্গল। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘতর সময়ের জন্য শিক্ষকদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবে এবং শিক্ষকগণ অভিনিবেশসহকারে গুরুত্বপূর্ণ কার্য করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সেখানে স্বল্প খরচে প্রস্তুত খাদ্য সস্তায় লাভ করতে এবং বারম্বার গৃহে যাতায়াত না করে সারাদিন কাজ করতে পারবেন।

২২.১৪. আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা কার্যকলাপের অভাব অত্যন্ত প্রকট। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা সমস্যা কিছুটা ভিন্ন ধরণের। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকের তৎপরতা ও শিক্ষাদানের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যই গবেষণার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবশ্য গবেষণার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, কেননা সেখানে গবেষণা ব্যতীত জ্ঞানের সত্যিকার প্রসার সম্ভব নয়।

২২.১৫. কমিশন শিক্ষকদের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কমিশন অবশ্যই এ বিষয়েও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দায়িত্ব পালনে আদর্শের প্রতি জোর দিলেই সর্বোত্তমভাবে শিক্ষাগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে। এই আদর্শ দুইটি একটি অন্যটির পরিপূরক। শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকদের অবশ্যই প্রেরণা দান করতে হবে। নতুন ভাবাদর্শ প্রায়ই জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ উভয়ের নিকট অপ্রিয় হয়ে থাকে। শিক্ষাগত স্বাধীনতা শিক্ষকদের ঊর্ধ্বতনদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সমাজের খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচরূপে কাজ করে। নিজেদের এলাকায় নিজেদের অনুভূতি অনুসারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার শিক্ষকদের যেমন রয়েছে, তেমনি নতুন সত্য ও অনুভূতি অন্বেষণ করার অধিকারও তাঁদের রয়েছে।

২২.১৬. অবশ্য শিক্ষাগত স্বাধীনতার অর্থ কখনই এ নয় যে শিক্ষকেরা তাঁদের খুশিমত সব কিছুই করতে পারবেন। শিক্ষকেরা কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্ম হতে অব্যাহতি পেতে পারেন। এ তাঁদের নিজেদের যে সামাজিক ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা অবমাননা করার অধিকার দান করে না। এসব কার্যাবলী কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাগত তৎপরতা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে এগুলি শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নেতিবাচকতার নামান্তর।

২২.১৭. সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট হতে অনেক কিছুই আশা করছি। তাঁদের নিকট হতে উঁচুমানের পেশাগত যোগ্যতা এবং বর্তমান অপেক্ষা কঠোরতর পরিশ্রম আশা করছি। অতএব তাঁদের এমন বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যাতে তাঁরা ন্যায়সংগতভাবে সন্তুষ্ট থাকবেন। এছাড়া তাঁরা যাতে সৃজনশীল শিক্ষকতা জীবনের পরিবেশে বাস করতে পারেন তাঁদের সেরূপ সুবিধাদিও দিতে হবে। এসব সুবিধাদি বলতে প্রয়োজনীয় আবাসিক ব্যবস্থা, যথোপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা, পেনসন অথবা অবদানমূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষকদের অগ্রবর্তী অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যের জন্য ছুটি মঞ্জুর করা উচিত। এ ধরণের ছুটির পূর্ণতম সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের কার্যকলাপ ও প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান থাকলে তবেই তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। ন্যায়সংগতভাবে বেশ কিছুকাল অন্তর অন্তর এরূপ ছুটি মঞ্জুর করলে তাতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের উপকার সাধিত হতে পারে।

শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন:

২২.১৮. শিক্ষাদান একটি সৃজনশীল কর্ম এবং এই শিক্ষাদানের মানের উপরই নির্ভর করে আগামী দিনের শিক্ষিত জনসম্পদের গুণাগুণ। এজন্য সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী এবং সৃজনশীল ব্যক্তিগণকে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে শিক্ষকতা পেশা, বিশেষ করে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতা, এই আকর্ষণ ক্ষমতা নিদারুণভাবে হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষার সকল স্তরে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজন। জাতীয় জীবনে শিক্ষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবীদার। আমাদের সমাজকে তাঁদের সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। শিক্ষকতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হবে না।

২২.১৯. শিক্ষাক্ষেত্রে কি অভাব-অনটন ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকের কাজ করতে হয় তা আমরা জানি। স্কুলে স্থানাভাব, ক্লাসে সংখ্যাতিরিক্ত ছাত্রের ভিড়, স্বল্প বেতন এবং সমাজে নিম্নমর্যাদা ইত্যাদি সকলই বিদ্যমান। এসব ও অপরাপর অসুবিধা দূর হওয়া

বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলি কার্যকর করতে একদিকে যেমন শিক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন শিক্ষকের যথোচিত যোগ্যতা ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা।

২২.২০. একজন সার্থক শিক্ষক বহুগুণের অধিকারী। যে বিষয়ে তিনি শিক্ষাদান করেন সে বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর থাকতে হবে। পাঠ্যবিষয়সমূহ কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় সে সম্পর্কে তাঁকে বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হতে হবে। তাঁর তত্ত্বাবধানে পাঠরত ছেলেমেয়েদের মনোভাব উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে এবং স্বীয় বৃত্তিগত মর্যাদা সম্পর্কে তাঁকে গভীর প্রত্যয়সম্পন্ন হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ যাতে চাকুরির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং মর্যাদার অনুপাতে বেতনের হার লাভ করেন তাও দেখতে হবে। তা ছাড়া তাঁদের কাজ করবার জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যাতে সমাজে তাঁদের অবদানের উপযুক্ত মর্যাদা তারা লাভ করতে পারেন।

২২.২১. স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করা উচিত, কিন্তু বর্তমান অবস্থা তদনুরূপ নয়। আমাদের শিক্ষকদের, বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবস্থার দিকে তাকালে একথা অনুধাবন করা যায়। শিক্ষকেরা এমন হারে বেতন পান না যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং তাঁদের কৃতিত্বের মর্যাদাও দেওয়া হয় না। সামান্য ও অনিয়মিত বেতনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকতার দিকে আকৃষ্ট হন না, হলেও তাঁদের অনেকে কিছুদিনের দুঃখময় অভিজ্ঞতার পরে অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে প্রতি বছর শতকরা দশজনেরও বেশী শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে শিক্ষকদের চাকুরী ত্যাগের এমন ব্যাপক হিড়িক দেখা যায় না। প্রায়শঃ শিক্ষকদের এমন পরিবেশে কাজ করতে হয় যা দুঃসাহসী ব্যক্তিকেও ভগ্নোৎসাহ করে ফেলতে পারে এবং এই পেশা শিক্ষককে ফলপ্রসূ পারিতোষিকের আশ্বাস দেয় না। শিক্ষকদের বেতনের হার নগণ্য বলে জীবনধারণের প্রয়োজন মিটাবার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁদের অনেককে প্রাইভেট টিউশানী করতে হয়। এর ফলে একটা দুষ্টচক্র গড়ে ওঠে এবং নিম্ন বেতন মানুষকে স্বল্প কাজ, এমনকি অসদুপায় এবং পরিণামে জনগণের অশ্রদ্ধা প্রভৃতির দিকে পরিচালিত করে। এমতাবস্থায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এই পেশার প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ বোধ করেন না। বলাই বাহুল্য, এ অবস্থায় শিক্ষকদের কাছে উন্নতমানের শিক্ষাদান প্রত্যাশা করা কঠিন। ফলে শিক্ষার মান অবনমিত হয় এবং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা জনচক্ষে হেয় হয়ে পড়ে।

২২.২২. রাতারাতি এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নয়। শিক্ষকদের পূর্ণ সামাজিক মূল্যের সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করতে হলে সমাজের শিক্ষিত অংশের সহযোগিতায় শিক্ষা বিভাগ এবং স্বয়ং শিক্ষক সমাজের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ এমন এক ব্যাপার যা সরকারের ব্যবস্থাপনার সাহায্যে স্বয়ং শিক্ষকদেরই অবশ্য অর্জন করতে হবে। কি সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে শিক্ষকদের দেখা হবে তা নির্ভর করবে মূলতঃ ছাত্রদের মধ্যে নিজেদেরকে শ্রদ্ধার্হ করার এবং সেবা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজের শ্রদ্ধা অর্জনে তাঁদের ক্ষমতার উপর।

২২.২৩. শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে সরকারের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। শিক্ষকের যাতে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আত্মসম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে চলতে পারেন তজ্জন্য তাঁদের অবশ্যই বেতন দিতে হবে এবং তা জীবনযাত্রার ব্যয়ের উঠানামার সঙ্গে সংগতিশীল হতে হবে। শিক্ষকতার বৃত্তিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অবশ্যই যে-কোন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পেশার অনুরূপ আকর্ষণীয় করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের ব্যাপারটি হল সকলের মূল। শিক্ষকদের বেতনের হার এমনভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত

যাতে তাঁদের কার্যকারিতা খর্ব করতে পারে এমন কোন কাজ গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য না হন। এজন্য বিশেষতঃ মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরের শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে। থানা, মহকুমা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক কর্মীর বেতন ও পদমর্যাদাও বাড়ানো প্রয়োজন।

২২.২৪. বর্তমানে অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত কম। শিক্ষার জাতীয় মান বজায় রাখতে হলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে। তাঁদের চাকরির শর্ত মোটামুটিভাবে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ন্যায় একইরূপ হওয়া উচিত। বেতন সম্পর্কে যথ যথ ব্যবস্থা ছ ড়াও বেসরক রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রবর্তন করা উচিত। চাকরির মেয়াদকালে শিক্ষকেরা ও তাঁদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই এতে চাঁদা দিবেন এবং এর ফলে রোগ, শোক ও অবসরকালীন অর্থ চিন্তা হতে শিক্ষকগণ রেহাই পাবেন।

২২.২৫. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় আট হাজার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে কার্যরত আশি হাজার স্কুল শিক্ষক ও দশ হাজার কলেজ শিক্ষক সরকারী স্কুল ও কলেজে নিযুক্ত শিক্ষকদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত। প্রায় ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মকালীন সবেতন ছুটি ভোগের ব্যবস্থা নাই, যুক্তিসংগত ভাড়ায় প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই; সরকারী সাহায্যে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের সুযোগও নাই। অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা নাই। সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও এ মুহূর্তে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের আশু সুযোগ-সুবিধা দান করা সম্ভব নয়, এ সময়সাপেক্ষ। এ পরিস্থিতিতে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের অবসরকালীন আর্থিক সাহায্য, অকাল মৃত্যু, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাজনিত পারিবারিক অর্থ চিন্তা লাঘবকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় কার্যকর ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করছি। এজন্য আমরা সুপারিশ করি যে জরুরী ভিত্তিতে এক কোটি টাকার একটি জাতীয় তহবিল গঠন করা হোক। এ তহবিলে প্রাথমিক অবস্থায় এককালীন সরকার পঞ্চাশ লাখ টাকার অনুদান দেবেন। বাকী পঞ্চাশ লাখ টাকা দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড এককালীন চাঁদা হিসাবে দিবেন। এক কোটি টাকার একটি জাতীয় তহবিল এভাবে গঠিত হবার পর মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারী একটি নির্দিষ্ট হারে এই তহবিলে বার্ষিক চাঁদা দিবেন। প্রত্যেকের বার্ষিক চাঁদার হার কমপক্ষে ছয় টাকা হবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহ এবং টেক্সটবুক বোর্ডও এই তহবিলে বার্ষিক চাঁদা দেবেন। কোন বোর্ডের থেকে এ চাঁদা পঞ্চাশ হাজার টাকার কম হবে না। তদুপরি সরকার এই তহবিলে বার্ষিক আবর্তক অনুদান দেবেন—এই অনুদান পাঁচ লাখ টাকার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জাতীয় তহবিলের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি অছি পরিষদ গঠন করতে হবে। এই তহবিল থেকে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের সময় এককালীন আর্থিক সাহায্য, তাঁদের দুর্ঘটনা ও দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য যুক্তিসংগত পরিমাণ চিকিৎসা খরচ ও অকাল মৃত্যুতে শিক্ষকদের পরিবারদের এককালীন আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি দেওয়া হবে।

২২.২৬. শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত এবং প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতি বছর বিশেষ উৎসব দিবস উপলক্ষে সে সব পুরস্কার বিতরণ করা উচিত। এ সকল শিক্ষকদের কৃতিত্বের বিবরণী সংবাদপত্র, বেতার ও সিনেমার মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচার করা উচিত।

২২.২৭. যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্তি লাভ করবেন তাঁদের নৈপুণ্যে অধিকারী হতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হবে। তাঁদের কর্মের গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে এবং তাঁদের পদোন্নতি প্রমাণিত দক্ষতার উপর নির্ভর করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা উচ্চতম পদ দখল করবেন তাঁরা হবেন উচ্চতম যোগ্যতা ও গুণবিশিষ্ট এবং তাঁদের পেশাগত

নৈপুণ্য প্রদর্শনের ফলেই এমন মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থায় পৌঁছতে হবে। যেহেতু এসব ব্যক্তির উপর আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব বর্তাবে এবং আমাদের শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তন ও সম্প্রসারণে তাঁরা নেতৃত্বদান করবেন, সেহেতু তাঁদের অভিমত ও পরামর্শের উপর মূল্য ও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এমন হবে যাতে সহকর্মীদের মনে তাঁদের প্রতি আস্থার ভাব জাগ্রত হতে পারে।

২২.২৮. শিক্ষা বিভাগের চাকরিগুলিতে আমরা যোগ্যতম ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে পারছি না। পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চতম চাকরিগুলিতে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হত। তাঁদের জন্য অনুরূপ যোগ্যতা নির্দিষ্ট ছিল এবং সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ মানে তাঁদের নিয়োগ করা হত। পদোন্নতি দ্বারা ঐ সব পদ পূরণ এবং ঐগুলির বেতন হ্রাস করার ফলে শিক্ষা, শাসন ও পরিচলনা ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গুণগত অবনতি নেমে আসে। আমরা পদোন্নতি নীতির বিরোধী নই, তবে আমরা এই চাই যে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদগুলির জন্য একদিকে যেমন জাতীয় প্রতিভার ভাণ্ডার হতে যুবকদের সংগ্রহ করতে হবে অপর দিকে তেমনি বিপুল অভিজ্ঞতা, উচ্চ-যোগ্যতা ও প্রমাণিত দক্ষতার অধিকারী এবং নেতৃত্বের গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও বাছাই করে নিতে হবে। এই লক্ষ্যের সাফল্যকল্পে শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চতম স্তরের পদকে আর্থিক আকর্ষণ, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা এবং বেতনের বেলায় প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চতম স্তরের পদের সমান করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি স্তরে মোটামুটি সমানুপাতিক পদ থাকবে এবং প্রতিটি স্তরের বেতন প্রশাসনিক বিভাগের অনুরূপ স্তরের বেতনের সমান হবে। মোটামুটিভাবে শিক্ষা কার্যরত ব্যক্তিগণকে দেশের চাকরির কাঠামোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য উচ্চতর শিক্ষা চাকরিক্রম অন্ততঃ উচ্চতর প্রশাসনিক চাকরিক্রমের সমকক্ষ হবে। এরূপ একটি কাঠামো সৃষ্টি করতে পারলে তবে আমাদের প্রতিভাশালী যুব সম্প্রদায় কোন চাকরিতে ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ-সুবিধা কত তা হিসাব করে নিজেদের জীবিকার পথ বেছে না নিয়ে বরং পেশাগত অনুদানের ভিত্তিতে তাঁরাই নির্বাচন করে নেবেন। বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষকেরা অনুভব করতে পারেন যে তাঁরা এমন একটি পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন, যেখান হতে পদোন্নতির স্থায়ী সুযোগসহ তাঁরা বৃত্তিগত জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম এবং এমন অবস্থা বা পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা নিজেদের আচরণের পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট থাকেন।

২২.২৯. অর্থনৈতিক আকর্ষণ ছাড়াও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তদুপরি শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, গ্রন্থাগার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক শিক্ষার্থীর যুক্তিসংগত হার থাকা অতীব প্রয়োজন। শিক্ষকদের পেশাগত সুযোগও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গ্রামগুলে মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ করে বাসস্থান ও অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সকল স্তরের শিক্ষকদের ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে ৬৫ বছর) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২২.৩০. উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যপনার জন্য কতকগুলি জাতীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষকতা ও গবেষণার বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানের ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

২২.৩১. নতুন সমাজ সৃষ্টির মহৎ দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক সমাজকে সকল প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যথাযথ অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং তাঁদেরকে যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য তাঁদের চিন্তা, সৃষ্টি ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের বেলায় শিক্ষকের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

২২.৩২. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক সমিতিগুলির শিক্ষক সমাজের কল্যাণে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এদের কার্যধারা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষক সমাজের পেশাগত উন্নয়নের একাডেমিক দিকেও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

২২.৩৩. দেশে শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশ করছিঃ

(১) দেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন সংক্রান্ত যে বৈষম্য রয়েছে, তা' যথাসম্ভব দূর করে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিচারের মাধ্যমে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের সমান পর্যায়ে আনা উচিত। এর দরুন যে বাড়তি খরচ হবে, তা' সরকার অনুদান দিয়ে পূরণ করতে পারেন।

(২) স্কুল পর্যায়ে বেতনের হার যে শুধু স্বল্প তা নয় বরং পদোন্নতির সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই নিয়মিত বেতনের হার ছাড়াও এতে সিলেকশন গ্রেড ও বিশেষ গ্রেড চালু করা উচিত। মাধ্যমিক স্তরে আমাদের প্রস্তাবিত বৃত্তিমুখী কোর্সগুলি প্রবর্তনের জন্য কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী বহু শিক্ষক প্রয়োজন হবে। বিশেষ গ্রেডের ব্যবস্থা না থাকলে এঁদের স্কুলের শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট করা কঠিন হবে।

(৩) ঔপনিবেশিক আমলে নানাভাবে শিক্ষকদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল। বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষকের পক্ষে পত্রপত্রিকায় কোন লেখা ছাপানো, বই প্রকাশ করা, কোনরূপ রেডিও বা টেলিভিশন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করা যেত না। চিন্তা ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বিধি-নিষেধ আরোপের দ্বারা তদানীন্তন সরকার দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। চিন্তার চর্চা, জ্ঞানের সাধনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের থাকা প্রয়োজন। কেননা এরূপ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে জাতির পক্ষে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই অনতি-বিলম্বে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অবাঞ্ছিত আইন-কানুনের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

(৪) প্রাক-স্বাধীনতা কালে অনুসৃত শিক্ষা সংকোচন নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ক্রমান্বয়ে শিক্ষকদের বেতন, পদ মর্যাদা, পদোন্নতি ইত্যাদি খর্ব করা। এর ফলশ্রুতিরূপে বর্তমানে সারাদেশে সরকারী কলেজগুলিতে প্রফেসারের কোন পদ নাই। তদুপরি এসব কলেজের শিক্ষক ও অধিকাংশ শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারীদের বছরের পর বছর ধরে অস্থায়ী রাখা হয়েছে, সাবস্টেনটিভ বা স্থায়ী করা হয়নি। বেতন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়েও এদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের এসব অন্যায় অবিচারের আশু প্রতিকার হওয়া উচিত। অন্যান্য সরকারী চাকুরেদের মত শিক্ষকদেরও প্রোবেশন বা শিক্ষানবিসী কাল শেষ হওয়ার সংগে সংগে চাকরিতে স্থায়ীভাবে বহাল করা প্রয়োজন। তদুপরি সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনহারে কোনরূপ তারতম্য থাকা উচিত নয়।

(৫) নির্বিঘ্নে শিক্ষাদান কার্য সমাধা করতে হলে, অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে, শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে সরকারী বাসস্থান প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষায়তনের অন্যান্য কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদি বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তবে মূল বেতনের একটি ন্যায্য অংশ বাড়ীভাড়া ভাতারূপে দেওয়া উচিত।

(৬) অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এছাড়া শিক্ষক যে-কোন স্তরেই শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত থাকুন না কেন তাঁকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দেওয়া প্রয়োজন।

(৭) পৃথিবীর নানা দেশে বছরের একটি বিশেষ দিনকে "শিক্ষক দিবস"-রূপে পালন করা হয়। এ প্রথা আমাদের দেশেও চালু করা প্রয়োজন।

২২.৩৪. উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যদি গৃহীত হয় ও কার্যকর করা হয় এবং তৎসহ পেশা হিসাবে শিক্ষকতার গুরুত্ব সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার কার্য চালানো হয়, তা'হলে আমাদের বিশ্বাস শিক্ষকদের যথাযোগ্য সুনাম ফিরে পাবার পথে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হবে। জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নে সর্বাধিক সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের জীবনে বিষয়টি একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা

সারাংশ

১। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা হচ্ছেন যে-কোন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র এবং শিক্ষার মান শিক্ষকের মান ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষার সকল স্তরে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বাছাই করে নিতে না পারলে এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষকেরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবীদার সমাজ তাঁদের সে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করলে কোন শিক্ষা সংস্কারই সফল হবে না। (২২.১.—২২.৩.)

২। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন করা এবং অনুসন্ধান ও সমালোচনার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা শিক্ষকদের প্রাথমিক কাজ। শিক্ষকেরা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নির্দিষ্ট সময় নিয়োগ করবেন। শিক্ষাদান, অনুশীলনী তৈরী, শিক্ষার্থীদের পরিচালনা এবং পাঠ্য-তালিকা বহির্ভূত কাজ, শিক্ষকদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যথাক্রমে প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণী এবং ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষকের স্কুলে সাপ্তাহিক কার্য সময়ের মেয়াদ ৪০ ঘণ্টা ও ৪৫ ঘণ্টা নির্ধারিত হওয়া উচিত। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান ১৮ ঘণ্টা, অনুশীলনী তৈরী ১০ ঘণ্টা, শিক্ষার্থীদের পরিচালন করা ও সংশোধনী ৭ ঘন্টা এবং পাঠ্য-তালিকা বহির্ভূত কার্যক্রম ৫ ঘন্টা। ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান ২১ ঘন্টা, অনুশীলনী তৈরী ১০ ঘন্টা, শিক্ষার্থীদের পরিচালনা ও সংশোধনী ৮ ঘণ্টা এবং পাঠ্য-তালিকা বহির্ভূত কার্যক্রম ৬ ঘণ্টা। স্কুল জীবনে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির পরিচয় শিক্ষকগণ সঞ্চয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন। (২২.৪.—২২.৫.)

৩। কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, যেমন বাগানের কাজ, হাতের কাজ, স্কুলের পরিচ্ছন্নতা ও মেরামত ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে শিক্ষকগণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। (২২.৬.)

৪। শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষাক্রোর্স ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের সাহায্য করতে হবে। (২২.৭.—২২.৮.)

৫। শিক্ষকদের আচরণ যাতে নিজেদের উপদেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে সতর্ক থাকতে হবে। উপদেশ ও আচরণের অসঙ্গতি তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশঃ শিথিল করে তোলে। (২২.৯.)

৬। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের সময়ের একটি বৃহৎ অংশ শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ ও টিউটোরিয়াল কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত। শিক্ষকদের অধ্যাপনা যাতে গতানুগতিক রুটিনে পর্যবসিত না হয়, তাঁদের অধ্যাপনা যাতে আনন্দদায়ক ও লাভজনক অনুসন্ধান কার্য হয়, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য অবশ্যই কার্যতালিকা সম্বলিত সুস্পষ্ট তপশীল থাকতে হবে। একজন শিক্ষক এক শিক্ষা-বছরে বিভিন্ন কর্তব্যে কতখানি সময় ব্যয় করবেন, তপশীলে সে সম্পর্কে অবশ্যই বিধান থাকবে এবং এই বিধান পালন করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করার দায়িত্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে। (২২.১০.—২২.১২.)

৭। প্রত্যেক শিক্ষকের তাঁর ব্যক্তিগত বা শিক্ষায়তনের পাঠাগারে দৈনিক তিন চার ঘণ্টা পড়াশুনা করা উচিত। শিক্ষকগণ যত দীর্ঘ সময় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে থাকবেন ততই মঙ্গল। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘতর সময়ের জন্য শিক্ষকদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবে এবং শিক্ষকগণ অভিনিবেশসহকারে গুরুত্বপূর্ণ কার্য করতে পারবেন। এজন্য কাফেটারিয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। (২২.১৩.)

৮। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা কার্যকলাপের অভাব অত্যন্ত প্রকট। সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে। (২২.১৪.)

৯। শিক্ষা কার্যে শিক্ষকদের স্বাধীনতা দিতে হবে। নিজেদের এলাকায় নিজেদের অনুভূতি অনুসারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার শিক্ষকদের থাকবে। তেমনি নতুন সত্য ও অনুভূতি অন্বেষণ করার অধিকারও তাঁদের থাকা উচিত। অবশ্য শিক্ষাগত স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে শিক্ষকেরা তাঁদের খুশিমত সব কিছুই করতে পারবেন। এ তাঁদের সামাজিক ও প্রশাসনিক যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার অবমাননা করার অধিকার দান করে না। (২২.১৫.—২২.১৬.)

১০। শিক্ষকদের উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যের জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। (২২.১৭.)

১১। শিক্ষকত্বকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অভাব অনটন ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ শিক্ষককে কাজ করতে হয়। বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবস্থার দিকে তাকালে একথা অনুধাবন করা যায়। শিক্ষকরা এমন হারে বেতন পান না যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং তাঁদের যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না।

শিক্ষকেরা যাতে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে চলতে পারেন তজ্জন্য তাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং তা জীবনযাত্রার ব্যয়ের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হতে হবে। অধিকন্তু শিক্ষকদের পদমর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে। (২২.১৮.—২২.২৩.)

১২। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন সংক্রান্ত যে বৈষম্য রয়েছে তা যথাসম্ভব দূর করে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত করতে হবে। একই ভাবে সরকারী ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা উচিত। (২২.২৪.)

১৩। বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য অবিলম্বে এক কোটি টাকার একটি জাতীয় তহবিল গঠন করতে হবে। এ তহবিল থেকে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের সময় এককালীন আর্থিক সাহায্য, তাঁদের দুর্ঘটনা ও দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়লে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ত্রাণ ও চিকিৎসা খরচ ও অকাল মৃত্যুতে শিক্ষকদের পরিবারদের এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। (২২.২৫.)

১৪। শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। (২২.২৬.)

১৫। শিক্ষাক্ষেত্রের উচ্চতম পদগুলিকে আর্থিক আকর্ষণ ও পেশাগত সুযোগ-সুবিধার বেলায় প্রশাসনিক বিভাগের উচ্চতম পদগুলির স্তরে উন্নীত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে সমান্তরাল পদ থাকবে এবং প্রতিটি স্তরের শিক্ষকদের বেতন প্রশাসনিক বিভাগের অনুরূপ স্তরের অফিসারদের বেতনের সমান হবে। (২২.২৮.)

১৬। শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে মহিলা শিক্ষকদের জন্য বাসস্থান ও অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সকল স্তরের শিক্ষকদের ও শিক্ষাকর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে ৬৫ বছর) হওয়া বাঞ্ছনীয়। (২২.২৯.)

১৭। উচ্চতর গবেষণা ও অধ্যাপনার জন্য কতকগুলি জাতীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা উচিত। (২২.৩০.)

১৮। শিক্ষাসম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের বেলায় শিক্ষকদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। (২২.৩১.)

১৯। শিক্ষকদের প্রোবেশন বা শিক্ষানবিশী কাল শেষ হওয়ার সংগে সংগে চাকরীতে স্থায়ীভাবে বহাল করা প্রয়োজন। তদুপরি সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন হারে কোনরূপ তারতম্য থাকা উচিত নয়। সরকারী কলেজগুলির জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রফেসারের পদ সৃষ্টি করা উচিত। (২২.৩৩.)

২০। যদি কোন শিক্ষকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে তাঁকে মূল বেতনের একটি ন্যায্য অংশ বাড়ী ভাড়া ভাতারূপে দেওয়া উচিত। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বছরের একটি বিশেষ দিবসকে "শিক্ষক দিবস" হিসাবে চালু করা প্রয়োজন। (২২.৩৩.)

অধ্যায় ২৩

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

২৩.১. বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিরক্ষর দেশগুলির অন্যতম। শুধু নিরক্ষরতার দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও দরিদ্রতম দেশগুলির সংগেই আমাদের তুলনা করা যায়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ বাংলাদেশের চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল এলাকার অধিবাসীর সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। প্রতি বর্গমাইলে প্রায় চৌদ্দশত মানুষ বাস করে। আমাদের দেশের অনুন্নত অবস্থা, দারিদ্র্য ও পশ্চাতমুখীনতার মূল কারণ আমাদের দেশের শতকরা আশি জনের ঊর্ধ্বে অক্ষর জ্ঞানহীন। ১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ২১·৫ জন, কিন্তু এ সংখ্যার মধ্যে রয়েছেন তাঁরাও যাঁরা অক্ষর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক কোনক্রমে নিজের নাম সই করতে পারেন। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শ্রেণীর ঊর্ধ্বে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৪·৫ জন। বই পড়ে জ্ঞানার্জন করার ক্ষমতা শতকরা দশ জনেরও নাই। আমাদের দেশে লেখাপড়া জানা মেয়েদের সংখ্যা শতকরা দশ জনও নয়। ষষ্ঠ শ্রেণীর ঊর্ধ্বে লেখাপড়া জানা মেয়েদের সংখ্যা শতকরা একজন হবে কিনা সন্দেহ। শুধু এগার থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের নিরক্ষরের সংখ্যা হবে সাড়ে তিন কোটি, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছত্রিশ হাজারের মত। এছাড়াও আরও প্রায় চার হাজার প্রাথমিক স্কুল স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চলছে। পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের সর্বমোট সংখ্যার পঞ্চান্ন ভাগ মাত্র প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়তে যায়। বাকী পঁয়তাল্লিশ ভাগ পড়তে যায় না, তাদের জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয়ে উঠেনি। যে পঞ্চান্ন ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই তাদের সংখ্যা কমে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যার শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পেঁছতেই নানা কারণে উক্ত সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যার আরও পঞ্চাশ ভাগ কমে যায়। পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বেই যে সব শিশু কিছু অক্ষরজ্ঞান ও কিছু সংখ্যা জ্ঞান নিয়ে সমাজে ফিরে যায়, চর্চার অভাবে, পরিবেশের প্রতিকুলতায় নিরক্ষরের বিশাল জনারণ্যে তারা আবার মিশে যায়। তাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

২৩.২. এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর লোকদের পঁচাশি ভাগ ছড়িয়ে আছে আমাদের ক্ষেতে-খামারে, দশ ভাগ কলেকারখানায়, সকল রকম উৎপাদনের উৎস মুখে। বাংলাদেশের মাত্র এক পঞ্চমাংশ লোক শহরে বাস করে। তাই দেশ বলতে বস্তুতঃপক্ষে গ্রামাঞ্চলগুলিকেই বুঝায়। অথচ গ্রামদেশ নিরক্ষর লোকে সমাকীর্ণ। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বলেই স্বাভাবিক কারণে তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দারিদ্র্য পীড়িত, কলহপ্রবণ, স্বাস্থ্যহীন ও কর্মবিমুখ। বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলগুলির পরিবেশ আরো ভয়াবহ ও দুঃখজনক।

শহরাঞ্চলে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, ধনিক শ্রেণীর আধিপত্য থাকায় শাসনযন্ত্রে তাদেরই প্রভাব বর্তমান। শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা অর্থনৈতিক ও শাসন বিষয়ক সুযোগ-সুবিধার দরুণ যে আধুনিক জীবনযাত্রার অধিকারী, একই দেশের অধিবাসী হয়েও গ্রামবাসী তা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসী গ্রামে বাস করতে চান না, চাকরী অথবা অন্য জীবিকা সংস্থানের জন্য শহরে চলে আসেন। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকালে বিপুল সংখ্যায় গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা কর্মের সন্ধানে অথবা কোনভাবে বাঁচার তাগিদে শহরাঞ্চলে চলে আসতে শুরু করেছেন বলে শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতির উপরও ভীষণ চাপ সৃষ্ট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলে আজ উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র শহর-গ্রাম ইত্যাদি ব্যবধান দূর করে সমগ্র জাতিকে এক কাতারে দাঁড় করাতে না পারলে কারো বাঁচার পথ প্রশস্ত নয়। আশি ভাগের

বেশী মানুষকে নিরক্ষর রেখে সামাজিক অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। শিল্পের প্রসার, কৃষির আধুনিকীকরণ, জনস্ফীতি নিরোধ, দুর্নীতি উচ্ছেদ প্রভৃতির জন্য দরকার শিক্ষিত সমাজ।

২৩.৩. ষাট লক্ষের মত নিরক্ষর অদক্ষ শ্রমিক কলেকারখানায় শিল্পাঞ্চলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন এবং উন্নত মানের দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য চাই শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিক। তার জন্য প্রথমেই তাদেরকে সাক্ষর করে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্য মধ্যযুগীয় চাষাবাদের পদ্ধতি পালটিয়ে আধুনিক যান্ত্রিক চাষাবাদের কলাকৌশল জানবার জন্য এবং কৃষি বিপ্লবের সৈনিক করে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকেও সর্বপ্রথম সাক্ষর হতে হবে। অধিক ফলানোর অভিযান, সেচ প্রক্রিয়া, শষ্য সংরক্ষণ, উপযোগী সময়ে উৎপাদন, সঠিক গোলাজাত ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাদি শিখতে হলে সাক্ষর কৃষক সমাজ একান্ত প্রয়োজন।

২৩.৪. উন্নত দেশসমূহে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়, সেখানে বয়স্ক শিক্ষা বলতে যা বুঝায় আমাদের দেশে বর্তমানে সঠিক তা বুঝাবে না। জীবনব্যাপী ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও কর্মভিত্তিক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সংগে, উৎপাদনমূলক যে-কোন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সে সব জ্ঞানার্জনের জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। শিক্ষা জীবনের প্রতি স্তরের পূর্ণতা দান করে এবং পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। প্রবহমান শিক্ষা ধারার আজীবন চর্চা ও নবতর অভিজ্ঞতা অর্জন বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্গত। আমাদের দেশে এ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রবর্তন প্রয়োজন এবং এই উদ্যোগসমূহ কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে সকল সময় সীমাবদ্ধ থাকবে না, সেগুলি কখনো আনুষ্ঠানিক কখনো বা অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতিরও হতে পারে। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলা এবং সংগে সংগে পেশা-ভিত্তিক, কর্ম ও পরিবেশকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা।

২৩.৫. নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে উন্নতর কলাকৌশল পদ্ধতি শিক্ষাদানের মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। সংগে সংগে তাদেরকে বুঝাতে হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বক্তব্য কি এবং কেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজ জীবনে এগুলির প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত সুপরিকল্পিত গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব। নিরক্ষর শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সমস্যাভিত্তিক আকর্ষণীয় শিক্ষাসূচীর মধ্যে তাঁদের সংসার কর্ম নির্বাহ, স্বাস্থ্য রক্ষা, সহজ বিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, নীতিকথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে অর্জিত বিদ্যার সাথে রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ দেশের বৃহত্তর কল্যাণের সহায়ক হবে।

২৩.৬. আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে দেশের আটটি থানায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরীক্ষামূলক কাজ চলছে। তার জন্য থানা পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা সংগঠক ও সংগঠিকা নিযুক্ত রয়েছেন। জনশিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে কুমিল্লায় রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য একজন সহকারী গণশিক্ষা পরিচালক, এবং প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনার জন্য একটি ক্ষুদ্রকায় বয়স্ক শিক্ষা ইনষ্টিটিউট। জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। দেশের বারটি থানায় পাইলট প্রজেক্টের অধীনে বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। রাংগুনিয়া বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প, গুরুদাসপুর গণমিলন, ধীরাই সাল্নাগন কেন্দ্র, রৌমারী পল্লী উন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা কার্যে নিয়োজিত। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু প্রতিষ্ঠান নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব উদ্যমের আন্তরিকতা আছে কিন্তু বিস্তার নাই। বাংলাদেশে সর্বাত্মক অভিযানের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের

জন্য সামাজিক আগ্রহ সৃষ্টি ও কর্মাভিযান শুরু করা এখনও সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, প্রয়োজনীয় পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির অভাবই নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থতার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

২৩.৭. নিরক্ষরতা দূরীকরণে যেসব দেশ পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে বা সার্থকতার পথে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে, তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। নিরক্ষরতা বিলোপ ব্যতীত পৃথিবীর কোন দেশ উন্নত হতে পারেনি। সোভিয়েট রাশিয়া বিপ্লবোত্তর কালে কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র জাতিকে সাক্ষর করে তুলেছে। চীন, কিউবা ও শ্রীলংকা সাক্ষর অভিযানে অসাধ্য সাধন করেছে। কিউবার সংগে আমাদের পরিস্থিতির তুলনা করা ঠিক না হলেও একথা স্মরণযোগ্য যে বিপ্লবোত্তর কালে মাত্র এক বছরে তারা দেশের নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তুলেছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৬০ সালে মন্ট্রিলে, ১৯৬৫ সালে ইরাণে এবং ১৯৭২ সালে জাপানে যে সব অধিবেশন হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যে সব অভিজ্ঞতার বিবৃতি দেন এবং সে সবের ভিত্তিতে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়, সেগুলি গভীরভাবে আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপারে ইউনেস্কোর সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের সহায়ক হবে।

২৩.৮. উপরিউক্ত পর্যালোচনা এবং আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে সাক্ষরতা অভিযান সফল করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন প্রণয়নের কথা গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবেঃ

(ক) উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তির সময়, যে-কোন সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সময় অন্ততঃ তিন মাস সাক্ষর অভিযানে অংশ গ্রহণের প্রমাণ-পত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের নিরক্ষরতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ছাত্র ব্রিগেড গঠন করে শিক্ষার্থীদের নিরক্ষরতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(গ) সকল পরীক্ষার্থীকে যে-কোন সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী প্রদানের আগে 'জাতীয় সেবা কার্যক্রমের' অধীনে একটানা তিন মাস সাক্ষর ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যে অংশ গ্রহণ করাতে হবে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি শিক্ষককে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষায় সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। বন্ধসমূহে যতদূর সম্ভব ছাত্রদের সংগে ঘনিষ্ঠ থেকে বয়স্ক শিক্ষা অভিযানে শিক্ষকগণকেও অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারী বেসরকারী যে-কোন ধরণের প্রতিষ্ঠানে, কলেকারখানায় কর্মরত নিরক্ষর কর্মীদেরকে এক বছরের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা সে সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অন্তর্গত হবে।

(চ) দেশের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ সাক্ষর অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(ছ) সক্ষম, ও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই, তিনি সরকারী বেসরকারী যে-কোন চাকুরিতেই থাকুন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যরত থাকুন নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে তাঁকে কোন না কোন

ভাবে অংশ গ্রহণ করতেই হবে। সমর্থ শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা সাক্ষর কর্মে অংশ গ্রহণ করতে চাইবেন না বা পারবেন না তাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতে হবে।

২৩.৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সরকারের শিক্ষা, শ্রম ও সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, স্থানীয় শাসন, পল্লী-উন্নয়ন, সমবায়, সেচ ও বিদ্যুৎ, কৃষি এবং খাদ্য প্রভৃতি মন্ত্রণালয়সমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমুদয় কার্যোদ্যোগের সমন্বয় সাধন ও নীতি নির্ধারণের জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বয়স্ক শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী সহ-সভাপতি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মন্ত্রীবর্গ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। শিক্ষা-সচিব এই কাউন্সিলের সম্পাদক হবেন। এ কাউন্সিলের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি, শিক্ষা-সচিবসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ সদস্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব এ কমিটির সম্পাদক থাকবেন।

২৩.১০. জাতীয় কাউন্সিলের নির্ধারিত নীতিসমূহ ও কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার ও কর্মচারী থাকবেন। প্রত্যেক জেলা সদরে জেলা বয়স্ক শিক্ষা অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী ও কর্মচারী থাকবেন। কাজের সমন্বয়ের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। জেলার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ও জেলা কাউন্সিলের প্রতিনিধি সদস্য এই কমিটিতে থাকবেন। মহকুমা পর্যায়ে একজন বয়স্ক শিক্ষা কর্মচারী ও থানা পর্যায়ে একজন বয়স্ক শিক্ষা সংগঠক ও একজন সংগঠিকা থাকবেন। থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার অধীনে প্রতিটি ইউনিয়নের পুরুষ ও মহিলাসহ সংগঠক ও সংগঠিকা নিযুক্ত হবেন। তাঁরা প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নসহ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করবেন এবং থানা কর্মকর্তার কাছে সাপ্তাহিক ও মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করবেন।

প্রতিটি স্তরে জনগণের মধ্য থেকে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রতিনিধি সদস্য সমন্বয়ে 'গণসাক্ষর সংঘ' গঠন করতে হবে। এই সাক্ষর সংঘের দায়িত্ব হবে নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং আর্থিক উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, সমবায়, এক কথায় সুষ্ঠু জীবন ধারণের জন্য সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকল নিরক্ষরকে সচেতন করে তোলা ও স্থানীয় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিচালনায় সাহায্য করা।

মহকুমা ও থানা পর্যায়ের পূর্ণকালীন কর্মচারীবৃন্দ স্থানীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবেন এবং শিক্ষক নির্বাচন, প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা, ভাতা প্রদান, কার্যক্রমের খতিয়ান সংরক্ষণ, কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তদারক করবেন।

২৩.১১. প্রত্যেকটি গ্রামে অন্ততঃপক্ষে একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার বলে আমরা মনে করি। প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজগুলিতে এবং চতুঃপার্শ্বস্থ শিক্ষা অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা যায়। এসব কেন্দ্রের পরিচালনার প্রধান হবেন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানগণ। একজন পূর্ণকালীন এবং একজন খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিটি কেন্দ্রে নিযুক্ত থাকবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ছ'মাস করে বছরে দু'টি কোর্স প্রবর্তিত হবে এবং প্রতি কোর্সে ছাত্রসংখ্যা থাকবে অনধিক ত্রিশ জন। মূল প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পাঠ গ্রহণের সাধারণতঃ সান্ধ্যকালীন অথবা সুবিধামত সময়সূচী নির্দিষ্ট হবে। ১০ থেকে ১৫ বছরের নিরক্ষর কিশোরদের জন্য প্রাথমিক স্কুলে বৈকালিক শিফট-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে দূরত্ব বা অন্যান্য অসুবিধার জন্য মহিলা কেন্দ্র স্থাপন অসুবিধাজনক

বিবেচিত হবে, সে সব ক্ষেত্রে গ্রামের অভ্যন্তরে কোন বৈঠকখানা বা ক্লাব ঘরে কেন্দ্র স্থাপন করা যুক্তিসংগত। মহিলাদের জন্য যতদূর সম্ভব স্থানীয় মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। পর্যাপ্ত শিক্ষিতা মহিলার অভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মহিলা অথবা নবম, দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সল্পকালীন প্রশিক্ষণদান করে এ কাজে নিয়োগ করা যায়। মেয়েদের শিক্ষা-সূচীর বিশিষ্টতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। প্রাথমিক স্কুলসমূহে শিক্ষিকা নিয়োগের প্রশ্নটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

২৩.১২. দেশে উচ্চমানের একটি জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) বিভিন্ন স্তরের প্রশাসক প্রশিক্ষণ, (খ) পরিদর্শক প্রশিক্ষণ, (গ) সমগ্র দেশে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ করা, (ঘ) পুস্তক ও অনুসরণী পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ এবং পাঠ সহায়ক অন্যান্য বস্তু যেমন ম্যাপ, চার্ট, দেয়াল পত্র, প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদির ব্যবস্থাকরণ ও বিতরণ, (ঙ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন গবেষণামূলক ও নব্য শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, (চ) বাৎসরিক ও ষান্মাসিক সম্মেলনের মাধ্যমে সমগ্র কর্মসূচীর অগ্রগতি ও অন্যান্য আনুসংগিক বিষয়াদির পর্যালোচনা।

বয়স্ক শিক্ষা ইনষ্টিটিউট একজন পরিচালকের অধীনে পরিচালিত হবে। এই ইনষ্টিটিউট চারিটি বিভাগে বিভক্ত থাকবে, যথাঃ

(ক) গবেষণা বিভাগ, (খ) প্রশিক্ষণ বিভাগ, (গ) পাঠ্য-পুস্তক, অনুসরণী পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন এবং আনুসংগিক অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থাকরণ বিভাগ, (ঘ) সরবরাহ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগের ভার ন্যস্ত থাকবে এক একজন সহকারী পরিচালকের উপর।

২৩.১৩. বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক করে তুলতে পাঠাগারের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে অর্জিত বিদ্যাকে সজীব ও সচল রাখতে পাঠাভ্যাস একটি জরুরী শর্ত এবং এই অভ্যাসকে নিয়মিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে, যেখানে শহরাঞ্চলের মত পুস্তক সরবরাহ করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় দেশের শতকরা আশি জন নিরক্ষর মানুষের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখতে হবে। গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারসমূহে নব্য শিক্ষিতদের প্রয়োজনভিত্তিক সহজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত এবং সহজভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। এই সব পাঠাগারের প্রাপ্ত পুস্তকাদি পড়াশোনার মাধ্যমে নব্য সাক্ষর ধীরে ধীরে জ্ঞান চর্চার আকাংখায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং পরবর্তী সময়ে তারা উন্নততর জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য নিজেদেরকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারবে।

২৩.১৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সংগে সংগে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ওতপ্রোত সংযোগ রয়েছে এবং এ উদ্যমকে সার্থক করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে অন্ততঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবিলম্বে বাধ্যতামূলক করতে হবে। ৫-১০ বছরের প্রতিটি শিশু যাতে বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায় এবং পড়তে যেতে বাধ্য হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য বর্তমানে যে সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার সংখ্যা প্রয়োজন মত বাড়াতে হবে অথবা বর্তমান বিদ্যালয়সমূহে দুই শিফটে পড়বার ব্যবস্থা করতে হবে। গৃহের স্নেহ-বন্ধনকে কঠোর শাসন ও পরীক্ষাভীতি বর্জিত পাঠশালায় সম্প্রসারিত করতে পারলে এবং বয়স্ক অভিভাবকগণকে শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করে তুলতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ড্রপ-আউটের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় এনে নিরক্ষর মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাধিক্যতার উৎসমুখ বন্ধ করা সম্ভব হবে।

২৩.১৫. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে এরূপ সংঘবদ্ধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বুঝায় যা শ্রেণী ও বয়সভিত্তিক এবং ডিপ্লোমাযুক্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক। এ শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক বা বিকল্পরূপে ধরা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাৎপদতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসনের উপায়রূপে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ ও সম্পদের অপ্রতুলতা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ক্ষীণ সংযোগ সর্বোপরি আজীবন শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কারণে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩.১৬. স্বাভাবিকভাবেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-শিক্ষার্থীর বয়স, পাঠক্রম, পরীক্ষা এবং শিক্ষায়তনের নিগড়ে বাঁধা। অপর পক্ষে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিশেষত্ব হ'ল কার্যক্রমের নমনীয়তা—ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ির অভাব, স্থানীয় অবস্থা ও পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান, নিত্য নতুন পদ্ধতি অনুসরণ, স্বল্প ব্যয়ে নানা ধরণের শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীর সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়, স্থান, সময় ও লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদি।

২৩.১৭. আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হওয়া প্রয়োজন। বয়স্ক সাক্ষরতা প্রসঙ্গে আমরা যে কার্যক্রমে সুপারিশ করেছি তা' অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। এ শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্ক সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কার্যক্রম যেমন কৃষি-সম্প্রসারণ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মহিলাদের জন্য গার্হস্থনীতি কোর্স, যুবা ও বয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রকল্প ইত্যাদি চালু করা প্রয়োজন।

২৩.১৮. বয়স্ক শিক্ষা এমন একটি আন্দোলন যা অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করা উচিত হবে না। এ আন্দোলন জাতীয় সত্তার অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে সমগ্র জাতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেবে এবং সমস্ত জাতি, গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি মানুষ সক্রিয়ভাবে এতে অংশ গ্রহণে আত্মনিয়োগ করবে। শুধু সরকারী পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান সীমাবদ্ধ রাখলে এ প্রচেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না। তাই দল মত নির্বিশেষে দেশের সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, মহিলা সংস্থাসমূহ, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, তথা সমস্ত জনসংগঠনসমূহ নিরক্ষরতা নির্মূল অভিযানে সর্বাত্মক দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রেরণা সৃষ্টি এবং সে প্রেরণা সক্রিয়ভাবে প্রবহমান রাখা একটি কঠিন কাজ। এ কাজ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বের অন্তর্গত হওয়া উচিত। অন্যদিকে সরকার, প্রশাসন বিভাগ, পরিকল্পক, শিক্ষক, সমাজকর্মী সকলকেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ১১—৪৫ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে যে সাড়ে তিন কোটি নিরক্ষর লোক রয়েছে তাদের অন্ততঃ ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্ভব। তাই এমন প্রকল্পকে আমরা কোনক্রমে অবাস্তব মনে করছি না। দেশের কৈশোরত্তর আট লক্ষ ছাত্র, দু লক্ষ শিক্ষক, ছাব্বিশ লক্ষ অন্যান্য শিক্ষিত জনের স্থির প্রতিজ্ঞা ও সম্মিলিত উদ্যমের সামনে কোন বাধাই টিকে থাকার কথা নয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

সারাংশ

১। বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিরক্ষর দেশগুলির অন্যতম। অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমাদের দেশ দরিদ্রতম দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়। প্রায় সাড়ে সাত কোটি অধিবাসী অধ্যুসিত বাংলাদেশের শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র ২১·৫ জন। শুধু এগার থেকে পয়তাল্লিশ বছরের নিরক্ষরের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। পাঁচ থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের সর্বমোট সংখ্যার পঞ্চান্ন ভাগ মাত্র প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়তে যায়। যে পঞ্চান্ন ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই তাদের সংখ্যা কমে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যার শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পেঁছিতেই নানা কারণে উক্ত সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যার পঞ্চাশ ভাগ কমে যায়। পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বেই যে সব শিশু কিছু অক্ষরজ্ঞান ও কিছু সংখ্যাজ্ঞান নিয়ে সমাজে ফিরে যায়, চর্চার অভাবে তারাও নিরক্ষরের বিশাল জনারণ্যে মিশে যায়। তাই, আমাদের সমাজে দিন দিন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। (২৩.১.)

২। এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর লোকদের পঁচাশি ভাগ ছড়িয়ে আছে ক্ষেতে খামারে, দশ ভাগ কল-কারখানায়। দেশ বলতে বস্তুতঃপক্ষে গ্রামাঞ্চলগুলিকেই বুঝায়। অথচ গ্রামদেশই নিরক্ষর লোকে সমাকীর্ণ। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসী জীবিকার জন্য শহরে চলে আসেন। শুধু তাই নয়, বাঁচার তাগিদে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট কালে বিপুল সংখ্যক সাধারণ গ্রামবাসীও শহর-মুখী হচ্ছেন। দেশের আশি ভাগের বেশী মানুষকে নিরক্ষর রেখে সামাজিক অগ্রগতি বা অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয় তা সকলেই উপলব্ধি করেছেন। (২৩.২.)

৩। শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর কৃষক শ্রেণীর দ্বারা আধুনিক যান্ত্রিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব আনয়নের জন্য সাক্ষর শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে।

৪। উন্নত দেশসমূহে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়, সেখানে বয়স্ক শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, আমাদের দেশে বর্তমানে তা বুঝাবে না। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে সমগ্র জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর করে তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে পেশাভিত্তিক, কর্ম ও পরিবেশকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা। (২৩.৩.—২৩.৪.)

৫। নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বুঝাতে হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বক্তব্য কি ও কেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে এগুলির প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিরক্ষর শিক্ষার্থীর সমস্যাভিত্তিক আকর্ষণীয় শিক্ষাসূচীর মধ্যে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা লাভের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। (২৩.৫.)

৬। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সামান্য কিছু চেষ্টা হয়েছে। সর্বাত্মক অভিযানের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সামগ্রিক আগ্রহ সৃষ্টি ও কর্মাভিযান শুরু করা এ যাবৎ সম্ভব হয়নি।

৭। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে উন্নত দেশসমূহ, যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, কিউবা ইত্যাদি দেশের অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারি। ইউনেস্কোর উদ্যোগে আয়োজিত অধিবেশনসমূহের সুপারিশসমূহ আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে ইউনেস্কোর সহযোগীতা আমাদের সহায়ক হবে।
(২৩.৬.—২৩.৭.)

৮। **সুপারিশসমূহ ঃ**

(১) দেশব্যাপী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১১—৪৫ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে যে সাড়ে তিন কোটি নিরক্ষর লোক রয়েছে তাদের সবাইকে ব্যবহারিক অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে।

(২) আমাদের দেশে সাক্ষরতা অভিযান সুফল করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে গাইন প্রণয়নের কথা গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবেঃ

(ক) উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তির সময় কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সময় অন্ততঃ তিন মাস সাক্ষর অভিযানে অংশ গ্রহণের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) সকল পরীক্ষার্থীকে যে-কোন সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী প্রদানের আগে একটানা তিন মাস বয়স্ক শিক্ষা কার্যে অংশ গ্রহণ করাতে হবে।

(ঘ) দেশের সকল শিক্ষককে বয়স্ক শিক্ষায় সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, কলকারখানায় কর্মরত নিরক্ষর কর্মীদেরকে এক বছরের মধ্যে সাক্ষর করে তোলা সে সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অন্তর্গত হবে।

(চ) দেশের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ সাক্ষর অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(ছ) প্রত্যেকটি সক্ষম ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে হবে।

(৩) নব্য শিক্ষিতদের অর্জিত বিদ্যাকে সজীব রাখার জন্য দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহের সহজ ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত সমুদয় কার্যোদ্যোগের সমন্বয় সাধন ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বয়স্ক শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এর সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী সহ-সভাপতি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। শিক্ষা-সচিব এই কাউন্সিলের সম্পাদক হবেন।

(৫) গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার জন্য একটি জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৬) জেলা পর্যায়ে জেলা বয়স্ক শিক্ষা অফিসার ও একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। মহকুমা পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা কর্মচারী, থানা পর্যায়ে একজন শিক্ষা সংগঠক ও একজন সংগঠিকা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন সহসংগঠক ও একজন সহসংগঠিকা থাকবেন।

৭। প্রত্যেকটি গ্রামে স্থানীয় কোন শিক্ষায়তনে অন্ততঃ একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে একজন পূর্ণকালীন ও একজন খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ছ' মাস করে বছরে দুটি কোর্স প্রবর্তিত হবে।

(৮) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে সারাদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রম চালু করা উচিত। (২৩.৮.—২৩.১৮.)

অধ্যায় ২৪

। নারী শিক্ষা ।

২৪.১. সমাজের সব মানুষের সকল বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ, গৃহের মান ও পরিবেশ উন্নতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। শিশু চরিত্র অংকুরিত ও বিকশিত হয় মাতৃ পরিবেশে। অথচ মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে কখনোই পুরুষদের শিক্ষার সমান গুরুত্ব অর্জন করেনি। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে পাথেয় করে সংসার জীবন নির্বাহ করেন। অনতিবিলম্বে এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

২৪.২. আধুনিক বিশ্বে নারীর কর্মজগৎ অত্যন্ত বিস্তৃত। অথচ আমাদের প্রাথমিক স্কুলে বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ, জুনিয়ার মাধ্যমিক স্কুলে ২০ ভাগ ও মাধ্যমিক স্কুলে মাত্র ১০ ভাগ। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং দেশ গড়ার কাজ দ্রুত ও সুষ্ঠভাবে সমাধান দ্বারা দেশের সমস্ত জনসমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করছিঃ

২৪.৩. নারী শিক্ষার প্রসার করতে হবে আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে। মেয়েদের উপযোগী বৃত্তিমূলক এবং তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে কাজে লাগে এরূপ বিষয়ে শিক্ষা যেন তারা পায় তা দেখতে হবে। এই জন্য প্রয়োজনবোধে মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বিবেচনা করা দরকার।

২৪.৪. পল্লীগ্রামে বিদ্যালয়গুলির দূরত্ব বেশী থাকে এবং বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চল নদী-নালা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এবং পথ-ঘাট সুগম নয় বলে মেয়েদের পক্ষে স্কুলের সুযোগ গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এক্কথা স্মরণ রেখে মেয়েদের বেলায় প্রয়োজনবোধে এক মাইলের কম দূরত্বেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

২৪.৫. ষষ্ট শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বিষয় তালিকায় ছাত্রীদের জন্য কিছু বিশেষ বিষয় থাকা আবশ্যক। এই শিক্ষা তাদের সাংসারিক জীবন যাপনে ও জীবিকা অর্জনে সহায়তা করবে। অষ্টম শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করে আমাদের দেশের বহু মেয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়না। সুতরাং তাদের পাঠ্য বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়সূচী থাকা একান্ত আবশ্যকঃ শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যপুষ্টি, খাদ্যপ্রস্তুত, খাদ্য সংরক্ষণ, সূচী শিল্প ও পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী, পুতুল ও খেলনা তৈরী, বাঁশ, বেত ও পাট প্রভৃতি কাজ, পাটী ও মাদুর বোনা, হাঁস-মুরগী ও গৃহপালিত পশু পালন ইত্যাদি।

২৪.৬. পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা দানের দায়িত্ব মেয়েদের উপর অর্পণ করা হয়ে থাকে। কারণ এ স্তরের শিক্ষাদানের দায়িত্ব, যাঁরা গ্রহণ করেন তাদের ভেতর মাতৃস্নেহ, সেবিকার নিষ্ঠা ও ধৈর্য এবং শিক্ষিকার গুণ আবশ্যক। সুতরাং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। এ জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

২৪.৭. বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে শিক্ষিকাদের আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকাগণ এই শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার হার প্রাথমিক স্তরে নগণ্য। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলিকে সম্প্রসারিত করে অধিক সংখ্যক শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

২৪.৮. দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে পল্লীগ্রামে শিক্ষিকা পাঠাতে হবে। এই কথা চিন্তা করে সকল স্তরে- বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

২৪.৯. অষ্টম শ্রেণীর পর মেয়েরা যেন প্রয়োজনমত মাধ্যমিক স্কুলগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সহ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। এতে কিশোরী ও তরুণীরা যে-সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধান সম্ভব হবে।

২৪.১০. নারী শিক্ষার উপযুক্ত ও দ্রুত প্রসারের জন্য শিক্ষা বিভাগ ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অভিভাবকদের রক্ষণশীল মনোভাব যেন নারী শিক্ষা প্রসারের গতি শ্লথ না করে সেজন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, বয়স্ক শিক্ষার দ্বারা অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে এবং এ-ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২৪.১১. সচ্ছল জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য এবং দেশের মোট উপার্জন বৃদ্ধির যে সমস্ত কার্যে মেয়েরা সহজে যোগদান করতে পারে বা যে সমস্ত বৃত্তিতে মেয়েরা স্বভাবতই বেশী উপযোগী, যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতালে, বিশেষ করে নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কার্যে, ব্যাঙ্ক এবং অফিস ইত্যাদিতে সচিব, টাইপিষ্ট, টেলিফোন সংযোজক, অর্ডারথনকারক ইত্যাদি জাতীয় বিশেষ ধরণের কাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২৪.১২. বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষাসমূহ ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে। মেয়েরা ভবিষ্যতের জননী হবে সুতরাং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্কুল সহ প্রতিটি স্কুলে মেয়েদের জন্য ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, সাঁতার শেখার সুযোগ প্রভৃতি থাকা অত্যাবশ্যক। এই সকল শরীর চর্চা শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২৪.১৩. মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহে মেয়েদের জন্য বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। এ-ছাড়া তাদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি থাকা দরকার। কারণ প্রতিটি মেয়েকেই গৃহ জীবন যাপন করতে হবে এবং সে বিষয়ে প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। সুতরাং পরবর্তী কালে সুষ্ঠু জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব রক্ষণে দক্ষতা অর্জনের জন্য 'গার্হস্থ্য হিসাব রক্ষণ' ব্যবস্থা পাঠ্যসূচীতে থাকা একান্ত আবশ্যক। একই সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পারিবারিক সেবাও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২৪.১৪. প্রাথমিক স্তরের ন্যায় মাধ্যমিক স্তরেও বিদ্যালয় পরিদর্শনে বর্তমানে পরিদর্শক ও পরিদর্শিকার প্রচুর অভাব দেখা যায়। ফলে বিদ্যালয় পরিচালনায় বহু ত্রুটি লক্ষ্য করা যচ্ছে। এ কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও পরিদর্শিকা বাড়াবার সুপারিশ করা হচ্ছে।

২৪.১৫. শিক্ষাদান এবং প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান অধিকার দিতে হবে। সুতরাং যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নারী শিক্ষা

সারাংশ

১। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমান গুরুত্ব অর্জন করেনি। বিদ্যালয়সমূহে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় জীবন যাপন করেন। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য নারী শিক্ষার বিস্তার সাধন একান্ত প্রয়োজন। (২৪.১. ২৪.২.)

২। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে দূরত্ব বা অনুরূপ কারণে মেয়েরা স্কুলের সুযোগ গ্রহণ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। (২৪.৪.)

৩। মেয়েদের শিক্ষা এমন হতে হবে যা তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজে লাগে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য, পুষ্টি, খাদ্য সংরক্ষণ, সূচী শিল্প, পুতুল ও খেলনা তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি থাকা দরকার। (২৪.৩., ২৪.৫., ২৪.১৩.)

৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকতায় অধিক সংখ্যায় মহিলা শিক্ষক-নিয়োগের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ইনষ্টিটিউট-গুলিতে অধিক সংখ্যায় মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (২৪.৬., ২৪.৭.)

৫। মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অধিকতর সংখ্যায় মেয়েরা লেখা পড়া করবে। (২৪.৯.)

৬। মেয়েদের জন্য তাদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেমন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, নার্সিং এবং প্যারামেডিকেল কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালতে টাইপিং ও ষ্টেনোগ্রাফির কাজ, টেলিফোন অপারেটারের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (২৪.১১.)

৭। শিক্ষাদান ও প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। (২৪.১৪., ২৪.১৫.)

অধ্যায় ২৫

বিশেষ শিক্ষাঃ শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য, বিশেষ মেধাবীদের জন্য

২৫.১. বাংলাদেশে শিক্ষার বয়স-সীমার অন্তর্গত অন্ধ, মূক-বধির, অন্যবিধ শারীরিক পঙ্গু বা মানসিক বাধাগ্রস্ত (যেমন মংগোলাইট ইত্যাদি) সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এখনো এদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণীত হয়নি। এদেশে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের অন্ধ, মূক-বধির ও শারীরিক পঙ্গুরা সাধারণতঃ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। জাতীয় স্বার্থে তাদের এই বৃত্তি গ্রহণ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। সারা বাংলাদেশে মাত্র অল্প কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয় আছে যেখানে অন্ধ এবং মূক-বধিরদের লেখাপড়া শেখানো হয়। ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুসারে কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষাও সেখানে দেওয়া হয়। অন্য কোনও বাধাগ্রস্তদের বিশেষ প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই।

২৫.২. সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রতুল। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ কার্যকর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সুপারিশ হলোঃ

(ক) ১৯৭৫ সালের মধ্যে অন্ধ, মূক-বধির, শারীরিক এবং মানসিক পঙ্গু ছেলেমেয়েদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য জরীপ কার্য চালাতে হবে। জরীপ চলাকালীন সময়ে বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন করতে হবে।

(খ) অন্ধ ও মূক-বধিরদের একই সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে সারা বাংলাদেশে মাত্র কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে, কিন্তু এদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রথমে প্রতিটি বিভাগে ও পরে প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনানুসারে অন্ধ ও মূক-বধিরদের জন্য পৃথক পূর্ণাঙ্গ ও উন্নতমানের বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং অন্ধ, মূক-বধিরদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি পৃথক। তা ছাড়া অন্ধ ও মূক-বধিরদের শিক্ষা পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে। অন্ধেরা চোখে দেখে না, কিন্তু তাদের শ্রবণ ও স্পর্শশক্তি খুবই প্রখর। মূক-বধিরেরা সব কিছু দেখতে পায়, কিন্তু তারা শুনতে পায় না বলে কথায় ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম। কাজেই উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয়গুলি হবে এবং পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ। উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্ধ ও মূক-বধিরদের বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ও আলাদা পাঠ্যপুস্তক তৈরী এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সুব্যবস্থা ১৯৭৯ সালের মধ্যেই করতে হবে।

(গ) এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলি ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক আবাসিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষাক্রম বিশেষ পদ্ধতিতে শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো এদের সক্ষম ও উপার্জনশীল করে তোলা। বাধাগ্রস্ত বলেই প্রথম দিকে এদের শিক্ষার গতি হবে মন্থর। তবে এদের মানসিক প্রবণতা যাচাই করে বৃত্তিমূলক ও প্রয়োগমুখী শিক্ষাদান করলে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। এভাবে শিক্ষা শেষে তারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

(ঘ) অন্ধদের শিক্ষাব্যবস্থায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষার্থীর ন্যায় সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে, তবে তাদের প্রবণতা অনুযায়ী সঙ্গীত ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই সঙ্গীত শিক্ষাদানের সাথে সাথে এদের

বেত, বাঁশ, তার, প্লাস্টিক এবং মাটির পুতুল তৈরী ও চামড়ার কাজ ইত্যাদি শেখাতে হবে। যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ তৈরী করা, মেশিন চালানো ও বাজনা শেখা, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন ইত্যাদি সমবায় ভিত্তিতে এরা যাতে পরিচালনা করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা ছাড়া, শরীরচর্চা, খেলাধূলা, আবৃত্তি; নাটক এসবই এদের শেখানো উচিত। দৃষ্টিহীনকে শিক্ষা দিতে হলে দৃষ্টিমান শিক্ষককে বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্ব করতে হবে। এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই এদের জন্য পূর্ণাংগ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিদ্যালয় তৈরীর আগেই শিক্ষক-শিক্ষণের এবং প্রচলিত 'ব্রেইলী' হরফে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) মূক-বধিরেরা পাঠ্যপুস্তক সাধারণ চলতি অক্ষরেই পড়বে। তবে এদের পুস্তকে ছবি থাকবে প্রচুর এবং প্রাথমিক স্তরে উচ্চারণ শেখার পদ্ধতিও হবে আলাদা, এরা শিক্ষকের ঠোঁট নাড়া দেখে আয়নার সামনে উচ্চারণ-ভংগী অনুকরণ করতে শিখবে। তা ছাড়া, তারা কণ্ঠ স্পর্শ করে শব্দের উচ্চারণের সংগে বস্তুর মিল করে জ্ঞানার্জন করবে। তাই এদের শিক্ষা সময়সাপেক্ষ। শোনা ও বলার পথ এদের জন্য রুদ্ধ, তাই এরা চোখ দিয়ে দেখে পেন্সিল, কালি ও রং দিয়ে আঁকতে চায়। ছবি আঁকা ও মাটির-কাজ আরম্ভের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে এরা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এদের শোনার জন্য অনেক দামী ও উন্নত মানের যন্ত্রপাতির দরকার হবে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রুপ হিয়ারিং এইড, মাল্টিপল মাইক্রোফোন এবং রেকর্ড প্লেয়ার ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া শব্দের বিভিন্নতা ও তারতম্য অনুধাবন করার জন্য নানা রকম সংগীত যন্ত্রেরও প্রয়োজন হবে।

(চ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মূক ও বধিরদের শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার সংগে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবিকা অর্জন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ। তাই অন্ধদের মত মূক বধির ছেলেমেয়েদের প্রবণতা অনুসারে আলাদাভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অষ্টম শ্রেণীর পর যারা আর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, এটা হবে তাদের জন্য পুনর্বাসনের প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্বে মূক ও বধিরদের কলকব্জার কাজও বিভিন্ন প্রকার কারিগরি কাজ, ছাপার কাজ, দর্জির কাজ, টাইপের কাজ ও বিভিন্ন কুটির-শিল্পের কাজও শেখানো যেতে পারে। সমবায় ভিত্তিতে যেখানে কৃষি বা পশুপালন করা সম্ভবপর সেখানে মূক ও বধিরদের নিয়োগ করলে তারা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে। সেজন্য এদের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী ও ওয়ার্কশপ স্থাপন করতে হবে।

(ছ) অন্ধদের ন্যায় মূক ও বধিরদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য এ ধরণের বিশেষ বিদ্যালয়ের সংগে শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যতদিন এদেশে এ প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে না, ততদিন শিক্ষকদের বিদেশে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তা না হলে বিদেশী বিশেষজ্ঞ এনে এ দেশেই শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) মানসিক পংগু ও অসম আবেগপ্রবণ মাত্র কিছু ছেলেমেয়ে বর্তমানে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়ে। এদের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহানুভূতি-শীল ও সহনশীল হতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এদের সাহচর্যে যেন সুস্থ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার গতি ব্যাহত না হয়। শিক্ষকদের থাকতে হবে ধৈর্য, মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলী ও সংবেদনশীল মন। তাই এদের শিক্ষার জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এসব বিদ্যালয়ে মানসিক পংগু ছেলেমেয়েদের সম্ভবমত বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করতে হবে। তারা যেন অন্ততঃ তাদের সাধারণ প্রয়োজন বুঝতে পারে এবং স্বাবলম্বী হয়ে চলতে পারে।

(ঝ) খোঁড়া, অবশাঙ্গ ও পক্ষাঘাতজনিত শারীরিক পঙ্গুদের জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে শারীরিক পঙ্গুদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

২৫.৩. দেশে ক্যাডেট কলেজ এবং রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের ব্যবস্থা থাকা সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী সুদীর্ঘ কালের। শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-বৈষম্য দূর না করলে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। ক্যাডেট কলেজ ও রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টির সহায়ক বলে এসব প্রতিষ্ঠান বিলোপ সাধনের জন্য আমাদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা এ ধরণের বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি শিক্ষায়তন, কৃষি পলিটেকনিক অথবা উন্নতমানের বিজ্ঞান বা সাধারণ শিক্ষানিকেতনরূপে চালু রাখার পক্ষপাতি।

২৫.৪. পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর পর ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা-দানের জন্য সাধারণ মাধ্যমিক স্কুল ছাড়াও বিশেষ মাধ্যমিক স্কুল থাকা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশেও এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্যই এই ধরণের ব্যবস্থা গণমুখী হবে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ মেধাবী ছাত্র বেছে নিয়ে এইসব শিক্ষায়তনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রতিযোগিতামূলক যে বৃত্তি পরীক্ষা প্রচলিত থাকবে তার মাধ্যমে বিশেষ মেধাবী ছাত্র বাছাই করা যেতে পারে। নির্বাচিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ-রূপে সরকার বহন করবেন। অন্যান্য বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের অভিভাবকগণ তাদের আয় অনুযায়ী উক্ত খরচ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বহন করবেন। বাকী খরচ প্রয়োজন অনুসারে সরকার বহন করবেন।

২৫.৫. আমাদের দেশের ল্যাবরেটরী বিদ্যালয়গুলির প্রসঙ্গে আমাদের মন্তব্য ও সুপারিশ নিম্নরূপঃ সাধারণতঃ এ রিদ্যালয়গুলি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের সাথে সংযুক্ত। এখানে মেধাবী ছাত্রদের ভর্তির উপরই জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এতে শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হয় না। দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের কর্মস্থলে যে সবই মেধাবী ছাত্রছাত্রী পাবেন তেমন সম্ভাবনা নাই। এসব বিদ্যালয় যদি মেধা নির্বিশেষে বিভিন্ন মানের ছেলেমেয়ে থাকতো তবেই এ ধরণের গবেষণামূলক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সফল হত। কিন্তু অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা বর্তমানে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমরা কয়েকটি বেসরকারী বিদ্যালয়কেও অনতিবিলম্বে গবেষণামূলক বিদ্যালয়রূপে ব্যবহার করার সুপারিশ করছি।

———

বিশেষ শিক্ষা: শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের এবং বিশেষ মেধাবীদের জন্য

সারাংশ

১। বাংলাদেশে শিক্ষার বয়স সীমার অন্তর্গত শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্ত অনেক ছেলে-মেয়ে আছে। এদের শিক্ষার কোন্ উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এদের অধিকাংশই ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। (২৫.১.)

২। ১৯৭৫ সালের মধ্যে জরীপ চালিয়ে অন্ধ, মূক-বধির এবং মানসিক পংগুদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন। (২৫.২.-ক)

৩। অন্ধ ও মূক-বধিরদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রথমে প্রতিটি বিভাগে এবং পরে প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনানুসারে অন্ধ ও মূক-বধিরদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। তাদের জন্য আলাদা পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিশেষ উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের পাঠ্যসূচীতে সংগীত, হাতের কাজ, খেলাধূলা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এদের মানসিক প্রবণতা যাচাই করে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজেদের জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়। (২৫.২-খ-ছ)

৪। মানসিক পংগু এবং অসম আবেগ প্রবণ ছেলে মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। শারীরিক পংগুদের জন্যও বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে। (২৫.২-জ, ঝ)

৫। শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির সহায়ক বিদ্যালয়সমূহের বিলোপ সাধন করা প্রয়োজন। ক্যাডেট কলেজ এবং রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলগুলিকে কারিগরি শিক্ষায়তন অথবা উন্নত মানের বিজ্ঞান বা সাধারণ শিক্ষা নিকেতন রূপে চালু রাখা যেতে পারে। (২৫.৩.)

৬। পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর পর যে সব ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ মেধার পরিচয় দিবে তাদের জন্য বিশেষ মাধ্যমিক স্কুল থাকা প্রয়োজন। এরূপ স্কুলের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যয় সরকার বহন করবেন। (২৫.৪.)

অধ্যায় ২৬

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা

২৬.১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে "স্বাস্থ্য" বলতে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বুঝায়। তাই শুধু রোগের অনুপস্থিতিকেই "স্বাস্থ্য" বলা ঠিক হবে না। সুস্থ মন ও শরীর সম্পন্ন সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকশের জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে শিক্ষার্থীকে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" সম্বন্ধে সুপরিকল্পিত শিক্ষাদান করতে হবে। তাই "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" সাধারণ শিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

২৬.২. দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের পরিপূর্ণভাবে সুস্থ, সুশৃংখল, সুসামাজিক এবং আত্মবিশ্বাসীরূপে গড়ে তুলতে হলে বর্তমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষায়তনেই "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতে হবে। তা হলে এ ধরনের শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সুস্থ মনে তাদের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে এবং সুস্থ শরীরে সমাজের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের জন্য সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহও গড়ে তুলতে সমর্থ হবে।

২৬.৩. শিক্ষায়তনে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা, আবহাওয়া, খনিজ পদার্থ, আলো-বাতাস, উপযুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য, বায়ু চলাচল, টিকাদান ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়ে তার দৈনন্দিন জীবনে এগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভবিষ্যতে সুস্থ ব্যক্তিত্ব লাভ করতে সমর্থ হবে। তাছাড়া জৈবিক পরিবেশের কোন্ কোন্ গাছ-গাছড়া বা জীব-জন্তু মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী কিম্বা অনুপযোগী তাও সে জানতে পারবে।

২৬.৪. মোটের উপর, রোগ প্রতিরোধ, রোগ চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা সম্বন্ধে শিক্ষায়তনে জ্ঞানলাভ করে শিক্ষার্থী তার নিজের এবং অপরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। তাই শিক্ষার্থীর পক্ষে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চার" মূল্য অপরিসীম।

২৬.৫. "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চার" প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ

(১) স্বাস্থ্য সম্পন্ন ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠন করা।

(২) খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করে তারা অপরাধ প্রবণতা প্রসমিত করা।

(৩) শিক্ষার্থীর মানসিক সজাগতা, সহনশীলতা এবং ন্যায় বিচার ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বিকাশ সাধন করা।

(৪) শিক্ষার্থীর স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃংখলতা দূরীভূত করে তাকে আইনের শাসন মেনে চলতে অভ্যস্থ করা।

(৫) শিক্ষার্থীর শারীরিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা।

২৬.৬. উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে পর্যায়ক্রমে সুপরিকল্পিত "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(ক) **প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরঃ**

২৬.৭. এ স্তরে শিক্ষার্থীকে খেলাধুলার মাধ্যমে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চার" বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রোগ প্রতিরোধমূলক প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃপক্ষে এ স্তরের শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলাই হবে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" বিষয়ক শিক্ষাদানের অন্যতম মাধ্যম। তাই এ স্তরের পাঠ্যসূচীতে ব্যায়াম, খেলাধুলা, কাবিং প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

২৬.৮. এ স্তরের "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী থেকে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে বয়সোপযোগী খেলাধুলা ও ব্যায়াম বেছে নিতে হবেঃ

(১) **ব্যায়ামঃ** যেমন দৌড়, ঝাঁপ, গড়াগড়ি দেওয়া, স্কিপিং, ক্লাইমবিং (উঁচুতে উঠা), স্প্রিং জাম্প, ভারসাম্য রক্ষা কর, বালির বস্তায় ঘুষাঘুষি করা ইত্যাদি।

(২) **খেলাঃ** দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন খেলা।

(৩) **নৃত্যঃ** যথা, ঝুমুর নাচ, ব্রতচারী নাচ, সাঁওতালী নাচ ইত্যাদি।

(৪) **সাঁতারঃ** যেমন সম্মুখ সাঁতার, চিৎ সাঁতার, ডুব সাঁতার, বুক সাঁতার, এককভাবে কিম্বা পাল্লা দিয়ে সাঁতার প্রভৃতি।

২৬.৯. এ স্তরে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকারঃ

(১) উপযুক্ত খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সাঁতারের জন্য পুকুর, খেলার রিং, কাঠের ব্লক, ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতে হবে।

(২) নৃত্য শেখার জন্য বাঁশি, নূপুর, তবলা, কাঠ ও লাঠি ইত্যাদির সংস্থান করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ব্যক্তিগত "স্বাস্থ্য কার্ড" প্রবর্তন হবে।

(৪) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন চিকিৎসকের অধীনে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

(৫) প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(খ) **মাধ্যমিক স্তরঃ**

২৬.১০. মাধ্যমিক স্তরেও "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষার জন্য খেলাধুলাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিকাশ ও প্রাণাবেগ এবং দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাকে খেলাধুলার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এ স্তরেও "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সেজন্য শিক্ষকসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণাদির ব্যবস্থাও সময়মত করতে হবে।

২৬.১১. সাধারণতঃ মাধ্যমিক স্তরের কিশোর কিশোরীদের দেহে ও মনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাদের চিন্তাধারায়, কাজকর্মে ও মানসিকতায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এ বয়সের শিক্ষার্থীরা অধিক আবেগময় ও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের এ মানসিকতা সঠিক ভাবে পরিচালিত করার জন্য "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চার" সুপরিকল্পিত পাঠক্রমের প্রয়োজন।

২৬.১২. এ বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে কঠিন ধরণের খেলাধুলা ও ব্যায়াম করতে সমর্থ হয়। তাদের জন্য যে কর্মসূচী তৈরী করতে হবে, তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলঃ

(১) ব্যায়াম : যেমন স্প্রিং বোড, রিং, লো বার, হাই বার, হেড, স্ট্যান্ড, হ্যান্ড স্ট্যান্ড, কার্ট হুইল, ক্যাট স্প্রিং, থ্রভল্ট, ইত্যাদি।

(২) দৌড়-ঝাপ : যেমন হাই জাম্প, লং জাম্প, জ্যাভেলিন থ্রো, ডিস্কাস থ্রো, শটপুট, রিলে রেস, হার্ডলস রেস, ইত্যাদি।

(৩) খেলাধুলা : যেমন ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেট বল, ক্রিকেট, হকি, টেনিকয়েট, ব্যাড মিনটন, লনটেনিস, সাঁতার ইত্যাদি।

(৪) নাচ : যেমন লাঠি নাচ, কাঠি নাচ, ঝুমুর নাচ, ইত্যাদি।

(৫) এস, এস, সি, সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে সুবিধা মত সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সপ্তাহকালীন একটি ক্যাম্পিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২৬.১৩। "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন। এদের ভাল করে শিখতে হবে কিভাবে শিক্ষার্থীদেরে 'আদেশ' দিয়ে কেলেস্থেনিকস, পি, টি, মার্চ—পাষ্ট, টার্নিং ও মার্চিং ইত্যাদি করাতে হবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

২৬.১৪। (১) প্রত্যেক শিক্ষার্থী সারা বছর "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" সম্বন্ধে কতটা শিক্ষালাভ করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রমোশনের সময় ও এস, এস, সি, পরীক্ষার জন্য পাঠাবার সময় মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) প্রতি তিন শত শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) প্রত্যেক শিক্ষায়তনের জন্য খেলার মাঠ ও সাঁতারের জন্য পুকুরের ব্যবস্থা, গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচলন, জিমনাষ্টিক, এ্যাথলেটিকস, ব্রতচারী, স্কাউটিং, গার্লগাইডিং এবং অন্যান্য খেলাধুলার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(৪) "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষক বা শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে প্রতিটি শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প মূল্যে টিফিন সরবরাহ করা দরকার।

(৫) এ স্তরের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য "স্বাস্থ্য কার্ড" এবং 'স্কুল হেল্থ সার্ভিস', "ইমারজেন্সী কেয়ার" ও অন্ততঃ ত্রৈমাসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চা" শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য স্কুল সংলগ্ন আবাসিক ব্যবস্থাও করতে হবে এবং তাদের বেতন, পদ-মর্যাদা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের সমমানের হতে হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর :

২৬.১৫। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়েও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীর চর্চার জন্য উপযুক্ত খেলাধুলার বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের অস্থিরচিত্ততা, বিক্ষুব্ধ মনোভাব এবং হতাশাজনিত অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি সুপরিকল্পিত খেলাধুলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে বহুলাংশে দূরীভূত করা সম্ভব। সে উদ্দেশ্যে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নানা প্রকার এ্যাথলেটিকস এবং জিমনাসটিকসের (খেলাধুলা, কুস্তি, লাঠিখেলা, জুডো, যুযুৎসু, সাঁতার, বক্সিং ইত্যাদি) আয়োজন করতে হবে।

৬.১৬। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করতে হবে :

(১) খেলার মাঠ, পুকুর বা সুইমিং পুল এবং খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংস্থান করতে হবে।

(২) প্রতি পাঁচ শত শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের জন্য বি, সি, সি এবং ইউ, ও, টি, সি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

২৬.১৭. সর্বস্তরে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীরচর্চা" শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

(১) বাংলাদেশের প্রত্যেক বিভাগে শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় শুধু মহিলাদের জন্য অন্ততঃ একটি কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপন করা দরকার হবে।

(২) পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) শিক্ষক ও শিক্ষিকার আশু অভাব মেটানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে এবং পি, টি, আই,-সমূহে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কোর্স চালু করতে হবে।

(৪) সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স (এম, এ, ইন-ফিজিক্যাল এডুকেশন) দানের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(৫) বিভিন্ন কলেজে শরীরচর্চা শিক্ষকদের পদগুলি লেকচারার পদে উন্নীত করতে হবে।

(৬) জেলা শারীরিক শিক্ষা সংগঠকদের বি, ই, এস, পদে উন্নীত করতে হবে।

(৭) বি, পি, এড্ এবং বি, এড্-এর মান সমপর্যায় রাখতে হবে এবং এসব ডিগ্রীপ্রাপ্তদের সমমানের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

সামরিক শিক্ষাঃ

২৬.১৮. বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাঙ্গালীদিগকে সকল প্রকার সামরিক শিক্ষার সুযোগ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এর ফলে সামরিক জীবন সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর মনে বীতশ্রদ্ধা এবং ভীতিভাব জন্মে গিয়েছিল। এ পরিস্থিতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার উপযুক্ত সাধারণ মানসিকতা সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে।

২৬.১৯. তাছাড়া, সামরিক শিক্ষার একটা নৈতিক দিকও আছে। এ শিক্ষার ফলে মানুষের মনে শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগের স্পৃহা বাড়ে, আইনের শাসন মানুষ সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হয়। এক কথায়, আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনে যে সব গুণের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়, সামরিক শিক্ষা সে সব গুণের পরিস্ফুটন ও পরিবর্ধনে সাহায্য করে।

২৬.২০. যদিও শরীরচর্চার বিষয়গুলি প্রকৃত সামরিক ট্রেনিং-এর আওতায় আসে না, তবুও এগুলি ছাত্রদিগকে ভবিষ্যতে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে সাহায্য করবে। তাছাড়া, এস, এস, সি সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পূর্বে সুবিধামত সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যে সপ্তাহকালীন একটি শরীরচর্চা ক্যাম্পে বাধ্যতামূলকভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে, তাতে সম্ভব মত সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে।

২৬.২১. আমাদের মতে বিভিন্ন দেশরক্ষা বাহিনী পৃথক পৃথক অথবা যৌথভাবে নিজেদের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য একাডেমী স্থাপন করবেন। এসব একাডেমী নিজেদের জন্য ডিগ্রী পর্যায়ের সিলেবাস তৈরী করবেন। একাডেমীর নির্দিষ্ট কোর্স শেষ করার পর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করবে। এ জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নৌ-বাহিনী একাডেমী, স্থল বাহিনী একাডেমী এবং বিমান বাহিনী একাডেমী স্থাপন করা যেতে পারে।

২৬.২২. তাছাড়া, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সামরিক বিজ্ঞান পূর্বের ন্যায় ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইউ, ও টি, সি চালু থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান বিভাগ চালু রাখা বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষা

সারাংশ

১। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীরচর্চা সাধারণ শিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। (২৬.১.)

২। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীরচর্চার প্রধান লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠন করা, শিক্ষার্থীর মানসিক সজাগতা, সহনশীলতা, ন্যায়-বিচার ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করা এবং আইনের শাসন মেনে চলতে সাহায্য করা। (২৬.২.—২৬.৫.)

৩। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রত্যেকটিতে শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত খেলার মাঠ, সাজ-সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, সি, সি ও ইউ, ও, টি, সি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। (২৬.৬.—২৬.১৬)

৪। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীরচর্চা শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে প্রতিবিভাগে শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করতে হবে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়েদের জন্য অন্ততঃ একটি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষক ও শিক্ষিকার আশু অভাব মিটানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে এবং পি, টি, আই-সমূহে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কোর্স চালু করা দরকার। সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়। শরীরচর্চা শিক্ষকদের পদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা উন্নীত করা দরকার। (২৬.১৭.)

৫। স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামরিক শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মনে শৃঙ্খলাবোধ জন্মে এবং জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের স্পৃহা বাড়ে। শরীরচর্চার বিষয়গুলি ছাত্রদের ভবিষ্যতে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়ক হবে। (২৬.১৯., ২৬.২০.)

৬। বিভিন্ন দেশরক্ষা বাহিনী পৃথক পৃথক অথবা যৌথভাবে প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করবেন। একাডেমির কোর্স সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদিগকে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী প্রদান করবে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সামরিক বিজ্ঞান পূর্বের মত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকবে। (২৬.২১, ২২.)

অধ্যায় ২৭

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি

২৭.১. বর্তমানে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ছুটির একই নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষায়তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ছুটির দিনের সংখ্যা সমান নয়। নির্ধারিত ছুটি ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা কারণে বহুদিন অনির্ধারিত ছুটি দেওয়া হয় অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি না দিয়েও কাজের দিনকে প্রকৃতপক্ষে ছুটির দিনে রূপান্তরিত করা হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বই-খাতা সংগ্রহ করে নিয়মিত লেখাপড়া আরম্ভ হতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। বহুক্ষেত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য পর্যায়ক্রমে কোন কোন শ্রেণীকে ছুটি দিয়ে অপরাপর শ্রেণীর পরীক্ষা নেওয়ার ফলেও সময়ের অপচয় হয়। দীর্ঘদিনের প্রচলিত এসব অভ্যাসগত ব্যবস্থা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ; বহিঃপরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ, ধর্মঘট প্রভৃতি কারণেও অনেক কাজের দিন নষ্ট হয়। একই স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বার্ষিক মোট কাজের দিনের সংখ্যা সমান নয়। এমনকি সাপ্তাহিক ছুটিও সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই দিনে হয় না। অনেক কাজের দিন অর্থপূর্ণ কাজ ছাড়াই ব্যয়িত হয় এবং সেজন্য নির্ধারিত পাঠক্রম বছরের শেষেও শেষ হয় না। ফলে বার্ষিক পরীক্ষার প্রাক্কালে অনভিপ্রেত দ্রুততার সাথে অপঠিত বিষয়ের পাঠ দেওয়ার ফলে ছাত্রদের মর্মোপলব্ধির গতি শিক্ষকের কাজের দ্রুতগতির সাথে সমতালে অগ্রসর না হওয়ার জন্যও শিক্ষা ব্যাহত হয়। অধিকন্তু, প্রত্যেক কাজের দিনকে সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় না।

২৭.২. শিক্ষার সাথে জড়িত অনেকের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে মান উন্নত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ অবনতি হচ্ছে। এ ধারণা অমূলক নয় কিন্তু শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির হেতু হিসাবে কোন একটি কারণকে চিহ্নিত করা যায় না। তবে অত্যধিক ছুটির ফলে পাঠক্রমে নির্দিষ্ট বিষয়াদির অপঠিত থাকা অবস্থাতেই শিক্ষাবর্ষ বা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল শেষ হওয়া যে মানের অধোগতির বিবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ সে কথা সত্য।

২৭.৩. এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি যে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছুটির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয় এবং একই স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটির একই নিয়ম পালিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

২৭.৪. আমরা মনে করি প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটিসহ বার্ষিক অনধিক ১২০ দিন ছুটি দেওয়ার নিয়ম পালন করা উচিত হবে।

২৭.৫. এই কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ এবং সমপর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটির নির্দেশনার জন্য আমরা নিম্নরূপ প্রস্তাব করিঃ

(ক) শিক্ষাবর্ষ মোটামুটি সমান দুইভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম ভাগের মধ্যে ষান্মাসিক পরীক্ষা শেষ হবে এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবে এবং ফল প্রকাশ করা হবে।

(খ) শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় ভাগের শেষের দিকে বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে বহিঃপরীক্ষাও গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে এবং সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষাবর্ষের মধ্যে বহিঃপরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হলে, লেখাপড়ার নিয়মিত সময়

এবং পরীক্ষার সময়ের মধ্যে বর্তমানে যে কয়েক মাসের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হবে। এ ব্যবস্থার ফলে সময় বাঁচবে এবং নিয়মিত লেখাপড়ায় ছাত্রদের আকর্ষণ বাড়ানো যাবে।

(গ) শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে নিয়মিত লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ করতে যাতে অহেতুক বিলম্ব না ঘটে পরবর্তী বছরের জন্য অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ছাত্ররা যাতে যথা সময়ে পেতে পারে, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) উল্লিখিত সকল প্রতিষ্ঠানে ১২০ দিন ছুটির মধ্যে থাকবে সাপ্তাহিক ছুটি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ছুটি, সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য ছুটি এবং স্থানীয় প্রয়োজনে অন্যান্য ছুটি।

(ঙ) উদ্দেশ্যবিহীন দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন বা রমজান মাসের ছুটি অপ্রয়োজনীয় বলেই আমাদের ধারণা।

(চ) সাপ্তাহিক ছুটি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই দিনে হবে। প্রচলিত নিয়মমত সরকারী অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পারিবারিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সুবিধার্তে সেই একই দিনে ছুটি থাকবে।

(ছ) 'চ'-তে বর্ণিত ছুটি ছাড়া অন্যান্য ছুটি সবপ্রতিষ্ঠানে একই সময়ে হওয়া অপরিহার্য নয়। স্থানীয় প্রয়োজন এবং ছাত্র-শিক্ষকের স্বার্থ বিবেচনা করে বিশেষ প্রতিষ্ঠান নিজ বিবেচনা মত এসব ছুটির দিন ধার্য করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে অঞ্চলে বর্ষাকালীন বন্যা একটা নিয়মিত ঘটনা সে অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রীষ্মাবকাশ বা শীতকালীন ছুটির পরিবর্তে বর্ষাকালে বন্যার সময় ছুটি দেওয়াই যুক্তিসংগত।

(জ) ফসল বোনা এবং কাটার সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকা অভিপ্রেত এ রকম একটি মত প্রচলিত আছে। আমরা মনে করি যে পারিবারিক পেশা বা বৃত্তিতে পড়ুয়ারা অভিভাবকদের সক্রিয় সাহায্য করলে অভিভাবকদের শ্রমলাঘব বা আর্থিক সাহায্য ছাড়াও পড়ুয়াদের অধিকতর লাভ হতে পারে। সে লাভ হবে বাস্তব জীবনধারার সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং উৎপাদন কার্যে নিজ শ্রম বিনিয়োগের তৃপ্তি। সেজন্য আমরা মনে করি যে ফসল বোনা এবং কাটার সময় স্কুলে ছুটির ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের সাহায্য করতে পারে।

(ঝ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজের দিনের সংখ্যা হবে ২৪৫ দিন। পরীক্ষা গ্রহণ, সামাজিক বা উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করাসহ নিয়মিত লেখাপড়ার জন্য এই সময় কিভাবে ব্যয়িত হয় সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য ও ব্যাখ্যাদানের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে।

(ঞ) নির্ধারিত ১২০ দিনের অতিরিক্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে না। পরিকল্পনার বাইরে কোন ছুটি দিতে হলে, যতদিন তেমন নতুন ছুটি দেওয়া হবে ততদিন নির্ধারিত ছুটি থেকে কাটা যাবে, যাতে প্রয়োজনীয় ছুটির সমন্বয় করা যায় এবং মোট ছুটি ১২০ দিনের অধিক না হয়।

২৭.৬. বর্তমানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুরু হয়। তার ফলে স্কুল পর্যায় থেকে কলেজ পর্যায়ে যাওয়ার মাঝখানে শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু সময়ের অপচয় হয়, অথচ স্কুল ও কলেজে শিক্ষাবর্ষ একই সময়ে শুরু হলে এ সময় শিক্ষাকার্যে লাগানো যাবে। তাই আমরা সুপারিশ করি যে দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ একই সময়ে শুরু হোক।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি

সারাংশ

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ছুটির একই নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ছুটির দিনের সংখ্যা সমান নয়। নির্ধারিত ছুটি ছাড়াও নানা কারণে বহুদিন অনির্ধারিত ছুটি দেওয়া হয় অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি না দিয়েও কাজের দিনকে প্রকৃতপক্ষে ছুটির দিনে রূপান্তরিত করা হয়। একই স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক মোট কাজের দিনের সংখ্যা সমান নয়। এমন কি সাপ্তাহিক ছুটি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই দিনে হয় না। অত্যধিক ছুটির ফলে পাঠক্রমে নির্দিষ্ট বিষয়াদি অপঠিত থাকা অবস্থাতেই শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়া যে শিক্ষার্থীদের অধঃগতির উল্লেখযোগ্য কারণ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। (২৭.১—২৭.২)

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা মনে করিঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটিসহ বার্ষিক অনধিক একশত বিশদিন ছুটি দেওয়ার নিয়ম পালন করতে হবে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজের দিনের সংখ্যা হবে বছরে দুইশত পঁয়তাল্লিশ দিন।

(খ) সাপ্তাহিক ছুটি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একই দিনে হবে। অন্যান্য ছুটি সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একই দিনে হওয়া অপরিহার্য নয়। স্থানীয় প্রয়োজনে এসব দিন ধার্য করা যেতে পারে।

(গ) শিক্ষাবর্ষ মোটামুটি সমান দুই ভাগে বিভক্ত হবে। দ্বিতীয় ভাগের শেষের দিকে বার্ষিক পরীক্ষার সময় বহিঃপরীক্ষাও গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা উচিত।

(ঘ) ফসল বোনা ও ফসল কাটার সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘ বন্ধ থাকলে পড়ুয়ারা অভিভাবকদের সাহায্য করতে পারে। এভাবে তারা বাস্তব জীবনধারার সংগে প্রত্যক্ষ-ভাবে পরিচিত হবে এবং উৎপাদন কার্যে নিজ শ্রম বিনিয়োগ তৃপ্তি লাভ করবে।

(ঙ) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ একই সময় শুরু হওয়া উচিত। (২৭.৩.—২৭.৬.)

অধ্যায় ২৮

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী:

২৮.১. আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণের দায়িত্ব শিক্ষা পরিদপ্তরের, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনার দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডসমূহের এবং উচ্চতর শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত। আর বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রচনা ও বিতরণ করা হয়।

২৮.২. বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সময়ের পরিবর্তন ও মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে দ্রুত সমৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপুল রূপান্তর ঘটছে, আমাদের দেশ এখনও তার প্রভাব থেকে যেন বাইরে রয়েছে। প্রায় এক যুগ পূর্বে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছিল, সামান্য রদবদল করে মোটামুটিভাবে তাই আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে চালু রাখা হয়েছে। এ ধরণের রক্ষণশীল, প্রাচীনপন্থী, গতানুগতিক ও নিম্ন-মানের উপকরণ একটি প্রগতিশীল দেশের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ মানের শিক্ষার সহায়ক হতে পারে না।

২৮.৩. বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন আশি লাখের উপরে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে আগামী কয়েক বছরে এ সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আগামী দিনের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের উন্নতিবিধানে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী:

২৮.৪. 'প্রাথমিক শিক্ষা' অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং এই পর্যায়ের শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করলে তার সার্বজনীনত্ব রক্ষিত হতে পারে না। তাই আমরা সুপারিশ করেছি যে প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।

২৮.৫. একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাই পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য আবশ্যিক ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমিকে দুর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করে গড়া সম্ভব নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠক্রম নির্ধারণ করার সময় শিক্ষার্থীর নৈতিক, দৈহিক, মানসিক এবং ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন ও সর্বতোমুখী বিকাশ যাতে সাধিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর পক্ষে যে সমস্ত অপরিহার্য মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে, সেগুলির সংগে তার যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী এমনভাবে তাকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হতে পারে। নাগরিকতাবোধ ও সামাজিক কর্তব্যবোধের সংগে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশ-প্রেম এবং দেশের উন্নয়নের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত সেবার মনোভাব যাতে জাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অধ্যয়ন, শ্রম

সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিগত সদাচার, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কৌতুহলবোধের অভ্যাসসহ শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়া পত্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। শরীর চর্চার প্রতি শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ ঝোঁক বা আকর্ষণ জাগ্রত করে শারীরিক সুস্থতা ও শারীরিক উৎকর্ষবিধানের ক্ষেত্রে খেলাধূলার ভূমিকা সম্পর্কে তাকে সজাগ করে তুলতে হবে। সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ শিক্ষার্থীর মনে যাতে বপন করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৮.৬. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স সাধারণতঃ পাঁচ বছর হতে তের বছর হবে। পাঁচ বছর হতে তের বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমার শিক্ষাকোর্স স্বাভাবিকভাবেই এ বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক গ্রহণ ক্ষমতার উপযোগী হতে হবে এবং এরূপ একটি পর্যায় পর্যন্ত মৌলিক কলা-কৌশলসমূহের বিকাশসাধনের উপযোগী করে এই কোর্স প্রণয়ন করতে হবে যা ছেলেমেয়েদের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের অতি স্বাভাবিক অবস্থার সংগে খাপ খেয়ে চলার ব্যাপারে যথোপযুক্ত হবে। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, ছেলেমেয়েদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সংগতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম ও পঠিতব্য বিষয় হবে বাংলা ও অংক। শরীর চর্চা ও খেলাধূলা, কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত এবং চিত্রাংকনও সংগে থাকবে। তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম ও পঠিতব্য বিষয় হবে বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল এবং সাধারণ বিজ্ঞান। শরীরচর্চা ও খেলাধূলা, কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত এবং এই সংগে চিত্রাংকনও থাকবে। ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম ও পঠিতব্য বিষয় হবে বাংলা, একটি দ্বিতীয় ভাষা (যেমন, ইংরেজী, আরবী ইত্যাদি), অংক, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান এবং ধর্ম শিক্ষা অথবা নীতিবিষয়ক শিক্ষা। সংগে থাকবে শরীর চর্চা ও খেলাধূলা, কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত এবং চিত্রাংকন। প্রথম হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষা পদ্ধতি কর্মমুখী হবে এবং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে। হাতের কাজ, যেমন বাগানের কাজ, স্কুল ঘরের পরিচ্ছন্নতা, খেলনা তৈরী, মাটির মডেল তৈরী, তাঁতের কাজ, বই বাঁধানো, বেত-বাঁশের কাজ, কাপড় রঞ্জন, সেলাই ইত্যাদি কাজ ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে করবে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কৃষি-সম্প্রসারণ কাজেও অংশ গ্রহণ করবে। হাতের কাজে বা হাত ব্যবহারের উপর সবচেয়ে কম গুরুত্ব আরোপ করাকে আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি মূল দুর্বলতা বলা যায়। বস্তুতঃ এক হিসাবে এ দুর্বলতা আমাদের সমাজেরই একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে। এই কারণে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সহজ ধরণের হাতের কাজের কোর্সকে সকল ছেলেমেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছি। এই কোর্সের সংগে কৃষি-সম্প্রসারণে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থাও থাকা উচিত যাতে ছেলেমেয়েরা জমি ও শস্যাদির চাষ সম্পর্কে কতকটা প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

২৮.৭. জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ সব চেতনার বিকাশ-সাধনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক স্কুলেই ছেলেমেয়েদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট গঠিত হয় এবং প্রাথমিক স্কুলেই আমাদের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। অতএব সামগ্রিকভাবে স্কুল জীবনের এই পর্যায়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির চেতনা গড়ে তোলাই হবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এই পর্যায়ের পাঠক্রম প্রণয়ন করার সময় দেখতে হবে তাতে যেন আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঠিক প্রতিফলন হয়।

২৮.৮. আমাদের মতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই। ভাষা শিক্ষার অতিরিক্ত বোঝা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ দশ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়াতে গেলে তাদের জন্য তা বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের মানসিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তদুপরি অধিক ভাষা শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হলে শিক্ষার সময়সূচী তার সংগে এমনভাবে তাল গোল পাকিয়ে যাবে যে আমাদের সুপারিশকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং আমাদের মতে ষষ্ঠ শ্রেণী হতে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার এবং বর্তমান বিশ্বের

পরিপ্রেক্ষিতে সহায়ক জ্ঞানলাভের প্রয়োজনে মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অন্য একটি ভাষা শিক্ষা করা উচিত। এই পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় একটি ভাষা বাধ্যতা-মূলক ভাবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উত্তমরূপে শিখতে হবে। তদ্বগতভাবে এই ভাষা ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত, পালি, ফরাসী, রুশ, জার্মান, জাপানী চীনা ইত্যাদি যে-কোন একটি হতে পারে। কিন্তু নিতান্ত বাস্তব পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে প্রাধান্য লাভ করবে। প্রয়োজনবশতঃ তৃতীয় একটি ভাষাও এ পর্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে শেখানো যেতে পারে।

২৮.৯. আমাদের বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যধিক পরিমাণে নির্ধারিত মানের এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় স্বার্থ বা প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা নাই। অনুরূপভাবে স্থানীয় জনসমাজের পেশা বা জীবনধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় বিষয়গুলির ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থাও এই শিক্ষা পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। এর অর্থ এই যে, আমাদের শিক্ষকগণ অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহের উপর নির্ভর করেন এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে গ্রামসমূহ ও আশে-পাশের জনসমাজের সম্পদ ও জীবন ধারা হতে উপকরণ সংগ্রহে যথার্থভাবে সচেষ্ট নন। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এর অর্থনীতি স্বভাবতঃ কৃষিনির্ভর। এছাড়া দেশকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য শিল্পায়িত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে।। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সময় আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এবং শিল্পব্যবস্থার কথা মনে রাখতে হবে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে স্থানীয় জনসমাজের সম্পদ, পেশা ও জীবনধারা হতে উপকরণ সংগ্রহ করে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকরা সচেষ্ট থাকেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী:

২৮.১০. শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রী শিক্ষার পূর্ববর্তী কার্যক্রম বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষাকাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তর-কালের শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সুসংহত করারা প্রয়াস মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্গত হবে। জাতির, দেশের এবং সামাজিক প্রগতির জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াসে দৃষ্টিভংগীর প্রসারতা ও গভীরতা সৃষ্টি করা হবে এর অন্যতম লক্ষ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যত কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রতিফলন পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজন।

২৮.১১. মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে এমনভাবে প্রণয়ন ও উন্নত করতে হবে যাতে আমাদের দেশ ও সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি ঘনিষ্ঠতর লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তার সংগে সম্পর্কিত হতে পারে। যে পর্যায় পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে একই বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে হবে, সে পর্যায় সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে। জীবনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির প্রভাব, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাবার জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞানের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে জন্য অনেকে এ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সে জ্ঞান আহরণের জন্য বার বছরের শিক্ষা প্রয়োজন। কাজেই সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা বার বছরের অর্থাৎ সতর বছর বয়স পর্যন্ত একই বিষয়সমূহে এবং একই প্রথায় হওয়া উচিত। এ ছাড়াও এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, প্রথম দিকের পর্যায়ে শিক্ষার গতি পরিবর্তন ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির আয়োজন করলে তা শিক্ষাগত ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে সুষ্ঠু ও দৃঢ়ভিত্তিক হবে না। যাঁরা এই মতের বিরোধিতা করেন তাঁরা বলেন যে, প্রাক-কিশোর পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হতে শুরু করে এবং সেজন্য তার বিকাশের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকন্তু রাষ্ট্র ও পিতামাতার

আর্থিক সংগতি এমন যে, তারা সকল বালক-বালিকাকে বার বছর শিক্ষা বা সতের বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাদান করতে পারেন না। কাজেই যাদের প্রথম দিকেই শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয় তাদের ও জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে।

২৮.১২. শিক্ষাবিদদের মধ্যে এরূপ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বার বছরের শিক্ষার শেষে নয় বরং আট ও দশ বছরের শিক্ষার শেষে শিক্ষার গতি পরিবর্তনের সুযোগ-সুবিধা বিধান করতে হবে। আমরা এই মত গ্রহণ করে সুপারিশ করেছি যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রম দুটি মৌলিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হোক। প্রথমতঃ দ্রুত উন্নয়নশীল সমাজে উপযুক্ত ও সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যে সব জ্ঞানের প্রয়োজন, সে সব বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কতকগুলি বাধ্যতামূলক বিষয় থাকবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পাঠক্রমে এমন সব নৈর্বাচনিক বিষয় ও প্রশিক্ষণের বিধান থাকবে যার মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি ও জীবিকা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলবে।

২৮.১৩. এই উদ্দেশ্যে আমরা দুটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছি। এ প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা হলে আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করা হবে। আমাদের বিশ্বাস এ ব্যবস্থা দুটির ফল সুদূর প্রসারী হবে। প্রথম ব্যবস্থাটি হল আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বহু স্কুলকে বহুমুখী (মালটিলেটারাল) বিদ্যালয়রূপে উন্নীত করতে হবে। এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মৌলিক বিষয়গুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি ঐচ্ছিক বা নৈর্বাচনিক বিষয়, বিশেষ করে ব্যবহারিক শিল্পসংক্রান্ত ও বৃত্তিমূলক বিষয়, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে যাতে অষ্টম শ্রেণীর অধ্যয়ন সমাপ্তির পর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের তত্ত্বাবধানে বালক-বালিকাগণ তাদের প্রবণতা ও আকাঙ্খার উপযোগী এবং আমদের সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের সংগে অধিকতর সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় বেছে নিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে। এই শিক্ষার সময় কাল দুই (নবম ও দশম শ্রেণী) হতে তিন (নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী) বছরের হবে। কর্মকুশল ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী তৈরী করা এই শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়াসে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নবম হতে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনান্তে বৃত্তিজীবি হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য আমরা বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেছি। এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা সবাই নবম ও দশম শ্রেণীতে ৩ বা ৪টি নির্দিষ্ট বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে, যেমন বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে-কোন একটি বৃত্তি নির্ধারণ করে সেই বৃত্তিভুক্ত পাঁচ বা ছয়টি পেপার অধ্যয়ন করবে। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্সগুলির তালিকা "মাধ্যমিক শিক্ষা" অধ্যায়ে যোগ করা হয়েছে। যে সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষা নবম ও দশম শ্রেণী অর্থাৎ দুই বছরে শেষ করা যাবে, দশম শ্রেণীর শেষে তাদের মূল্যায়নের জন্য বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা সার্টিফিকেট প্রদান করবে। যে সকল বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য তিন বছরের প্রয়োজন হবে তার জন্য দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থী নির্বাচিত বৃত্তিতে এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগদান করবে। একাদশ শ্রেণীর শেষে মূল্যায়নের জন্য বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

২৮.১৪. বর্তমানে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যার চাপ বেশী। কারণ, বয়সের দিক দিয়ে এ সময়ে তারা কোনরূপ কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না এবং উপযোগী কোন বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও দেখা যায় না। আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী যখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানে হাতে-কলমে অর্থাৎ ব্যবহারিক কলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে, তখন হতে বর্ধিত সংখ্যক বালক-বালিকা ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে সৃষ্টিকার আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপন করবে। এ সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি সুবিধাজনক বিকল্প শিক্ষা কোর্সের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক

এবং এর ফলে সাধারণ শিক্ষা লাভের সংগে সংগে তারা কারখানা ও হাতে-কলমে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহেও প্রশিক্ষণ লাভে সমর্থ হবে। কাজেই শিক্ষার্থীরা যাতে সরাসরি বৃত্তিমূলক জীবনে প্রবেশ অথবা শিক্ষানবীশ কোর্স গ্রহণে সমর্থ হয়, তদুদ্দেশ্যে আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্সের সুপারিশ করেছি। যে সকল ছাত্র বৃত্তিমূলক বিষয়ে আগ্রহ ও প্রবণতার পরিচয় দেবে তাদের বাছাই করে নেবার সময় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে দেশে কিছু সংখ্যক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তন রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাদান কার্যসূচীর অভাবে ঐগুলিতে বিশেষ কার্যকরী ফল লাভ হচ্ছে না। তাই আমরা প্রস্তাব করেছি যে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

২৮.১৫. আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব হল যে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তিত হবে এরূপ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ) উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়নের প্রস্তুতি দানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ সাধারণতঃ দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এই বিদ্যালয়সমূহে যুক্ত থাকবে। সব শিক্ষার্থী এ পর্যায়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে ৫ বা ৬টি বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে, যেমন বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, ইতিহাস ও ভূগোল। এ ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের থেকে ইচ্ছানুযায়ী দুই বা তিনটি বিষয় নির্বাচন করবে। তদুপরি এসব শিক্ষার্থীরা একটি বৃত্তিমূলক বিষয়েও এক পেপার অধ্যয়ন করবে। এই নির্দিষ্ট বিষয়-সমূহের তালিকা "মাধ্যমিক শিক্ষা" অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা সার্টিফিকেট প্রদান করবে। দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নের প্রক্কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যত শিক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী সাধারণ শিক্ষাক্রমসমূহের যে-কোন একটিতে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বাংলা এবং ইংরেজী বাধ্যতামূলক-ভাবে অধ্যয়ন করবে। শিক্ষার্থীরা আর চারটি বিষয় নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ হতে ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচন করবে। এ নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের তালিকাও "মাধ্যমিক শিক্ষা" অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ করা হবে এবং পরীক্ষা পরিচালনা সংস্থা সার্টিফিকেট প্রদান করবে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে এই রিপোর্টের অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৮.১৬. আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের সবগুলিকেই প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় এবং সে সব বিষয়ের জন্য প্রায় সমান সংখ্যক পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কম সংখ্যক বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শিক্ষার্থীরা তা বোঝাস্বরূপ মনে করে। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় সময়ের দিক হতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি বিভিন্নরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে এবং এগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন বছরে প্রবর্তিত ও সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। কয়েকটি বিষয় চালু করার অর্থ এই নয় যে যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত সব চালু বিষয়গুলিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সে হিসাবে শিক্ষাদান করতে হবে। একজন শিক্ষিত নাগরিকের পক্ষে যে সব বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন সে সব বিষয়ে অন্ততঃ মৌলিক জ্ঞান বিতরণের নিশ্চয়তা বিধানই হল মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

২৮.১৭. পাঠক্রম সম্পর্কে চিন্তাধারার এ দুটি পন্থা প্রয়োগ করিলে দেখা যাবে যে এক বিষয় অপেক্ষা অপর বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন বছরে বিষয়গুলির অধ্যয়নে নিয়োজিত পিরিয়ড সংখ্যায় বিভিন্নতা সৃষ্টি করে এবং বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে কতকগুলি বিষয়কে একত্রিত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্তির সময়ের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারীদের দায়িত্ব ঃ

২৮.১৮. যাঁরা বিস্তারিত পাঠক্রম প্রণয়নের পরিকল্পনা করবেন তাঁদের বিভিন্ন পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়বস্তু চাপাবার এবং যে সকল শ্রেণীর জন্য এগুলি অভিপ্রেত সে সকল শ্রেণীর পক্ষে পাঠক্রমগুলিকে কঠিন করে তোলার প্রবণতা প্রতিরোধ করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রম এমন ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে পূর্ববর্তী পর্যায়-গুলির সাথে পরবর্তী পর্যায়গুলির যোগসূত্র রক্ষিত হয়। অধ্যয়নের সময় এবং সাফল্যের পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং বিদ্যালয়-ব্যবস্থা ও তার পৃথক্ পৃথক অংশের জন্য অখণ্ড ও যথোপযুক্ত ভাবে সংগঠিত পাঠক্রম প্রণয়নের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে।

২৮.১৯. বিশেবর সাধারণ প্রবণতার সঙ্গে তাল রক্ষা করে বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষাদান ব্যবস্হাকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে। বিজ্ঞান ও ফলিত শিল্প বিজ্ঞানে দক্ষতা জাতির অগ্রগতির পরিমাণ নির্ধারণ করে বলে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ-ক্রমে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষাদানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্হান দেওয়া অত্যাবশ্যক। অবশ্য ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়, সমাজ সম্পর্কিত বিদ্যা এবং পাঠক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। তথাপি এদের একটা অত্যন্ত বিশেষ মর্যাদা থাকা প্রয়োজন। নবম ও দশম শ্রেণীতে অঙ্কশাস্ত্রের দুটি পর্যায় থাকা দরকার—সাধারণ গণিত যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক এবং উচ্চতর গণিত যা বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত থাকবে। সে রকম নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের দুটি পাঠক্রম থাকা উচিত। এদের একটি থাকবে সাধারণ বিজ্ঞান যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অপরটি থাকবে উচ্চতর বিজ্ঞান, উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য।

২৮.২০. ব্যবহারিক আর্ট বা শিল্পকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত সমঝোতা ও হাতের কাজের দক্ষতা বোঝাবার জন্য ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের বহু সংখ্যক বালক-বালিকাদের কাছে এর অর্থ হবে কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানের উন্মেষ। বাস্তব শিল্পের দ্বারা কারুশিল্প কর্ম এবং হাত ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার দক্ষতা বুঝায়। এর দ্বারা টাইপিং, ষ্টেনোগ্রাফি ও হিসাবরক্ষণ বিদ্যা প্রভৃতি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় এবং বালিকাদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সাধারণ নার্সিং ইত্যাদিও বুঝায়। এসব বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বিশেষ কর্মকক্ষ যুক্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্হাসহ একে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সাধারণ হস্তচালিত ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে কাঠের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, ধাতুর কাজ, বিজলীর কাজ, যন্ত্রের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা-দানের ব্যবস্হা রাখতে হবে। বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে কারুশিল্প, নৃত্য ও অভিনয় শিল্প, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, সূচের কাজ ও সূচীশিল্প, তাঁতশিল্প, সাবানশিল্প এবং অন্যান্য উপযুক্ত শিল্প-সম্মত হাতের কাজ সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া আরও অনেক বৃত্তিমূলক বিষয় রয়েছে সেগুলোর শিক্ষাদানের জন্য আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবস্হা থাকা প্রয়োজন, যেমন শিক্ষক-শিক্ষণ, গ্রন্হাগার সহকারীশিক্ষণ, বই বাঁধানো, ড্রাফটসম্যানশিপ, অঙ্কনবিদ্যা, গ্রাফিক আর্টস, প্লাষ্টিক শিল্প, মোটরগাড়ী মেরামত, রেডিও মেরামত, ঘড়ি মেরামত, গৃহ নির্মাণ, বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও সেলসম্যানশিপ, কেটারিং ও হোটেল ব্যবস্হাপনা, মৎস্য বিজ্ঞান, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, মুদ্রণশিল্প, কৃষিবিদ্যা, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন ইত্যাদি।

২৮.২১. এই কোর্সগুলি পরবর্তী বৃত্তি বা পেশাসমূহের সঙ্গে যথাসম্ভব সম্পর্কযুক্ত হবে। এই সম্পর্ক আবার এমন হবে যেন একজন শিক্ষার্থী কোর্সসমূহের একটি সমাপনের পর প্রয়োজন-বোধে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এজন্য মৌলিক সাধারণ শিক্ষার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও আমরা সুপারিশ করেছি। এ সকল উদ্দেশ্যসাধন করতে হলে পাঠ্য বিষয়সমূহের সুষ্ঠু ও সতর্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

২৮.২২. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রুপ এমনভাবে গঠিত হবে যাতে গ্রুপগুলি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ যে সকল ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ করতে চায়, তাদের জন্য পদার্থ বিদ্যা, গণিত, রসায়ন বিদ্যা ছাড়াও ড্রইং-এ একটি কোর্স থাকা উচিত। এ পর্যায়ে কৃষি, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ বৃত্তিমুখী ও কারিগরি কোর্সের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এতে শিক্ষার্থীদের পেশা বা বৃত্তিপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে এবং পেশাদারী শিক্ষাদান কলেজগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিষয়াদি শিক্ষাদানের ঝামেলা হতে অনেকখানি মুক্তি পাবে।

২৮.২৩. আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষায় অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত উচ্চমান অর্জন করতে হবে। মাতৃভাষা বাংলায় তাদের দক্ষতা যথেষ্টভাবে ভবিষ্যত শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন ও তারা যে বৃত্তি গ্রহণ করবে তাতে সফলতা লাভে কার্যকরভাবে সাহায্য করবে। বর্তমানে বাংলা ভাষা যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তার যথেষ্ট উন্নয়ন প্রয়োজন। যে পরিমাণ সময় এজন্য ব্যয়িত হচ্ছে তাও যথেষ্ট নয়। ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাংলা ভাষায় অধিক পারদর্শী হতে পারে তজ্জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদিও মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে তথাপি বহু পেশা এবং অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যারা উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চায় তাদের জন্যও এ একটি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বিশেষ। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে তার কার্যকারিতা এবং একটি জীবন্ত ভাষা হিসাবে এর ব্যবহারের উপর অধিক জোর দিতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষার যে ভূমিকা রয়েছে তার গুরুত্ব সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজনানুসারে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত সময় দিতে হবে। এ বিবেচনায় মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করা দরকার। প্রয়োজন হলে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটিঃ

২৮.২৪. চিরকালের জন্য উপযোগী পাঠক্রম প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের পরিধি এবং সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমকে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়। আগামী দশ বছরকাল একথা আমাদের দেশের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা প্রচলিত শিক্ষাক্রম হতে উন্নতির পথে অগ্রসর হব এবং এই রিপোর্টে যে সব পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন অপরিহার্য। তাই আমাদের অভিমত যে আমাদের প্রস্তাবাবলীর আলোকে বর্তমান ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনার জন্য এই রিপোর্টের কার্যকরীকরণ ব্যবস্থার অংশ হিসাবে অবিলম্বে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী (কারিকুলাম ও সিলেবাস) কমিটি গঠন করা উচিত।

সাধারণ উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদির শিক্ষাক্রমঃ

২৮.২৫. সাধারণ উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যা, শিক্ষক-শিক্ষণ, বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির শিক্ষাক্রম বিষয়ে এই রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ব্যুরো এবং শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাক্রম বিভাগঃ

২৮.২৬. শিক্ষাক্রমসংক্রান্ত বিষয়ে ক্রমাগতভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণা চালাবার জন্য আমাদের শিক্ষাবোর্ডগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্থায়ী বিভাগ সৃষ্টি করা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এসব বিভাগের পরামর্শ করার স্বাধীনতা থাকবে। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজ যাতে সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গভাবে করা যায় তার জন্য প্রস্তাবিত বিভাগগুলি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২৮.২৭. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উন্নয়নসাধনের জন্য একটি "শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ব্যুরো" স্থাপন করা প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য সরাসরি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন নয় বরং বিভিন্ন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উন্নয়নের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দানই হবে সুপারিশকৃত ব্যুরোর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আমূল সংস্কারের যে আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেজন্য এই রিপোর্টে বর্ণিত মূলনীতি ও কাঠামোর ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি গঠন করার জন্য উপরে সুপারিশ করা হয়েছে। এর পরে বছরের পর বছর বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকবে।

পাঠ্যপুস্তকঃ

২৮.২৮. পৃথিবীর সর্বত্র পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে কম অথবা যে সব দেশে পাঠযোগ্য অতিরিক্ত বই-পুস্তক প্রয়োজনমত পাওয়া যায় না সে সমস্ত দেশে পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই উভয়বিধ অবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশে বিরাজমান। কাজেই আমাদের শিক্ষার্থীদের নিকট ন্যায়সংগত মূল্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করার উপায় সতর্কতার সংগে নির্ধারণ করতে হবে।

২৮.২৯. পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের সংগে কতকগুলি বিষয় জড়িত রয়েছে। সার্থক পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যসূচীর উপাদান এমনভাবে পরিবেশিত হয় যে তা শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য হয়। বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইহা অধিকতর জ্ঞান অর্জনের অবিচ্ছিন্ন সূত্র ও প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যারা পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেনঃ

২৮.৩০. একটি উত্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য যে বিভিন্ন রকমের প্রতিভার প্রয়োজন হয় তা স্বভাবতঃ একজন লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এজন্য সাধারণতঃ কতিপয় বিশেষজ্ঞের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা পাঠ্যপুস্তক রচনা করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যে শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হচ্ছে সে পর্যায়ের একজন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের মধ্যে থাকবেন। সে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং তাদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কিভাবে বিভিন্ন উপাদান অত্যন্ত কার্যকরভাবে সন্নিবেশিত করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করবেন। দ্বিতীয় জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং পাঠ্যপুস্তকে যে সমস্ত উপাদান সন্নিবেশিত হবে তার গুরুত্ব ও যথার্থতা নির্ণয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পাঠ্যপুস্তক লিখবার প্রকৃত দায়িত্ব এমন একজন ব্যক্তির উপর দিতে হবে যিনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে সক্ষম। তদুপরি পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের মধ্যে এমন একজন শিল্পী থাকবেন যিনি প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন, মানচিত্র এবং অন্যান্য সচিত্র উপাদানের সাহায্যে কঠিন বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট এবং কেন্দ্রীয়ভাবের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি সুসম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক রচনা এরূপ একটি দলের কাজ হওয়া উচিত।

২৮.৩১. বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে কার্যকরভাবে পাঠ্য বিষয় তুলে ধরার জন্য উপরিউক্ত পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা শুধু এদেশের নয় যাতে অন্যান্য দেশেরও পাঠ্যপুস্তক লেখকদের চিন্তাধারা ও রচনারীতি পাঠ্যপুস্তক রচনার বেলায় স্বাধীনভাবে অনুসরণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য

তাঁদের ব্যবহারার্থে দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে গবেষণার সংক্ষিপ্তসার, শিক্ষাদানসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষকদের মন্তব্য, জ্ঞানার্জন ব্যবস্থায় গবেষণার ফলাফল ও বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তার উল্লেখসম্বলিত ক্ষুদ্র অথচ সঠিক সংকলনের নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

২৮.৩২. অতএব এখানে প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হল পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহী বিশেষজ্ঞদের একত্র সমাবেশ করা, শিক্ষাদানের উপযোগী নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য তাঁদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে যেগুলি সর্বোত্তম সেগুলি নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত পুস্তকগুলি এমনভাবে সম্পাদন করা, যাতে তাদের মধ্যে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সংহত ও প্রগতিশীল জ্ঞানের অভিজ্ঞতা পরিবেশন করা হয়।

পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনাঃ

২৮.৩৩. এরপর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে কি উপায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরূপ পুস্তক প্রকাশের নিশ্চয়তা বিধান করবেন যা উৎকর্ষ ও বহিরংগের দিক দিয়ে যথোপযুক্ত এবং স্বল্পমূল্যে সারা বছর বাজারে সহজলভ্য হয়। এ সমস্যা আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষদের নিকট বহুদিন যাবত উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে।

২৮.৩৪. প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নির্ধারণের ব্যাপারে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রথমটা হল বোর্ড পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বেশীর ভাগ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করান। অবশ্য প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেদের তত্ত্বাবধানে বোর্ড অব এডিটর্স-এর সাহায্যে বোর্ড পাঠ্যপুস্তক রচনা করান। তদুপরি প্রণীত পুস্তকের সমালোচনা ও উৎকর্ষ নির্ধারণের জন্য বোর্ড অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেন। এরূপ সমালোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ সমাধা করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেক্সটবুক বোর্ড পুস্তক জমা দেওয়ার জন্য গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের আমন্ত্রণ জানান। এগুলিরও সমালোচনা ও উৎকর্ষ নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়। এরূপ সমালোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে পুস্তকসমূহ নির্বাচন এবং নির্ধারণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে পাঠ্যসূচীর আওতাভুক্ত প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করে পাঠ্যপুস্তক থাকে।

২৮.৩৫. বর্তমানে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক বিষয়ে মাত্র একটি করে পাঠ্যপুস্তকের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা শিক্ষানীতির দিক থেকে অযৌক্তিক। এও সত্য যে অনেক পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ গুণের অভাব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়ক গ্রন্থাদিরও গুরুতর অভাব রয়েছে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে উপলব্ধি প্রয়োগ ও সৃজনশীলতার প্রসারের পরিবর্তে গতানুগতিকতা ও বোধহীন মুখস্ত বিদ্যার প্রসার ঘটছে।

২৮.৩৬. পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের যে পাণ্ডুলিপি তৈরী করানো হয়, তা যে শিক্ষা বছরে প্রবর্তন করা হবে, অন্ততঃপক্ষে তার দু' বছর আগেই তৈরী হওয়া উচিত। সে পুস্তক যে শ্রেণীর জন্য প্রণীত হবে তা সে শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁদের মাঝে বিলি করা দরকার। এ বিষয়ে দেশের শিক্ষাবিদ ও লেখকদের মতামত গ্রহণ করা উচিত। তারপর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে সেগুলি পুস্তাকারে প্রকাশ করলে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

২৮.৩৭. সাহিত্য পুস্তকসমূহ ছাড়া বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা থাকা উচিত। উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বনে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়ে প্রকাশ করতে পারেন। তদুপরি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একাধিক পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ও নির্বাচনের জন্য পুস্তক প্রণেতা ও

প্রকাশকদের নিকট থেকে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। এগুলির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পর্যালোচনার ব্যবস্থা করবেন এবং পর্যালোচনা ও সমালোচনা ভিত্তিতে সকল শ্রেণীর জন্য প্রতি বিষয়ে কয়েকটি পুস্তক নির্বাচন করা উচিত। এরূপ নির্বাচনের পর এ সকল পুস্তক বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক হিসাবে পুস্তক রচয়িতা অথবা প্রকাশক প্রকাশ করবেন। এ সমস্ত পুস্তকের তালিকা বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহের তালিকার সংগে বিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রকাশিত হবে, অর্থাৎ এ ব্যাপারে সাধারণ নীতি এই হওয়া উচিত যাতে পুস্তক প্রণেতা ও প্রকাশকগণ খোলা বাজারে স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারেন এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক স্বাধীনভাবে লিখিত পুস্তকসমূহ হতে ইচ্ছানুযায়ী পুস্তক নির্বাচন যাতে করা যায়।

২৮.৩৮. বাংলাদেশ স্কুল টেক্সবুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের গ্রন্থ স্বত্ব এবং প্রকাশনা স্বত্বের মালিকানাও বোর্ডেরই থাকা উচিত। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত ও উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বোর্ডের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। বিক্রয় মূল্য, ছাপার কাগজ ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী বোর্ড পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ এবং প্রকাশনার দায়িত্ব প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রকাশকদের উপর অর্পণ করবেন। যেহেতু পাঠ্যপুস্তকের উৎকর্ষ এবং ন্যায্য মূল্যই প্রধান বিবেচ্য, এ কারণে কেবলমাত্র ঐ সকল প্রকাশক অথবা প্রকাশনা সংস্থাকে বোর্ডের নির্বাচিত করা উচিত যাদের উপযুক্ত ছাপাখানা, দক্ষ কর্মচারী এবং পুস্তক পরিবেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পুস্তকের নিম্নমূল্য বজায় রাখার জন্য এবং কাগজ, ছবি ও ছাপার দিক দিয়ে উৎকৃষ্টমানের পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রয়োজনবশতঃ বোর্ড নিজেরাই পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা এবং বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। অনুমোদিত পুস্তকের বেলায়ও ছাপার কাগজ, বিক্রয় মূল্য, বিতরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এমনভাবে নির্দিষ্ট করে দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিম্নমূল্যে উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক যথাসময়ে এবং বছরের সব সময় পায়।

২৮.৩৯. পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড শিক্ষাক্রম, অধ্যয়ন পরিকল্পনা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সমস্যা সম্পর্কিত রেফারেন্স এবং গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করবেন। শিক্ষক সহায়ক পুস্তক, শিক্ষকদের জন্য নির্দেশক পুস্তক এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত অতিরিক্ত উপকরণ প্রকাশের কাজও স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের দায়িত্বের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

২৮.৪০. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশনায় নিযুক্ত অথবা এসব কাজে উৎসাহী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী স্থাপন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। এই সকল লাইব্রেরীতে অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকের যথেষ্ট সংখ্যক নমুনা থাকা উচিত। সে সংগে থাকা উচিত প্রয়োজনীয় অনুবাদ পুস্তক, পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত প্রবন্ধ সম্বলিত সাময়িক পত্রিকা এবং শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিষয় সংক্রান্ত অভিধান।

স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের গঠনঃ

২৮.৪১. বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। কিন্তু যোগ্যতার সংগে কাজ করার জন্য তা আকারে ছোট হবে। ইহা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে থাকবে। পুস্তক লিখন ও গ্রন্থকার নির্বাচন এবং পুস্তক নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে কাজ করে যাবেন। বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ দানের জন্য বোর্ড বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করবেন।

২৮.৪২. উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থীদেরকে ন্যায্য মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যে সকল ব্যক্তি পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে এবং যে সকল সংস্থা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনে পারদর্শী তাঁদের এই কাজে সময় ও শক্তি নিয়োজিত করতে এই প্রস্তাবসমূহ উৎসাহিত করবে। আমাদের এই পরিকল্পনা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে সাহায্য করবে।

২৮.৪৩. এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাঠ্যপুস্তকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা দূর করার জন্য আমাদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠনের কাজ পুরোদমে চলা উচিত। শিক্ষাদান পদ্ধতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির সংগে সংগে পাঠ্যপুস্তকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা কমবে। বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকের স্থান যদিও পূর্বের মত বহাল থাকবে তথাপি আমরা আশা করি যে বিদ্যালয়ের পাঠাগার ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ব্যবহারের সংগে সংগেই পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার চলবে।

২৮.৪৪. শিক্ষার্থীদের বাজারের নিকৃষ্ট অর্থ ও নোট বই ব্যবহারের ফলে আমাদের শিক্ষার মানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। অর্থ ও নোট বইয়ের প্রকাশনা, মুদ্রণ এবং বিক্রয়কে ফৌজদারী আইনে দন্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য করা উচিত। তা ছাড়া যে সকল প্রকাশক, মুদ্রাকর বা পুস্তক বিক্রেতা এ সকল বেআইনী নোট ও অর্থ বইয়ের ব্যবসায় লিপ্ত থাকবে তাদের সরকার, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের পক্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বা বিক্রয় করার অধিকার হতে বঞ্চিত করা উচিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, আদর্শ প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বাজারের নোট বইয়ের আবশ্যকতা অনুভব না করে। এ ব্যাপারে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম।

২৮.৪৫. বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকের পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সকল পাঠাগার হতে শিক্ষার্থীগণকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কিংবা সমগ্র শিক্ষা বছরের জন্য পাঠ্যপুস্তক ধার দেওয়া যেতে পারে। এ সকল পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই ভাল হলে এবং শিক্ষার্থীদের নিকট ধার দেওয়ার সময় ভাল কাগজের মোড়ক ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীগণ এ সকল পুস্তক তিন অথবা চার বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের বেতনের সংগে দেয় পাঠ্যপুস্তকের চাঁদা গ্রহণের মারফত এ ব্যবস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য যে সকল পুস্তকের প্রয়োজন সেগুলির গড়পড়তা মূল্যের ভিত্তিতে এই চাঁদা নির্ধারণ করা যেতে পারে অথবা পুস্তকের পুরা দাম জমা রেখে পুস্তক ধার দেওয়া এবং পুস্তক ফেরত নেওয়ার সময় তার অবস্থা অনুযায়ী উক্ত জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তনের দ্বারাও তা করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পুস্তক হারানো বা নষ্ট করার জন্য মূল্য দিতে হবে। তবে এ সকল পাঠ্যপুস্তক সাবধানে ব্যবহার করলে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বছরের শিক্ষার্থীদের সংগে এ সকল পুস্তকের মূল্য আংশিকভাবে তাদের বহন করতে হবে। এর ফলে অভিভাবকদের অর্থও বাঁচবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থাও হবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক:

২৮.৪৬. আমরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য ও ব্যবহারের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য কোন একটি বিশেষ সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করি না। ইতিমধ্যে বাংলা একাডেমীকে ডিগ্রী ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বাংলা একাডেমী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার সকল পর্যায়ে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা একটি অতি জটিল ও ব্যয়সাধ্য কাজ। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। ডিগ্রী এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে খুব অল্প ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এ পর্যায়ে কতক-গুলি পুস্তক পড়বার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিদ্যালয় পর্যায়ের

শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে অনেক কম বলে পাঠ্যপুস্তকের বেলায় দুর্নীতির বড় একটা সুযোগ থাকে না তথাপি আমরা আশা করি যে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সকল পুস্তক নির্বাচনের বেলায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এ সকল পুস্তক তাদের নিকট স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন।

২৮.৪৭. আমাদের শিক্ষা প্রকল্পকে সার্থক করে তোলার জন্য অবিলম্বে সর্বস্তরে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুপারিশ আমরা করেছি। তাই উচ্চতর পর্যায়ে ব্যাপক হারে বাংলা ভাষায় মৌলিক পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় পাঠ্য-পুস্তকের অনুবাদের জন্য অধিকতর আন্তরিকতার সংগে সুপরিকল্পিত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী এবং দেশের উচ্চমানের কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে তাদের কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে বাংলা ভাষায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তক রচনা, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী ও কারিগরি বিষয়ের পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রণয়ন, অভিধান প্রণয়ন এবং এসবের প্রকাশনার ব্যবস্থা। এ সকল উদ্যোগকে সফল করার জন্য সরকার থেকে বাংলা একাডেমী, সংশ্লিষ্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহকে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী দেওয়ার প্রয়োজন হবে। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দকে ছুটি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করতে হবে। মৌলিক পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদের কাজে দেশের যে সব ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ব্রতী হতে পারেন তাঁরা যাতে এরূপ কাজে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে উদ্যোগী হতে অনুপ্রাণিত হন তার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী অর্থানুকূল্য প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুবাদের পরিবর্তে মৌলিক রচনা অথবা ভাবালম্বনে লিখিত বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এর ফলে মৌলিক চিন্তাধারার সৃষ্টি হবে এবং স্বাধীন কল্পনা শক্তির বিকাশ লাভ ঘটবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদের জন্য আধুনিক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে।

পরিভাষা ও পরিভাষা প্রণয়নঃ

২৮.৪৮. উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের পথে একটি প্রধান বাধা হল পরিভাষার অভাব, কারণ আমাদের ভাষাতে অনেক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শব্দের প্রতিশব্দ নাই। আমরা মনে করি যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শব্দ, সাংকেতিক চিহ্ন, প্রতীকসমূহের অনুবাদ করার প্রচেষ্টা কেবল যে ব্যর্থ হবে তা নয়, চিন্তাধারার প্রগতি এবং জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর হবে। অনুবাদ করার সময় বহু নতুন শব্দ আবিষ্কার করতে হবে। অথচ বিজ্ঞান জগতে এ সকল শব্দের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কাজেই ইংরেজীতে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শব্দ এবং চিহ্নসমূহ গ্রহণ করাই সর্বোত্তম পন্থা বলে আমরা মনে করি। বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষা সার্বজনীন এবং তা বিশেষ কোন জাতির নিজস্ব বস্তু নয়। বর্তমান বিশ্বে বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূলে রয়েছে বিভিন্ন জাতির সমবেত প্রচেষ্টা। আমরা যদি বিজ্ঞানের সর্বজন ব্যবহৃত ভাষা আয়ত্ব ও ব্যবহার না করি, অর্থাৎ বিজ্ঞান জগতে যে সকল শব্দ, সাংকেতিক চিহ্ন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তা যদি আমরা না শিখি তা হলে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতায় আমরা কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারব না। অন্যদিকে যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বজন ব্যবহৃত, সেগুলি ব্যবহার করলে গবেষণা কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সহজ হবে। ক্রমে ক্রমে এই ইংরেজী শব্দ-গুলি বাংলার নিজস্ব শব্দ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এগুলি আর বিদেশী বলে পরিচিত হবে না। ইতিপূর্বে বহু বিদেশী শব্দ আমাদের ভাষাতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলি ক্রমশঃ আমাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

২৮.৪৯. পরিভাষা প্রণয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিভিন্ন বিষয়ে পরিভাষা সম্পর্কে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য বাংলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি এবং আশা করি যে এই পরিভাষা কমিটি পরিভাষা তৈরী করতে এবং তদ্দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচনা করতে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারবেন। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণই নিজেদের উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই কার্য সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। বাংলা একাডেমী পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং পরিভাষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে বাংলা একাডেমীর পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ও কর্মচারীর প্রয়োজন হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

সারাংশ

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীঃ

১। আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণের দায়িত্ব শিক্ষা পরিদপ্তরের, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনার দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডসমূহের এবং উচ্চতর শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত। আর বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট্‌বুক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রচনা ও বিতরণ করা হয়। (২৮.১.)

২। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সময়ের পরিবর্তন ও মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে দ্রুত সমৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপুল রূপান্তর ঘটছে, আমাদের দেশ এখনও তার প্রভাব থেকে যেন বাইরে রয়েছে। প্রায় একযুগ পূর্বে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছিল, সামান্য রদবদল করে মোটামুটিভাবে আজও তাই চালু রয়েছে। এ ধরণের রক্ষণশীল, প্রাচীনপন্থী, গতানুগতিক ও নিম্নমানের উপকরণ একটি প্রগতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের শিক্ষার সহায়ক হতে পারে না। (২৮.২.)

৩। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন আশি লাখের উপরে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে আগামী কয়েক বছরে এ সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এ বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে আগামী দিনের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। (২৮.৩.)

৪। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে যথোপযুক্ত পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করা দরকার। পাঠ্য-সূচীতে রাষ্ট্রীয় চারিটি মূলনীতি, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন হতে হবে। শিক্ষা-পদ্ধতি হবে কর্মমুখী এবং হাতের কাজ হবে বাধ্যতামূলক। (২৮.৫.—২৮.৭.)

৫। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কেবল বাংলা ভাষাই শিক্ষা করবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার্থীরা পড়বে। বাস্তব পরিবেশ ও ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে প্রাধান্য লাভ করবে। যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী পড়বে না তারা এ পর্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ইংরেজী পড়বে। (২৮.৮.)

৬। পাঠক্রম নির্ধারণের সময় আমাদের গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক পরিবেশ এবং শিল্পায়ন প্রচেষ্টার কথা মনে রাখতে হবে এবং পাঠদানকালে পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। (২৮.৯.)

৭। প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সুসংহত করার প্রয়াস মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্গত হবে। দেশের, জাতির এবং সামাজিক প্রগতির জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াসে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ও গভীরতা সৃষ্টি করা হবে অন্যতম লক্ষ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবন-যাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির

কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রতিফলন পাঠ্য-সূচীতে প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে এমনভাবে প্রণয়ন ও উন্নীত করতে হবে যাতে আমাদের দেশ ও সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি ঘনিষ্টতর লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। (২৮.১০.—২৮.১১.)

৮। অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষার গতি পরিবর্তনের সুযোগ দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলতঃ দ্বিধাবিভক্ত হবেঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। উভয় ধারার শিক্ষাক্রমে কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক পঠনীয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বৃত্তিমূলক কোর্সের শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীতে তিন বা চারটি নির্দিষ্ট বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে, যেমন বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে-কোন একটি বৃত্তি নির্ধারণ করে সে বৃত্তিভুক্ত পাঁচ বা ছয়টি পেপার অধ্যয়ন করবে। সাধারণ কোর্সের শিক্ষার্থীরা পাঁচ বা ছয়টি বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে। যেমন কলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান; ইতিহাস ও ভূগোল, বাণিজ্যিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ভূগোল এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজী, গণিত, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা বাধ্যতামূলকভাবে পড়বে। এ ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের থেকে ইচ্ছানুযায়ী দুই বা তিনটি বিষয় নির্বাচন করবে। তদুপরি এসব শিক্ষার্থীরা একটি বৃত্তিমূলক বিষয়েও এক পেপার অধ্যয়ন করবে। দশম শ্রেণীর শিক্ষাসমাপ্তির পর একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নের প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী সাধারণ শিক্ষাক্রমসমূহের যে-কোন একটিতে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজী বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে। শিক্ষার্থীরা আর চারটি বিষয় নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ হতে ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচন করবে। (২৮.১২.—২৮.১৭.)

৯। যারা বিস্তারিত পাঠক্রম প্রণয়ন করবেন তাঁদের বিভিন্ন পাঠক্রমে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়বস্তু চাপাবার এবং যে সকল শ্রেণীর জন্য এগুলি অভিপ্রেত সে সকল শ্রেণীর পক্ষে পাঠক্রমগুলিকে কঠিন করে তোলার প্রবণতা প্রতিরোধ করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রম এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে পূর্বরতী পর্যায়গুলির সাথে পরবর্তী পর্যায়গুলির যোগসূত্র রক্ষিত হয়। (২৮.১৮.)

১০। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষাদানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া অত্যাবশ্যক। অবশ্য ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়, সমাজ সম্পর্কিত বিদ্যা এবং পাঠক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষাদানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। (২৮.১৯.)

১১। উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বিশেষ কর্মকক্ষ যুক্ত করতে হবে এবং যোগ্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ একে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (২৮.২০.)

১২। বৃত্তিমূলক কোর্সগুলি পরবর্তী বৃত্তি বা পেশার সাথে যথাসম্ভব সম্পর্কযুক্ত হতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এ রকমের একটি কোর্স সমাপনের পর বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (২৮.২১.)

১৩। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রতিটি গ্রুপ এমনভাবে গঠিত হবে যাতে গ্রুপগুলি যথাযথ-ভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ যে সকল ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ করতে চায়, তাদের জন্য পদার্থ বিদ্যা, গণিত, রসায়ন বিদ্যা ছাড়াও ড্রইং-এ একটি কোর্স থাকা উচিত। এ পর্যায়ে কৃষি, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ বৃত্তিমুখী ও কারিগরি কোর্সের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এতে শিক্ষার্থীদের পেশা বা বৃত্তিপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এখানেই হয়ে যায়। (২৮.২২.)

১৪। মাতৃভাষা বাংলার শিক্ষাদান আরও উচুমানের হতে হবে। ভাষা হিসাবে ইংরেজীর উপরও অধিকতর জোর দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে আধুনিক ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। (২৮.২৩.)

১৫। (ক) আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আমূল সংস্কারের যে আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেজন্য এই রিপোর্টে বর্ণিত মূলনীতি ও কাঠামোর ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয়ভাবে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী (কারিকুলাম ও সিলেবাস) কমিটি গঠন করা অত্যাবশ্যক।

(খ) শিক্ষাক্রমসংক্রান্ত বিষয়ে ক্রমাগতভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণা চালাবার জন্য আমাদের শিক্ষা বোর্ডগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্থায়ী বিভাগ সৃষ্টি করা উচিত।

(গ) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন সাধনের জন্য জাতীয় "শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ব্যুরো" স্থাপন করা প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য সরাসরি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন নয় বরং বিভিন্ন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা-স্তরের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উন্নয়নের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও উপদেশ দানই হবে প্রস্তাবিত ব্যুরোর মুখ্য উদ্দেশ্য। (২৮.২৪.—২৮.২৭.)

পাঠ্যপুস্তকঃ

১৬। পৃথিবীর সর্বত্র পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে কম অথবা যে সব দেশে পাঠযোগ্য অতিরিক্ত বই-পুস্তক প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না সে সমস্ত দেশে পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই উভয়বিধ অবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশে বিরাজমান। কাজেই আমাদের শিক্ষার্থীদের নিকট ন্যায়সংগত মূল্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করার উপায় সতর্কতার সংগে নির্ধারণ করতে হবে। (২৮.২৯.)

১৭। সার্থক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, লেখক এবং শিল্পির সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। তাঁদের প্রগতিশীল দেশসমূহে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এর জন্য তাঁদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার। (২৮.৩০.—২৮.৩২.)

১৮। সাহিত্য পুস্তক ছাড়া কোন পাঠ্যবিষয়ের জন্য মাত্র একটি করে পাঠ্যপুস্তকের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা শিক্ষানীতির দিক থেকে অযৌক্তিক। ,অধ্যয়নারম্ভের দু' বছর পূর্বে পাঠ্য-পুস্তকটি তৈরী এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য বিলি হওয়া উচিত যাতে একে ত্রুটিমুক্ত করা যায়। টেক্সট্‌বুক বোর্ড একটি মাত্র পুস্তক প্রণয়ন করাতে পারেন। তবে এতদসংগে লেখক ও প্রকাশকদের কৃত বই থেকে নির্বাচিত কতেক পাঠ্যপুস্তকও অনুমোদন করবেন। প্রকাশনা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা স্বল্প মূল্যে বই পায়। (২৮.৩৪.—২৮.৩৮.)

১৯। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও টেক্সট্‌বুক বোর্ড শিক্ষাক্রম, অধ্যয়ন পরিকল্পনা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সমস্যা সম্পর্কিত রেফারেন্স এবং গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করবেন। শিক্ষক সহায়ক পুস্তক, শিক্ষকদের জন্য নির্দেশক পুস্তক এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত অতিরিক্ত উপকরণ প্রকাশের কাজও টেক্সট্‌বুক বোর্ডের দায়িত্বের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। (২৮.৩৯.)

২০। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশনায় নিযুক্ত অথবা এসব কাজে উৎসাহী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী স্থাপন করা উচিত। (২৮.৪০.)

২১। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট্‌বুক বোর্ড প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। এ বোর্ড স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে থাকবেন। পুস্তক লিখন ও গ্রন্থকার নির্বাচন এবং পুস্তক নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কার্য নির্বাহি পরিষদের মাধ্যমে কাজ করবেন। বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শদানের জন্য বোর্ড বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করবেন। (২৮.৪১.)

২২। অর্থ ও নোট বইয়ের প্রকাশনা, মুদ্রণ এবং বিক্রয়কে আইনতঃ দণ্ডণীয় অপরাধরূপে গণ্য করতে হবে এবং অপরাধীদেরকে পাঠ্যপুস্তক, প্রকাশনা ইত্যাদি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে হবে। (২৮.৪৪.)

২৩। বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সকল পাঠাগার হতে দীর্ঘ মেয়াদিভাবে ধার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করা হবে। (২৮.৪৫.)

২৪। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে পুস্তক নির্বাচনের বেলায় সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এ সকল পুস্তক তাদের নিকট স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন। (২৮.৪৬.)

২৫। উচ্চতর পর্যায়ে ব্যাপক হারে বাংলা ভাষায় মৌলিক পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদের জন্য অধিকতর আন্তরিকতার সংগে সুপরিকল্পিত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী এবং দেশের উচ্চমানের কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মৌলিক রচনা এবং অনুবাদে নিয়োজিত সংস্থা ও ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দেওয়া আবশ্যক। (২৮.৪৭.)

২৬। অনুবাদের বেলায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শব্দ এবং সাংকেতিক চিহ্নসমূহ বাংলায় হুবহু গ্রহণ করাই শ্রেয়; বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা বিভ্রান্তিকর এবং আমাদের শিক্ষা স্বার্থের পরিপন্থী। (২৮.৪৮.)

২৭। পরিভাষা প্রণয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। পরিভাষা প্রণয়নের কাজ জোরদার করার জন্য বাংলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। (২৮.৪৯.)

অধ্যায় ২৯

শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ

২৯.১. আগামী দশ বছরের মধ্যে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির সংগে সংগে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত বয়সের আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয় গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরূপ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার নতুন নতুন গৃহ তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন অংগন বা ক্যাম্পাস নির্মীয়মান রয়েছে।

২৯.২. আমাদের বিদ্যালয় গৃহগুলির অধিকাংশ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। কতকগুলির আবার নির্মাণে ত্রুটি রয়েছে। কতকগুলি জরাজীর্ণ, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন। কতকগুলিতে আবার অহেতুকভাবে অত্যধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই যে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কার্যে যে অর্থ ব্যয়িত হবে, তা হতে যেন সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয় ভবনে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যে আধুনিক সকল প্রকার কারিগরি সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হবে। যে সমস্ত নতুন বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করা হবে, তা সাধারণ প্রকৃতির হওয়া উচিত। নির্মাণ কাজে যথাসম্ভব স্থানীয় মাল মশলা ব্যবহার করতে হবে। বিদ্যালয় গৃহ তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে যাতে স্বল্প ব্যয় হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২৯.৩. আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার কিভাবে করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে স্থান ও সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক ক্লাস ও ল্যাবরেটরির জন্য একটি সময়-তালিকা তৈরী করতে হবে। এরূপ তথ্যানুসন্ধান কার্য যেখানে চালানো হবে, সেখানে ক্লাসের সময়-তালিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে এবং নতুনভাবে ক্লাসের ব্যবস্থা করে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য স্থানের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেজন্য প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য একজন শিক্ষক বা কর্মচারীকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে এবং এই শিক্ষকেরই দায়িত্ব হবে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ, লেকচার হল এবং ল্যাবরেটরি নির্দিষ্ট করে দেওয়া ও সময়-তালিকা নির্ণয় করা। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ডীন ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে গঠিত সমন্বয় কমিটি শ্রেণীকক্ষ, লেকচার হল, টিউটোরিয়াল ঘর ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং সময়-তালিকা নির্ণয় করবেন। তাঁরা এও লক্ষ্য রাখবেন যেন বিশেষ কয়েকটি সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি না হয়, যেমন, এমন কোন বিশেষ কারণ নাই যে জন্য বাংলা বা ইংরেজী ক্লাসের ব্যবহৃত শ্রেণীকক্ষ অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি অথবা ইতিহাসের জন্য অনুরূপ সুবিধার খাতিরে ব্যবহার করা যাবে না।

২৯.৪. বিদ্যালয় গৃহের ডিজাইন ও নির্মাণ কার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যাঁরা সাধারণ বিল্ডিং নির্মাণে পারদর্শী তাঁদের বিদ্যালয় গৃহ তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে—এতে প্রায় ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায় না। বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করার সময় যে সকল সমস্যার দিকে খেয়াল রাখতে হয় তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির দিকে নজর রেখে শ্রেণীকক্ষের আয়তন ও আকার নির্ধারণ, সর্বাধিক আলো ও বাতাসের জন্য জানালার স্থান ও আয়তন নির্দিষ্ট করা। শ্রুতির সুবিধা ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে শ্রেণীকক্ষের গঠন বৈশিষ্ট্য ও আসবাবপত্র নির্ধারণ করা; শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তির উপর কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয় সেজন্য স্বাভাবিক আলোর সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রংয়ের ব্যবস্থা করা। যাঁরা আমাদের

দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য গৃহ নির্মাণ করে থাকেন, তাঁদের উচিত হবে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি রাখা। আমাদের বিদ্যালয় গৃহগুলিকে স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণ করতে হলে, আমাদের উচিত দেশীয় মাল মশলা ব্যবহার করে বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণ সম্পর্কে গবেষণা চালানো। যে সমস্ত মাল মশলা এদেশে সহজপ্রাপ্য ও দীর্ঘস্থায়ী, সেগুলির ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়েই আমাদের বিদ্যালয় গৃহ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় প্রসারসাধন সম্ভব। উপযুক্ত বিদ্যালয় ভবন নির্মানের ব্যাপারে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। এঁরা এ ব্যাপারে স্থাপত্য শিল্পীকে সাহায্য করতে পারেন। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে কোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়।

২৯.৫. বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের বর্তমান দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য এবং ভবিষ্যতে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব যে সকল সরকারী বিভাগের উপর ন্যস্ত, তাদের বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্থাপত্য শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা এবং বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এ সকল বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে দেওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করাও প্রয়োজন। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সমস্যাদি এবং গৃহ নির্মাণের জন্য স্থানীয় মাল মশলার উন্নতিসাধন সম্পর্কে আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহ নির্মাণ গবেষণা সংস্থা, কলেজ গবেষণাগার এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্য চালানো অতীব প্রয়োজন।

২৯.৬. বিদ্যালয় গৃহের ন্যায় প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার উপকরণ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। কতকগুলির ক্ষেত্রে আবার অহেতুক অত্যধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ল্যাবরেটরীতে বহু যন্ত্রপাতি এখনও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কারণ, হয় এগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না, অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি মেরামত করার মত উপযুক্ত কারিগরের অভাব রয়েছে। যে সমস্ত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় এখনো পড়ে রয়েছে, সেগুলির আশু ব্যবহার, যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

২৯.৭. শিক্ষার প্রসারের জন্য আমরা যে সকল সুপারিশ করেছি তা বহুলাংশেই বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান প্রসংগে প্রযোজ্য। এই সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। আমাদের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অনবরত বিদেশ থেকে এ সমস্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে থাকলে বিদেশী মুদ্রার ব্যয়ের বোঝা বেড়ে যাবে। তাই যে সকল যন্ত্রপাতির চাহিদা সর্বাধিক সেগুলি আমাদের দেশে নির্মাণ করাই হবে সর্বোত্তম পন্থা। এর ফলে আমাদের পরিকল্পনা বাবদ মোট ব্যয় হ্রাস পাবে, বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ হবে না এবং আমাদের সুপারিশগুলি সত্বর কার্যকর করা সম্ভব হবে।

২৯.৮. আমরা মনে করি যে বর্তমানে যন্ত্রপাতিগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পরীক্ষা করা, ভবিষ্যতে এগুলি সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চাহিদা মিটাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করবেন। সরকারের স্কুল কলেজের যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনুরূপ একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্কুল কলেজের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আবেদন করা প্রয়োজন হলে শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রধানগণ উক্ত কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কিছু সংখ্যক কারিগরের উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এ সকল কারিগর নিযুক্ত করেত হবে। সরকারের শিক্ষা বিভাগের আওতায় একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মেরামত কেন্দ্র খোলার প্রয়োজন রয়েছে যদ্বারা কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির চাহিদা মিটতে পারে।

২৯.৯. বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পদ্ধতি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির পরিবর্তে চলচ্চিত্র, 'স্লাইড' ইত্যাদি ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। যেখানে প্রদর্শনীর সাহায্যে শিক্ষাদানের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় না অথবা সামান্য কাজে ব্যবহারের পক্ষে এগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেখানে আলোক চিত্রের সাহায্যে মহড়াদানের সন্তোষজনক সুবিধাদি রয়েছে। বিশেষ পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা থাকলে একই চলচ্চিত্র ও 'স্লাইড' একই বছরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত হবার পরেও পরবর্তী বছরে আবার ব্যবহৃত হতে পারে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র অথবা 'স্লাইড' প্রদর্শনীর যন্ত্র থাকে সেখানে ইহা বহু শিক্ষক ও বহু বিভাগের প্রয়োজন সারা বছর ধরে মিটাতে সক্ষম হয়।

২৯.১০. ভাল ব্লাকবোর্ড, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি উপকরণ ছাড়া স্কুল কলেজে উন্নত মানের শিক্ষাদান সম্ভব নয়। এ সমস্ত উপকরণের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান প্রয়োজন। শিক্ষা উপকরণ তৈরীর জন্য দেশে বর্তমানে দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে—অডিও ভিসুয়েল এডুকেশন কেন্দ্র এবং ইকুইপমেণ্ট ডেভেলাপমেণ্ট ব্যুরো। এদের সামর্থ্য এতই সীমিত যে শিক্ষা উপকরণের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে তারা অক্ষম। অতএব আমরা সুপারিশ করি যে দুটি প্রতিষ্ঠানকে অনতিবিলম্বে একীভূত করে এরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যাতে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে নানাবিধ শিক্ষা উপকরণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

২৯.১১. বিজ্ঞান, কারিগরি, বৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষার জন্য নানা ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন মিটানোর জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাধীনে সাধারণ যন্ত্রপাতি দেশে তৈরী করার জন্য যত সত্বর সম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী উদ্যম ছাড়া বেসরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্দেশ্যসাধন হতে পারে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপাদনী যন্ত্র, বিশেষ ধরণের ছাঁচ, ফিকসার ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার সাহায্য করতে পারে।

২৯.১২. যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং মেরামতের জন্য যে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন সরকারকে তার জন্যে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। এইরূপে দক্ষ কারিগর এবং প্রকৌশলী তৈরী হলে আগামী দশ বছরের মধ্যে জটিল যন্ত্রাদি তৈরীতে হাত দেওয়া যাবে।

২৯.১৩. কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি এবং যন্ত্র উৎপাদন সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে উৎপাদিত যন্ত্র কারিকুলামের উপযুক্ত হয় অথবা কারিকুলামের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্ভব হয়।

২৯.১৪. সরকারকে অবিলম্বে কৃষি, টেকনিক্যাল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন যন্ত্রপাতি আমদানী এবং তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। পাম্প, স্প্রেয়ার, ছোট ডিজেল ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর ইত্যাদি তৈরীর ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। লেদ মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, গ্রাইণ্ডিং মেশিন, শেপিং মেশিন, মিলিং মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিন, বল প্রেস ইত্যাদি দেশে তৈরীর বন্দোবস্ত করতে হবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র, বক্ষ পরীক্ষার যন্ত্র, থার্মোমিটার, সিরিজ, অস্ত্রোপচারের সকল যন্ত্রাদিও দেশে তৈরী করার বন্দোবস্ত করতে হবে। উপরোক্ত যন্ত্রপাতি এবং আনুসংগিক উপকরণ, কৃষিশিল্প এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ

সারাংশ

১। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে অতিরিক্ত বিদ্যালয় গৃহ ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে হবে। এই সব গৃহ নির্মাণ কার্যে যে অর্থ ব্যয়িত হবে তা হতে যেন সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয় ভবনে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলোনের উদ্দেশ্যে আধুনিক সকল প্রকার কারিগরি সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হবে। যে সমস্ত নতুন বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করা হবে, তা সাধারণ প্রকৃতির হওয়া উচিত। নির্মাণ কাজে যথাসম্ভব স্থানীয় মাল-মশল্লা ব্যবহার করতে হবে এবং যাতে কম খরচে তৈরী ও রক্ষনা-বেক্ষন করতে স্বল্প ব্যয় হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। (২৯.১.—২৯.২.)

২। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটারী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার কিভাবে করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে স্থান ও সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। (২৯.৩.)

৩। স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা চালাতে হবে। শিক্ষাগৃহ নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের কিছুটা অবহিত থাকতে হবে। এঁরা এ-ব্যাপারে স্থাপত্য শিল্পীর সাহার্য গ্রহণ করতে পারেন এজন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিতেও কোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়। (২৯.৪.)

৪। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কোন দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য এবং ভবিষ্যতে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব যে সকল বিভাগের উপর ন্যস্ত, তাদের বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্থাপত্য শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা এবং সমস্ত বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা এ সকল বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে দেওয়া উচিত। (২৯.৫.)

৫। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার উপকরণ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপর্যাপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে আবার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াও মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরীতে বহু যন্ত্রপাতি এখনও অবেহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ-সমস্ত যন্ত্রপাতির আশু ব্যবহার, যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যে সকল যন্ত্রপাতির চাহিদা সর্বাধিক সেগুলি আমাদের দেশে নির্মাণ করাই হবে সর্বোত্তম পন্থা। (২৯.৬.—২৯.৭.)

৬। বর্তমানে যন্ত্রপাতিগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পরীক্ষা করা, ভবিষ্যতে এগুলির সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা মিটাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করতে পারেন। সরকারের স্কুল-কলেজের যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনুরূপ একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে। (২৯.৮.)

৭। ভাল ব্ল্যাক বোর্ড, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি উপকরণের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান প্রয়োজন। "অডিও ভিসুয়েল এডুকেশন সেন্টার" এবং "ইকুইপমেন্ট ডেভেলাপমেন্ট ব্যুরো" এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে আরও উন্নীত ও সম্প্রসারিত করতে হবে। (২৯.১০.)

৮। নানা ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন মিটানোর জন্য স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য যে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন সরকারকে তার জন্য প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। (২৯.১১.—২৯.১২.)

অধ্যায় ৩০

গ্রন্থাগার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার ঃ

৩০.১. গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের হৃৎপিন্ড স্বরূপ। সাবেক আমলের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এ সত্যটি স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং সকল স্তরের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের বহু গুরুগম্ভীর সুপারিশ সে রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কমিশন উন্নয়নের কোন মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড নির্ণয় না করায় তাঁদের সুপারিশগুলি স্তোক বাক্যে পর্যবসিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পে হয় গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে কিংবা উন্নয়ন বরাদ্দের ন্যায্য বখরা পায়নি। ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি, যেখানে যা রাখা হয়েছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা অপরিসর, তাই গ্রন্থাগারে স্থানাভাব সর্বত্র। এতদভিন্ন বই ও সাময়িকীর ব্যয় বরাদ্দ, গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা ও সংখ্যা, গ্রন্থাগারের আসবাব সামগ্রী ইত্যাদি এতই অপ্রতুল যে আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে গ্রন্থাগার বলে কিছু নাই বললেও চলে। যেখানে যা আছে তাও প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। অন্যকথায়, আমাদের বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিন্ডটি নিস্পন্দ। আমাদের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার উন্নয়ন জোড়াতালির ব্যাপার নয় একে নতুন করে সাজাতে হবে যদি আমাদের শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হয়।

৩০.২. আমাদের বিশ্বাস মামুলী কতক উন্নয়নমূলক সুপারিশের কোন সার্থকতা নাই। এই বিশ্বাসের বশে আমরা আমাদের সুপারিশে উন্নয়নের পরিধি বা মান নির্দেশ করে দিয়েছি যাতে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মী এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগোতে পারেন এবং যাতে স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কিছুটা সমতা বিধান হয়।

৩০.৩. আমরা যে মান নির্দেশ করছি তা আমাদের মতে সর্বনিম্ন মান এবং আমাদের বর্তমান সামর্থের প্রেক্ষিতে তা অবাস্তব নয়। তবে একটি মাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদে সবগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারকে এ মানে উন্নীত করা সম্ভব হবে না।

৩০.৪. আমাদের নির্দেশিত মান উন্নত দেশগুলির মানের চাইতে নিম্নতর। শিক্ষাসৌকর্যের জন্য গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বিবেচনায় এ মানকে ক্রমে আরো উচ্চতর করতে হবে। অন্ততঃ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এ মানের পুনর্বিবেচনা আবশ্যক হবে।

প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার ঃ

৩০.৫. বইয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি, বইয়ের প্রতি মর্যাদা বোধ জাগানো এবং পাঠভ্যাসের বীজ বপনের জন্য ছোটদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দায়িত্ব প্রথমে অভিভাবকের এবং পরে স্কুলের ওপর বর্তায়। কিন্তু এ দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক অক্ষর জ্ঞান শূন্য, আমাদের প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার নাই অথচ শৈশবে শিক্ষার্থীর হাতে মনোরম বই তুলে দেওয়ার প্রথম দায়িত্ব অভিভাবকের পরে প্রাথমিক স্কুলের। উন্নত দেশগুলোর পক্ষেও প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার সৃষ্টি সম্ভব হয়নি কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র শিক্ষকের প্রয়োজন মত বই সরবরাহের ব্যবস্থা সেখানে হয়েছে। এ পর্যন্ত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ দেশের প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশনের কথা চিন্তা করা হয়নি। ফলে শিক্ষকদের দৃষ্টির প্রসারলাভ হচ্ছেনা, শিক্ষা হচ্ছে পাঠ্য-পুস্তক সর্বস্ব, শিক্ষাব্যবস্থা বই পড়ার দিক থেকে অত্যন্ত একঘেঁয়ে এবং নিরানন্দ।

৩০.৬. সকল প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন বর্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাথমিক স্কুলের গৃহ এবং সরঞ্জামের যা বর্তমান অবস্থা তাতে অনেক স্কুলে আশু গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

৩০.৭. অবিলম্বে গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশনের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে একটি গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশন এ গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে।

৩০.৮. প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক স্কুলকে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের শিবিররূপে ব্যবহার করতে হবে। থানা গণগ্রন্থাগার থেকে বই প্রেরণ করা হবে এ শিবিরে, এখান থেকে এলাকাভুক্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ নিজেদের স্কুলের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করবেন এবং ব্যবহারান্তে এখানেই ফেরত দেবেন। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী প্রাথমিক স্কুলে থানা গ্রন্থাগার থেকে সরাসরি এই পরিবেশন চলবে।

৩০.৯. থানা শিক্ষা অফিসারের সভাপতিত্বে অন্যূন পাঁচ জন সদস্যের একটি পুস্তক পরিবেশন কমিটি এ ব্যবস্থার তদারক করবে। স্কুলে থানা-গ্রন্থাগার থেকে সরাসরি এই পরিবেশন চলবে।

৩০.১০. থানা গণগ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করবে জাতীয় সরকার। পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহও হবে সরকারের দায়িত্ব। প্রাথমিক স্কুলে পরিবেশনের জন্য বই কেনা এবং পরিবেশনের আনুসংগিক ব্যয়ের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ (আনুমানিক ৫০%) জোগাবে যৌথভাবে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা।

৩০.১১. আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হতে হবে দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে এবং কর্তৃপক্ষের আয়ের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়িত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে এ বরাদ্দ ক্রমেই বাড়াতে হবে। এ কর্তৃপক্ষের একটি 'গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি' থাকবে। কমিটির দায়িত্ব হবে কর্তৃপক্ষ পরিচালিত প্রাথমিক স্কুল গ্রন্থাগারের মান নির্ণয়, পরিচালন ব্যবস্থা এবং মানোন্নয়নে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দান। এতদ্ব্যতীত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে জাতীয় 'গ্রন্থাগার পরিচালন দপ্তর'-এর পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে চলবে।

৩০.১২. প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপনের পরেও গণগ্রন্থাগারকে বরাবর-এর পরিপূরক হিসাবে কাজ করে যেতে হবে। থানা, মহকুমা এবং জেলা, এ তিন স্তরের গণগ্রন্থাগারকে বরাবর বহন করে যেতে হবে নিজ নিজ থানা এলাকার প্রাথমিক স্কুল এবং পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমিক স্কুলেও বই পরিবেশনের দায়িত্ব, কারণ চাহিদার পরিমাণে পর্যাপ্ত বই সংগ্রহ এবং সদ্যপ্রকাশিত বই যথাশ্রীঘ্র সংগ্রহ করা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। অন্য পক্ষে কোন আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গণগ্রন্থাগার থেকে ধারে বই পাওয়া গেলে স্বল্প ব্যয়ে বেশী সংখ্যক বইয়ের সাথে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচয় করে দেওয়া সহজ হয়। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি স্তরে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গণগ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে। গ্রন্থাগার পরিচালন দপ্তরের পরামর্শক্রমে সরকার এ ভূমিকার পরিধি নির্ণয় এবং তা পালনের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করবে।

৩০.১৩. প্রাথমিক স্কুলের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষে উন্মুক্ত সেলফে শিক্ষার্থীদের জন্য বই-পুস্তক রাখার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এ সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর কাছে বই-পুস্তক পরিবেশন করবেন।

৩০.১৪. সরকারী উদ্যোগে ছোটদের জন্য অধিকতর মনোরম বই ও সাময়িকী প্রকাশনা এবং তা স্বল্পমূল্যে বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আকর্ষণীয় বইয়ের প্রকাশন ব্যয় অত্যধিক অথচ এ জাতীয় পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণে পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে খুবই কম। এই কারণে ছোটদের বই প্রায় দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্যও বটে। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এজন্য একটি জাতীয় শিশু সাহিত্য প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। তদুপরি লেখক, চিত্রশিল্পী, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এঁদেরকে আকর্ষণীয় উৎসাহ যোগালেও উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ছোটদের উপযোগী সন্তোষজনক কোন বই প্রকাশনের পর দীর্ঘকাল অবধি প্রকাশকের মূলধন যাতে আটকা পড়ে না থাকে, তার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, যথা—উপযুক্ত প্রত্যেকটি পুস্তকের নির্দিষ্ট সংখ্যা খরিদ করে গণগ্রন্থাগার এবং প্রাথমিক স্কুলে বিতরণ।

মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারঃ

৩০.১৫. মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলি নানা কারণে অচল হয়ে পড়েছে। ছাত্র সংখ্যার চাপে অধিকতর শ্রেণীকক্ষের স্থান করতে গিয়ে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে কোন অপরিসর স্থানে যেখানে বইয়ের জায়গাই হয়না, আলো বাতাসের প্রবেশাধিকর সীমিত, পাঠ কক্ষতো দূরের কথা। অধিকাংশ স্কুলে গ্রন্থাগারটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বেশীর ভাগ বই শিক্ষকদের এবং প্রধান শিক্ষকের কক্ষে, বাদবাকী স্কুল ভবনের আনাচে-কানাচে আলমারীতে তালাবন্ধ। মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারে বহু পুরাতন, জরাজীর্ণ, কীটদষ্ট অকেজো বইয়ের গাদায় পড়ে নতুন বইগুলিও অচিরে নষ্ট হয়ে যায়। স্থানাভাব কিংবা স্থান আর আলমারী উভয়ের অভাবে অকেজো বইগুলিকে আলাদা করা যাচ্ছে না। গ্রন্থ-তালিকা থেকে এগুলিকে খারিজ করবার পথে আইন এবং পদ্ধতিগত বাধা আছে, কিছু পরিশ্রমও রয়েছে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কালে ভদ্রে কীটনাশক ছড়ানো হয়। এতে বইয়ের স্বাস্থ্যক্ষয় হয়, অথচ পোকা-মাকড় ক্রমে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। এ সব প্রতিকূল অবস্থায় গ্রন্থাগার বিন্যাসের কোন কলা-কৌশল অবলম্বনের কথাই উঠেনা। বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাগারের বিরস চেঁহারা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে কোন প্রেরণা জাগায়না।

৩০.১৬. একজন শিক্ষকের উপর সাধারণতঃ মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার পরিচালনের দায়িত্ব চাপানো হয়। এ কাজের জন্য তিনি সপ্তাহে দু'তিনটি পিরিয়ডের জন্য শিক্ষাকাজ থেকে রেহাই পান বটে কিন্তু অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত শিক্ষকদের কাজের জন্য পিরিয়ডগুলি ব্যয়িত হয়। ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগার পিরিয়ড বলে কিছু নাই।

৩০.১৭. এদেশে ২২টি 'পাইলট' স্কুলে মাধ্যমিক পাস ও স্বল্পকালীন গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্বক্ষণিক গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়েছিল। শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ স্কুলগুলিতে প্রচুর দেশী-বিদেশী বই-পুস্তক সরবরাহ করা হয়েছিল এবং গ্রন্থাগার বিন্যাসের কিছু আধুনিক কলা-কৌশলও এখানে অবলম্বিত হয়েছিল। বাকী মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলিতে স্থানাভাব, বইয়ের অপ্রতুলতা, বই বরাদ্দের অকিঞ্চিতকরতা, সাময়িকী এবং বিশেষভাবে রেফারেন্স জাতীয় পুস্তকের অভাব এবং সর্বোপরি সার্বক্ষণিক গ্রন্থাগারিকের অনুপস্থিতি বিরাজ করছে। অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়।

৩০.১৮. যে-সব মাধ্যমিক স্কুল কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এসেছিল সেগুলি বই কেনার জন্য এককালীন কিছু টাকা পেয়েছিল। ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্পে যা বরাদ্দ ছিল, গ্রন্থাগার সেই বরাদ্দের ন্যায্য বখরা পায়নি। বাৎসরিক বই বরাদ্দও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি যদিও ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে, ঐচ্ছিক বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বই-পুস্তকের মূল্য বেড়েছে বিস্তর।

৩০.১৯. মুষ্টিমেয় কয়েকটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক গ্রন্থাগারিক লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট কোর্সে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। কিছু সংখ্যক সরকারী স্কুলের শিক্ষকও শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে স্বল্পকালীন গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানো হয়নি।

৩০.২০. আমরা মনে করি, মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার মামুলি উন্নয়ন বা জোড়াতালির ব্যাপার নয়। আমাদের মতে একে সম্পূর্ণরূপে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

৩০.২১. মনোরম পরিবেশ সুবিন্যস্ত বইয়ের মধ্যে যথেচ্ছ বিতরণের সুবিধা দিতে হবে শিক্ষার্থীকে যাতে বই নিজস্ব আবেদনে প্রভাবিত করতে পারে তাদের কিশোর মনকে, যাতে তীক্ষ্ণধী, অগ্রসর, অনগ্রসর সব স্তরের শিক্ষার্থী তাদের রুচি এবং পঠন ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ মানের বই-পুস্তক স্বাধীনভাবে বাছাই করে নিতে পারে। আমরা আরও মনে করি, মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। আগেই বলেছি, অধিকাংশ অভিভাবক অক্ষরজ্ঞানহীন এবং প্রাথমিক স্কুলেও গ্রন্থাগার নাই, অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বইয়ের প্রতি আকর্ষণ, বইয়ের মর্যাদাবোধ এবং পঠন প্রবণতা সৃষ্টির প্রাথমিক দায়িত্ব বহুকাল যাবত মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারকেই পালন করতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগারের ব্যর্থতার সুনিশ্চিত পরিণাম হবে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার প্রয়াসের ব্যর্থতা। বাস্তবে হয়েছেও তাই। বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পঠনে নিস্পৃহ, অনেক শিক্ষক এবং অধ্যাপক অধ্যয়নে উৎসাহী নন। মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগারের নিস্পন্দতা বহুলাংশে এ অশুভ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। সুতরাং মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারকে যথাবিহিত অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩০.২২. মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারকে নতুন করে গড়তে হবে, এর অভাব অনটন দূর করতে হবে। সুতরাং আমরা পরিমানজ্ঞাপক নিম্নতম মান নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করছি এবং এ অনুভূতির প্রেক্ষিতে নিম্নোল্লেখ মানের সুপারিশ করছিঃ

(ক) **গ্রন্থাগারের আয়তনঃ** মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগারের আয়তন কমপক্ষে এক হাজার বর্গ-ফুট হবে। প্রয়োজনবোধে বরং শ্রেয়তঃ আলাদা গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করতে হবে। নীল নকশা তৈরীর বেলায় মনে রাখতে হবেঃ
ভবিষ্যতে ভবনটির সম্প্রসারণ অপরিহার্য হবে।
অধিকাংশ বই-পুস্তক খোলা শেলফে বিন্যস্ত হবে।
ভবনটির মেঝে হবে আর্দ্রতা ও কীটরোধক।
ধুলি ঝড়, বৃষ্টির ছাঁট, সূর্যের কিরণ ও তাপের সরাসরি প্রবেশ থাকতে হবে।
ভবন নির্মাণের পূর্বে আসবাবপত্রের আকার, সংখ্যা ও অবস্থান ছকে নিতে হবে।

(খ) **গ্রন্থাগারের আসবাবঃ** বিজ্ঞানসম্মত, উদ্দেশ্যনিষ্ঠ আধুনিক আসবাবপত্রের সমাবেশ হতে হবে গ্রন্থাগারে।

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসনিক সংস্থা নমুনাস্বরূপ পরিকল্পিত গ্রন্থাগার ভবনের একাধিক বিকল্প নীল নকশা তৈরী করে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্বাহ্নে তা বিতরণ করবেন। এ নমুনা নীল নকশায় আসবাব সরঞ্জামের আকার, আকৃতি এবং অবস্থানও দেখানো হবে।

(ঘ) **ব্যয় বরাদ্দঃ** বই, সাময়িকীর জন্য বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ হবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে মাথাপিছু কমপক্ষে পাঁচ টাকা, অন্য কথায় মাথাপিছু স্বল্প মূল্যের একখানা বই কেনার মতন হার। বই মেরামত, বাঁধাই এবং আনুসংগিক ব্যয়ও এ অংকের সামিল থাকবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার খোলা থাকবে স্কুল বসবার এক ঘণ্টা পূর্ব থেকে ছুটির এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর সাপ্তাহিক কর্মসূচীতে কমপক্ষে দুটি পিরিয়ড গ্রন্থাগারে ব্যয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(চ) একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক থাকবেন, তাঁর যোগ্যতা হবে কমপক্ষে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং একজন পূর্ণকালীন ক্যাটালগার সহকারী থাকবেন যার যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক পাস এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

একজন সংরক্ষক একাধারে পুস্তক মেরামত, বাঁধাই, ঝাড়পোঁছ ও পিয়নের কাজ করবে।

(ছ) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর উপরোক্ত মানের পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং সম্ভব হলে তাকে আরো উঁচু করতে হবে।

কলেজের গ্রন্থাগারঃ

৩০.২৩. আমাদের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির দৈন্য মূলতঃ মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগারের দৈন্যের মতই। এখানেও স্থানাভাব সর্বত্র প্রকট। অনেক পুরাতন এবং বড় কলেজে দেখা যায়, কেবল দরজা জানালা বাদ দিয়ে দেওয়ালের গায়ে আঁটা বইয়ের শেল্ফগুলি উচ্চতায় সিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত। শেল্ফের ঊর্ধ্বাংশে রক্ষিত বইগুলো নামানোর জন্য সিঁড়ির প্রয়োজন হয়। তবুও বইয়ের জায়গা হচ্ছে না। বড় কলেজগুলির কিছু সংখ্যক বই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অধ্যক্ষের জিম্মায় বিভাগ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এতে ঠাসাঠাসি কিছু কমেছে বটে কিন্তু বিভাগ এলাকায় কোন পাঠকক্ষ নাই। বই রক্ষণ এবং পরিবেশনের দায়িত্ব বহন করেন বিভাগীয় কোন অধ্যাপক, পরিবেশন করেন তাঁর সময় সুবিধা মতন। গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে আসন সংখ্যা খুবই কম। নিত্য প্রয়োজনীয় বইয়ের সাথে কচিত ব্যবহৃত এবং প্রায় অকেজো বইয়ের গাদাগাদি, কারণ পৃথক পুস্তক সংরক্ষণ এলাকা বলে কিছু নাই যাতে শেষোক্ত দু'জাতের বই আলাদাভাবে রাখা যায়। রেফারেন্স বইয়ের দারুন অভাব। হয়ত বহু পুরাতন সংস্করণের বিশ্বকোষ এবং সেই জাতীয় মনোরম বাঁধাই বহু খণ্ডে সমাপ্তকৃত কয়েকটি রেফারেন্স পুস্তকের সেট্ গ্রন্থাগারের শোভা বর্ধন করছে। দেশী বিদেশী নিত্য প্রয়োজনীয় বইগুলির একাধিক কপি ক্রয়ের সামর্থ্য হয় খুবই কম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি শিক্ষকদের একচেটে ব্যবহারে থাকে।

৩০.২৪. অপেক্ষাকৃত নতুন কলেজের কোন কোনটিতে দেখা যায় যে গ্রন্থাগার কক্ষের সব জায়গাতে বই। গ্রন্থাগারিক একটি গবাক্ষ পথে বাইরে অপেক্ষমান শিক্ষার্থীদের সাথে বইয়ের লেন-দেন সম্পন্ন করেন। শিক্ষার্থীরা পূর্বাহ্নে আকাংখিত বইয়ের নাম নম্বরের চিরকুট দাখিল করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে গবাক্ষের সামনে ভীড় জমায়।

৩০.২৫. হালে কয়েকটি সরকারী কলেজ গেজেটেড পর্যায়ের গ্রন্থাগারিক এবং যোগ্যতর ক্যাটালগার পেয়েছে। অন্যান্য সরকারী কলেজে গ্রন্থাগারিক পদ এখনো গেজেটেড পর্যায়ে উন্নীত করা হয়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাটালগার পদটিও সেখানে নাই। এ অসমতা কয়েক বছর যাবত চলেছে। বই বরাদ্দেও এরূপ অসম ব্যবস্থা বিদ্যমান।

৩০.২৬. সাম্প্রতিক কালে কিছু সংখ্যক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়েছে। কতগুলি কলেজে আবার বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্সও চালু হয়েছে। এমনকি কিছু সংখ্যক কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস খোলা হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি পায়নি।

৩০.২৭. আমরা মনে করি কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্যও নিম্নতম মান স্থির করার প্রয়োজন আছে। মান নির্দেশের জন্য কলেজগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) বড় কলেজ—যার ছাত্র সংখ্যা এক হাজারের ঊর্ধ্বে।

(খ) মাঝারি কলেজ—যার ছাত্র সংখ্যা পাঁচ শত থেকে এক হাজার পর্যন্ত।

(গ) ছোট কলেজ—যার ছাত্র সংখ্যা পাঁচ শ'য়ের কম।

৩০.২৮. কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের নিম্নতম মান সম্বন্ধে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

(ক) **গ্রন্থাগারের আয়তনঃ**

বড় কলেজ—কমপক্ষে ৪,০০০ বর্গফুট।
মাঝারি কলেজ—কমপক্ষে ৩,০০০ বর্গফুট।
ছোট কলেজ—কমপক্ষে ২,০০০ বর্গফুট।

কলেজ গ্রন্থাগারের জন্য অলাদা ভবন নির্মাণ অপরিহার্য।

(খ) **ব্যয় বরাদ্দঃ** বই সাময়িকীর জন্য বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ হবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে ছোট বড় সব কলেজের জন্য মাথাপিছু অন্যূন ১০ (দশ) টাকা। এর মধ্যে থেকে বই মেরামত, বাঁধাই এবং অন্যান্য আনুসংগিক ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। নতুন বিভাগ খুললে পর্যাপ্ত বইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

(গ) কলেজ গ্রন্থাগার সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারে উন্মুক্ত শেল্ফের ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) গ্রন্থাগার পরিচালনে থাকবেন কমপক্ষে—

	পদবী	ন্যূনতম যোগ্যতা	বড় কলেজ	মাঝারি কলেজ	ছোট কলেজ	মন্তব্য
১।	গ্রন্থাগারিক	ডিগ্রি এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিগ্রি উত্তর ডিপ্লোমাধারী।	একজন	একজন	একজন	১। বড় কলেজের গ্রন্থাগারিক হবেন মাষ্টার ডিগ্রি এবং ডিগ্রি উত্তর ডিপ্লোমাধারী।
২।	সহকারী গ্রন্থগারিক	ঐ	একজন	একজন	একজন	
৩।	বিন্যাসক (ক্যাটালগার)	ঐ	দুইজন	একজন	একজন	৩। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উঃ মাধ্যমিক পাস এবং গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেটধারী হতে পারেন।
৪।	সহকারী	মাধ্যমিক পাস এবং গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট।	দুইজন	একজন	একজন	
৫।	পুস্তক পরিবেশক	মাধ্যমিক পাস এবং গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত	তিনজন	দুইজন	একজন	
৬।	পিয়ন	অষ্টম শ্রেণী পাস।	দুইজন	তিনজন	একজন	
		মোট	৯জন	বারজন	৬ জন	

যে সব বড় কলেজে অনার্স ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস রয়েছে সে সব কলেজে অতিরিক্ত একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক ও অতিরিক্ত দুজন পুস্তক পরিবেশকের প্রয়োজন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারঃ

৩০.২৯. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের মতে তাও বিশেষ সন্তোষজনক নয়। এখানেও স্থানাভাব প্রকট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখনও গ্রন্থাগার ভবনই নির্মাণ করেননি। সুতরাং বই পত্রাদি রাখারও লাইব্রেরী সংগঠনের সুবন্দোবস্ত এখনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য ধার দেওয়ার বই যা' আছে তা' প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ভাড়াতে ধার দেওয়ার ব্যবস্থা সবখানে চালু হয়নি। যে সব বইয়ের মূল্য শিক্ষার্থীদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তা' পরিবেশনের ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্মীরা হিমশিম খাচ্ছেন। গবেষণার প্রয়োজনে যে শক্তিশালী রেফারেন্স সার্ভিসের প্রয়োজন তা' গড়ে উঠেনি। গবেষণা কাজের জন্য মাইক্রো ফটোগ্রাফী এবং অনুরূপ পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ফিল্ম এনং আনুসংগিকভাবে ব্যবহৃত সামগ্রীর যোগান সন্তোষজনক নয়।

৩০.৩০. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারগুলির কার্যকারিতা এবং দুর্বলতার খতিয়ান তৈরী করা দরকার। এ খতিয়ানের ভিত্তিতে উন্নয়নপ্রকল্প তৈরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্য প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি।

৩০.৩১. আমরা মনে করি উন্নয়নের একটা আশু এবং স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থাও হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আমরা নিম্নরূপ সুপারিশ করছিঃ

(ক) বই ও সাময়িকীর ব্যয় বরাদ্দ অবিলম্বে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বৃদ্ধির পরিমাণ বিচারের ব্যাপারে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিষয়ের সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, বর্তমান বই সম্পদের পরিমাণ, নিত্য ব্যবহার্য এবং কদাচিত ব্যবহৃত বই সাময়িকীর অনুপাত, বই সাময়িকীর মূল্য বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারের আয়তন বিবেচনা করা আবশ্যক।

(খ) গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ বা প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের কাজ সত্বর হাতে নেওয়া উচিত।

(গ) গবেষণা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এবং উপযুক্ত সংখ্যক রেফারেন্স সহকারী নিযুক্ত করা এবং গ্রন্থাগারকে আন্তঃগ্রন্থাগার বিনিময়ের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আবশ্যক।

(ঘ) প্রয়োজনীয় বিদেশী বই, সাময়িকী, ফিল্ম এবং আনুসংগিকভাবে ব্যবহৃত গ্রন্থাগার সামগ্রী আমদানীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে অধিকতর লাইসেন্স প্রদান করা আবশ্যক। দেশের আমদানী নীতি, শুল্ক আইন এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এবং প্রসংগত অন্যান্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণারত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ অনুকূল্যের ব্যবস্থা থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। আইন ও পদ্ধতিগত অসুবিধা এবং বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য আমদানী, শুল্ক ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে গ্রন্থাগার সমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-সমূহের গ্রন্থাগারিকদের মতামত নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ইউনেস্কোর সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

গণগ্রন্থাগারঃ

৩০.৩২. এ দেশে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষীণ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের কোঠায়। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এ সময়ে জেলা সদরের পনরটি বেসরকারী গ্রন্থাগারকে এককালীন সাহায্য দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম এবং খুলনায় আর দু'টো সরকারী গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এ সব গ্রন্থাগার তদারকের জন্য

জনশিক্ষা পরিদপ্তরে একজন অফিসার নিযুক্ত করা হয়। আশা করা গিয়েছিল বেসরকারী গ্রন্থাগারের সাহায্য বরাদ্দ ক্রমাগত বাড়বে এবং বহু নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে। সে আশা সফল হয়নি। বরাদ্দ মাত্র দুই লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল যা থেকে শতাধিক গ্রন্থাগার সাহায্য পাচ্ছিল। লাইব্রেরী অফিসারের পদটি ১৯৬৯ সাল থেকে শূন্য রয়েছে।

৩০.৩৩. ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনায় তিনটি সরকারী গ্রন্থাগারের বর্তমান বই বরাদ্দ মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। বরাদ্দের অপ্রতুলতা এদের বই সংগ্রহ প্রচেষ্টা বিঘ্নিত করছে। কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার ভবনটি ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানায় চলে যায়। এর জন্য নতুন ভবনটির নির্মাণ কাজ এখনও অসমাপ্ত। তাই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি তার সাবেক আবাসের একাংশে কোন রকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিতেও স্থানাভাব। চট্টগ্রামের সরকারী গ্রন্থাগারটিতে স্থানাভাব আরও প্রকট। এ গ্রন্থাগারটির জন্য কোন ভবন তৈরী করা হয়নি। খুলনার সরকারী গণগ্রন্থাগারের ভবনটির সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৩০.৩৪. বেসরকারী গ্রন্থাগারের সাহায্যের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বর্তমানে দুই লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা। যোগ্যতার নিরিখে প্রতি স্তরের গ্রন্থাগারের সাহায্যের হার নির্ধারিত হয়। একটি গ্রন্থাগার গড়পরতা হিসাবে এ বরাদ্দ থেকে মাসে দুশ টাকার মত পেতে পারে। এ থেকে একজন খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিক এবং একজন পিয়নের বেতন দিয়ে বই কেনার জন্য কিছু আর থাকে না। পৌরসভা এবং জেলা পরিষদের তহবিল থেকে বার্ষিক যা পাওয়া যায় এবং চাঁদা যা উসুল হয় তাতে কিছুই হয় না। বেসরকারী স্কুল কলেজের জন্য ক্যাপিটাল গ্রান্টের বরাদ্দ আছে কিন্তু বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের জন্য এ জাতীয় কোন বরাদ্দ নাই। সুতরাং অধিকাংশ গ্রন্থাগারের ভবন অপরিসর এবং অবস্থা শোচনীয়।

৩০.৩৫. অধিকাংশ সাহায্যকৃত বেসরকারী গ্রন্থাগার বিকাল বা সন্ধ্যার দিকে দু'তিন ঘণ্টা খোলা থাকে। উপস্থিত পড়ুয়ারা পত্রপত্রিকা পড়ে। চাঁদা দাতা সদস্যেরা বই ধার পায়। পর্যাপ্ত সংখ্যায় নতুন বই কেনা সম্ভব হয় না বলে চাহিদা পূরণ হয় না।

৩০.৩৬. বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক খুবই বিরল, প্রায় সবাই খণ্ডকালীন কর্মচারী।

৩০.৩৭. বর্তমানে জেলা এবং মহকুমা শহরে সরকারী তথ্য কেন্দ্রগুলিও গণগ্রন্থাগাররূপে কাজ করছে। অনেকগুলি তথ্যকেন্দ্র স্থানীয় গণগ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অংগাংগীভাবে চালু আছে। বাংলাদেশ পরিষদ পরিচালিত কয়েকটি গ্রন্থাগারও বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে।

৩০.৩৮. পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশে গণগ্রন্থাগার বলতে বোঝায় আইনভিত্তিক ট্যাক্স নির্ভর সাংস্কৃতিক সেবা প্রতিষ্ঠান যাতে জনগণের প্রবেশাধিকার অবাধ, জনগণ সেখানে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরাও গণগ্রন্থাগার ব্যবহার করে। এতে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অভাব ঘোচে। উন্নত গ্রন্থাগারে গবেষক তাঁর গবেষণার সুযোগ পান। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ছেঁকে তাঁকে প্রয়োজনীয় বই, নথিপত্র এবং তথ্যের যোগান দেওয়া হয়। সে সব দেশে আঞ্চলিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি সমন্বিতভাবে কাজ করছে। তারা প্রতিযোগিতার পথ ছেড়ে সহযোগিতার ভিত্তিতে পৃথিবীর সর্বত্র থেকে বইপত্র সংগ্রহ করে আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কর্মসূচী নিয়েছে। পারস্পরিক লেনদেন এবং বিনিময় সূত্রে যে-কোন গ্রন্থাগারের পড়ুয়া সে গ্রন্থাগারের মধ্যস্থতায় দেশের অপর যে-কোন গ্রন্থাগারের বই পাচ্ছে। গণগ্রন্থাগারের সাথে এ ব্যাপারে অগণগ্রন্থাগারও সহযোগিতা করছে বিস্তর। সমগ্র দেশের বইসম্পদের তালিক তৈরী হচ্ছে দেশের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে, যাতে এক জায়গায় বসে এই সম্পদের সার্বিক চিত্রটি পাওয়া যায়। সমন্বিত গ্রন্থাগারের সেতু বেয়ে বই বা বই সাময়িকীর প্রতিলিপি পৌঁচাচে

দেশের ভিতরে বাইরে দূর দূরান্তরের পাঠকের কাছে। দেশের বিরল বসতি প্রত্যন্ত প্রদেশেও বই পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাখা বা ভ্রাম্যমান গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে। উন্নয়নের বহু স্তর ভেদ করে উন্নত দেশগুলির গ্রন্থাগার এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্যঃ

৩০.৩৯. আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশব্যাপী গণগ্রন্থাগারের বিস্তার করা যাতে অদূর ভবিষ্যতে কোন নাগরিকের পক্ষে একটি গণগ্রন্থাগার বা তার একটি শাখা কিংবা একটি চলমান শাখা থেকে বই পেতে হলে তাঁর বাসস্থান থেকে সাধারণতঃ এক মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করতে না হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের প্রতিষ্ঠা শিক্ষা সাংস্কৃতির প্রসার, উন্নত জাতীয় চরিত্রের বিকাশ, শিল্পকলার উৎকর্ষ ইত্যাদি সামগ্রিক গণশিক্ষার উপর নির্ভরশীল। অন্যপক্ষে গণশিক্ষা বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়, গণগ্রন্থাগার তার পরিপূরক। তাই ব্যাপকভাবে গণগ্রন্থাগার স্থাপন অত্যাবশ্যক।

৩০.৪০. জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের মতে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন অপরিহার্য। গণগ্রন্থাগার ট্যাক্স প্রবর্তন, একটি গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তর সৃষ্টি এবং একটি গণগ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠনও এ আইনের আওতায় আসবে। আইন প্রণয়ন সাপেক্ষে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করছিঃ

৩০.৪১. অনতিবিলম্বে রাজশাহীতে সরকারী গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩০.৪২. অবিলম্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ সরকারী গণগ্রন্থাগারগুলির স্থানাভাব সমস্যার সমাধান করা এবং বর্তমান বই বরাদ্দকে কমপক্ষে তিনগুণ বৃদ্ধি করা উচিত।

৩০.৪৩. অবিলম্বে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির সাহায্য বরাদ্দ বাড়িয়ে অন্ততঃপক্ষে তিন গুণ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত দশ লাখ টাকার একটি ক্যাপিটাল গ্রান্টের নতুন বাজেট বরাদ্দ প্রবর্তন করা উচিত হবে যাতে জেলা ও মহকুমা সদরের গ্রন্থাগারগুলির সম্প্রসারণ করা যায় এবং থানা স্তরে গণগ্রন্থাগার স্থাপনের সহায়তা করা যেতে পারে। এ তিন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির মান হবে যথাক্রমে বড়, মাঝারি এবং ছোট কলেজের গ্রন্থাগারের মানের সাথে তুল্য।

৩০.৪৪. প্রস্তাবিত গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসাবে একটি নতুন অফিস খোলা উচিত এবং জনশিক্ষা পরিদপ্তরের লাইব্রেরী অফিসারের শূন্য পদটিকে সেখানে স্থানান্তরিত করে এবং তাঁকে প্রয়োজনমত সহায়ক দেওয়া হোক। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সহায়কগণসহ গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তরের অঙ্গীভূত হবেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারঃ

৩০.৪৫. জাতীয় গ্রন্থাগার হবে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র এবং বহির্বিশ্বের সাথে দেশের সাংস্কৃতিক সেতুস্বরূপ। একে কপিরাইট ডিপোজিটের অধিকার দিতে হবে এবং এর উপর ন্যস্ত থাকবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন ও প্রকাশনের দায়িত্ব এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের ভার। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং একে স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়তে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা আরো সুপারিশ করছি যে অপর তিনটি বিভাগ সদরের প্রধান গণগ্রন্থাগারেও কপিরাইট ডিপোজিটর অধিকার দিতে হবে।

৩০.৪৬. বর্তমান কেন্দ্রীয় গ্রন্থগারকে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করা যেতে পারে। বর্তমান আরকাইভজ ও লাইব্রেরী পরিদপ্তরের জাতীয় গ্রন্থাগার শাখাটিকেও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৩০.৪৭. জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হবে প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি পদটির পূরণ এবং নিয়োজিত গ্রন্থাগারিককে প্রয়োজনীয় কাজের ভার অর্পণ।

জাতীয় আরকাইভ্‌স ঃ

৩০.৪৮. অবিলম্বে জাতীয় আরকাইভ্‌সকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাও অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড এবং জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণার জন্য এ সবের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন হবে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। দেশের অফিস আদালতে এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন সংস্থায় অহরহ যে দলিলাদি সৃষ্টি হচ্ছে তা কালে অবহেলা ও অযত্নে নষ্ট হয়। যা নষ্ট হয় না তাও স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে বলে প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অপ্রয়োজনীয় নথি-পত্রের স্তূপ থেকে যথাবিহিত পরীক্ষার পর মূল্যবান দলিলগুলিকে আলাদা করার এবং পোকা-মাকড়ের হাত থেকে তার রক্ষণের কোন ব্যবস্থাও নাই। সুতরাং আরকাইভ্‌স প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে হবে।

৩০.৪৯. বর্তমানে আমাদের দেশে অনেকেই আশ্যনরূপভাবে অতি মূল্যবান পুরাতন ঐতিহাসিক দলিলপত্র সংগ্রহ ও সরকারী নথিপত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবগত নন। আরকাইভ্‌স এমন একটি সংগ্রহশালা যেখানে সকল প্রকার সরকারী অনিত্য ব্যবহার্য নথি পত্র এবং ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী পত্র-পত্রিকা ও দলিলাদি সংরক্ষিত থাকে।

৩০.৫০. জাতীয় আরকাইভ্‌স সম্পর্কে আমাদের অবিলম্বে একটি সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। দেশের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী লিখিত উপকরণসমূহও সংরক্ষণ করে তা' গবেষকদের ব্যবহারোপযোগী করার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু কার্যক্রমের প্রয়োজন। এছাড়া একটি স্থায়ী জাতীয় আরকাইভ্‌স কমিশন গঠন করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

৩০.৫১. বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভ্‌স-এ নিযুক্ত নথি রক্ষকদের জন্য নথি সংরক্ষণের আধুনিকতম পদ্ধতি সম্বন্ধে বিদেশী প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভ্‌সে দলিল-পত্র সংরক্ষণের সকল প্রকার আধুনিকতম বন্দোবস্ত থাকতে হবে। ঐতিহাসিক দলিল-পত্র সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনবোধে আইন প্রবর্তন ও প্রকল্প রচনারও আবশ্যক আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরকাইভ্‌স পরিদপ্তর জাতীয় আরকাইভ্‌স-এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ ঃ

৩০.৫২. গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীউত্তর প্রশিক্ষণের একটি ডিপ্লোমা কোর্স এবং একটি মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স রয়েছে। উভয়েই এক বছরের সান্ধ্যকালীন কোর্স। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করেনি। ডিগ্রী নিম্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি। তারা বছরে মাত্র একটি সান্ধ্যকালীন সার্টিফিকেট কোর্স আরম্ভ করে ১৯৫৭ সালে। বহু বছর ধরে এ কোর্সের শিক্ষকগণ বিনা বেতনে কাজ করছেন। ইদানিং সমিতি বছরে দু'টো কোর্স পরিচালনা করছেন এবং সমিতির খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও রাজশাহী শাখাতেও প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ করে ঢাকাস্থ সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর।

৩০.৫৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টো কোর্স সরকারের 'অথরাইজড কোর্স' রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে যাতে করে আইনানুগতভাবে সরকারী বিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ডেপুটেশনে এ কোর্স-দ্বয়ে ভর্তি হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার সমিতির সার্টিফিকেট কোর্সটি এ স্বীকৃতি এখনও পায়নি যদিও সরকারী, বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, ক্যাটালগার ইত্যাদি নিয়োগের বেলায় সমিতির সার্টিফিকেটকে যোগ্যতার প্রমাণরূপে গ্রহণ বরাবর করে আসছে।

৩০.৫৪. আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণের পক্ষে

বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট নয়। অন্যত্র আমরা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রমে স্থান দিয়েছি। এতেও অনেক উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে।

৩০.৫৫. রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর এই তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপন করা আবশ্যক।

৩০.৫৬. প্রাক্-ডিগ্রী স্তরে প্রশিক্ষণের জন্য অবিলম্বে ঢাকায় একটি গ্রন্থাগার ইনষ্টিটিউট গঠন করতে হবে। আপাততঃ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিকে এর পারিচালন দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র ভবনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এর কাজ আরম্ভ করা যায়। এই ইনষ্টিটিউট দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা সমিতির মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ভার নেবে।

৩০.৫৭. উভয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০.৫৮. গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের সহায়ক এবং সহযোগী। উন্নত দেশসমূহে এ সত্যটি স্বকৃতি লাভ করেছে বলে গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্ভাবনী তৎপরতার মাধ্যমে তথাকার গ্রন্থাগারগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর সার্থকতা অর্জন করছে। আমরা তাই সুপারিশ করি, তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীগণকে পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের প্রশাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের হাতে তুলে দিতে হবে গ্রন্থাগারের সর্বময় দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব।

মিউজিয়াম :

৩০.৫৯. শিক্ষাসৌকর্যের গরজে শিক্ষাংগনে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। নানা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর ছোট-বড় অনুকৃতি বা মডেল শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় অংকিত সাদা-কালো ছবির চাইতে বেশী চিত্তাকর্ষক ও অধিকতর বাস্তব-নির্ভর। জাতীয় জীবনের ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের রূপরেখা মিউজিয়ামে যথাসম্ভব বিধৃত হয়। তাই শিক্ষাংগনে এবং শিক্ষাংগনের বাইরে অবস্থিত মিউজিয়ামের সাহায্যে শিক্ষাদানকর্ম অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ও অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং শিক্ষাংগনের বাইরেও দেশময় কতকগুলি মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

৩০.৬০. শিক্ষাংগনের মিউজিয়াম খুব ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়; তবে পর্যাপ্ত অর্থব্যয়ে তাকে সুসমৃদ্ধ করা যায়। সহজলভ্য বহু দ্রব্য সামগ্রী উপযোগী পটভূমিকায় মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হতে পারে—চাই কেবল চয়ন চাতুর্য আর বিন্যাস-নৈপুণ্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পাদ্য অপেক্ষাকৃত নিখুঁত ও সুন্দর চারু ও কারুকর্ম শিক্ষাংগনের মিউজিয়ামের স্থান লাভ করতে পারে। অনুপ্রেরণা এবং সৃষ্টি প্রবণতা জাগানোর পক্ষে পূর্বসূরীদের শিল্পকর্মের কার্যকারিতা সমধিক।

৩০.৬১. আমরা মনে করি, অদূর ভবিষ্যতে বাছাই করা অন্ততঃ কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুলে মিউজিয়াম স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিউজিয়াম সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য প্রদান বাঞ্ছনীয়। একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ ক্ষেত্রেও ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগোন আবশ্যক।

জাতীয় মিউজিয়াম :

৩০.৬২. সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়ঃ জাতীয় মিউজিয়াম হবে একাধারে সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চিত্তাকর্ষক নিদর্শনসমূহের সুবিন্যস্ত পেক্ষাগৃহ, নাগরিক সাধারণের মনে শিক্ষাপ্রদ অবসর বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম জাতীয় চেতনার উন্মেষক।

৩০.৬৩. আমাদের দেশে এমন কোন সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই যাকে এ মুহূর্তে জাতীয় মিউজিয়ামের মর্যাদা দেওয়া যায়। পাকিস্তান আমলে ঢাকায় একটি বৃহদাকার সরকারী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রকল্প রচনার প্রয়াস হয়েছিল, শাহবাগ এলাকায় প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ভবন নির্মাণের কাজও কিছুটা হয়েছিল। কিন্তু নীলনকশায় ভ্রম প্রমাদের অজুহাতে নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়। বেসরকারী পরিচালনাধীনে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী "ঢাকা যাদুঘর" টিও বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। বাংলাদেশের ভূগর্ভে প্রাপ্ত দুর্লভ ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বহু নিদর্শন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে সরানো হয়েছে। বহু জিনিষ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে বলেও প্রকাশ। রাজশাহীতে অবস্থিত দ্বিতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী "বারেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম" টিও অবহেলার দরুণ প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। কিছুদিন পূর্বে মিউজিয়ামটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। হালে ভূ-তাত্ত্বিক খননক্রিয়াস্থল ময়নামতি, পহাড়পুর ও মহাস্থানগড়ে "সাইট" মিউজিয়াম হয়েছে এবং আগ্রাবাদে একটি আর্কিয়োলজীল মিউজিয়ামের পত্তন করা হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে কিশোরগঞ্জ গণগ্রন্থাগারের একাংশে এবং দিনাজপুর নাজিমুদ্দিন হল লাইব্রেরী সংলগ্ন স্থানে স্থানীয় উদ্যোগে আঞ্চলিক আহরণ দিয়ে দুটো মিউজিয়াম অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং অঙ্কুরেই রয়ে গেছে। একবার রাংগামাটিতে উপ-জাতীয়দের জীবনযাত্রার উপকরণ দিয়ে একটি মিউজিয়াম সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কাজ কিছুই হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম, হাজং ইত্যাদি বিস্তীর্ণ উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীরা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার ধরণ আর তাঁদের ধ্যান-ধারণা নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অমূল্য এবং অতুল্য-উপকরণ-বিশেষতঃ বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে। আমরা এ কথাটি সম্যক উপলব্ধি করিনি বলে আমাদের কোন মিউজিয়ামে উপজাতীয়দের জীবন সার্বিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি অথবা তাদের জীবনকে ভিত্তি করে কোন একান্ত মিউজিয়াম গড়ে ওঠেনি। আধুনিক সভ্যতার অনুপ্রবেশে বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে উপজাতীয়রা উৎখাত হয়েছে এবং তাঁদের এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, অচিরেই তাঁদের জীবনমূলক উপকরণ সংগ্রহ অতি দুরূহ হয়ে পড়বে—তার জন্য বিদেশীদের দ্বারস্থ হতে হবে।

৩০.৬৪. আজকের জগতে জাতীয় পর্যায়ে বহুবিধ বিশালকায় মিউজিয়াম জন্মলাভ করেছে যেমন সাইন্স মিউজিয়াম, ইন্ডাষ্ট্রি মিউজিয়াম ইত্যাদি, এগুলির কথা এতদিন আমরা তেমন ভাবিনি। এগুলি বহু অর্থ ব্যয়, দীর্ঘদিনের সঞ্চয় এবং অধ্যবসায়সাপেক্ষ।

আমাদের সুপারিশঃ

৩০.৬৫. ঢাকা যাদুঘরের আহরিত সম্পদ দিয়েই আমাদের জাতীয় মিউজিয়ামের গোড়া পত্তন করা যেতে পারে; সুতরাং তাই করা হোক। এ যাদুঘরের বর্তমান স্থান অপরিসর, ভবনটি ততোধিক অপরিসর। মিউজিয়ামের পক্ষে বহুতলবিশিষ্ট ভবন উপযোগী নয়। সুতরাং এর জন্য বিস্তীর্ণ জায়গার প্রয়োজন এবং এতে ভবিষ্যত সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবকাশ থাকতে হবে। জানা যায়, শেরেবাংলা নগরে জাতীয় মিউজিয়ামের জন্য পাঁচ একর এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সমপরিমাণ জায়গা নিরূপিত আছে। সম্পূর্ণ জায়গাটি মিউজিয়ামকে দেওয়া যাক। অন্যপক্ষে শাহবাগ এলাকায় যেখানে মিউজিয়ামের ভবন নির্মিত হতে যাচ্ছিল সে জায়গাটি জাতীয় গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত থাকা আবশ্যক, যদি আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে জাতীয় গ্রন্থাগারে উন্নীত করা হয় এবং শাহবাগ এলাকায় তার অবস্থান নির্ধারিত হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে শাহবাগ এলাকায় মিউজিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গার পাশেই বর্তমান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভবন নির্মাণ হচ্ছে। জাতীয় মিউজিয়াম হবে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

৩০.৬৬. আগ্রাবাদে পত্তন করা আর্কিয়োলজীল মিউজিয়ামকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া উচিত। কালে এ মিউজিয়াম ও ভূ-তত্ত্ব ক্ষেত্রে জাতীয় মিউজিয়ামের মর্যাদার দাবীদার হবে।

৩০.৬৭. বিশেষজ্ঞদের মতে সাইন্স মিউজিয়াম, ইন্ডাস্ট্রি মিউজিয়াম জাতীয় যে-কয়টি মিউজিয়াম স্থাপন করা আবশ্যক তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ধীরপদে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

৩০.৬৮. জাতীয় মিউজিয়ামের শাখা হিসাবেই হোক কিংবা স্বতন্ত্র মিউজিয়ামরূপেই হোক, উপজাতীয়দের জীবনের প্রতিফলন হতে হবে কোন মিউজিয়ামে। বিশিষ্ট কোন পর্যটন কেন্দ্রে জাতীয় মিউজিয়ামের শাখা হিসাবে একটি উপজাতীয় মিউজিয়ামই বোধ হয় সহজসাধ্য হবে।

৩০.৬৯. দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান মিউজিয়াম হিসাবে বারেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের অগ্রগতির ব্যবস্থাকে প্রাপ্য অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩০.৭০. গণশিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা হিসাবে প্রথম পর্যায়ে বিভাগ ও জিলা পর্যায়ে ঐতিহ্য-ভিত্তিক মিউজিয়াম স্থাপন করতে হবে।

ডকুমেন্টেশান সেন্টার:

৩০.৭১. বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সাইনটিফিক এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর পরিচালনাধীন যে "সাইনটিফিক ডকুমেন্টেশান সেন্টার" রয়েছে, পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক স্তরে যার ভিত্তি পত্তন হয়েছিল, বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে গবেষণার ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির তাগিদে অবিলম্বে এটিকে জাতীয় ডকুমেন্টেশান সেন্টারের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এটি হবে দেশের গবেষকদের জন্য প্রধান তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র এবং এর যোগাযোগ থাকবে দুনিয়ার সব প্রসিদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের সাথে। গবেষণালব্ধ তথ্য সম্বলিত বর্ষপঞ্জী, সাময়িকী ইত্যাদি যেখানে যে ভাষায় যা প্রকাশিত হয় তা অথবা তার অনুলিপি সংগ্রহ করে গবেষকের প্রয়োজন মেটানোই হবে এ কেন্দ্রের দায়িত্ব। এ ধরণের একটি ডকুমেন্টেশান সেন্টারের জাতীয় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হোক, আণবিক শক্তি কমিশনই হোক, কিংবা জুট রিসার্চ বা কলেরা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটই হোক, স্বতন্ত্রভাবে কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় দেশী-বিদেশী সব সাময়িকী ও নানাবিধ প্রকাশনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, এমন কি তার খোঁজ রাখাও দুঃসাধ্য। তাই প্রয়োজন হয় ন্যাশনাল ডকুমেন্টেশান সেন্টারের। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে অতি জরুরী ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং জাতীয় ডকুমেন্টশান কেন্দ্র গড়ার পথে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্লেনেটোরিয়াম:

৩০.৭২. সৌরজগত এবং মহাশূন্যের রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর এ যুগের মানব গোষ্ঠীর জন্য প্লেনেটোরিয়াম স্থাপনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্লেনেটোরিয়ামের সিলিংয়ে ছায়াছবি প্রজেকশান প্রক্রিয়ায় প্রতিবিম্বিত নীল আকাশটিতে গ্রহ ও নক্ষত্রাদির বিচরণ দেখে এবং সাথে সাথে গ্রহ-উপগ্রহ মণ্ডলের গতি-স্থিতি সম্পর্কীয় ধারা বিবরণী শোনেও শিক্ষার্থীরা রোমাঞ্চকর আনন্দের ভিতর দিয়ে ভূগোল-জ্যোতির্বিজ্ঞানের এমন সব দুর্বোধ্য ও দুরূহ পাঠ দু-এক ঘন্টায় প্রায় অবিস্মরণীয়ভাবে আয়ত্ব করে, যা সারা বছরের অধ্যয়ন-অধ্যবসায়ে সম্ভব হয় না। জিয়োফিজিক্যাল গবেষণা প্রসূত তথ্যাদি বিশেষ বিশেষ প্রজেকশান-প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন সাধারণ দর্শকদের দেখানো যায় তাদের ঔৎসুক্য ও উপলব্ধি ক্ষমতা অনুসারে, তেমনি দেখানো যায় উচ্চস্তরের ছাত্র-শিক্ষক এবং উচ্চ শিক্ষিত জনগণকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, প্লেনেটোরিয়ামে সর্বদাই দর্শকদের ভীড় থাকে, বিশেষতঃ ছুটির দিনে। প্রবেশ-ফিতে যা আয় হয়, তাতে বার্ষিক ব্যয়ের একটা বিশেষ অংশ পাওয়া যায়।

৩০.৭৩. আমরা সুপারিশ করছি, ঢাকায় একটি প্লেনেটোরিয়াম আশু স্থাপন করা হোক। ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিভাগ-সদরে একটি করে প্লেনেটোরিয়াম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগার

সারাংশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার:

১। গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ডটি নিস্পন্দ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার উন্নয়ন জোড়াতালির ব্যাপার নয়। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে স্বার্থক করে তুলতে হলে একে নতুন করে সাজাতে হবে। (৩০.১.)

২। বর্তমান রিপোর্টে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিধি বা মান নির্দেশ করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়নকর্মী এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগোতে পারেন এবং যাতে স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কিছুটা সমতা বিধান হয়। নির্দেশিত মানের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনর্বিবেচনা আবশ্যক হবে। (৩০.২.—৩০.৪.)

প্রাথমিক স্কুলের গ্রন্থাগার:

৩। বইয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও মর্যাদাবোধ জাগানো এবং পাঠাভ্যাসের বীজ বপনের জন্য ছোটদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দায়িত্ব প্রথমে অভিভাবকদের, পরে প্রাথমিক স্কুলের উপর বর্তায়। কিন্তু এ দায়িত্ব পালিত হচ্ছেনা। এ পর্যন্ত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এদেশের প্রাথমিক স্কুলে বই পরিবেশনের কথা চিন্তা করা হয়নি। সকল প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রত্যেক থানা সদরে গ্রন্থাগার স্থাপন করে প্রাথমিক স্কুল-গুলিতে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক নির্ধারিত প্রাথমিক স্কুলকে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের শিবিররূপে ব্যবহার করতে হবে। সরকারী উদ্যোগে ছোটদের জন্য মনোরম বই ও সাময়িকী প্রকাশনা ও তা স্বল্প মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩০.৫.—৩০.১৪.)

মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগার:

৪। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও গ্রন্থাগার একান্ত অবহেলিত। বইয়ের স্বল্পতা, স্থানাভাব, গ্রন্থাগারিকের অভাব, সর্বোপরি শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে বই পড়ার প্রেরণার অভাব মাধ্যমিক স্কুলগুলির করুণ চিত্রের পরিচয় প্রদান করে। মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের সর্বত্র সুসমভাবে নির্ধারিত নিম্নতমমানে মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলিকে গড়ে তোলার দিকে আশু দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের ব্যর্থতার সুনিশ্চিত পরিণাম হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার প্রয়াসের ব্যর্থতা। (৩০.১৫.—৩০.২২.)

কলেজের গ্রন্থাগার:

৫। দেশের কলেজ গ্রন্থাগারগুলি দৈন্যতা মূলতঃ মাধ্যমিক স্কুলগুলির মতই। সরকারী কলেজগুলির গ্রন্থাগার একটু ভাল হলেও বেসরকারী কলেজগুলির গ্রন্থাগারের দুর্দশা অত্যন্ত প্রকট। সম্প্রতি অনেক কলেজ ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, কোন কোন কলেজে অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে, এমন কি কিছু সংখ্যক কলেজে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশ খোলা হয়েছে কিন্তু ঐ কলেজ-গুলির গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের বস্তুতঃ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কলেজগুলিকে বড়, ছোট, মাঝারি এ তিন পর্যায়ের বিভক্ত করে কলেজ গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের নিম্নতম মান নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে গ্রন্থাগারের আয়তন, ব্যয় বরাদ্দ ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩০.২৮.)

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ

৬। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে যে গ্রন্থাগারব্যবস্থা রয়েছে আমাদের মতে তাও সন্তোষজনক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এই পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলির কার্যকারিতা ও দুর্বলতার খতিয়ান তৈরী করা দরকার। এ খতিয়ানের ভিত্তিতে উন্নয়নপ্রকল্প তৈরী এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের জন্য প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করা দরকার। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই সাময়িকীর বরাদ্দ বাড়াতে হবে, গবেষণা কর্মকে জোরদার করবার জন্য রেফারেন্স বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশী বই, ফিল্ম, ইত্যাদি আমদানির জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারী আনুকূল্যের প্রয়োজন হবে। (৩০.২৯.—৩০.৩১.)

গণগ্রন্থাগার ঃ

৭। উন্নত দেশে গণগ্রন্থাগার বলতে বোঝায় আইনভিত্তিক ট্যাক্স নির্ভর সাংস্কৃতিক সেবা প্রতিষ্ঠান, যাতে জনগণের প্রবেশাধিকার অবাধ, সর্বস্তরের জনগণ সেখানে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরাও গণগ্রন্থাগার ব্যবহার করে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশব্যাপী গণগ্রন্থাগারের বিস্তার, যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার বাসস্থানের অনধিক এক মাইলের মধ্যে গণগ্রন্থাগারের বই পেতে পারেন। তজ্জন্য গণগ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে ট্যাক্স ধার্য, গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তর স্থাপন এবং গণগ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

অবিলম্বে রাজশাহীতে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা দরকার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় অবস্থিত সরকারী গণগ্রন্থাগারের স্থানাভাব-সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং এদের বই বরাদ্দ তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারী গণগ্রন্থাগারের জন্য সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনাবর্তক মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারকে জাতীয় গ্রন্থাগারে উন্নীত করে একে কপিরাইট ডিপোজিটের অধিকার দিতে হবে এবং আইনভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে। (৩০.৩২.—৩০.৪৭.)

৮। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড এবং জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণার প্রয়োজনে সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য আর্কাইভস্ পরিদপ্তর স্থাপন করা ও জাতীয় আর্কাইভস্‌কে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদান এবং একটি জাতীয় আর্কাইভস্ কমিশন নিয়োগ করা দরকার। (৩০.৪৮.—৩০.৫১.)

গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ ঃ

৯। আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণের পক্ষে বর্তমান প্রশিক্ষণব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট নয়। আমরা সুপারিশ করি, রাজশাহী, চট্টগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিভাগ খোলা হোক এবং ঢাকায় একটি গ্রন্থাগার ইনস্টিটিউট স্থাপন করা আবশ্যক। সমতুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদেরকে পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত। (৩০.৫২.—৩০.৫৮.)

মিউজিয়াম ঃ

১০। শিক্ষাসৌকর্যের দরজে শিক্ষাঙ্গনে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে। জাতীয় জীবনের ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের রূপরেখা মিউজিয়ামে যথাযথভাবে বিধৃত হয়। তাই শিক্ষাঙ্গনে ও শিক্ষাঙ্গনের বাইরে অবস্থিত মিউজিয়ামের সাহায্যে শিক্ষাদানপর্ব অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও দেশময় কতকগুলি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

ঢাকা যাদুঘরকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে জাতীয় মিউজিয়াম গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক বিভাগ সদরে একটি মিউজিয়াম স্থাপন করা উচিত। জেলা পর্যায়ে ঐতিহ্যভিত্তিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হবে। (৩০.৫৯.—৩০.৭০.)

ডকুমেন্টেশান সেন্টার:

১১। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের পরিচালনাধীন ডকুমেন্টেশান কেন্দ্রটি প্রাদেশিক স্তরে স্থাপিত হয়েছিল। বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির তাগিদে অবিলম্বে এটিকে জাতীয় ডকুমেন্টেশান সেন্টারের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। (৩০.৭১.)

প্লেনেটেরিয়াম:

১২। গণশিক্ষা ও জনগণের শিক্ষাপ্রদ অবসর বিনোদনের জন্য ঢাকায় একটি প্লেনেটেরিয়াম শীঘ্রই স্থাপন করা দরকার। ভবিষ্যতে প্রত্যেক বিভাগ সদরে একটি করে প্লেনেটেরিয়াম স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। (৩০.৭২.—৩০.৭৩.)

শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান

৩১.১. একটি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য দূর করে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান করতে হবে। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রধানতঃ সমাজের একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তার ফলে, কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের সন্তান-সন্ততিদের প্রতিভা বিকাশের পথে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। সারাদেশে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে ও অগ্রগতির স্বার্থে দেশব্যাপী শিক্ষার মানের একটি মোটামুটি সমতা বিধান অপরিহার্য। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, বয়স, প্রভৃতি কারণে যেন কারও প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত না হয় তা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনিশ্চিত করতে হবে।

৩১.২. সামাজিক বৈষম্যের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার শ্রেণী বৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে উপযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে এরূপ বৈষম্য দূরীকরণের প্রধান ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশ সমাজতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় উত্তরণের প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে। সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের এক বৃহৎ অংশ রক্ষণশীল। এদের পক্ষে শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের মানসিকতা বর্জন অত্যন্ত কঠিন। সমাজের এই অংশ স্বাভাবিক কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধানের বিরোধিতা করতে পারে। এরূপ বিরোধিতা অপসারণ করে যদি সতর্কতার সঙ্গে নীচের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা হলে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা জনগণ ভোগ করতে পারবেন।

৩১.৩. শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ লাভের অধিকার বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ও তার সঙ্গে সংযুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের এ একটি মূলনীতি। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকারসংক্রান্ত সনদে ঘোষিত নীতিমালায় এ সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশ এ মানবাধিকার নীতিটি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি হিসাবে নতুন সমাজ গঠনকল্পে এর রূপায়ণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই নীতি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বহুবিধ সরকারী ঘোষণাপত্রে এর রূপায়ণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

৩১.৪. ব্যক্তিত্ব, সমাজের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান একটি অপরিহার্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি এবং প্রধানতঃ এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ শ্রেণী বৈষম্যও বিদূরিত হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায় যে শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা যেমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহায়ক ও পরিপূরক তেমনি রাষ্ট্র শিক্ষাকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে সক্ষম।

৩১.৫. শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নীতির সহায়ক হিসাবে অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। প্রতিটি নাগরিকের সুপ্ত শক্তিসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিকাশের প্রধান দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। এ ব্যাপারে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হবে প্রধানতঃ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এবং এরূপ সুযোগলাভ সামাজিক ও নাগরিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে। বালক-বালিকার প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা ও মেধা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই সুযোগ-সুবিধার তারতম্যের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। যথাসম্ভব একই ধরণের শিক্ষাংগনে কিংবা

সমান সুবিধাপূর্ণ শিক্ষায়তনে সকল শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সুতরাং সম-স্তরের এবং একই ধরণের সকল শিক্ষায়তনের সর্বত্র ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ লাভ করবে। শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের নিজেকে উন্নত করার ব্যক্তিগত প্রবণতা একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পাবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা-এর ধারক হিসাবে নিয়োজিত থাকবে। উচ্চতর শিক্ষার স্তরে বা বিশেষ পেশাগত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রবণতা, প্রতিভা এবং মানসিক ও শারীরিক গুণাবলী বিবেচ্য বিষয় হবে। সর্বোপরি শিক্ষা-ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিরসনের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩১.৬. নানাবিধ কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। অতীতে সাম্রাজ্য-বাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন আমলে আমাদের বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিদেশী শাসকেরা তাদের প্রয়োজনে শ্রেণীভিত্তিক বা শ্রেণী সৃষ্টিকারী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া পত্তন করে গিয়েছে। এই ব্যবস্থা তাদের শাসন, শোষণ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপূরক ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক তারতম্য রয়েছে তাও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। নানবিধ সামাজিক কুসংস্কার, অদৃষ্ট-বাদিতা, নৈরাশ্যবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ, স্বার্থপরতা, রক্ষণশীলতা এবং সর্বোপরি আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বৈষম্যের কারণগুলির অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পদক্ষেপের ফলে দূরীভূত করা যেতে পারে।

৩১.৭. শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধানের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন কার্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এ কার্যপন্থাসমূহের প্রধান কয়েকটির এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

৩১.৮. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন হবে। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একে অপরের উপর নির্ভরশীল। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার পরেই অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব হয়ে থাকে; অবশ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে পৌঁছবার পরেই সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সম্ভব, কেননা বছরের পর বছর ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। অধিকাংশ শিল্প য়িত ও উন্নত দেশ ষোল বছর পর্যন্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে, অবশ্য গোড়ার দিকে তারা এর অনেক কম সময় হতে অরম্ভ করেছিল এবং ক্রমক্রমে সম্পদ বৃদ্ধির সংগে সংগে তারা সার্বজনীন শিক্ষার মেয়াদও বৃদ্ধি করেছে। উন্নত দেশগুলি শিল্পায়নে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলে বাংলাদেশকে এ সকল শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় বিবর্তনের সময়কে অবশ্যই স্বল্পকাল স্থায়ী করতে হবে। অবশ্য উন্নত দেশসমূহে প্রচলিত সার্বজনীন শিক্ষার সমপর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চালু করার মত প্রয়োজনীয় সম্পদ আমাদের নাই। এখানে আমাদের মৌলিক বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে যে অর্থনৈতিক প্রগতি এবং শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তুলবার মত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয় পর্যায়ে কিভাবে পৌঁছান সম্ভব। আট বছরের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মৌলিক নীতি গ্রহণ করার জন্য আমরা সুপারিশ করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সুনাগরিক তৈরীর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে দারিদ্রই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। দরিদ্র জনগণ সন্তানের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারগ। উপরন্তু দারিদ্র্যতার দরুণ ছোট ছেলেদের কায়িক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করা হয়। এসব কারণে বহু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেরণের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় মাতাপিতাকে বহন করতে হবে তা লাঘব করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক, অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও বছরে এক সেট স্কুল

ইউনিফর্ম ইত্যাদি সরবরাহ করা হলে এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থাকলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে স্কুলে ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। তা ছাড়া স্কুলে অল্প মূল্যে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করলে প্রায় সকল পরিবারই ছেলেমেয়েদের স্কুলের সময় কাজে নিয়োজিত না করে স্কুলে পাঠাবার সুযোগ গ্রহণ করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার মান শহরাঞ্চলের শিক্ষার মানের সমপর্যায়ে আনার জন্য সম্ভাব্য সকল রকমের ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে। আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপকতা এবং মান উন্নয়নের জন্যও সুপারিশ করেছি। এর ফলে অবশ্য শিক্ষা বাবত খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং সেজন্য এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে অভিভাবক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারকে সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩১.৯. ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিপূর্ণ সদব্যবহারের জন্য মাধ্যমিক স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সকল ছাত্রের বিশেষ ভাল লাগার বিষয় বস্তু বা ঝোঁক এবং আশা আকাঙ্খা সব সময় একই ধরণের হয় না। যে বিষয়ে তার প্রতিভা রয়েছে, সেই বিষয় উপেক্ষা করে, শুধু শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা অনুসরণের চাপে পড়ে যে বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ নাই এমন বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোন কোন ছাত্রের পক্ষে বিচিত্র নয়। এর মূল কারণ, নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব বোধ শক্তির অভাব এবং বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে তারা অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে নিছক মাতাপিতা বা অভিভাবকের ইচ্ছা পূরণের জন্যই কোন ছাত্র একটি বিষয়ে লেখাপড়া করেছে বা কোন একটি পেশা অবলম্বন করেছে। জনশক্তির এই অপচয় রোধ করার জন্য ছাত্র ও তার মাতাপিতা বা অভিভাবককে তার প্রতিভা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং যে পেশার মাধ্যমে তার প্রতিভা কার্যে নিয়োজিত করা সম্ভব, সেদিকে তাকে পরিচালিত করা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা এবং প্রবণতা শুধু নির্ধারণ ও পরিমাপ করলে চলবে না, তাদের প্রতিভা, প্রবণতা এবং আগ্রহের পরিপূর্ণ সদব্যবহারের জন্য বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং এই স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থার জন্য আমরা সুপারিশ করেছি। এখানে এও বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলাফলের সংগে উৎপাদনী শ্রমের ও সমাজ সেবার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৩১.১০. বিশ্বের সকল জাতিই আজ সর্বাপেক্ষা উচ্চমানের প্রতিভা আবিষ্কারের এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত জাতিসমূহও এর থেকে বাদ পড়ে নাই। এই বিশ্বব্যাপী জরুরী তাগিদের পশ্চাতে রয়েছে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও যন্ত্রভিত্তিক জীবনধারা। দ্রুত পরিবর্তন এবং তীব্র প্রতিযোগিতাই এ যুগের ধর্ম। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উৎসাহী এবং যুগধর্মের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার মত সক্ষম লোকের প্রয়োজন হয়তো এর পূর্বে কখনও এত অধিক অনুভূত হয়নি। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে এবং তাঁদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে অক্ষম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিই শ্লথ হয়ে আসবে। এ জন্যই প্রতিভার অনুসন্ধানের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই একই কারণে অপেক্ষকৃত উন্নত দেশগুলিও উপযুক্ত লোকদের খুঁজে বের করবার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের প্রতিভাকে জাতীয় উন্নয়নের কাজে লাগাবার জন্য যথার্থ শিক্ষা-ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশে এই প্রতিভার আবিষ্কার এবং প্রতিভার বিকাশসাধনে সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তা খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা ইতিহাসের এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছি, যখন বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বহু কর্মীর প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব দূরীকরণের জন্য এসব বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, সেই অভাবই আবার এদের প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষাদানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা বলা যায় যে যেহেতু একটি শিল্পোন্নত দেশের ন্যায় উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের নয় সেই কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন তার বায়ভার আমরা বহন করতে অক্ষম। এ সমস্যার একটি সমাধান

আছে এবং তা হচ্ছে আমাদের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার। পৃথিবীতে বর্তমানে এমন বহুদেশ রয়েছে যারা কাঁচা মালের অভাব সত্ত্বেও তাদের জনশক্তির সদ্ব্যবহারের ফলে উন্নতশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য দেশের সম্পদই শিল্পোন্নত সমাজের মূল উপকরণ। আমাদের সেই সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে এখনও সঠিক হিসাব আমরা না পেতে পারি কিন্তু আমাদের দেশে সাড়ে সাত কোটি লোক রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এই জনশক্তি দেশের জন্য যেমন মূল্যবান হবে তেমনি হবে অক্ষয়। বিশেষ করে যাদের মেধা ও প্রতিভা উচ্চমানের তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩১.১১. উপযুক্ত শিক্ষাদান ও ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে মাধ্যমিক স্তর থেকে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন আমাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ স্বল্প থাকবে, ততদিন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছাত্রের পক্ষেও উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর হবে। এর ফলে দেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দক্ষ লোকের অভাব দেখা দিবে। সুতরাং যে সকল প্রতিভাবান ছাত্রের দ্বারা দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধিত হতে পারে, তাঁদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে বহুসংখ্যক বৃত্তিদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এরূপ বৃত্তিদানের ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার একটা অর্থপূর্ণ সমতাবিধান করতে সক্ষম হব।

৩১.১২. আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যক প্রতিভাবান যুবক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের কর্মক্ষমতা অনুধাবন করার সুযোগ পায় না। অন্যদিকে যাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে লাভবান হবার ক্ষমতা বা স্পৃহা নাই। এভাবে আমাদের জনশক্তি অপচয় ঘটতে কিংবা আমাদের সীমাবদ্ধ শিক্ষাবিষয়ক সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার হতে দেওয়া অনুচিত। প্রতিভাবান ছাত্রদের অধিকাংশের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হচ্ছে অর্থাভাব। আমাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে দারিদ্র্যকে প্রতিভার পথে অন্তরায় হতে অথবা দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভার বিকাশসাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া উচিত নয়। ছাত্রদের বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধানের যে সুপারিশ করছি তার ফলে যোগ্য ছাত্রদের খুঁজে বের করা এবং তাদের ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করার এবং সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সরকারকে মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান যাতে উচ্চতর বা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বহু দরিদ্র ছাত্রের বেতন মওকুফ করা হয়। সাধারণতঃ শতকরা দশজন ছাত্রের পূর্ণ বেতন এবং সমসংখ্যক ছাত্রের অর্ধেক বেতন মওকুফ বর্তমান রীতি। কলেজগুলিতেও কনসেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ সকল সুযোগ-সুবিধা দান অব্যাহত রাখতে হবে। তবে বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর উপযুক্ততার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩১.১৩. বৃত্তির পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থী কোন প্রকার আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে পড়াশুনা করতে পারে। গুণাগুণ বিচারই হবে বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচনার বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেমন সাধারণ ছাত্রদের জন্য বৃত্তি, যাতে তাদের বেতন ও আনুসঙ্গিক ব্যয় চলতে পারে, আবাসিক ছাত্রদের জন্য বৃত্তি যাতে তারা বেতন, ছাত্রাবাসে আহার, বাসস্থান এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় বহন করতে পারে ইত্যাদি।

৩১.১৪. বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে ও পেশায় প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রবেশের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নিয়োগের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও মূল্যায়নের সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। যেমন যখন বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অধিক হয়, তখন ছাত্রদের বিজ্ঞানের প্রতি

আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে চাহিদা কম, সেখানে বৃত্তির সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। প্রতিভাবান ছাত্রদের খুঁজে বের করার জন্য এবং তাদের উৎসাহিত করার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে প্রতিভা বিভিন্নমুখী। যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় কেবল তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ভুল করা হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা প্রকারের কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির প্রয়োজন। যে সকল ছাত্রের এদিকে ঝোঁক আছে, তাদের ভাবী কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি গড়ে তুলবার জন্য সুযোগ দিতে হবে। এই ধরণের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে হলে প্রত্যেকের সুপ্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং পরিমাপ করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

৩১.১৫. সমাজের কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ নির্বিশেষে সকল প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী যেন বিশ্বের উন্নত দেশ-সমূহের সমকক্ষ শিক্ষালাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি যেন কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

৩১.১৬. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ যে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শিক্ষাকে সমাজমুখী করার সমস্যা। দেশময় সাধারণ মানুষের যে সমাজ আর সে সমাজের অঙ্গীভূত যে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনকে অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে হতে হবে সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্যের অবসান। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ হলেই সেটা সম্ভব। জাতীয়করণের অর্থ দাঁড়াবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব সরকারী কর্তৃত্বের আওতায় রাখা, শহর, গ্রামের সব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান যথাসম্ভব সমপর্যায়ে আনা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হারে সমতা বিধান করা। এ কাজ ব্যয়বহুল তাতে সন্দেহ নাই। তথাপি পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণী-কক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদির যোগান দেবার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ক্রমাবয়ে এগোতে হবে।

৩১.১৭. বাংলাদেশে বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এবং বেসরকারী কলেজগুলিতে ছাত্র বেতন থেকে যা আয় তার সাথে সরকারী অর্থ সাহায্য যোগ করে মোটামুটি সব টাকা শিক্ষকদের বেতন দিতে ব্যয় হয়। জাতীয়করণ করলে সব শিক্ষকের বেতন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ে আনতে হবে। কাজেই সমস্ত স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করার ফলে শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারের প্রতি বছরে পৌনঃপুনিক ব্যয় বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে। এতদুদ্দেশ্যে দশ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩১.১৮. শিক্ষকদের বাড়তি বেতনই জাতীয়করণের একমাত্র খরচ নয়। জনসাধারণের মধ্যে অন্ততঃ নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার চাহিদা রয়েছে, দাবী রয়েছে অন্ততঃ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সকলের জন্য অবারিত করার। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র বেতন মওকুফ করলে সরকারের প্রতি বছরে আরো বাড়তি ব্যয় হবে। এ ছাড়া অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর-বাড়ি, সাজসরঞ্জাম এখন যে রকম নিম্নমানের ও অপ্রতুল তাতে এসবের জন্যও ক্রমে ক্রমে প্রচুর ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে।

৩১.১৯. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষক, উপকরণ ও শিক্ষাদানের মানের যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করতে হবে। বিশেষ করে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষাগৃহ, উপকরণ ও শিক্ষাদানের মানের বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান। অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন কম। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদানের মানের উন্নয়নের জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। আর্থিক অভাবের দরুণ অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারে না। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত গৃহ, শ্রেণী-

কক্ষ, আসবাবপত্রের অভাব খুবই প্রকট, খেলাধুলার জন্য কোন মাঠ বা স্থান নাই, বাসস্থান ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নাই। জাতীয় শিক্ষার মান উন্নীত করতে হলে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ ও শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র ও খেলাধুলার স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষোপকরণের যে অভাব এবং বহুক্ষেত্রে যেসব শিক্ষোপকরণ রয়েছে তা যে নিম্নমানের তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। জাতীয় শিক্ষার মান উন্নীত করতে হলে এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত মানের এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তদুপরি যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই যতদিন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩১.২০. ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার সাথে সংগতি রেখে এবং জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াবার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে শুধু গতানুগতিকে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না, বরং পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পেশাগত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদনী পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে দ্রুত হারে শিক্ষাবিস্তার অত্যাবশ্যক প্রয়োজন।

৩১.২১. সমাজের কল্যাণের স্বার্থে শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং প্রয়োজনমত বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। যে সকল কর্মজীবী ইতিপূর্বে যথাযথ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি তাদের প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্নমুখী আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৩১.২২. আমাদের দেশে মিশনারী, বিভিন্ন সংস্থা কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। একই পাঠ্যসূচী অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই সব বিদ্যালয়ের মান, পরিচালনাব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত সামঞ্জস্যের অভাবে সমাজে শ্রেণীভেদ তীব্রতর হয়েছে। যাতে বৈষম্যাদি দূর করা যায় তার জন্য আমরা মনে করি যে এসব বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থাসংক্রান্ত নিয়মাবলী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরির শর্তাদি, শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা, পাঠ্যসূচী, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি প্রশ্নে সরকারী নিয়ন্ত্রণে একই নীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে।

৩১.২৩. বলা বাহুল্য, বহুকালের শোষণভিত্তিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তাতে উপরের সবগুলি কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে সময়ের প্রয়োজন হবে। সমগ্র দেশে এবং জনসমাজের সর্বস্তরে সমমানের গণশিক্ষা প্রবর্তনে বিপুল বস্তুসম্পদ ও জনশক্তি প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ণয় করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে যাতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সমমানের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান

সারাংশ

১। শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য দূর করে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান করতে হবে। সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে ও অগ্রগতির স্বার্থে দেশব্যাপী শিক্ষার মানের মোটামুটি সমতাবিধান অপরিহার্য। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম প্রভৃতি কারণে যেন কারও প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত না হয় তা শিক্ষাব্যবস্থায় সুনিশ্চিত করতে হবে। (৩১.১.)

২। সামাজিক বৈষম্যের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার শ্রেণীবৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে। উপযুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে এরূপ বৈষম্য দূরীকরণের নির্ভরযোগ্য হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা যায়। প্রতিটি নাগরিকের সুপ্ত শক্তিসমূহের পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ বিকাশের প্রধান দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। এ ব্যাপারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালিত হবে প্রধানতঃ শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে। বালক-বালিকার প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা ও মেধা ব্যতীত অন্য কোন কিছু সুযোগ-সুবিধার তারতম্যের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। যথাসম্ভব একই ধরণের শিক্ষাংগনে কিংবা সমান সুবিধাপূর্ণ শিক্ষায়তনে সকল শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সুতরাং সমস্তরের এবং একই ধরণের সকল শিক্ষায়তনের সর্বত্র ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ লাভ করবে। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বা বিশেষ পেশাগত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রবণতা, মেধা এবং মানবিক ও শারীরিক গুণাবলীই বিবেচিত হবে। (৩১.২.—৩১.৬.)

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধানের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিভিন্ন কার্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেরণের জন্য মাতাপিতার যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে তা লাঘব করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক, অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও স্কুল ইউনিফর্ম ইত্যাদি সরবরাহ করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া অল্প মূল্যে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করলে প্রায় সকল পরিবারই ছেলেমেয়েদের স্কুলের সময় কাজে নিয়োজিত না করে স্কুলে পাঠাবার সুযোগ গ্রহণ করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। (৩১.৭.—৩১.৮.)

৪। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা, প্রবণতা ও আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য মাধ্যমিক স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং এ স্তর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ফলাফল সংগে উৎপাদনী শ্রম-অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। (৩১.৯.)

৫। যাদের মেধা ও প্রতিভা উচ্চমানের তাদের জন্য উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারকে মাধ্যমিক স্তর থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততি যাতে উচ্চতর বা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য মেধাবী গরীব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। (৩১.১০.—৩১.১৩.)

৬। বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে ও পেশায় প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রবেশের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক নিয়োগের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও মূল্যায়নের সামঞ্জস্যবিধান করা দরকার। (৩১.১৪.)

৭। সমাজের কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ নির্বিশেষে সকল প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী যেন বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সমকক্ষ শিক্ষালাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি যেন কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। (৩১.১৫.)

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষাদানের মানের যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যতদিন সম্পূর্ণ জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্ভব না হয় ততদিন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামানের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৩১.১৬.—৩১.১৯.)

৯। ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার সাথে সংগতি রেখে এবং জতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পেশাগত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদনী পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সম্ভবনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে দ্রুত হারে শিক্ষাবিস্তার অতীব প্রয়োজন। (৩১.২০.)

১০। সমাজের কল্যাণের স্বার্থে শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। যে সকল কর্মজীবী ইতিপূর্বে যথাযথ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি তাদের প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্নমুখী আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৩১.২১.)

১১। দেশের মিশনারী, বিভিন্ন সংস্থা কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে। (৩১.২২.)

১২। দেশে সর্বস্তরে সমমানের শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যথার্থ অগ্রাধিকার নির্ণয় করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে যাতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সমগ্রদেশে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সমমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩১.২৩.)

অধ্যায় ৩২

ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান

৩২.১. ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু বাংলাদেশের গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ বিষয়ের দিকে এ পর্যন্ত তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ফলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এ যাবত দক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। স্বকীয় মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতির দিক দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পর থেকে ভিন্ন এ সত্য আজ সর্বত্র স্বীকৃত। ব্যক্তির প্রতিভা, বহুমুখী প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যক্তির স্বার্থে যেমন প্রয়োজন, জাতীয় কল্যাণে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্যও তা তেমনি প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষের চিরাচরিত শিক্ষা পদ্ধতি এই প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য পরিপূরক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৩২.২. **নির্দেশনা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য:**

(ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রচ্ছন্ন গুণাবলির আবিষ্কার এবং তাঁদের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভে সাহায্য করা।

(খ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠন ও সার্বিক ক্রমোন্নতিতে তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং ভাবাবেগজনিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের যথোপযুক্ত সমন্বয়সাধনে সহায়তা করা।

(গ) শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান, অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, নিজস্ব গুণাবলীর সম্যক উপলব্ধি, জ্ঞানার্জনের অগ্রগতি ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালে স্বকীয় মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার প্রেক্ষিতে নিজ নিজ পাঠ্যবস্তু ও ভবিষ্যত কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করা।

(ঙ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আত্মনির্দেশনা ও আত্মনির্ভরশীলতায় সক্ষম হতে সাহায্য করা।

৩২.৩. **নির্দেশনার নীতিগত দিক:** বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে নির্দেশনা কর্মসূচী প্রণয়নের কয়েকটি নীতিগত দিক নীচে উল্লেখ করা হলো। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে 'পরামর্শদান' কথাটি পেশাগত নির্দেশনা কর্মসূচীর অন্যতম কার্যক্রম। তাই 'নির্দেশনা' কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(ক) নির্দেশনা হবে ছাত্রকেন্দ্রিক। সমস্যা সমাধান করে দেওয়া অপেক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে এর প্রধান লক্ষ্য।

(খ) শিক্ষা পদ্ধতির মত নির্দেশনাও একটি ধারাবাহিক কাজ। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে এর প্রয়োজন।

(গ) স্তরভেদে প্রাথমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনমত নির্দেশনা কর্মসূচী বিভিন্ন ধরণের হবে।

(ঘ) নির্দেশনা কর্মসূচী পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। তবে ছাত্র, শিক্ষক, সমাজকর্মী, প্রশাসক এবং অভিভাবকবৃন্দের সম্মিলিত সহযোগিতার উপর এর সফলতা নির্ভরশীল।

৩২.৪. **নির্দেশনা কর্মসূচীর কার্যক্রমঃ** নির্দেশনা কর্মসূচী কয়েকটি সুবিন্যস্ত কার্যক্রমের সমষ্টি। এই কার্যক্রমসমূহ সাধারণতঃ নিম্নরূপঃ

(ক) **ছাত্র তথ্যসংক্রান্ত কার্যক্রমঃ** প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সঠিকভাবে জানা এবং তার যাবতীয় গুণের উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য তার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধিষ্ণু বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্যগত তথ্য, পারিবারিক পরিবেশ ও সম্পর্ক, ব্যক্তিগত আশা ও আকাংখা, আগ্রহ এবং ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য এরূপ তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই এ তথ্য সংগ্রহ এবং তা' লিপিবদ্ধ করার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রের ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক একটি করে রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে যার নাম হবে 'সঞ্চয় রেকর্ড'। বস্তুতঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য এই রেকর্ড একটি সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পরিচয়পত্র। তার বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের পথে এ রেকর্ড একটি প্রামাণ্য দলিল-রূপে ব্যবহৃত হবে।

(খ) **তথ্য সরবরাহ কার্যক্রমঃ** এই কার্যক্রমে অন্ততঃ তিন প্রকার তথ্য সরবরাহ এবং তাদের যথাযথ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাজনিত বিবিধ তথ্য, কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট তথ্য ও তার বিশ্লেষণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-মূল্যায়নজনিত তথ্যাদি এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ বিশেষভাবে অবহিত বা তথ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে নিজের জীবনের পরিকল্পনা, তার কর্মজীবন ও সামাজের প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ যতটুকু সুষ্ঠু হবে, সাধারণভাবে শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানলাভ থেকে তা' তত সুষ্ঠু হতে পারে না।

এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে হলে বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে পরিচিতি কর্মসূচী বা 'ওরিয়েন্টেশান প্রোগ্রাম', স্কুল ও কলেজের নিজ নিজ হ্যান্ডবুক, কর্মসংস্থানজ্ঞাপক পুস্তিকা এবং অনুরূপ আরও অনেক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) **'কাউন্সেলিং' বা পরামর্শদান কার্যক্রমঃ** এই কার্যক্রম নির্দেশনা কর্মসূচীর প্রাণ-কেন্দ্র। এর জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী কাউন্সেলারের নিকট থেকে পেশাগত পরামর্শদান পদ্ধতির মাধ্যমে নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিগত পরামর্শের জন্য কাউন্সেলারের সাহায্য গ্রহণ করবে। এই সমস্যাগুলি নিছক শিক্ষাগত না হয়ে পারিবারিক অথবা সামাজিক পরিবেশ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।

(ঘ) **উপস্থাপন কার্যক্রমঃ** কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা খুঁজে বের করে কাজে নিযুক্তির ব্যাপারে তাঁদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করা এই কার্যক্রমের অন্যতম দিক। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে উপস্থাপন কার্যক্রম প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর শ্রেণী নির্ধারণ এবং সমবয়সীদের সহ-অবস্থানজনিত সমস্যার সমাধান হিসাবে ব্যবহৃত হবে। মাধ্যমিক স্তরে এই কার্যক্রম একদিকে যেমন কলেজ গমন ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষার অকৃতকার্য, শিক্ষার বিরতি টানা এবং কাজে যোগদান ইচ্ছুকদের জন্যও প্রয়োজন।

(ঙ) **অনুসরণ কার্যক্রমঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্যও নির্দেশনা এবং পরামর্শদান কার্যক্রমের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তির পর কেহ যদি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে পরামর্শদান কার্যক্রমের সুযোগ গ্রহণ করতে চায়, তবে

তাকেও সেই সুযোগ প্রদান করা এর আওতাভুক্ত। তদুপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায়ী এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এই কার্যক্রমের অন্যতম দিক।

৩২.৫. শিক্ষার ব্যবহারিক মানের উন্নতি এবং দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে। এ ধরণের প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ, বাংলায় রচিত উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও নির্দেশনা পুস্তিকা, ছাত্রছাত্রীদের মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, বিশেষ প্রতিভা ইত্যাদি মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ বহুবিধ পূর্ব প্রস্তুতি। নির্দেশনা কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

(ক) নির্দেশনা কর্মসূচী ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে অনতিবিলম্বে একটি 'গাইডেন্স ও টেস্টিং ইনষ্টিটিউট' স্থাপন করতে হবে। এই ইনষ্টিটিউটের প্রধান কাজ হবেঃ

(১) নির্দেশনা ও পরামর্শদান কার্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য বহুবিধ ফরম, প্রশ্নমালা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশনার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২) ব্যক্তিগত মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব, বিশেষ দক্ষতা এবং জ্ঞানার্জনের পরিমাণ নির্ধারক ও বিভিন্ন স্তরে ব্যবহারযোগ্য মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করা।

(৩) প্রয়োগমুখী গবেষণার সাহায্যে নির্দেশনা কর্মসূচীর উপযোগী বিবিধ তথ্য সংগ্রহ এবং তার সুষ্ঠু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) গাইডেন্স ও টেস্টিং বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দান করা। উক্ত ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দেশনা কার্যক্রমকে সার্থক করে তুলতে হবে। প্রস্তাবিত গাইডেন্স ও টেস্টিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন-সাপেক্ষে উপরিউক্ত কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে আরম্ভ করা যায়।

(খ) শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে, শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্রে, এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-সমূহে কাউন্সেলর প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কার্যরত শিক্ষকবৃন্দের এরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

(গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রত্যেক বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরে নির্দেশনা ও পরামর্শদান শাখার প্রবর্তন এবং তথায় বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে।

(ঘ) যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্ভব সে সব প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা কর্মসূচী অনতিবিলম্বে প্রবর্তন এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কার্যসূচীর বাস্তবায়ন করতে হবে।

ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান

সারাংশ

১। ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী শিক্ষাব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে পরিগণিত হওয়া দরকার। (৩২.১.)

২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি "সঞ্চয় কার্ড" প্রস্তুত করতে হবে। এতে তার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বৈশিষ্ট্য, পারিবারিক পরিবেশ, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা ও প্রবণতা, ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা, শিক্ষাগত উন্নতি ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট থাকবে। (৩২.৪.-ক)

৩। অরিয়েনটেশান প্রোগ্রাম, স্কুল-কলেজের নিজ নিজ হ্যান্ডবুক এবং কর্মসংস্থানজ্ঞাপন পুস্তিকার মাধ্যমে অবহিত করে শিক্ষার্থীকে তার নিজের জীবনের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে হবে। (৩২.৪.-খ)

৪। শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত এবং জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শদান কার্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে। (৩২.৪.-গ)

৫। ঝরিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শ কার্যক্রমের দ্বার উন্মুক্ত রাখার জন্য "অনুসরণ কার্যক্রম"-এর প্রবর্তন করতে হবে। (৩২.৪.-জ)

৬। নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের প্রস্তুতির জন্য একটি গাইডেন্স ও টেষ্টিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন করতে হবে। আপাততঃ এই ইনষ্টিটিউটের কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে আরম্ভ করা যেতে পারে। (৩২.৫.-ক)

৭। শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-সমূহে "কাউন্সেলর" প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। (৩২.৫.-খ)

৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবং প্রত্যেক বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরে "নির্দেশনা ও পরামর্শদান" বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩২.৫.-গ)

৯। যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্ভব, অনতিবিলম্বে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচীর প্রবর্তন করতে হবে এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর বাস্তবায়ন করতে হবে। (৩২.৫.-ঘ)

অধ্যায় ৩৩

ছাত্রকল্যাণ ও জাতীয় সেবা

৩৩.১. শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শিক্ষায়তনে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পক্ষে এবং তাদের শিক্ষা জীবনের অব্যাহত গতির পক্ষে সহায়ক হয়। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের সংগে তাই অধ্যয়নের ব্যয়ভার লাঘব করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করা, অধ্যয়নের কার্যক্রমে সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণের উপযোগী শারীরিক ক্ষমতা অর্জনে তাদেরকে সাহায্য করা, অধ্যয়নকালে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা এবং পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের যথাযথ বিকাশ ঘটানো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৩৩.২. এই রিপোর্টের অন্যত্র আমরা পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার এবং বৃত্তিদান ব্যবস্থা সম্পর্কেও সুপারিশ করেছি। তা ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্বল্প মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান এবং ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের চাঁদা নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল স্থাপন করা প্রয়োজন। এই তহবিল থেকে শিক্ষায়তন কর্তৃপক্ষ অভাবগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য করতে পারবেন। তা ছাড়া, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার এবং বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৩.৩. আমাদের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যে পরিবেশ থেকে শিক্ষায়তনে আসে, সেখানে পুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয়। আবশ্যকীয় কায়িক পরিশ্রম যেন ছাত্রছাত্রীদেরকে আরও পুষ্টিহীন করে না তোলে অথবা পুষ্টিহীনতা যেন কায়িক পরিশ্রমের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই আমাদের প্রস্তাবঃ

(ক) প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর (পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স্ক) সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য স্কুলে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের টিফিন বাবদ বর্তমানে যে চাঁদা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে তা অব্যাহত থাকতে পারে, তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে এক্ষেত্রে অধিকতর সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে ইউনিসেফ বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য গ্রহণের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারেন।

(খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করতে পারে, সেজন্য ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের সাহায্যপ্রাপ্ত ক্যান্টিন/কাফেটেরিয়া থাকা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও মান নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং তা যাতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষকগণ তত্ত্বাবধান করবেন। সম্ভব হলে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত একটি কমিটি ক্যান্টিন পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে।

৩৩.৪. শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়েও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমাদের সুপারিশ হলঃ

(ক) প্রতিটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষায়তনে প্রবেশ করলে যাতে হেলথ সার্ভিসের সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নথিপত্র রক্ষিত হবে। স্কুল ত্যাগের সময়ে শিক্ষার্থীকে ঐ নথি প্রদান করা হবে এবং সে পরবর্তী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় তা সেখানে জমা দেবে।

(খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে ছাত্রছাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীকে হাসপাতাল পাঠাবার ভারও তার শিক্ষায়তন গ্রহণ করবে।

(গ) স্কুলে হেলথ সার্ভিসের জন্য প্রতি ইউনিয়নে একজন ডাক্তার নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই হেলথ সার্ভিস যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি থানায় একজন ডাক্তারকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

(ঘ) প্রতি কলেজে অন্ততঃ একজন ডাক্তারের অধীন একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থাকতে হবে। ছাত্র সংখ্যানুপাতে ডাক্তারের সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে এবং সেখানে মহিলা ডাক্তারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার থাকবেন।

(চ) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষক এবং ছাত্র নির্দেশক নিয়োগ করা দরকার।

(ছ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৩.৫. পাঠক্রমের বিশেষ প্রকৃতির জন্য যেসব শিক্ষায়তনে ছাত্রছাত্রীদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি প্রয়োজন হয় (যেমন বহু বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তনে), সেখানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হবে বাধ্যতামূলক। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দূরাঞ্চল থেকে ছাত্রছাত্রী আসে সেখানেও এই ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ প্রসংগে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা সংগত বলে আমরা বিবেচনা করিঃ

(ক) কলেজে শতকরা ৪০ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে জেলা শহরে ও মহকুমা শহরে অবস্থিত কলেজ-সমূহের ক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে এই নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে।

(খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত ছাত্রবাসগুলিতে ব্যবস্থার অনুপাতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে।

(গ) আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্ভবপর হলে সাহায্যপ্রাপ্ত কাফেটেরিয়া প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কাফেটেরিয়া এবং ডাইনিং হলের জন্য ষ্ট্যাটুটরি রেশনিং এলাকার সুযোগ সম্প্রসারণ করা দরকার।

৩৩.৬. অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন কেন্দ্রঃ উচ্চশিক্ষা স্তরে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ডে-ষ্টাডি সেন্টার খোলা উচিত। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এরূপ শিক্ষার্থীদের গৃহে পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশের একান্তই অভাব। এরূপ সেন্টারগুলিতে গ্রন্থাগার ও স্বল্পব্যয়ে কাফেটেরিয়ার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের অন্ততঃ পঁচিশ শতাংশের জন্য এরূপ সেন্টারের বন্দোবস্ত করতে হবে।

৩৩.৭. ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচী বহির্ভূত তৎপরতা বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এই রিপোর্টের অন্যত্র আমরা সুপারিশ করেছি। এখানে আমাদের প্রস্তাব হলঃ

(ক) স্কুল পর্যায়ে একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাট্যগোষ্ঠী, সাহিত্য চক্র, বিতর্ক সভা, সংগীত চক্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যায়ে নির্বাচিত সংসদসমূহ তাদের অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে এইসব দায়িত্বও পালন করবে। পেশাদার শিল্পীদের নিয়ে ব্যয়বহুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার যে নীতি এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত হচ্ছে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(খ) বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য হবেঃ

(১) স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে নিকটবর্তী এলাকার দ্রষ্টব্য নিদর্শন বা জীবনধারার সংগে পরিচয় স্থাপন করা।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধীত বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো স্মৃতি নিদর্শনের সংগে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় স্থাপন করা। বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত এইসব সফর দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

(গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং ছাত্রছাত্রীদের আবাসে পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টির জন্য তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দান করতে হবে।

৩৩.৮. ছাত্রছাত্রীদের নাগরিক ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সাথে সাথে তাদের জাতীয় সেবামূলক কর্মে অংশগ্রহণের জন্যও প্রেরণা দিতে হবে। এতে তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ যে বৃদ্ধি হবে শুধু তা নয়, দেশের বর্তমান অবস্থায় সেবামূলক কর্মে ছাত্র সমাজের মত একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। সেজন্য আমরা মনে করি যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাদের শিক্ষা জীবনে অন্ততঃ তিন মাস বাধ্যতামূলকভাবে বেসামরিক সেবাকর্মে অংশগ্রহণ করবে। যে কোন কর্মে নিযুক্তির জন্য প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সংগে তার জাতীয় সেবাকর্মে অংশগ্রহণের সার্টিফিকেটও বিবেচনা করতে হবে।

৩৩.৯. জাতীয় সেবামূলক কর্ম আপাততঃ দুটি ধারায় বিভক্ত হতে পারেঃ (ক) নিরক্ষরতা বিরোধ অভিযান এবং (খ) সমাজ সেবা। মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে ছাত্রছাত্রীরা এর যে কোন একটিতে যোগ দেবে। সেই উদ্দেশ্যে প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি কেন্দ্র বলে বিবেচনা করতে হবে এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রথম ধারায় কর্মীরা সেই কেন্দ্রে কিংবা তার সন্নিহিত এলাকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। দ্বিতীয় ধারার কর্মীরা স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করবে।

৩৩.১০. জাতীয় সেবামূলক কর্মের জন্য দেশব্যাপী কোন বৃহৎ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা আরও তিন মাস কাজ করতে পারে। এই পর্যায়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, প্রকৌশল বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা কোন উন্নয়ন প্রকল্পে (গ্রামাঞ্চলে হলে ভালো হয়), কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা কোন কৃষি প্রকল্পে এবং অন্যেরা অনুরূপ কোন প্রকল্পে অথবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ছাত্রকল্যাণ ও জাতীয় সেবা

সারাংশ

১। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গরীব ছাত্রছাত্রীদের স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রয়োজনমত তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। (৩৩.২.)

২। পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজন হলে ইউনিসেফ বা অনুরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য গ্রহণের কথা সরকার বিবেচনা করতে পারেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে অল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করতে পারে সে জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত কাফেটেরিয়া থাকা প্রয়োজন। (৩৩.৩.)

৩। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "হেল্থ সার্ভিসের" ব্যবস্থায় বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার সুযোগ থাকা দরকার। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে। (৩৩.৪.)

৪। কলেজে শতকরা ৪০ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৩৩.৫.)

৫। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য "ডে-ষ্টাডি সেন্টার" খোলা দরকার। এসব সেন্টারে গ্রন্থাগার ও স্বল্প ব্যয়ে কাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৩৩.৬.)

৬। সাংস্কৃতিক এবং পাঠ্যসূচী বহির্ভূত অন্যান্য তৎপরতায় অংশ গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে হবে। পেশাদার শিল্পীদের নিয়ে ব্যয় বহুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার যে প্রথা এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে তা বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। (৩৩.৭.)

৭। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তার শিক্ষাজীবনে অন্ততঃ তিন মাস বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সেবামূলক কার্যে অংশ গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে আত্মনিয়োগ করবে কিংবা স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে সেচ্ছায় শ্রমের ভিত্তিতে কাজ করবে। প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের আরো তিন মাস বেসামরিক সেবা কার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে। (৩৩.৮.—৩৩.১০.)

অধ্যায় ৩৪

শিক্ষা প্রশাসন

৩৪.১. অতীতে স্বাধীনতা পূর্বযুগে অনেকগুলি শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কখনো কখনো সামান্য পরিবর্তন প্রবর্তন করা ছাড়া এ ব্যবস্থার সামগ্রিক কার্যকারিতা ও তার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে তেমন কোন সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই প্রশাসনিক দিক থেকে শিক্ষা সংস্কারের বিশেষ কোন নেতৃত্ব আসেনি বরং প্রশাসকদের রক্ষণশীলতা ও সময়ে সময়ে অক্ষমতায় কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির প্রয়াস ব্যাহত হয়েছে। সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি সেই পুরাতন প্রশাসন ব্যবস্থা চালু থাকে তা'হলে আমাদের বহু আকাঙ্খিত শিক্ষা সংস্কার আগের মত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

৩৪.২. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস কিভাবে করা হয় তা সুপারিশ করার পূর্বে আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলি জানা প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিসমূহ মোটামুটিভাবে নিম্নরূপঃ

(ক) রাজধানীতে প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অত্যধিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর, এ দুটি পরিদপ্তর রয়েছে। প্রথমোক্ত পরিদপ্তরের চারটি উপ-পরিদপ্তর দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগে রয়েছে। এ উপ-পরিদপ্তরগুলির দায়িত্ব শুধু স্কুল পর্যায়ের (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তদুপরি, এ উপ-পরিদপ্তরগুলিকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত এবং তা তাদের দায়িত্বের সংগে সুসামঞ্জস্যও নয়। ফলে উপ-পরিদপ্তরগুলিকে স্কুল পর্যায়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারের অধিকাংশ বিষয়ে ঢাকাস্থ জনশিক্ষা পরিদপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়। অপর দিকে জনশিক্ষা পরিদপ্তর সরাসরি কলেজসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করে। কলেজসমূহকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা সীমিত বলে এসব বিষয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজসমূহকেও জনশিক্ষা পরিদপ্তর এবং তার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে কলেজসমূহের কাজের অগ্রগতিতে বাঁধা পড়ে এবং তাদের পরিচালনা কার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারে না। দেশের কারিগরি ও প্রকৌশল স্কুল ও কলেজসমূহ প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে সরাসরি কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের সংগে সংযুক্ত। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে অর্পিত ক্ষমতা সীমিত বলে এসব বিষয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর ও তার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। ফলে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। এসব কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ ত্রুটি বলে পরিগণিত হয়ে আসছে।

(খ) শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অপেক্ষা একান্তভাবে প্রশাসনিক সুবিধা ও সুযোগের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নে তুলনামূলকভাবে শিক্ষাবিদদের মতের অপ্রাধান্য বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম দোষ। শিক্ষা প্রশাসককে তাঁর দায়িত্বের, তা পেশাগত ক্ষেত্রেই হোক বা প্রশাসন ক্ষেত্রেই হোক, নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে তিনি কাজ করছেন সে সম্পর্কে এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষার রীতি-নীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং শিক্ষা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং এর সংগে জড়িত সমস্যাবলীর সমাধান প্রচেষ্টায় তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়ে না থাকলে তাঁর পক্ষে এসব গুণ ও যোগ্যতা সহসা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। এ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সংগে তাঁর দূরদৃষ্টির মিলন হলে তবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকের পক্ষে বাস্তব এবং শিক্ষাগত সুষ্ঠুনীতি উদ্ভাবন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। সচরাচর দেখা যায় যে আমাদের শিক্ষানীতি নির্ধারণের বেলায় এবং শিক্ষা সম্পর্কিত চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের শিক্ষাবিদদের এবং বিশেষ করে বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতের উপর অতি অল্পই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে যে নতুন শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয় এবং যে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তা প্রশাসনিক দিক থেকে উত্তম হলেও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের দিক থেকে বিচারে অধিকাংশ সময়ে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ হয়। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার মানের উন্নতি সম্ভব হয় না।

(গ) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রণালয় ও পরিদপ্তরে বিভক্তিজনিত অপচয় ও একই কাজের পুনরাবৃত্তি আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একটি প্রধান ত্রুটি। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর এদুটি শিক্ষা পরিদপ্তর রয়েছে। সাধারণতঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষানীতির সমন্বয় বিধান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সাধারণ সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দকরণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়াবলী, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া সংক্রান্ত বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদসমূহে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়। আর শিক্ষা পরিদপ্তর দুটির দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা-নীতিকে বাস্তব রূপদান, শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন এবং মোটামুটিভাবে শিক্ষা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু উপরিউক্তভাবে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অতীতেও কার্যকর হয়নি বা করা সম্ভব হয়নি এবং বর্তমানেও কার্যকর হচ্ছে না এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় না। বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা পরিদপ্তর দুটিতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি বহুকাল থেকে চলে আসছে। সুতরাং শিক্ষা পরিদপ্তর দুটির দায়িত্ব ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা পরিদপ্তরে আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার যে বিভক্তি তা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

(ঘ) প্রশাসকদের রক্ষণশীল মনোভাব এবং প্রশাসনিক মানের অবনতি আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে পংগু করার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তাতে বলা যায় যে শিক্ষা দপ্তর বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদসহ উচ্চপদসমূহ সাধারণ প্রশাসন বিভাগের ব্যক্তিরাই পূরণ করেছেন। শিক্ষা বিভাগের ব্যক্তিদের পরিদপ্তর দুটি ব্যতীত উপরোক্ত পদসমূহে বিশেষ কোন স্থান হয়নি এবং দুটি শিক্ষা পরিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে শেষোক্ত কর্তৃপক্ষের

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়েছে। অথচ এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যাঁরা নেন শিক্ষা ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রশাসনের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণতঃ তাঁরা নন। তাই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা মোটেই শিক্ষার সহায়ক হয় না বরং প্রশাসকদের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক হয়।

(ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেবল উচ্চ পর্যায়কে যথা মর্যাদা দান ও আনুপাতিক-ভাবে নীচের স্তরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন অন্যতম প্রধান ত্রুটি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা সচিব ও জনশিক্ষা পরিদপ্তরে জনশিক্ষা পরিচালক এবং কারিগরি শিক্ষা পরিচালক ও সে পরিদপ্তরের আওতাধীন কয়েকটি পদ ছাড়া বর্তমানে বেতন ও মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষা বিভাগের নীচের স্তরসমূহের পদগুলির আমাদের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নাই। ফলে কার্যক্ষেত্রে তাঁরা উপযুক্ত স্থান পান না বলে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ ঘটে না। স্বভাবতই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার উপর এর প্রতিকূল প্রতিফলন ঘটে।

(চ) শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগ এবং একই বিভাগের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। স্কুল ও পরিদর্শন বিভাগ এবং কলেজ বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। তেমনি স্কুল ও পরিদর্শন এই একই বিভাগের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও সত্যিকারের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব। স্কুল ও পরিদর্শন এই একই বিভাগের মধ্যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার পরিপন্থী।

(ছ) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য প্রশাসক ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাবও রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষকদের দ্বারা সাধারণতঃ প্রশাসনিক ক্ষেত্রের পদগুলি পূরণ করা হয়। এই শিক্ষকদের সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই। এমন কি শিক্ষা প্রশাসন বিভাগের নীচের স্তরে সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই। এর ফলে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার পক্ষে যতটা কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা উচিত ততটা কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

(জ) প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবের পরিবর্তে প্রশাসনিক আদেশ বলে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার প্রবণতা আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। শিক্ষানীতি যে জাতীয় নীতিসমূহের একটি অপরিহার্য অংশ তা অনুধাবন করা হয় না বলেই উপরোক্ত প্রবণতা বিদ্যমান। শিক্ষা-নীতিকে যতদিন জাতীয় নীতিসমূহের অংশ হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া না হবে ততদিন শিক্ষানীতিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে না।

৩৪.৩. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণার্থে আমাদের মতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরদ্বয়কে একীভূত করতে হবে। এরূপে গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারূপে এবং এই পদাধিকার বলে মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে একজন শিক্ষাবিদকে নিয়োগ করতে হবে। গত তিন দশক হতে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি এবং প্রশাসনিক কমিশন ও কমিটি এরূপ সুপারিশ করছেন। প্রাক-বিভাগ ভারতে এবং বিভাগোত্তরকালে ভারত ও পাকিস্তানের অনেক রাজ্য ও প্রদেশে এ সুপারিশ কার্যকর করা হয়েছে।

(২) প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয় ও জেলা এবং মাধ্যমিক স্তরের উপরের পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে যথা প্রয়োজন ও যথাসম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

(৩) উক্ত একীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষানীতির সমন্বয় বিধান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সাধারণ সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দকরণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়াবলী, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সংক্রান্ত বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ; বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার বিভিন্ন বিষয়; শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদ-সমূহে নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয় যা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাসমূহ এবং বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর ও জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে।

এ সকল কাজের কথা চিন্তা করলে তার সংগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা সংস্থানের কথা এসে পড়বে। আমাদের মতে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করা উচিত। শিক্ষার বিভিন্ন শাখা ও অপরাপর দায়িত্বের ভিত্তিতে বিভাগগুলি আরও কতিপয় উপ-বিভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। এর অর্থ হবে এই যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ বহু ব্যক্তি থাকতে হবে যাঁদের মতামত ও পরামর্শ দেশের এবং বিদেশের শিক্ষাবিদদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। সর্বোপরি তাঁরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাঞ্ছিত কাজ পেতে হলে এর সম্প্রসারণ আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, কাঠামো ও কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় সংখ্যা পরিশিষ্টে সংযুক্ত প্রস্তাবিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠান চার্টে দেখানো হয়েছে।

(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগে চারটি বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর (ডিভিশনাল এডুকেশন ডাইরেক্টোরেট) থাকবে। এই পরিদপ্তর-সমূহের তত্বাবধানে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য সমুদয় শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক স্কুলসমূহের পরিদর্শনের ভারও এদের উপর ন্যস্ত থাকবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বর্তমানে সোয়া দু'কোটি। আগামী দশ বছরের মধ্যে এ সংখ্যা আড়াই কোটিরও উপরে দাঁড়াবে। এই সংখ্যা সমস্ত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যার দ্বিগুণ। এই বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থা অধিকতর কাম্য।

তদুপরি মাধ্যমিক স্তরের উপরের পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন সাধারণ কলেজ, কারিগরি স্কুল, কারিগরি কলেজ, প্রভৃতি) প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বহির্ভূত সমুদয় বিষয়ও উক্ত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহের তত্বাবধানে থাকবে, অর্থাৎ বর্তমানে জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের উপর সাধারণ কলেজ, কারিগরি স্কুল, কারিগরি কলেজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পিত রয়েছে মোটামুটিভাবে সে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহের উপর অর্পিত হবে। অবশ্য মাধ্যমিক পর্যায়ের উপরের স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

সুষ্ঠু কর্মদক্ষতা লাভের জন্য প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক বরাদ্দকরণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। বর্তমান জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও জনশিক্ষা পরিচালক এবং কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিচালকের যে দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা, আর্থিক

বরাদ্দকরণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা রয়েছে মোটামুটিভাবে সে সমস্ত ক্ষমতা প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহ ও তাদের পরিচালকদের (ডিভিশনাল এডুকেশন ডাইরেক্টার) প্রদান করতে হবে। এর ফলে কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু হবে। প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহের কাঠামো ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-কর্মকর্তার সংখ্যা পরিশিষ্টে সংযুক্ত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠান চার্টে দেখানো হয়েছে।

(৫) বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহের অধীন ও আওতাধীন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ সেই পরিদপ্তরসমূহের নিকট দেওয়া উচিত। এর ফলে পরিদপ্তরসমূহের শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ক্ষমতা জোরদার করার জন্য তাদের প্রধানদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলগুলির প্রধানদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এতে তাঁদের কর্তব্য কর্মে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই মাধ্যমিক স্কুলগুলির প্রধানদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি। কলেজ অধ্যক্ষদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ম কানুন অনুযায়ী ব্যয়ের ক্ষমতা কলেজ অধ্যক্ষদের অর্পণ করা উচিত। এরূপ বিকেন্দ্রীকরণে শিক্ষায়তনসমূহের এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হবে এবং তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সহজ হবে।

(৭) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেরূপ মেডিক্যাল কলেজ-সমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ব্যাপারে আমাদের অভিমত চিকিৎসা শিক্ষা অধ্যায়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

(৮) বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতাধীন। স্কুল ও সাধারণ কলেজসমূহে যা কৃষিশিক্ষা দেওয়া হয় তাও জনশিক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন। অথচ কৃষি কলেজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। এতে কৃষি শিক্ষার সামগ্রিকভাবে উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের মতে বর্তমান কৃষি কলেজ ও প্রস্তাবিত কৃষি কলেজগুলি বর্তমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বের আওতাধীনে আনা উচিত। এতে সাধারণ শিক্ষার সংগে প্রকৌশল ও কারিগরি, বাণিজ্য ইত্যাদি শিক্ষার ন্যায় কৃষি শিক্ষাও একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাবে এবং বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশ ও জাতির চাহিদা মেটানোর কাজ সহজ হবে।

(৯) উপরের অনুচ্ছেদে মন্তব্য চিকিৎসা শিক্ষার বেলায়ও প্রযোজ্য। আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতাধীনে আনার কথাও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। এ বিষয়ে এই রিপোর্টের 'চিকিৎসা শিক্ষা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১০) বেসরকারী কলেজগুলিতে আবর্তক অনুদান সরাসরি দেওয়া যেতে পারে। তবে বেসরকারী কলেজগুলিতে উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ, সাময়িক ও বিশেষ অনুদান ইত্যাদি বরাদ্দের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যায়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সে সমস্ত কলেজ ও প্রতিষ্ঠান অনার্স ও পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষায় নিয়োজিত আছে বা থাকবে তাদের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হাতে অর্পিত হওয়া উচিত। তা না হলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ব্যাহত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয় অযথা অধিক হবে।

(১১) প্রাথমিক শিক্ষার (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) সংগঠন, পরিচালন, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। সুষ্ঠু কর্মদক্ষতা লাভের জন্য জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষায়তন প্রধানদের প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা কার্যেরত শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সভাপতি ও সচিব হবেন যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ঐ জেলার একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ণকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসক। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হবেন উক্ত নির্বাচিত প্রবীণ শিক্ষাবিদ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসক এরও সচিব হবেন। সুষ্ঠুভাবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট দিতে হবে।

৩৪.৪. শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায়তনসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সকল পর্যায়ের শিক্ষায়তনে কার্য নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ থাকবে এবং এ সমস্ত পরিষদে শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। তদুপরি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালয়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিসহ শিক্ষায়তন প্রধানকে সভাপতি করে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা উচিত। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদান কর্মকে সার্থক করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতকে যুক্তিসংগত ও বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ছাত্রাবাস, খেলাধুলার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও টিফিনের ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীর প্রাসংগিক চিত্তবিনোদনের বিবিধ উপকরণের সুযোগ যেন শিক্ষার্থীগণ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমমানের, সমযোগ্যতার, সমঅভিজ্ঞতার এবং সমপরিস্থিতিতে একই ধরণের দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত শিক্ষাবিদ, তা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কার্যরত থাকুন না কেন, যেন একই রকম বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী সম্বলিত বিধি প্রণয়ন করে তাঁদের কর্তব্যের বিষয়ে সজাগ রাখতে হবে এবং নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তাদান করতে হবে। তদুপরি বেতন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়াও এ সকল শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা সম্পর্কিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। চাকরির মেয়াদকালে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ এবং নিয়োগকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এতে চাঁদা দিবেন এবং এর ফলে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণ রোগ-শোক ও অবসরকালীন অর্থ চিন্তা হতে অনেকটা রেহাই পাবেন।

৩৪.৫. শিক্ষা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে, নীতিগতভাবে, উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের পদগুলি শিক্ষাবিদদের দ্বারা পূরণ করা দরকার। শিক্ষা একটি জটিল এবং উচ্চ স্তরের বিশেষজ্ঞতাপূর্ণ ক্ষেত্র। কাজেই এই ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য পেশাগত ও কারিগরি যোগ্যতা, প্রশাসনিক নৈপুণ্য, দেশের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষারীতি, সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের আবশ্যক। পেশাগত ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিচালককে শিক্ষা কর্মসূচী, শিক্ষাদানের গুণগত মান, বিশেষজ্ঞতাপূর্ণ শিক্ষণ নৈপুণ্য ও পাঠক্রমের উৎকর্ষ বিধান এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অন্যান্য দেশে চালু শিক্ষা ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কেও তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি প্রশাসন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার জন্য শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। উচ্চতর স্তরে একই ব্যক্তির দ্বারা এসব কাজ সম্পন্ন হয় এবং তাঁর নিকট আনীত বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁকে পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাঁর দায়িত্বের পেশাগত ক্ষেত্রেই হোক বা প্রশাসন ক্ষেত্রেই হোক সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে তিনি কাজ করছেন সে সম্পর্কে এবং

অপরাপর দেশের শিক্ষারীতি এবং সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কোন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং শিক্ষাধারা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং এর সংগে জড়িত সমস্যাবলীর সমাধান প্রচেষ্টায় তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়ে না থাকলে তাঁর পক্ষে এসব গুণ ও যোগ্যতা সহসা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার সংগে তাঁর দূরদৃষ্টির মিলন হলে তবেই শিক্ষা প্রশাসকের পক্ষে বাস্তব এবং শিক্ষাগত সুষ্ঠুনীতি উদ্ভাবন করা সম্ভব। শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ এবং সুসংগঠিত করে তুলতে হলে এমন শিক্ষা প্রশাসকের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শুধু নৈপুণ্যের সংগে নয় বরং পেশাগত যোগ্যতার সংগেও বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের পদগুলি শিক্ষাবিদদের দ্বারা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমতের বিশেষ কোন অবকাশ নাই।

৩৪.৬. শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিবর্গকে যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের চাকরি কাঠামোতে সর্বোচ্চ বেতনক্রম ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষা বিভাগের চাকরিগুলিতে যোগ্যতম যুব সম্প্রদায় আকৃষ্ট হয় না। পূর্বে এই উপমহাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতম চাকরিগুলিতে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হত। সিভিল সিভিসের অনুরূপ মানে তাঁদের নিয়োগ করা হত এবং তাঁদের জন্য অনুরূপ যোগ্যতা নির্দিষ্ট ছিল। এমনকি শিক্ষা বিভাগের চাকরি প্রাদেশিক সরকারের আওতাভুক্ত হওয়ার এবং সাবেক আই, ই, এস, এব স্থলে প্রাদেশিক প্রথম শ্রেণীর চাকরি প্রবর্তিত হওয়ার পরও তাঁদের যোগ্যতা এবং বেতনের হার প্রায় সাবেক আই, ই, এস, এর সমপর্যায়ে রাখা হয়েছিল। পদোন্নতি দ্বারা এ সব পদ পূরণ এবং এগুলির বেতনের হার হ্রাস করণের জন্য ১৯৩৯ সালে যে নীতি গৃহীত হয় তার ফলে শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গুণগত অবনতি নেমে আসে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমরা পদোন্নতি নীতির বিরোধী নই, তবে আমরা চাই যে সর্বোচ্চ পদগুলির জন্য একদিকে যেমন জাতীয় প্রতিভার ভান্ডার হতে যুবকদের সংগ্রহ করতে হবে অপরদিকে তেমনই বিপুল অভিজ্ঞতা, উচ্চ যোগ্যতা ও প্রমাণিত দক্ষতার অধিকারী এবং নেতৃত্বের গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও বেছে নিতে হবে। তাঁরা শিক্ষা বিভাগের লোক হোন বা বাইরের হোন তাতে কিছু আসে যায় না। তবে যাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্তি লাভ করবেন তাঁদের নৈপুণ্যের অধিকারী হতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হবে। তাঁদের কাজের গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে এবং তাঁদের পদোন্নতি প্রমাণিত দক্ষতার উপরই নির্ভর করবে। যেহেতু এসব ব্যক্তির উপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাবে এবং আমাদের শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তন ও সম্প্রসারণে তাঁরা নেতৃত্বদান করবেন সেহেতু তাঁদের দক্ষতা এবং খ্যাতি উভয়ই থাকতে হবে। কারণ, এগুলি তাঁদের অভিমত ও পরামর্শের উপর মূল্য ও গুরুত্ব আরোপ করবে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র এমন হবে যাতে সহকর্মীদের মনে তাঁদের প্রতি আস্থার ভাব জাগ্রত হতে পারে।

৩৪.৭. উপরোক্ত লক্ষ্যের সাফল্যকল্পে শিক্ষা বিভাগের পদসমূহকে আর্থিক আকর্ষণ, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা এবং বেতনের হারের বেলায় সিভিল সার্ভিসের সমান করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি স্তরে সমানুপাতিক পদ থাকবে এবং প্রতিটি স্তরের বেতন সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ স্তরের বেতনের সমান হবে। এরূপ একটি কাঠামো সৃষ্টি করতে পারলে তবেই আমাদের যুব সম্প্রদায় কোন চাকরিতে ভবিষ্যত উন্নতির সুযোগ-সুবিধা কত তা হিসাব করে নিজেদের কর্মজীবনের পথ বেছে না নিয়ে বরং পেশাগত অনুরাগের ভিত্তিতে তা নির্বাচন করে নেবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হবে শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদসমূহে ত্রিবিধ উপায়ে লোক নিয়োগ। একুশ হতে পঁচিশ বছর বয়োসীমার মধ্যে সরাসরি কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ, কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বিভাগীয় পদোন্নতি দান, এবং প্রমাণিত পেশাগত দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল হতে কিছু সংখ্যক লোক সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৪.৮. স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করা উচিত। বর্তমান অবস্থা উক্ত রূপ নয়। শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিরা এমন হারে বেতন পান না যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং তাঁদের কৃতিত্বের যথাযথ মর্যাদা কদাচিৎ দেওয়া হয়।

প্রায়শঃ তাদের এমন পরিবেশে কাজ করতে হয় যা দুঃসাহসী লোকদেরও ভগ্নোৎসাহ করে ফেলতে পারে এবং এ পেশা তাঁদের ফলপ্রসূ পারিতোষিকের আশ্বাসও দেয় না। এমতাবস্থায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এ পেশার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিদের পূর্ণ সামাজিক মূল্যের সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করতে হলে সমাজের শিক্ষিত অংশের সহযোগিতায় শিক্ষা বিভাগ এবং খোদ শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিদের সুদীর্ঘ ও সুধীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। যদিও সরকার কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ এমন এক ব্যাপার যা সরকারের ব্যবস্থাপনার সাহায্যে শিক্ষা কার্যেরত লোকদের স্বয়ং অর্জন করতে হবে। কি সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে তাঁদের দেখা হবে তা' নির্ভর করবে মূলতঃ ছাত্রদের মধ্যে তাঁদের নিজেদের শ্রদ্ধার্হ করার এবং সেবা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজের শ্রদ্ধা অর্জনে তাঁদের ক্ষমতার উপর।

৩৪.৯. শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রশাসন বিভাগের অফিসারদের সাধারণ ও পেশাগত ক্ষেত্রে কিছু দিনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যাঁরা অল্প বয়সে নিয়োগ লাভ করবেন তাঁদের বেলায় এক বছরের জন্য স্কুল ও কলেজ সংক্রান্ত একটি কর্মসূচী থাকবে। এরপর আরও এক বছরের জন্য হাতে-কলমে কাজ করার আর একটি কর্মসূচী থাকবে। উল্লিখিত সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নবীন অফিসারদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চার করতে হবে। যাঁদের অধিক বয়সে বাইরে থেকে এনে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে, বিভাগীয় কার্যধারা ও নীতির সংগে তাঁদের পরিচিতির এবং শিক্ষা সংক্রান্ত স্বীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। চাকরিরত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্সের প্রয়োজন হবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ইন্সপেক্টার, বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় শাসন পরিচালনা ব্যবস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক ও পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ বিধানকল্পে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কর্ম-সূচীতে তাঁদের কাজের গুণাগুণ নির্ণয় করা হবে এবং পদোন্নতি ও ভবিষ্যত নতুন কাজে নিয়োগের বেলায় এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বস্তুতঃ কৃতিত্ব সহকারে পূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত না করলে এবং উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত, প্রশাসনিক এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর অধিকারী নয় বলে বিবেচিত হলে কোন ব্যক্তিকে উচ্চতর পদে নিয়োগ করা উচিত হবে না।

৩৪.১০. যুক্তিযুক্ত সময়ের ব্যবধানে প্রশাসনিক ব্যবস্থার নতুন নতুন পদ্ধতির সংগে পরিচিত করার জন্য শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের প্রত্যেক স্তরের শিক্ষা প্রশাসকদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তাই তাঁদের পেশাগত কাজের উপযোগী করে তোলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এ ছাড়া একবার প্রশিক্ষণ পেয়েও নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সঞ্জীবনী কোর্সে (রিফ্রেসার্স কোর্স) প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করে সমগ্র কর্মজীবন ব্যাপী শিক্ষাকার্যে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এ নীতি উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং সেসব দেশে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের জ্ঞান ও ধারণাকে পুনঃ নতুনত্ব দানের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণই যদি আমাদের কাম্য হয়ে থাকে তা হলে রিফ্রেসার্স কোর্স ট্রেনিংকে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ হিসাবে ধরে নিতে হবে। আমরা সুপারিশ করি যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা প্রশাসকের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নতুন নতুন পদ্ধতির সংগে পরিচিত হবার জন্য একবার করে রিফ্রেসার্স ট্রেনিং নেওয়া উচিত। প্রারম্ভিক অবস্থায় বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রে পরিদর্শকসহ শিক্ষা বিভাগের প্রশাসন অফিসারদের এবং প্রধান শিক্ষকদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। রিফ্রেসার্স ট্রেনিং কোর্স পরিচালনার জন্য বিশেষ ষ্টাফ নিয়োগ করা আবশ্যক।

৩৪.১১. শিক্ষা বিভাগেব অফিসারদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ আমরা উপরে করেছি। এ ছাড়া যুক্তিযুক্ত সময়ের ব্যবধানে প্রশাসনিক ব্যবস্থার নতুন নতুন পদ্ধতির সংগে পরিচিত করার জন্য শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কারার প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধেও আমরা বলেছি। তদুপরি বর্তমানে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর স্তরের অন্যান্য শিক্ষায়তনসহ প্রায় নয় হাজারের মত মাধ্যমিক স্তর থেকে উপরের স্তরের শিক্ষায়তন রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দরকার। এজন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। আমরা প্রস্তাব করি যে "শিক্ষা প্রশাসক প্রশিক্ষণ একাডেমী" নামে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক। প্রস্তাবিত একাডেমী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হবে। এই একাডেমীর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালক, যোগ্য ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক এবং বিশেষ ষ্টাফ নিয়োগ করা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যবস্থাও অপরিহার্য। এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরাসরি নিযুক্ত শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। কার্যরত শিক্ষা প্রশাসকদের (যাঁরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন) প্রশিক্ষণের ভারও এ একাডেমীর উপর ন্যস্ত হবে। তদুপরি শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থার নতুন নতুন পদ্ধতির সংগে পরিচিত করার জন্য, শিক্ষা প্রশাসকদের যুক্তিযুক্ত সময়ের ব্যবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণদানের দায়িত্বও এ একাডেমীর উপর বর্তাবে। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাজে দক্ষতা সাধারণতঃ খুব উঁচুমানের নয়; এর প্রধান কারণ প্রতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণের অভাব, শুধু কর্মঅভিজ্ঞতা এসব কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিকেন্দ্রীকরণের পর বিভাগীয় ও জেলা শিক্ষা প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহে বহুসংখ্যক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে। এসকল কাজে নিয়োগের জন্য এবং নিযুক্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এ একাডেমী করবে।

৩৪.১২. আমাদের স্কুল ও কলেজের পরিদর্শন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন অতীব প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির পরিদর্শনের ভার জনশিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনস্থ পরিদর্শকদের উপর ন্যস্ত। এই পরিদর্শকদের পরিদর্শনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় জনশিক্ষা উপ-পরিদপ্তরসমূহ নিম্ন-মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে অনুমোদন করেন ও অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে পরিদর্শন করার জন্য শিক্ষাবোর্ডসমূহের কোন পরিদর্শক বা ব্যবস্থা নাই। এ ব্যাপারে শিক্ষাবোর্ডগুলি জনশিক্ষা পরিদপ্তরের পরিদর্শকদের উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে ইন্টার মিডিয়েট কলেজ পরিদর্শন ও অনুমোদনের জন্য দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডের নিজেদের পরিদর্শক এর ব্যবস্থা রয়েছে। সেরূপ ডিগ্রী কলেজ পরিদর্শন ও অনুমোদনের জন্য দেশের তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক এর ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৪.১৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলি পরিদর্শন করার জন্য যে সংখ্যক পরিদর্শক রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল এবং পরিদর্শনের ব্যবস্থাও অত্যন্ত অসন্তোষজনক। বর্তমানে পরিদর্শককে একাধারে একজন কেরাণী এবং একজন পুলিশের কার্য সম্পাদন করতে হয়। তদুপরি পরিদর্শকদের শিক্ষা বিভাগের আওতার বহির্ভূত বহু কাজে অনেক সময় ব্যাপৃত রাখা হয়। ফলে বছরের পর বছর বহু স্কুলের পরিদর্শন হয় না। যাও বা হয় তাও সুষ্ঠুভাবে হয় বলা যায় না। এ পরিস্থিতির দ্রুত অবসান হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে উন্নত দেশসমূহে যে রীতি অনুসৃত হয় আমাদের দেশেও তা প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে। আমাদের বর্তমান স্কুল পরিদর্শকদের কাজ সম্পর্কে প্রায়শঃই আলোচনা এবং সমালোচনা হয়ে থাকে। স্কুলের প্রশাসনিক, পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা দেখা ছাড়াও পরিদর্শকদের কাজ হল স্কুলের শিক্ষা কাজের উৎকর্ষ বিধান, নব নব চিন্তাধারার প্রবর্তন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রেরণা দান। শিক্ষা যন্ত্রের বহিরংগের পরিবর্তে এর সার বস্তুর প্রতি সমগ্র দৃষ্টির নিবন্ধ রাখলে পরিদর্শকেরা স্কুলের শিক্ষা কাজের গুণগত উৎকর্ষ বিধান করতে পারবেন। বস্তুতঃ পরিদর্শকের কাজ একজন শিক্ষাবিদের কাজই হওয়া উচিত। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষা কর্মসূচীর

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকের সংগে বিষয় বিশেষজ্ঞদের থাকা বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতি অপরাপর দেশে ক্রমবর্ধিত হারে প্রযুক্ত হচ্ছে এবং এ আমাদের দেশে প্রবর্তন করা হলে শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ বিধানের আশা করা যায়। পরিদর্শকদের বই-পুস্তক, পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেশসমূহ হতে প্রকাশিত পেশা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা এবং ইউনেস্কোর মত অপরাপর আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট পুস্তক-পুস্তিকাসমূহ পাঠ করতে হবে।

৩৪.১৪. স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যাতে প্রত্যেক স্কুলের পরিদর্শন হয় তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য পরিদর্শকদের শিক্ষা বিভাগের আওতার বাইরের কাজ থেকে একেবারে অব্যাহতি দিতে হবে। তদুপরি প্রয়োজনীয় পরিদর্শক সংখ্যার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিদর্শন ও প্রাসংগিক কাজ সুষ্ঠুভাবে ও উপযুক্ত রূপে সম্পাদনের জন্য যে সংখ্যক পরিদর্শকের দরকার বলে আমরা মনে করি তা সংযুক্ত প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠান চার্টে দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে এও উল্লেখযোগ্য যে থানা স্তরে প্রতেক থানাতে যে দু'জন থানা স্কুল পরিদর্শকের ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন মহিলা পরিদর্শক থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩৪.১৫. উপরে বলা হয়েছে যে শিক্ষাবোর্ডসমূহের মাধ্যমিক স্কুলগুলি পরিদর্শন করার জন্য নিজেদের কোন পরিদর্শক এবং ব্যবস্থা নাই, মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শনের জন্য জনশিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনস্থ স্কুল পরিদর্শকদের উপর শিক্ষা বোর্ডসমূহের নির্ভর করে থাকতে হয়। এ পরিদর্শকদের দ্বারা মাধ্যমিক স্কুলগুলির পরিদর্শনও যথা সময়ে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন, অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধির, স্কুলের কর্মসূচী, মান ইত্যাদি যাচাই যথাসময়ে হয় না এবং এ ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে অবনতির একটি বিশেষ কারণ। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শন ও প্রাসংগিক কাজের জন্য নিজেদের পরিদর্শক নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি। শিক্ষাবোর্ড-সমূহের স্কুল পরিদর্শকদের এবং বিভাগীয় পরিদপ্তরের অধীনস্থ স্কুল পরিদর্শকদের কাজের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন।

৩৪.১৬. আমাদের দেশের কলেজগুলির পরিদর্শনের জন্য শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের যে ব্যবস্থা এবং যে সংখ্যক পরিদর্শক রয়েছে তাও খুব সন্তোষজনক বলা যায় না। দেশে প্রায় ছয়শত ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন শ'য়ের মত ডিগ্রী কলেজ যাদের সংগে ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক ডিগ্রী কলেজে ইন্টার-মিডিয়েট বিভাগও আছে। দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ড চারজন কলেজ পরিদর্শক রয়েছেন। এ চারজন কলেজ পরিদর্শকের পক্ষে ছয়শত ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজের ইন্টার-মিডিয়েট বিভাগগুলি সুষ্ঠু ও উপযুক্তভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। সেরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন কলেজ পরিদর্শকের পক্ষে দেশের প্রায় তিন শ' ডিগ্রী কলেজ সুষ্ঠু ও যথাযথরূপে পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। তদুপরি কলেজগুলির প্রশাসনিক, পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা এবং কর্মসূচী, মান ইত্যাদি সম্যক পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং যাচাই সঠিকভাবে ও যথাসময়ে সম্ভব হচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মতে কলেজ পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তদুপরি কলেজগুলির কর্মসূচী বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শনের সময় কলেজ পরিদর্শকের সংগে বিষয় বিশেষজ্ঞদের থাকা উচিত হবে। প্রত্যেকটি কলেজ যাতে বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার পরিদর্শন করা হয় তার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। তদুপরি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে কলেজগুলির বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৩৪.১৭. সক্রিয়ভাবে শাসন পরিচালনার জন্য যে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার প্রয়োজন তা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কলেজের অধ্যক্ষদের দেওয়া হয় না, অনবরত বাইরের হস্তক্ষেপের দ্বারা তাঁদের বিব্রত করে রাখা হয়। আমাদের মতে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে সক্রিয় নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং তাঁকে বিশ্বের অপরাপর দেশের প্রধান শিক্ষকদের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব

দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক হবেন এ ধরণের ব্যক্তি যিনি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বদান করতে সমর্থ, যাঁর মতামতের গুরুত্ব আছে এবং যাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র হবে শিক্ষার্থীদের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। প্রধান শিক্ষকদের সম্বন্ধে যা বলা হল অধ্যক্ষদের বেলায়ও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে এই পদের লোক নিয়োগ করলে চলবে না। জাহাজের নায়ক বা সেনাদলের অধিনায়ক নির্বাচনে যে গভীর বিচার বিবেচনা এবং সতর্কতার প্রয়োজন, আমাদের স্কুল ও কলেজসমূহের ভার যাঁদের উপর অর্পিত হবে তাঁদের নির্বাচনেও অনুরূপ বিচার বিবেচনা এবং সতর্কতার দরকার। যাঁদের হাতে আমাদের কিশোরদের ভার ন্যস্ত করে থাকি তাঁদের নেতৃত্বদান ও অন্যান্য গুণাবলীর অপরিসীম গুরুত্বকে আমরা অতীতে উপেক্ষা করে এসেছি। ইহা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, যে ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার অর্পিত হয়, সেখান হতে কাজের মান ও ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে অতি অল্প অভিযোগ আসে।

৩৪.১৮. বর্তমানে প্রায়ই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ স্থানীয় লোক। তাঁদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা হচ্ছে বলে নানা জায়গা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁরা যাতে কর্তব্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হন সেজন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সকল সম্ভাব্য পন্থাও অবলম্বন করতে হবে। এর প্রতিকার স্বরূপ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিজের গ্রামে বা বাড়ীর নিকটবর্তী স্কুলে না রেখে দূরে বদলী করার কথাও বিবেচনার যোগ্য।

৩৪.১৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (নবম হতে দ্বাদশ শ্রেণী) শিক্ষাব্যবস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন) সমূহের কতৃত্বাধীন রয়েছে। সুতরাং মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ-মাধ্যমিক) স্তরের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব শিক্ষাবোর্ডসমূহের উপর ন্যস্ত। অতএব মাধ্যমিক স্কুলের ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অনুমোদনদান, শিক্ষণীয় বিষয়, পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী নিরূপণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাবোর্ডসমূহের করণীয় কাজ।

৩৪.২০. গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা বেপরোয়াভাবে বেড়েছে। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করেই বহু সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই যথারীতি ও যোগ্যতাপূর্ণভাবে চালাবার মত সামর্থ্য ও সম্পদ কর্তৃপক্ষের নাই। শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণ, আসবাবপত্র, শিক্ষাংগন ইত্যাদির অভাব রয়েছে এমন স্কুল-কলেজকে অনুমোদন দান উচিত নয়। স্কুল ও কলেজকে অনুমোদন দান সম্পর্কিত বিধিসমূহ কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত না হলে সংস্কার সাধনের কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না। অতীতের ত্রুটি সংশোধনের জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। যে-সব স্কুল ও কলেজ অনুমোদনের শর্তাদি পালন করতে অপরাগ তাদের অনুমোদন বাতিল করা উচিত হবে। অপ্রয়োজনীয় স্কুল কলেজের অনুমোদন বাতিল ও প্রয়োজন হলে অনুমোদন দান স্থগিত রাখা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

৩৪.২১. মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহের আওতাধীন মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা একত্রে প্রায় আট হাজার এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় আট লাখ। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধান ও উন্নয়ন' দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতি বছর এ চারটি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৭২ সালে মাধ্যমিক (এস, এস, সি) ও উচ্চ-মাধ্যমিক (এইচ, এস, সি) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় সোয়া তিন লাখ ও দেড় লাখ। সম্প্রতি ১৯৭৩ সালের যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে—তাতে চারটি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে আড়াই লাখ এবং দেড় লাখের মত। অথচ ১৯৭০ সালে এসকল স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুই লাখ এবং এক লাখ পঁচিশ হাজারের মত।

৩৪.২২. বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর দেশের এ চারটি শিক্ষাবোর্ড নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত যে তাদের অনুমোদিত মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেওয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। অনুমোদিত স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিযুক্তি, আর্থিক ও প্রশাসন ইত্যাদি ব্যাপারে নির্ধারিত শর্তাদি পালন করার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং সর্বোপরি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা শিক্ষাবোর্ডেসমূহের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তুষ্টি বিদ্যমান এসবও তার কারণ। পরিস্থিতি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছে।

৩৪.২৩. ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন ছিল। সেই বছরে আইনের মাধ্যমে এ স্তরের শিক্ষাকে শিক্ষাবোর্ডসমূহের আওতাধীন করা হয়। এ সংগে এও সিদ্ধান্ত ছিল যে ইন্টারমিডিয়েটের দু'টি ক্লাসকে ডিগ্রী কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উচ্চ-মাধ্যমিকের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীরূপে গণ্য করা হবে। প্রায় সরকারী ডিগ্রী কলেজগুলি থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস দু'টি বিচ্ছিন্ন করে পৃথক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালে এই বিষয়সহ শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে আন্দোলনের ফলে পরবর্তী সময়ে উক্ত ব্যবস্থাকে বাতিল করতে হয়। তাই ইন্টারমিডিয়েটের দু'টি ক্লাসও ডিগ্রী কলেজগুলির সংগে যুক্ত রয়েছে। একমাত্র শিক্ষাবোর্ডসমূহের পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য সকল ব্যাপারে ইন্টারমিডিয়েট বলে এ স্তরের শিক্ষার নাম প্রচলিত, যেমন শিক্ষাবোর্ডসমূহের নাম, "বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন", "বোর্ড অব হাইয়ার সেকেন্ডারী এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন" নয়। একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণী যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রয়েছে তাদের নাম ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বা ইন্টারমিডিয়েট সেকশান কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল বা ডিগ্রী কলেজে তা 'উচ্চ-মাধ্যমিক শাখা' নামে পরিচিত নয়। কার্যতঃ বর্তমানে 'উচ্চ-মাধ্যমিক' বা 'ইন্টারমিডিয়েট' স্তর কলেজগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩৪.২৪. একই পদ্ধতিতে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী ক্লাসের শিক্ষাদান দেশে প্রচলন রয়েছে। একই শিক্ষকবৃন্দ এ দু'টি স্তরে শিক্ষাদান করেন। এদের পরীক্ষা পদ্ধতিও এক রকমের। শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যাপারে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। পরীক্ষার পদ্ধতিও ঠিক এক রকমের নয়। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের অধিকাংশ ছাত্র ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগগুলিতে লেখাপড়া করে। অথচ ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা বোর্ডসমূহের এবং ডিগ্রী স্তরের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন। একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দু'টি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে শিক্ষাকার্য সম্পাদন করতে হয় বলে তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ম-কানুনের বিভিন্নতার ফলে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স ও ডিগ্রী কোর্স খোলার অনুমোদন, কলেজ পরিদর্শন, ছাত্রের রেজিস্ট্রেশান, পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ম-কানুন এবং প্রশাসনিক বিষয়াদির অন্যান্য নানা ব্যাপারে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার ফলভোগ করতে হয়। একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানসংক্রান্ত ব্যাপারে দুই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন, এর নজীর মেলা ভার।

৩৪.২৫. আমরা একাদশ শ্রেণী স্কুল প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুপারিশ করেছি তা সফলকাম হলে দেশে দশম শ্রেণী মাধ্যমিক স্কুলের পরিবর্তে একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুল চালু হবে। সেক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণী কলেজের প্রথম ডিগ্রী শ্রেণীগুলির সংগে যুক্ত হবে। সুতরাং তখন শিক্ষাবোর্ডসমূহের আওতার মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা থাকবে না। এ শুধু সময় সাপেক্ষ।

৩৪.২৬. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত হল যে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর দেশের এ চারটি শিক্ষাবোর্ডকে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার 'সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন'-এর দায়িত্ব থেকে ভারমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ইন্টার-মিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সেকশান শিক্ষাবোর্ডসমূহের সংগে সংযুক্ত

ও তাদের আওতায় না রেখে এমন সংস্থাসমূহের আওতাধীনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত যাদের দ্বারা কলেজগুলির শিক্ষাদানসংক্রান্ত ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের সমস্যাবলী যথার্থরূপে সমাধান করা সম্ভব হবে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সুপারিশ হল যে বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ স্তরের শিক্ষার সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হতে পারবেন।, ফলে এ স্তরের শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পঠন এবং পরীক্ষা পদ্ধতির মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। যার প্রতিফলন ঘটবে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে। কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাচ্ছন্দ ও অধিকতর স্বাতন্ত্র লাভ করবে শিক্ষাবোর্ডসমূহ মাধ্যমিক স্কুল 'সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধান ও উন্নয়ন' এবং মাধ্যমিক (এস, এস, সি) পরীক্ষার ব্যাপারে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারবেন। তাঁরা নিজেদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করার সময়ও পাবেন। এতে এসব স্তরের শিক্ষার মান বাড়বে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে এ ব্যবস্থা সহায়ক হবে।

৩৪.২৭. এ প্রসংগে এও বলা উচিত হবে যে বর্তমান শিক্ষাবোর্ডসমূহের ন্যায় আরও কয়েকটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করে উপরোক্ত সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব নয়। বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন বা উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড নামে পৃথক পৃথক সংস্থা গঠন করেও এসব সমস্যাবলীর সমাধান করা যাবে না। বিশেষ করে আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা কাঠামোর পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের সংস্থার কথা ওঠে না।

৩৪.২৮. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থাদির সুপারিশ করেছি তা বাস্তবায়ন হলে বর্তমান টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড বা কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের পৃথক সত্তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেরূপ বর্তমান মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড বা মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডেরও আলাদা অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা এসে পড়ে। এ সকল বোর্ডের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার ভার থেকে মুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহ পালন করতে পারবে। তা ছাড়া এ সকল বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের উপরের পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করা যাবে।

৩৪.২৯. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে। দেশের বর্তমান ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন আইনসমূহ কার্যকরী হওয়ার পথে। বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন প্রণয়ন প্রস্তুতির শেষ পর্বে বলে জানা গেছে। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত আইনসমূহ প্রণয়নের পূর্বে সরকার শিক্ষা কমিশনের সভাপতিকে চেয়ারম্যান ও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার এবং শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। এর প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনের ব্যাপারে এই রিপোর্টে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। এ ছাড়া প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক কাঠামো, বিভিন্ন পরিষদ, সংসদ ইত্যাদি বিষয়ে এই রিপোর্টের 'উচ্চশিক্ষা ও গবেষণ' অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৩) আলোচনা করা হয়েছে। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করার সময় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইনগুলিতে উপযুক্ত রদবদলের প্রয়োজন হবে।

৩৪.৩০. সমগ্র দেশে সর্বস্তরে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান এবং মান সুনিশ্চিত করাও এই সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হবে। উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়

এবং অন্যান্য স্তরের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে এই সংস্থার সভাপতি ও সহ-সভাপতি হবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা-সচিব দ্বিতীয় সহ-সভাপতি থাকবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত একজন শিক্ষাবিদ এর সদস্য-সচিব হবেন।

৩৪.৩১. শিক্ষাসংক্রান্ত নানা নিয়মকানুন, শিক্ষকদের নিয়োগ, ছাত্রভর্তি; ছাত্রাবাস পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়মাবলী, শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃংখলা রাখা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তিদান, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন ইত্যাদি বহু শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় সম্বলিত একটি 'এডুকেশন কোড' দ্বারা এবং শিক্ষাবোর্ডগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন ও নিয়মকানুন দ্বারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এ ধরণের একটি 'এডুকেশন কোড' শেষ-বারের মত ১৯৩১ সালে সংকলিত হয়েছিল। এ সময়ের পরে বহু বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু আর নতুন কোন এডুকেশন কোড সংকলিত হয়নি। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বহু আইন-কানুন ও নিয়মাবলীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়েছে। এ সকল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সময়ে সময়ে অনেক আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনামা জারী হয়েছে। সেসব সংকলিত করে প্রকাশ করা জাতীয় কর্তব্য। এ কারণে আমরা সুপারিশ করি যে 'এডুকেশন কোড' সংকলনের জন্য সরকারের একজন সচিবের পদ-মর্যাদা ও মানের একটি পদ দুই বছরের জন্য সৃষ্টি করে একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোক। এ কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী দেওয়া ও অফিসেরও ব্যবস্থা করা হোক।

শিক্ষা প্রশাসন

সারাংশ

১। অতীতে স্বাধীনতাপূর্ব যুগে প্রচলিত শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কখনো কখনো সামান্য পরিবর্তন প্রবর্তন করা ছাড়া এ ব্যবস্থার সামগ্রিক কার্যকারিতা ও তার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে তেমন কোন সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই প্রশাসনিক দিক থেকে শিক্ষাসংস্কারের বিশেষ কোন নেতৃত্ব আসেনি বরং প্রশাসকদের রক্ষণশীলতা ও সময়ে সময়ে অক্ষমতা কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির প্রয়াস ব্যাহত করেছে। সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি সেই পুরাতন প্রশাসনব্যবস্থা চালু থাকে তা'হলে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাসংস্কার আগের মত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। (৩৪.১.)

২। আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান দোষ-ত্রুটিসমূহ মোটামুটিভাবে নিম্নরূপঃ

(ক) রাজধানীতে প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অত্যধিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ। (৩৪.২.—ক)

(খ) শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অপেক্ষা একান্তভাবে প্রশাসনিক সুবিধা ও সুযোগের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নে তুলনামূলকভাবে শিক্ষাবিদদের মতের অপ্রাধান্য। (৩৪.২.—খ)

(গ) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রণালয় ও পরিদপ্তর বিভক্তিজনিত অপচয় ও একই কাজের পুনরাবৃত্তি। (৩৪.২.—গ)

(ঘ) প্রশাসকদের রক্ষণশীল মনোভাব এবং প্রশাসনিক মানের অবনতি। (৩৪.২.—ঘ)

(ঙ) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেবল উচ্চ পর্যায়কে যথা মর্যাদা দান ও আনুপাতিক ভাবে নীচের স্তরের প্রতি অবহেলা। (৩৪.২.—ঙ)

(চ) শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগ এবং একই বিভাগের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব। (৩৪.২.—চ)

(ছ) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য প্রশাসক ও প্রশাসন-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব। (৩৪.২.—ছ)

(জ) প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষাসংস্কারের পরিবর্তে প্রশাসনিক আদেশ বলে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার প্রবণতা। (৩৪.২.—জ)

৩। শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণার্থে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জনশিক্ষা পরিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরকে একীভূত করতে হবে। এইরূপে গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারূপে এবং এই পদাধিকার বলে মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে একজন শিক্ষাবিদকে নিয়োগ করতে হবে। (৩৪.৩.(১))

(২) প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয় ও জেলাভিত্তিতে এবং মাধ্যমিক স্তরের উপরের পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে যথা প্রয়োজন ও যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। (৩৪.৩.(২))

(৩) উক্ত একীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষানীতির সমন্বয় বিধান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সাধারণ সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দকরণ, আন্তঃমন্ত্রণালয়

বিষয়াবলী, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াসংক্রান্ত বৈদেশিক বিষয়সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদসমূহে নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয় যা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ এবং বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর ও জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে।

শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করা উচিত এবং শিক্ষার বিভিন্ন শাখা ও অপরাপর দায়িত্বের ভিত্তিতে বিভাগগুলিকে উপ-বিভাগে ভাগ করা দরকার। (৩৪.৩.(৩))

(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগে চারটি বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর (ডিভিশনাল এডুকেশন ডাইরেক্টরেট) থাকবে। এই পরিদপ্তর-সমূহের তত্বাবধানে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য সমুদয় শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক স্কুলসমূহের পরিদর্শনের ভারও এদের উপর ন্যস্ত থাকবে। তদুপরি মাধ্যমিক স্তরের উপরের পর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বহির্ভূত সমুদয় বিষয়ও বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহের তত্বাবধানে থাকবে। সুষ্ঠু কর্ম দক্ষতা লাভের জন্য প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক বরাদ্দকরণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। (৩৪.৩.(৪))

(৫) সুষ্ঠু শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরসমূহের অধীনস্থ ও আওতাধীন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ এসব পরিদপ্তরসমূহের নিকট দিতে হবে। (৩৪.৩.(৫))

(৬) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ক্ষমতা জোরদার করার জন্য তাদের প্রধানদের অর্থব্যয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। (৩৪.৩.(৬))

(৭) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করে তাদের অর্থব্যয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। (৩৪.৩.(৭))

(৮) বর্তমান কৃষি কলেজ ও প্রস্তাবিত কৃষি কলেজগুলি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বের আওতাধীনে আনা উচিত। সেরূপ মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থাও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বের আওতাধীনে আনার কথাও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। (৩৪.৩.(৮)(৯)

(৯) বেসরকারী কলেজগুলির আবর্তক আর্থিক অনুদান সরাসরি কলেজগুলিকে দেওয়া যেতে পারে। তবে এদের উন্নয়ন ও বিশেষ অনুদান ইত্যাদি বরাদ্দের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হাতে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যে সমস্ত কলেজ ও প্রতিষ্ঠান অনার্স ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাদান করবে, তাদের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের ভার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের থাকা উচিত। (৩৪.৩. (১০))

(১০) প্রাথমিক শিক্ষার (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) সংগঠন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে "জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ" গঠন করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ও শিক্ষায়তন প্রধানদের প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা কার্যেরত শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। এ কর্তৃপক্ষের সভাপতি ও সচিব হবেন যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত ঐ জেলার একজন প্রবীন

শিক্ষাবিদ এবং এই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ণকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসক। এ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে এবং কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ এ কর্তৃপক্ষের হাতে দিতে হবে। (৩৪.৩. (১১))

৪। সকল পর্যায়ের শিক্ষায়তনে কার্যনির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ থাকবে এবং এ সমস্ত পরিষদে শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালয়ে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিসহ শিক্ষায়তন প্রধানকে সভাপতি করে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা উচিত। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদান কর্মকে সার্থক করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতকে যুক্তিসংগত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী সম্বলিত বিধি প্রণয়ন করে তাঁদের কর্তব্যের বিষয়ে সজাগ রাখতে হবে এবং নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করতে হবে। (৩৪.৪.)

৫। শিক্ষা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে, নীতিগতভাবে, উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের পদগুলি শিক্ষাবিদদের দ্বারা পূরণ করা অত্যাবশ্যক। (৩৪.৫.)

৬। শিক্ষা কার্যেরত ব্যক্তিবর্গকে যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের চাকুরী কাঠামোতে সর্বোচ্চ বেতনক্রম ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষা বিভাগের পদসমূহকে আর্থিক আকর্ষণ, পেশাগত সুযোগ-সুবিধা এবং বেতনের হারের বেলায় সিভিল সার্ভিসের সমান করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি স্তরে সমানুপাতিক পদ থাকবে এবং প্রতিটি স্তরের বেতন সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ স্তরের বেতনের সমান হবে। (৩৪.৬.—৩৪.৮.)

৭। শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রশাসনিক ও পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষবিধানকল্পে বিভিন্ন মেয়াদী শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা দরকার। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নতুন নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য একবার করে রিফ্রেসার্স ট্রেনিং দেওয়া উচিত। (৩৪.৯.—৩৪.১০.)

৮। "শিক্ষা প্রশাসক প্রশিক্ষণ একাডেমী" নামে একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন এবং প্রস্তাবিত একাডেমী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হবে। (৩৪.১১.)

৯। আমাদের স্কুল ও কলেজের পরিদর্শন পদ্ধতির নিম্নরূপ উন্নয়নসাধন করা একান্ত প্রয়োজনঃ

(ক) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজসমূহের সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক এবং পরিদর্শিকা নিয়োগ করা উচিত।

(খ) পরিদর্শকের কাজ শিক্ষাবিদের কাজ। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মসূচীর পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনার জন্য পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকের সঙ্গে বিশেষ বিশেষজ্ঞদের থাকা বাঞ্ছনীয়।

(গ) পরিদর্শকদের শিক্ষা বিভাগের আওতার বাইরের কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিতে হবে।

(ঘ) থানা পর্যায়ে দু'জন স্কুল পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং তাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) শিক্ষাবোর্ডসমূহের মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শন ও প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য নিজেদের পরিদর্শক নিযুক্ত করা উচিত। শিক্ষাবোর্ডসমূহের পরিদর্শকদের এবং বিভাগীয় পরিদপ্তরের অধীনস্থ পরিদর্শকদের কাজের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন।

(চ) প্রত্যেকটি কলেজ যাতে বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার পরিদর্শন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩৪.১২.—৩৪.১৬.)

১০। সক্রিয়ভাবে শাসন পরিচালনার জন্য যে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার প্রয়োজন তা' স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষদের দিতে হবে এবং বাইরের কারো হস্তক্ষেপ তাঁদের যাতে বিব্রত না করে, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (৩৪.১৭.)

১১। বর্তমানে প্রায়ই প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ স্থানীয় লোক। তাঁদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা হচ্ছে বলে নানা জায়গা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর প্রতিকারস্বরূপ তাঁদের নিজেদের গ্রামে বা বাড়ীর নিকটবর্তী স্কুলে না রেখে বদলী করার কথা বিবেচনার যোগ্য। (৩৪.১৮.)

১২। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করেই বহু সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় এবং অনুমোদনের শর্তাদি পালনে অপারগ স্কুল ও কলেজের অনুমোদন বাতিল করা উচিত হবে। (৩৪.২০.)

১৩। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর দেশের এ চারটি শিক্ষাবোর্ডকে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বভার থেকে মুক্ত করা উচিত। এ দায়িত্ব এলাকাস্থ অনুমোদনকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের উপর ন্যস্ত করতে হবে। প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ স্তরের শিক্ষার সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হতে পারবে। ফলে এ স্তরের শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পঠন ও পরীক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে যার প্রতিফলন ঘটবে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে। কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকতর স্বাতন্ত্র্যলাভ করবে। শিক্ষাবোর্ডসমূহ মাধ্যমিক স্কুল "সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, ও উন্নয়ন" এবং মাধ্যমিক (এস, এস, সি) পরীক্ষার ব্যাপারে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারবেন। তারা নিজেদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করার সময়ও পাবেন। এতে এসব স্তরের শিক্ষার মান বাড়বে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে এ ব্যবস্থা সহায়ক হবে। (৩৪.২১.—৩৪.২৭.)

১৪। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য যে সব ব্যবস্থাদির সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের পৃথক সত্তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে কিনা তা' পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড সম্পর্কেও এ সুপারিশ প্রযোজ্য। (৩৪.২৮.)

১৫। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হবে। (৩৪.২৯.)

১৬। সমগ্র দেশে সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান এবং উন্নতমান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা দরকার। এ পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্তরের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রী এ সংস্থার সভাপতি হবেন। (৩৪.৩০.)

১৭। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংক্রান্ত বিধি সম্বলিত "এডুকেশন কোড" দ্বারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ১৯৩১ সালের পর "এডুকেশন কোড" আর সংকলিত হয়নি "এডুকেশন কোড" সংকলনের এবং শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন ও অনুশাসনের সঙ্গে কোডের প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য সরকারের একজন সচিবের পদমর্যাদা ও মানের একটি পদ দু'বছরের জন্য সৃষ্টি করে একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোক। তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী ও কর্মচারী দিয়ে স্বতন্ত্র অফিসের ব্যবস্থা করা হোক। (৩৪.৩১.)

অধ্যায় ৩৫

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

৩৫.১. আধুনিক সমাজ গঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার অপরিসীম অবদান সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীরা একমত। এই শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণের রীতি ছিল শিক্ষাকে সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসাবে না দেখে একটি ব্যয়বহুল সমাজ সেবামূলক কাজ হিসাবে দেখা। নিঃসন্দেহে, অন্ততঃ আংশিকভাবে, এর কারণ ছিল এই যে শিল্প ও ব্যবসায়ের যেরূপ লাভ-লোকসানের খতিয়ান করার রীতি আছে, শিক্ষার ব্যাপারে সেরূপ খতিয়ান করা সহজ নয়। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগের ফলে যে বিপুল অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা স্বীকৃতির ফলে এ পরিষ্কার হয়েছে যে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরি ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সমাজের আর্থিক অবস্থাকে অনেকখানিই নিয়ন্ত্রণ করে। একটি সুউন্নত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করা না হলে এরূপ ব্যক্তিবর্গ গড়ে তোলা যাবে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে, শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে আমরা যে নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষাবাবত অর্থ ব্যয়কে দেখার অর্থাৎ তাকে জাতীয়সম্পদ বৃদ্ধির একটি অপরিহার্য উপায় হিসাবে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।

৩৫.২. শিক্ষা এবং উৎপাদনের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অবশ্য সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্যগোচর হয় বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং কৃষিসম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহে। তবে উপরোক্ত যুক্তি সকল প্রকারের শিক্ষাসম্পর্কেই প্রযোজ্য। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় যে দ্রুত পরিবর্তনের সংগে তাল রেখে চলতে পারে এবং ট্রেনিংয়ের জন্য সহজেই সাড়া দেয় এরূপ বহু সংখ্যক লোককে শিক্ষিত করে তোলার সাধারণ শিক্ষা শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করেছে। এসব দেশ স্বীকার করে যে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার এবং ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাপকভাবে বহুসংখ্যক লোকের দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগালে উৎপাদনেরক্ষেত্রে এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সুফল দেখা দেয়। এভাবে চিন্তাধারা বাস্তবক্ষেত্রে তখনই কাজে পরিণত হতে পারে যখন জনসাধারণ এসব তথ্য বোঝার প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে। অতএব অর্থনৈতিক উৎপাদনের সংগে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে, কেননা এরূপ শিক্ষার ফলে গবেষকদের চিন্তাধারা কাজে পরিণত করার উপযোগী লোকের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু শিক্ষিত শ্রমিকদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ বেশী এবং শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বও তারা বুঝতে পারে, তার ফলে অধিকতর যোগ্যতার সংগে তারা কাজ করে এবং শিল্প-কারখানার সম্প্রসারণেও উৎসাহ যোগায়। শিল্পক্ষেত্রে অগ্রণী দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণই যে শুধু এ অভিমত পোষণ করেন তা নয়, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং জনসাধারণেরও একটি বিরাট অংশ বিষয়টি স্বীকার করেন। ফলে ক্রমশঃ উচ্চতর হারে শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয়ের অনুকূল মনোভাব দেখা যায়।

৩৫.৩. উত্তম শিক্ষা, বিশেষতঃ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি এবং কৃষিবিদ্যা, ব্যয় বহুল। প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের সপক্ষে প্রবল যুক্তি না থাকলে সরকার অথবা জনসাধারণ কেউই একটি সুষ্ঠু শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য অর্থ ব্যয় করবেন না। জাতির শিক্ষা প্রচেষ্টার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশা যে সরকার এবং জনসাধারণ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—বস্তুতঃ অপরিহার্য সম্পর্ক—স্বীকার করবেন।

৩৫.৪. আমরা নিজেরাই এ সপর্ক দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি বলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও কৃষি শিক্ষার সম্প্রসারণ, এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক কর্ম-সূচীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছি। যাতে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষার যথোপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত

হতে পারে সেজন্য এর প্রত্যেকটি স্তরে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আমরা সুপারিশ করেছি। অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার জন্য অত্যাবশ্যক মনোভংগীর বিকাশ ও অভ্যাস গঠন এবং এজন্য আবশ্যকীয় মূল্যবোধ সঞ্চারের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন যে শিক্ষা প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার উপরেই নির্ভর করবে। আবার এগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার এবং অর্থ ব্যয়ের জন্য সরকার ও সমাজের সম্মতির সংগে। আমাদের বিশ্বাস ও আশা সকলে উপলব্ধি ও স্বীকার করবেন যে সম্পদ সৃষ্টির একটি পন্থা হচ্ছে শিক্ষা; শুধু ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছল জীবন যাপনের অনির্দিষ্ট অর্থেই নয়, অর্থনৈতিক উন্নতিতে সরাসরিভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সাহায্যের অর্থেই। ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত যে-সব দেশের অর্থনৈতিক শিক্ষার সুফল দেখা দিয়েছে সে-সব দেশের সকলে এ কথা উপলব্ধি করেছেন। দেশের আর্থিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যক, এ দৃষ্টিভংগী প্রসারলাভ করায় শিক্ষা ও গবেষণা খাতে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে অর্থ ব্যয়ের জন্য ঐসব দেশের সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছুক, কেননা এ বিষয়ে তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে তা হতে যথেষ্ট পরিমাণে সুফল পাওয়া যায়।

৩৫.৫. আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকেও শিক্ষাখাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মাধ্যমেই উল্লেখযোগ্য সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব।

৩৫.৬. শিক্ষা খাতে অর্থসংস্থানের প্রশ্নটি তিন অংশে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

(ক) দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা দরকার?

(খ) বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার মধ্যে কিভাবে এই ব্যয় বন্টন করা হবে?

(গ) আমাদের শিক্ষাখাতে অর্থসংস্থানের পদ্ধতি কি হবে?

৩৫.৭. প্রশ্নগুলি সমাধানের কোন সর্বজন স্বীকৃত পন্থা নাই। তবে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ নির্দ্ধারণ পদ্ধতি এ উদ্দেশ্যে ব বহ'র করাই যুক্তিযুক্ত। এই পদ্ধতিতে দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত দক্ষতার প্রয়োজন তাকে নীতি নির্ণয়করূপে ব বহার করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ'ও যাতে পূর্ণ হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় জনশক্তি সম্বন্ধে ত্রুটিপূর্ণ পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করে যেন পরিকল্পনা রচিত না হয় সে সম্পর্কেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। জনশক্তি সম্বন্ধে এই পূর্বানুমান খুব সঠিক ও বিস্তারিতভাবে করা সম্ভব নয়, তবে এই পূর্বানুমান যত বিস্তারিতভাবে হবে, শিক্ষা পরিকল্পনাও তত বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এমন কি যদি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য প্রাক অনুমান করা নাও যায় এবং শুধু মূল ব্যক্তিগত শ্রেণী বিন্যাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয় জনসম্পদের একটা মোটামোটি দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বানুমান করা হয় তাও শিক্ষা পরিকল্পনার পক্ষে খুবই কার্যকর হবে। সুতরাং আজ থেকে দশ-পনেরো বছর পরে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যে লক্ষমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তার জন্য কি পরিমাণ শিক্ষিত জনসম্পদের প্রয়োজন সে সমীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

৩৫.৮. ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্বানুমান নাই যা আগামী দশ-বিশ বছরের শিক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এ অবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তথ্য থেকে আমরা নীতি গ্রহণ করতে পারি।

৩৫.৯. বিশ্বের উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় তাদের জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমাংশে বহু অগ্রসর দেশের শিক্ষায় শুধু সরকারী ব্যয়ই ছিল জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৮% এর মধ্যে, অথচ এই সময়

বাংলাদেশের এই অনুপাত ছিল ১% এর মত এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যয় বরাদ্দের হিসাব অনুযায়ী তা প্রায় ১.৮%। বাংলাদেশের এই উভয় পরিমাণই আমাদের প্রতিবেশী বা আমাদের মত অবস্থার যে কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক কম। অন্যান্য দেশের প্রচেষ্টার তুলনায় বাংলাদেশে সরকার কোন সময়েই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আর্থিক পোষকতা দেননি। প্রায়ই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে শিক্ষা বাবতে ব্যয় সাধ্যানুযায়ীই করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে আমাদের সম্পদ সীমিত, কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অক্ষম। এর মধ্যে অবশ্য কিছু সত্য আছে। আমরা হঠাৎ এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি গঠনের আশা করতে পারি না যা ব্যক্তির দিক দিয়ে আমাদের কয়েকগুণ বেশী সম্পদের অধিকারী দেশ-সমূহের শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু আমাদের সম্পদ সীমিত বলে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যাবে না এ যুক্তি সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধী। এ ব্যাপারে সত্য এই যে যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত অতএব এরূপ একটি শিক্ষা পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য আমাদের অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যা ভবিষ্যতে আমাদের সম্পদকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৩৫.১০. আমরা যখন আমাদের সম্পদের তুলাদন্ডে আমাদের প্রচেষ্টার মূল্য নির্ণয় করি এবং অন্যান্য দেশের প্রচেষ্টার সঙ্গে তার তুলনা করি তখন দেখি যে, যে সব দেশের সম্পদ প্রায় আমাদের সমান সে সব দেশ অপেক্ষা আমরা শিক্ষা খাতে আমাদের জাতীয় আয়ের ও মোট রাজস্বের স্বল্পতর অংশ ব্যয় করছি। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের শিল্পায়িত দেশগুলির কথা বাদ দিলেও, আমাদের ন্যায় যেসব দেশ যুক্তিসঙ্গত আর্থিক স্থায়িত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের চেষ্টা করছে সে সব দেশের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের আর্থিক প্রচেষ্টা নগণ্য। আমরা এসত্য এড়াতে পারি না যে শিক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় আয়ের এবং সরকারী ব্যয়ের আরও বড় অংশ বরাদ্দ করলে শুধু তবেই এই রিপোর্টে প্রস্তাবিত শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর করা যাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৬২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য মোট জাতীয় আয়ের ৪ থেকে ৫% শিক্ষা খাতে ব্যয় আদর্শরূপে বিবেচনা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।

৩৫.১১. এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমাদের সুপারিশ এই যে, আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫% এ উন্নীত করা দরকার এবং এই ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এটা যে অত্যন্ত দুরূহ কাজ তা জাতীয় আয়ের সঙ্গে সরকারের রাজস্ব খাতে আয়ের তুলনা হতে বোঝা যায়। অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনের গুরুত্ব সত্বেও আমাদেরকে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। দ্রুত কিন্তু সহজে এই লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের উপায় হচ্ছে, অধিক ক্ষেত্রে অধিকতর হারে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধিকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ।

৩৫.১২. বিভিন্ন স্তর ও ধরনের শিক্ষার মধ্যে শিক্ষা ব্যয় বন্টন প্রশ্নের সমাধানের জন্যও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা দরকার। যেসব দেশ এখন উন্নত, উন্নয়নের প্রথমিক অবস্থায় সাধারণ শিক্ষায় তাদের মোট ব্যয় সাধারণতঃ কম ছিল এবং তার প্রধান অংশই বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যয়িত হত। উন্নতির সংগে সংগে তাদের মোট ব্যয় বাড়তে থাকে এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যয়ের অনুপাত ক্রমাগত বেড়ে চলে।

৩৫.১৩. আমাদের ১৯৭৩-৭৪ সালে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য মোট শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছেঃ

	আবর্তক	অনাবর্তক বা মূলধনী
প্রাথমিক শিক্ষা	৬১.৫%	১৭.৯%
মাধ্যমিক শিক্ষা	১৪·৫%	১৮·৮%
কলেজ শিক্ষা	৬%	৫·৮%
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৯.২%	১৩·২%
কারিগরি শিক্ষা	৩·৩%	১২·৮%
অন্যান্য	৫·৫%	৩১·৫%

১৮৮৫ সালে জাপান যখন তাদের শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা আরম্ভ করে তখন তাদের মোট শিক্ষার ব্যয়ের ৮৪% প্রাথমিক শিক্ষায় (৬ বছর ব্যাপী), ৭.৮% মাধ্যমিক শিক্ষায় (স্থিতিকাল ৬ বছর, প্রথম ৩ বছর বাধ্যতামূলক) এবং ৮.২% উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় করে এবং ১৯৬০ সালে তাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৪২%, ৪৫% ও ১৩%।

৩৫.১৪. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫—১৩ বয়োবর্গের (অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করতে হবে। এ বয়সেই বিদ্যার্থীরা তাদের মৌলিক শিক্ষালাভ করবে এবং যত সত্বর সম্ভব এই বয়োবর্গের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমরা যদি ১৯৮৩ সালের মধ্যে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে চাই, তবে বর্তমানে অধ্যয়নরত প্রায় ৮০ লক্ষ বিদ্যার্থীর তুলনায় প্রায় ২০০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা উক্ত সময়ের মধ্যে করতে হবে। অর্থাৎ এই স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ১৫০% সম্প্রসারণ করতে হবে। এটা করতে পারলে শুধু যে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালিত হবে তাই নয়, এতে দেশের শিক্ষা সৌধ প্রসারিত ভিত্তিভূমির উপর দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারও এর ফলে বৃদ্ধি পাবে।

৩৫.১৫. প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার উৎকর্ষ, পরিমাণ ও ধরণ দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় জন সম্পদের কথা স্মরণ রেখে নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বলা চলে যে, আমাদের এখন কলা তথা মানবিক শাখায় বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষার উপর অধিকতর জোর প্রদান করে দ্রুততর হারে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উৎপন্ন করতে হবে। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার জন্য আবশ্যক প্রতি ছাত্র খরচার একেবারে সঠিক তথ্য আমাদের কাছে না থাকলেও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা সুপারিশ করি যে, শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় আয়ের ৫% অর্থ ব্যয় সম্ভবপর করে মোটামুটিভাবে তার ৬০% প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য, ২৫% বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য এবং বাকী ১৫% কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হোক। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাখাতে এ স্তরের বরাদ্দকৃত অংশের অধিকাংশ নিয়োগ করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

৩৫.১৬. অর্থ বিভাজন এমনভাবে হবে যেন বর্ধিত অর্থনীতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় শাখা-সমূহের কলেবর এবং সেখানে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা অবাধে না বাড়তে পারে। প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত মেধা, সমাজ জীবনের চাহিদা এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষায় সমাজকে কি ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে তার ভিত্তিতে উচ্চপর্যায়ে ছাত্র ভর্তি নিরূপিত হবে। শিক্ষা যে দক্ষতা উৎপন্ন

করবে তার কতকখানি প্রয়োজন তা বিশেষভাবে দেখতে হবে। জাতীয় জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের নির্দিষ্ট পাঠ্যরূপে যে কোন বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং মেধা যদি থাকে শুধু তবেই উচ্চ পর্যায়ে কোন ছাত্রকে ভর্তি করা হবে।

৩৫.১৭. সাধারণ বিদ্যালয় ও কলা কলেজগুলি থেকে যে সমস্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র বের হয়ে আসছে তাদের সংখ্যা যদি আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে এসব শিক্ষায়তনগুলিকে প্রয়োজনমত বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় বা কলেজে রূপান্তরিত করা উচিত হবে। উপরের স্তরে কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা সমীচীন হবে না। আমাদের অবস্থা এমন নয় যে, ১৪ থেকে ২২ বছর বয়সের সকল তরুণকে বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে আমরা সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষায় নিযুক্ত রেখে উৎপাদনমুখী কাজ হতে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। তাদের উৎপাদনশীল কাজের সংস্থান দ্বারা অবশ্যই দেশের আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৩৫.১৮. প্রাথমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) ১৯৮৩ সাল নাগাদ সার্বজনীন ও বাধ্যতা-মূলক করতে হলে বর্তমান খরচের ভিত্তিতেও হিসাব করলে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হবে ২৭০ কোটি টাকা। এরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু গতানুগতিক পন্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে বিশেষ পন্থায় দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়ে এবং অপচয়ের অবসান ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়টি বিকেন্দ্রিত ও স্থানীয় করলে বিষয়টির জটিলতা কমবে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণার্থে স্থানীয় শ্রম সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে দ্বিতীয় শিফ্‌ট চালু করা বা একই গৃহ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা বা গ্রামের সমাজকেন্দ্র, গ্রামবাসীর বহির্বাটী, এমন কি হাটের দোকান ঘর ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা অনাবর্তক বা মূলধনী ব্যয়ের প্রয়োজন কমান যেতে পারে। আমাদের সীমিত সম্পদ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, বই ও লেখাপড়ার অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য এবং কিছু খরচ হবে চক খড়ি ও ব্ল্যাকবোর্ডের জন্য। স্কুল গৃহের ভূমি বিত্তবানদের নিকট হতে ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৩৫.১৯. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তা সহসা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকেও শিক্ষক নিযুক্ত করে বা শিক্ষিত যুবকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'জাতীয় সেবা' আদায় দ্বারা শিক্ষকের অপ্রতুলতা হ্রাস করা যেতে পারে। প্রাথমিক প্রাথমিক শিক্ষা দরিদ্রদের মধ্যেও জনপ্রিয় করবার জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিদ্যালয়ের ছুটিগুলি পুনর্গঠিত করা (যাতে ভরা মওসুমে চাষাবাদে বিদ্যার্থীরাও সাহায্য করতে পারে) ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রামীণ জীবন ও কৃষির উপর জোর দিয়ে শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন সাধন করলে শিক্ষার প্রতি গ্রামের শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে।

৩৫.২০. মোট শিক্ষা ব্যয়ের প্রায় ৭৫% সরকারী তহবিল থেকে আসে। শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হলে বা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সমমান প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার অথবা স্থানীয় সংস্থানসমূহের নিয়ন্ত্রাধীন করতে হবে এবং শিক্ষা-ব্যয় সরকারী তহবিল থেকে দিতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার দরুণ এবং পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা অনুচিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয়, প্রতিশীর্ষ আয় ও সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তবে আমাদের মতে শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কর রাজস্বকে জাতীয় আয়ের বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৮% করতে হবে এবং শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত ৭%

থেকে অন্ততঃ ২৫% এ উন্নীত করতে হবে। বর্ধিত হারে সম্পদকর, উত্তরাধিকারকর, ভূমিকর বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং প্রতিশীর্ষ আয়ের বৃদ্ধি এরূপ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব করতে পারে। শিক্ষার জন্য সিগারেট ও গ্যাসোলিনের উপর বিশেষ কর এবং বিশেষ প্রমোদকর আরোপ করা যেতে পারে। পানি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদির উপর শিক্ষা লেভি ধার্য করা যেতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ কর আরোপের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার জন্য স্ব স্ব বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হতে পারে। এক লক্ষাধিক জন-অধ্যুষিত সমস্ত পৌরসভাকে নিজ নিজ এলাকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অন্যান্য পৌরসভাকে দুই-তৃতীয়াংশে এবং জেলা পরিষদগুলিকে ৩৫% প্রাথমিক ব্যয় সংগ্রহ করতে সমর্থ হতে হবে। বেসরকারী বদান্যতায় উৎসাহ সঞ্চারের জন্য দাতার স্মৃতিরক্ষা প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে।

৩৫.২১. আমরা শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেছি সরকার নতুন কর ধার্য করে সে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার পরও আরও অর্থের প্রয়োজন হবে এবং এই অর্থ জনসাধারণের হিতৈষণামূলক অর্থদান এবং ছাত্র বেতনের মারফতেই সংগৃহীত হতে পারে। এই অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থার জন্য সকল লোককেই আরও বেশী পরিমাণে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষা সম্পর্কে আমরা সুপারিশ করি যে, এর ব্যয়ের শতকরা ৫০% ভাগ ছাত্র বেতন হতে আদায় করা হোক এবং অন্যান্য উৎস থেকে যা পাওয়া যাবে তা সহ সরকার বাকী ৫০ ভাগ বহন করুক। এক্ষেত্রে মাতাপিতা ও অভিভাবকদের ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে যে বিনা বেতনে স্কুল কলেজে পড়লেও শিক্ষকগণকে বেতন দিতে হবে, উপকরণ ও সরঞ্জাম কিনতে হবে এবং স্কুল ও কলেজ গৃহ নির্মাণ ও রক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আশা করা যায় যে ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হবে এবং জনসাধারণকেও সে অনুপাতে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে জনসাধারণ এসব ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হবেন। শিক্ষার দ্বারা শেষ পর্যন্ত তাঁরাই উপকৃত হবেন এবং শিক্ষা লাভের ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা নানারূপ সুযোগ-সুবিধা বেশী পরিমাণে পাবে। শিক্ষার প্রত্যক্ষ আর্থিক সুফল হবে জীবন যাত্রার উচ্চতর মান এবং অধিকতর স্বচ্ছন্দ সামাজিক জীবন যাপন। স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হচ্ছে শিক্ষা এবং প্রতিটি ব্যক্তির অধিকতর পরিমাণে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারই শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন পূরণের একমাত্র পথ।

৩৫.২২. সাধারণতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার প্রসারে অর্থ সাহায্য করে না, এমন কি যে কারিগরি শিক্ষার দ্বারা শিল্প কারখানা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়ে থাকে সে শিক্ষার প্রসারেও সাহায্য করে না। শিল্প কারখানায় কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, যন্ত্রবিদ, সুপারভাইজার এবং ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাধারণতঃ এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় না। এই রিপোর্টে কারিগরি শিক্ষার যে কর্মসূচী প্রস্তাব করা হয়েছে তা হতে শিল্প কারখানা আরও বেশী উপকৃত হবে। এই কারণে আমরা সুপারিশ করি যে শিক্ষার ব্যয়ের একাংশ, বিশেষতঃ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যয়ের বড় অংশ, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহন করতে হবে। উপরে আমরা প্রস্তাব করেছি যে কারিগরি শিক্ষায় অর্থ সাহায্যের জন্য শিল্প কারখানার উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হোক। এই কর পুরাপুরিভাবে কারিগরি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত হবে। ফ্রান্স, স্পেন যুগোশ্লাভিয়া এবং অন্যান্য বহুদেশে এ ধরণের কর ইতিপূর্বেই ধার্য করা হয়েছে। এ বাবদে শিল্প কারখানা যে অর্থ ব্যয় করবে তা সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধরা উচিত হবে।

৩৫.২৩. উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। এসব পরিকল্পনার আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে কাঁচামাল, শ্রমিক ও সরঞ্জাম এবং টেকনিশিয়ান ও উপদেষ্টাদের বাবদেও ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা একবার কার্যকরী হলে তার পরিচালনা ও কাজের জন্য অথবা অন্যত্র অনুরূপ পরিকল্পনার জন্য যে-সব লোকের প্রয়োজন হবে তাদের শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের জন্য সাধারণতঃ কোন ব্যয় ধরা হয় না। আমাদের পরিকল্পনাসমূহের কাজের জন্য যে-সব লোকের

প্রয়োজন তাদের শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ব্যয় উন্নয়ন তহবিল হতে বহন করাই যুক্তিসংগত ও অত্যাবশ্যক, এ কারণে আমরা সুপারিশ করি যে প্রধান প্রধান পরিকল্পনাসমূহের বিশেষতঃ বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন, যোগাযোগ এবং বড় বড় শিল্প পরিকল্পনাসমূহের ব্যয়ের একটি উপযুক্ত অংশ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা উচিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৃত্তিমূলক, কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা উচিত হবে। অন্যান্য দেশে এরূপ রীতি প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃটেনের কোল বোর্ড, গ্যাস কাউন্সিল এবং সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক অথরিটি তাদের তহবিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করেন। এর ফলে প্রথম প্রথম জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে দাম আবার শীঘ্রই কমে যাবে, কেননা কারিগরি ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন মূল্য কমে যাবে। এভাবে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে। জনসাধারণ প্রথমে ব্যয় বহন করলেও পরে উপকৃত হবে এবং সমগ্র জাতি উপকৃত হবে।

৩৫.২৪. এশিয়ার অন্যান্য যে-সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সে-সব দেশে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপোষকতার জন্য তার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে শিক্ষা পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়। আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য সর্বোচ্চ পরিমাণে সুফলপ্রসূ করতে হলে বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপনের ব্যাপারে অবশ্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে এবং এজন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু যেরূপ শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা' পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বৈদেশিক সাহায্য প্রধানতঃ সরকারের অনুরোধক্রমেই পাওয়া যায়। সে সাহায্যের একটি ন্যায় সংগত অংশ বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় শিক্ষা ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হোক তা' আমরা চাই।

৩৫.২৫. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনা হতে বোঝা যাবে যে নানা উপায়ে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান করতে হবে। এসব উপায় হচ্ছে কর, ছাত্র বেতন, জনহিতৈষণামূলক অর্থ দান, উন্নয়ন তহবিল, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি। যে ধরণের রাজস্ব সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক তা এরকম লোকের দ্বারা প্রণীত হওয়া উচিত যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত ও এই ব্যাপারে সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সে সংগে রাজস্ব কর ধার্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক জ্ঞানেরও অধিকারী। আমরা মনে করি যে এ ধরণের পরিকল্পনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা থাকা উচিত। এই শাখাতে থাকবেন অর্থনীতিবিজ্ঞান ও অর্থ সংস্থানের যথোপযুক্ত ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কিরূপ অর্থ সংস্থান আবশ্যক এবং এদেশে কিরূপ আর্থিক পরিস্থিতি বর্তমান সে সম্বন্ধে এবং সরকারের রাজস্ব নীতি ও বিভিন্ন দেশে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে এই শাখা অবহিত থাকবে। এভাবে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের প্রস্তাবসমূহ এবং নতুন নতুন তহবিল সৃষ্টির উদ্যম বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকর হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

৩৫.২৬. শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে আমরা নানা পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছি। বর্তমানে প্রচলিত কয়েক প্রকারের কর বৃদ্ধি, নতুন কর আরোপ, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষাখাতে ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে অর্থ প্রদান, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি কয়েক ধরণের উপায়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ সকল পন্থার মাধ্যমে এবং অন্যান্য কি কি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার জন্য অর্থ পাওয়া যেতে পারে, তার উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে সরকারকে বিস্তারিতভাবে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি শিক্ষা প্রশাসক, কর সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং অর্থনীতিবিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

৩৫.২৭. ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সম্পর্কে কোনো পূর্বানুমান না থাকায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তদুপরি দেশের জন্য সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনাসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে জনসম্পদের পূর্বানুমান অতীব প্রয়োজন। তাই জনসম্পদ সম্পর্কে জরীপ, বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও সেসব তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আমরা সুপারিশ করি যে এজন্য একটি জনশক্তি কমিশন গঠন করা হোক।

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

সারাংশ

১। আধুনিক সমাজ গঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার অপরিসীম অবদান সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীরা একমত। এ জন্যই বিভিন্ন দেশের সরকার শিক্ষা ও জনসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষাখাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মাধ্যমেই উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। শিক্ষাকে ব্যয় বহুল সমাজ সেবামূলক কর্ম হিসাবে নয়, সম্পদ সৃষ্টির ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসাবে গণ্য করতে হবে। (৩৫.১.—৩৫.৫)

২। শিক্ষাখাতে অর্থ সংস্থানের প্রশ্নটি তিন অংশে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

(ক) দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা দরকার?

(খ) বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার মধ্যে কিভাবে এই ব্যয় বন্টন করা হবে?

(গ) আমাদের শিক্ষাখাতে অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি কি হবে? (৩৫.৬.)

৩। উক্ত প্রশ্নগুলি সমাধানের কোন সর্বজনস্বীকৃত পন্থা নাই। তবে প্রয়োজনীয় জন সম্পদ নির্ধারণ পদ্ধতি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এই পদ্ধতিতে দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত দক্ষতার প্রয়োজন তাকে নীতি নির্ণয়কল্পে ব্যবহার করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যও যাতে পূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় জন-শক্তি সম্বন্ধে ত্রুটিপূর্ণ পূর্বমানের উপর নির্ভর করে যেন পরিকল্পনা রচিত না হয় সে সম্পর্কেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। জনশক্তি সম্বন্ধে এই পূর্বানুমান খুব সঠিক ও বিস্তারিতভাবে করা সম্ভব নয়, তবে এই পূর্বানুমান যত বিস্তারিত হবে, শিক্ষা পরিকল্পনাও তত বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এমনকি যদি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য প্রাক-অনুমান করা নাও যায় এবং শুধু মূল বৃত্তিগত শ্রেণী বিন্যাসের দিক থেকে প্রয়োজনীয় জন সম্পদের একটি মোটামুটি দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বানুমান করা হয় তাও শিক্ষা পরিকল্পনার পক্ষে খুবই কার্যকর হবে। সুতরাং আজ থেকে দশ-পনেরো বছর পরে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যে লক্ষ্য-মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তার জন্য কি পরিমাণ শিক্ষিত জন সম্পদের প্রয়োজন সে সমীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। (৩৫.৭.)

৪। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় জন সম্পদ সম্পর্কে আমাদের এমন কোন পূর্বানুমান নাই যা আগামী দশ-বিশ বছরের শিক্ষার প্রয়োজন নির্ধারনের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এ অবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তথ্য থেকে আমরা নীতি গ্রহণ করতে পারি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় তাদের জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমাংশে বহু অগ্রসর দেশ শিক্ষায় শুধু সরকারী ব্যয়ই ছিল জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৮%-এর মধ্যে। ১৯৬২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা-মন্ত্রীদের সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য মোট জাতীয় আয়ের ৪ থেকে ৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় আদর্শরূপে বিবেচনা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। এ সমস্ত বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫% এ উন্নীত করা দরকার এবং এ ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এই লক্ষ্য-মাত্রা অর্জনের উপায় হচ্ছে, অধিক থেকে অধিকতর হারে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধি করণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ। (৩৫.৮—৩৫.১১.)

৫। বিভিন্ন স্তর ও ধরণের শিক্ষার মধ্যে শিক্ষা ব্যয় বন্টন প্রশ্নের সমাধানের জন্যও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা দরকার। যে সব দেশ এখন উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থায়, সাধারণ শিক্ষায় তাদের মোট ব্যয় সাধারণত কম ছিল এবং তার প্রধান অংশই বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যয়িত হত। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মোট ব্যয় বাড়তে থাকে এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যয়ের অনুপাত ক্রমাগত বেড়ে চলে। ১৮৮৫ সালে জাপান যখন তাদের শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা আরম্ভ করে তখন তাদের মোট শিক্ষার ব্যয়ের ৮৪% প্রাথমিক শিক্ষায় (৬ বছর ব্যাপী), ৭·৮% মাধ্যমিক শিক্ষায় (স্থিতিকাল ৬ বছর, প্রথম ৩ বছর বাধ্যতামূলক) এবং ৮.২% উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় করে। ১৯৬০ সালে তাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৪২%, ৪৫% এবং ১৩%। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় আয়ের ৫% অর্থ ব্যয় সম্ভবপর করে মোটামুটিভাবে তার ৬০% প্রাথমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য, ২৫% বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য এবং বাকী ১৫% উচ্চ শিক্ষার (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা) জন্য নির্ধারিত রাখা উচিত। (৩৫.১২.—৩৫.১৭.)

৬। প্রাথমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) ১৯৮৩ সাল নাগাদ সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। এরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু গতানুগতিক পন্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে বিশেষ পন্থায় দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়ে এবং অপচয়ের অবসান ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়টি বিকেন্দ্রিত ও স্থানীয় করলে বিষয়টির জটিলতা কমবে। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণার্থে স্থানীয় শ্রম সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে দ্বিতীয় শিফট্ চালু করা বা একই গৃহ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা বা গ্রামের সমাজকেন্দ্র, গ্রামবাসীর বহির্বাটী ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা অনাবর্তক বা মূলধনী ব্যয়ের প্রয়োজন কমান যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তা সহসা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণহীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকেও শিক্ষক নিযুক্ত করে বা শিক্ষিত যুবকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য "জাতীয় সেবা" আদায় দ্বারা শিক্ষকের অপ্রতুলতা হ্রাস করা যেতে পারে। (৩৫.১৮.—৩৫.১৯.)

৭। শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হলে বা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সমমান প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার অথবা স্থানীয় সংস্থানসমূহের নিয়ন্ত্রনাধীন করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যয় সরকারী তহবিল থেকে দিতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার দরুণ এবং পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা অনুচিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয়, প্রতিশীর্ষ আয় ও সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা কঠিন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কর রাজস্বকে জাতীয় আয়ের বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৮% করতে হবে এবং শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত ৭% থেকে অন্ততঃ ২৫%এ উন্নীত করতে হবে। বর্ধিত হারে সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর, বিত্তবানদের ভূমি কর বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং প্রতিশীর্ষ আয়ের বৃদ্ধি এরূপ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব করতে পারে। শিক্ষার জন্য সিগারেট ও গ্যাসোলিনের উপর বিশেষ কর এবং বিশেষ প্রমোদকর আরোপ করা যেতে পারে। পানি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদির উপর শিক্ষা লেভি ধার্য করা যেতে পারে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বিশেষ কর আরোপের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার জন্য, স্ব স্ব বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হতে পারে। এক লক্ষাধিক অধ্যুষিত সমস্ত পৌরসভাকে নিজ নিজ এলাকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অন্যান্য পৌরসভাকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং জেলা পরিষদগুলিকে ৩৫% প্রাথমিক ব্যয় সংগ্রহ করতে সমর্থ হতে হবে। (৩৫.২০.)

৮। শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন নতুন কর ধার্য করে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার পরও আরো অর্থের প্রয়োজন হবে এবং এই অর্থ জনসাধারণের হিতৈষণামূলক অর্থদান এবং ছাত্র বেতনের মারফতেই সংগৃহীত হতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষার ব্যয়ের শতকরা ৫০% ছাত্র বেতন থেকে আদায় হওয়া উচিত এবং অন্যান্য উৎস থেকে যা পাওয়া যাবে তা সহ সরকার ৫০% বহন করবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হবে।(৩৫.২১.)

৯। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যয়ের বড় অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহন করতে হবে। এ বাবতে শিল্প কারখানা যে অর্থ ব্যয় করবে তা সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় হিসাবে ধরা উচিত হবে। প্রধান প্রধান পরিকল্পনাসমূহের বিশেষতঃ বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন, যোগাযোগ এবং বড় বড় শিল্প পরিকল্পনাসমূহের ব্যয়ের একটি উপযুক্ত অংশ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা উচিত। (৩৫.২২.—৩৫.২৩.)

১০। এশিয়ার অন্যান্য যে-সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সে সব দেশে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপোষকতার জন্য তার পাশাপাশি শিক্ষা পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়। আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য সর্বোচ্চ পরিমাণে সুফলপ্রসূ করতে হলে বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (৩৫.২৪.)

১১। শিক্ষার জন্য যে ধরণের রাজস্ব সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক তা এরকম লোকের দ্বারা প্রণীত হওয়া উচিত যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত ও এ ব্যাপারে সহানুভূতি সম্পন্ন এবং সে সংগে রাজস্ব কর ধার্য ও উন্নয়ন, সংক্রান্ত অর্থনৈতিক জ্ঞানেরও অধিকারী। এ ধরণের পরিকল্পনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা থাকা উচিত। (৩৫.২৫.)

১২। শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য প্রচলিত কয়েক প্রকারের কর বৃদ্ধি, নতুন কর আরোপ, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে শিক্ষার জন্য অর্থ পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি শিক্ষা প্রশাসক, কর নির্ধারণ বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। (৩৫.২৬.)

১৩। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে জনসম্পদের পূর্বানুমান অপরিহার্য। তাই জনসম্পদ সম্পর্কে জরীপ, বিস্তারিত অথ্য সংগ্রহ ও সেসব তথ্য বিশ্লেষণের জন্য একটি জনশক্তি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। (৩৫.২৭.)

অধ্যায় ৩৬

পরিশেষ

৩৬.১. আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্র বর্তমানে অসংখ্য জটিল সমস্যায় সমাকীর্ণ। একই সংগে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং সে প্রচেষ্টা বাস্তবানুগ হবে না। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে।

৩৬.২. বর্তমান রিপোর্টে আমরা যে সব বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি সেগুলি হচ্ছেঃ

(ক) শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় মূলনীতি চতুষ্টয়ের সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) সর্বস্তরে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করতে হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়নের পথে যে-সব অসুবিধা রয়েছে সেগুলি জরুরীভিত্তিতে দূরীভূত করতে হবে। সরকারী অর্থানুকূল্যে উচ্চ শিক্ষার বইপুস্তক, বিশেষ করে বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রকৌশল ও বৃত্তি-শিক্ষা বিষয়ের বইপুস্তক প্রণয়ন ও অনুবাদের কাজে অবিলম্বে হাত দিতে হবে।

(গ) প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে সার্বজনীন করতে হবে। ১৯৮০ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক স্তর থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষাকে এবং কৃষি শিক্ষাকে বিশেষ স্থান দিতে হবে এবং তার মান সর্বস্তরে যথাসম্ভব উন্নীত করতে হবে।

(ঙ) মাধ্যমিক স্তরে নবম শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে উচ্চ স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করতে হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাক্রম বাস্তবমুখী করার জন্য এসব শিক্ষায়তন ও সংশ্লিষ্ট কর্মপ্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে গভীর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(চ) সর্বস্তরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন করতে হবে।

(ছ) ১৯৮০ সালের মধ্যে দেশব্যাপী সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং দেশের সমস্ত শিক্ষিত জনের সাহায্যে দেশ থেকে নিরক্ষতার গ্লানি দূর করতে হবে।

(জ) বর্তমান পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির বিশেষ সংস্কার সাধন করতে হবে।

(ঝ) সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে বিরাজমান বর্তমান বৈষম্য যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করতে হবে। পর্যায়ক্রমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করার জন্য ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) শিক্ষা প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করে তাকে আরো ব্যাপক ও সুসংহত করতে হবে।

(ট) শিক্ষার সর্ব স্তরে মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে সুযোগ বা অর্থের অভাবে তাদের প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(ঠ) দেশের যুবশক্তিকে জাতীয় সেবাকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(ড) শিক্ষকতা কাজে যোগ্যতম ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করার জন্য দেশের এ চ করির কাঠামোকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(ঢ) শিক্ষাকে ব্যবয়বহুল সমাজ সেবামূলক কর্ম হিসাবে নয়, 'সম্পদ সৃষ্টির' উপায় হিসাবে গণ্য করতে হবে। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত বর্তমানের শতকরা সাত থেকে অন্ততঃ শতকরা পঁচিশে উন্নীত করতে হবে। এই ব্যয় এখন মোট জাতীয় আয়ের (জি-এন-পি) পাঁচ শতাংশে বর্ধিত করে যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭ শতাংশে উন্নীত করা দরকার।

৩৬.৩. শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা লাভ করেছে। এগার বছরের স্কুল ব্যবস্থা এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুপারিশ আমরা করেছি। এ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হবে আমরা আশা করছি। তখন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবিত কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সার্বিক লক্ষ্যের পথে যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি তবে পাঁচ বছরের পর শিক্ষার মানোন্নয়নের সম্যক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে দশ বছরের স্কুল ব্যবস্থা এবং চার বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

পরিশিষ্ট

শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাব,	..	প-১
অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটিসমূহ	..	প-৫
শিক্ষা কমিশনের অফিসারবৃন্দ	..	প-২৭
শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান	..	প-৩১
জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা	..	প-৩৫
প্রশ্নমালার জবাব বিশ্লেষণ	..	প-৫৭
প্রস্তাবিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠান চার্ট		
প্রস্তাবিত বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তর চার্ট		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-বিষয়ক মন্ত্রক

প্রস্তাব সংখ্যা ৯০০-শিক্ষা, তারিখ ১১ই শ্রাবণ, ১৩৭৯

বিষয়ঃ **শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাব**

১। যেহেতু স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম বাংলাদেশের জন্য এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য নব দিগন্তের দিশারী এক সুমহান বিপ্লব এবং এই বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী জাতি বঙ্গ-বন্ধুর নেতৃত্বে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে ভিত্তি করে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর এবং এই উপলব্ধির আলোকে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে,

যেহেতু নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান অংশ তরুণ ও যুব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ও তাদের সুশিক্ষার উপর দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ নির্ভরশীল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত উন্নয়নের বাহনরূপে গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে,

যেহেতু বাংলাদেশ এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে,

সেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

২। এই উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে নিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন :

পূর্বকালীন সদস্য (পরবর্তীকালে রদবদলসহ)

১। **সভাপতিঃ** ডক্টর মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা।

২। **সহ-সভাপতিঃ** ডক্টর সুরত আলী খান। (১৯৭৩ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত)।

৩। **সদস্য-সম্পাদকঃ** অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। (১৯৭৩ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত)। জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক। (সদস্য-সম্পাদক, ১৯৭৩ সালের ১লা আগষ্ট থেকে। সদস্য, ১৯৭৩ সালের ১৪ই মার্চ থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত।

৪। জনাব এম, ইউ, আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

৫। জনাব মাহ্‌ফুজ মোকাররম হোসেন, অধ্যক্ষ, দিনাজপুর কে, বি, এম, মহাবিদ্যালয় (ভারপ্রাপ্ত সদস্য-সম্পাদক, সদস্য-সম্পাদকের ১৯৭২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হতে ১৯৭৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বিদেশে অবস্থানকালে)।

৬। জনাব মোহাম্মদ নুরুস সাফা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, উচ্চ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। (১৯৭৩ সালের ২০শে জুন থেকে)।

৭। জনাব এম, এ, সাত্তার, প্রাক্তন কারিগরী শিক্ষা পরিচালক, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান। (১৯৭৩ সালের ৮ই নভেম্বর থেকে)।

খন্ডকালীন সদস্য (পরবর্তীকালে রদবদলসহ)।

৮। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯। ডক্টর ফজলে হালিম চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ফলিত রসায়ন শাস্ত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়। (১৯৭৩ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত)।

সচিব, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (১৯৭৩ সালের ২৭শে এপ্রিল থেকে ডক্টর ফজলে হালিম চৌধুরীর স্থলে)

১০। ডক্টর আব্দুল হক, অধ্যক্ষ, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১১। ডক্টর আনিসুজ্জামান, অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১২। ডক্টর স্বদেশ রঞ্জন বসু, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন-অর্থনীতি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

১৩। ডক্টর নুরুল ইসলাম, পরিচালক, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

১৪। ডক্টর এম, শামসুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, কৃষি-অর্থনীতি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫। ডক্টর আ, , জহুরুল হক, অধ্যক্ষ, তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়।

১৬। ডক্টর সিরাজুল হক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আরবী ও ইসলামী চর্চা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়।

১৭। শ্রীমতি বাসন্তী গুহঠাকুরতা, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

১৮। অধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান, অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়।

১৯। ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি।

২০। ডক্টর এ, এম, শরফুদ্দিন, পরিচালক, শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র। (১৯৭৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)।

ডক্টর মুহম্মদ নুরুল হক, পরিচালক, শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র। (১৯৭৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ডক্টর এ, এম, শরফুদ্দিন এর স্থলে)।

২১। ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, অধ্যক্ষ, বাণিজ্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২। শ্রীমতি হেনা দাস, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নারায়নগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়।

২৩। জনাব আশরাফ উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

৩। (ক) এ কমিশন দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করবেন ও শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য তাঁদের সুপারিশ সরকারের নিকট রিপোর্ট আকারে পেশ করবেন।

(খ) এ ছাড়া প্রয়োজনবোধে সরকার শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন জরুরী সমস্যা সম্পর্কে কমিশনকে অন্তর্বর্তীকালীন অভিমত পেশ করতে অনুরোধ করতে পারেন।

৪। (ক) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে সরকার কমিশনকে সাহায্য করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন।

(খ) কমিশন প্রয়োজনমত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কমিশনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবেন।

(গ) শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কমিশন ছাত্রসহ দেশের সর্ব্বস্তরের জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করবেন।

৫। এই কমিশন গঠনের ছয় মাসের মধ্যে কমিশন সরকারের কাছে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করবেন এবং এক বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করবেন।

আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই প্রস্তাব সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হোক।

এ, এস, নূর মোহাম্মদ
সচিব,
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রক

অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটিসমূহ

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন

অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটিসমূহ

১। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

জনাব আশরাফ উদ্দিন খান	..	(সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব এম, ইউ, আহমেদ ..	..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ সিরাজুল হক ..	..	(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আরবী ও ইসলামী চর্চা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক ..	..	(পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ হাফিজুদ্দিন শেখ ..	..	(সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ নুরুন্নাহার ফয়েজুন্নেসা	..	(শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
মিসেস কাজী আনোয়ারা মনসুর	..	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা)
ডঃ কামরুন্নেসা বেগম ..	..	(সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব আব্দুল আউয়াল ..	..	(দপ্তর সচিব, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি)।

২। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

শ্রীমতি হেনা দাস ..	..	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নারায়নগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	..	(সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন	..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক ..	..	(পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
শ্রীমতি বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	..	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনীজা রহমান বালিকা বিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব এম, মুহিয়ুদ্দীন	..	(চেয়ারম্যান, ঢাকা উচ্চ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড)।
ডঃ এ, এইচ, এম, এ, লতিফ	..	(সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব কামরুজামান	..	(সভাপতি, বাংলাদেশ বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং প্রধান শিক্ষক, জুবিলী হাই স্কুল, ঢাকা)।
জনাব মামুন আল-রশীদ	..	(অধ্যক্ষ, শাহীন স্কুল, ঢাকা)
জনাব জয়নাল আবেদীন চৌধুরী	..	(সচিব, বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং প্রধান শিক্ষক নাজনীন হাই স্কুল, ঢাকা)।
জনাব বি, এইচ, চৌধুরী	..	(ওয়ার্ক ক্যাম্প এসোসিয়েশন)।
ডঃ এ, এইচ, এম, করিম	..	(অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ঢাকা)।
জনাব আবদুল মান্নান	..	(প্রধান শিক্ষক, নবকুমার ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা)।
জনাব এম, এ, রহিম	..	(প্রধান শিক্ষক, পৌরসভা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর)।
শ্রী দ্বিজেন শর্মা	..	(অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, নটারডাম কলেজ, ঢাকা)।
ডঃ সফিয়া খাতুন	..	(সহকারী অধ্যাপিকা, সরকারী মহিলা কলেজ, ঢাকা)।
জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	..	(বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ঢাকা)।
জনাব এ,কে, মনজুরুল হক	..	(অবসর প্রাপ্ত সহকারী পরিচালক, জনশিক্ষা)।
শ্রী কে, কে, পাল	..	(অধ্যক্ষ, মদন মোহন কলেজ, সিলেট)।

৩। স্কুল পর্যায়ে পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা

শ্রীমতী বাসন্তী গুহঠাকুরতা	..	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব এম, এ সাত্তার	..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব এম, এ, বারী	..	(অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, চট্টগ্রাম)।
জনাব শাহাবুদ্দিন খান	..	(সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব সৈয়দ শফিকুল হোসেন	..	(অধ্যক্ষ, চারু ও কারু কলা কলেজ, ঢাকা)।
জনাব তাজাম্মুল হোসেন	..	(সভাপতি, ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, ঢাকা)।

শ্রী বারীন মজুমদার . . . . . (অধ্যক্ষ, সংগীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা)।

শ্রী বি, বি, সেন . . . . (অধ্যক্ষ, কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র, মীরপুর, ঢাকা)।

জনাব সফিউদ্দিন সরকার . . (ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, ঢাকা)।

জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরী . . (অধ্যক্ষ, মেরিন ডিজেল ট্রেনিং সেণ্টার, নারায়নগঞ্জ)।

ডঃ মুঃ লুতফর রহমান . . . . (পরিচালক, শিক্ষা কমিশন)।

অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

৪। শিক্ষক-শিক্ষণ

ডঃ এ,এম, শরফুদ্দিন . . . . (পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ও খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)–আহ্বায়ক (৩০–৯–৭৩ তারিখ পর্যন্ত)।

ডঃ মুহাম্মদ নূরুল হক . . . . (পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)–আহ্বায়ক (১-১০–৭৩ তারিখ থেকে)।

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান . . (সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ মোঃ সেলিম . . . . (পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

মিসেস কাজী জাহানারা খান . . (উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র ঢাকা)।

ডঃ বাসারাত আলী . . . . (সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব আবুল হাসেম . . . . (অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, খুলনা)

জনাব মোঃ এলতাস উদ্দিন . . . (অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, রাজশাহী)।

ডঃ এ, এইচ, এম, করিম . . (অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ঢাকা)।

ডঃ শামসুল হক . . . . (সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব শামসুল কবির . . . . (কাউন্সেলার, মহিলা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ময়মনসিংহ)।

জনাব এম, এ, বারী . . . . (অধ্যক্ষ, কারিগরী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ঢাকা)।

জনাব এম, নূরুল ইসলাম . . . . (সিনিয়ার ম্যানেজমেন্ট কাউন্সেলার, ম্যানেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার, ঢাকা)।

৫। উচ্চতর শিক্ষা (সাধারণ) ও গবেষণা।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ..	(অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক
জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা ..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—যুগ্ম-আহ্বায়ক
জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন ..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ মযহারুল ইসলাম	(মহা পরিচালক, বাংলা একাডেমী এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব আবু সুফিয়ান	(অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ আবদুল হক	(জাতীয় সংসদ সদস্য, এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ আনিসুজ্জামান	(অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ সিরাজুল হক	(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আরবী ও ইসলামী চর্চা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব সৈয়দ আলী আহসান ..	(উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব আজহার হোসেন	(সহকারী পরিচালক, জনশিক্ষা)।
মিসেস হামিদা খানম	(অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা)।
ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ ..	(অধ্যক্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ সালাউদ্দিন আহমেদ ..	(অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া .	(অধ্যক্ষ, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব মোহাম্মদ আলী .. .	(অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ মোহতেশাম হোসেন .. .	(অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ..	(সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ঃ আজিজুল হক	(অধ্যক্ষ, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এ, লতিফ	(অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব আব্দুল হালিম	(বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি)।

৫(ক) মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান

ডঃ মুযহারুল ইসলাম	(মহা-পরিচালক, বাংলা একাডেমী এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক	(অধ্যক্ষ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক	(সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন)।
ডঃ সালাউদ্দিন আহমেদ	(অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	(অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব মোহাম্মদ আলী	(অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ সৈয়দ আবদুল কাদির	(অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়), ময়মনসিংহ)।
ডঃ এ, কে, নাজমুল করিম	(অধ্যক্ষ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	(সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৬। প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা

ডঃ অ, মু, জহুরুল হক	(অধ্যক্ষ, তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব এম, এ, সাত্তার	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—যুগ্ম-আহ্বায়ক।
জনাব আবদুর রশীদ	(চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা)।
ডঃ এস, এইচ, কে, ইউসুফজাই	(অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।
ডঃ ইকবাল মাহমুদ	(সহযোগী অধ্যাপক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।
জনাব এম, এফ, এ সিদ্দিকী	(সাধারণ সম্পাদক, ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ, ঢাকা)।
ডঃ আলিমুল্লাহ খান	(উপদেষ্টা প্রকৌশলী, ঢাকা)।
ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ	(কারিগরি শিক্ষা পরিচালক, ঢাকা)।

জনাব সৈয়দ নূরুর রহিম ..	.. (প্রধান, যোগাযোগ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন)।
জনাব এম, এম, গোলাম ফিবরিয়া	.... (প্রধান প্রকৌশলী, আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল সংস্থা)।
ডঃ শাহান শাহ উদ্দীন চৌধুরী	.. (ডীন, প্রকৌশল বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব এম, এ, বারী ..	.. (অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ; চট্টগ্রাম)।
জনাব আব্দুল করিম ভূইয়া	.. (প্রজেক্ট ডিরেক্টার, কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)
জনাব আবদুল লতীফ ..	.. (কারিগরী স্কুল পরিদর্শক, কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)।
জনাব আফসার উদ্দিন আহমেদ	.. (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)।
জনাব তাজাম্মুল হোসেন ..	.. (সভাপতি, ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ)।

৭। **বিজ্ঞান শিক্ষা**

অধ্যাপক শাহ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ..	(অধ্যাপক, ফলিত পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়)—আহ্বায়ক।
ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ..	(সভাপতি, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ এস, এ, খান	(সহ-সভাপতি, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ...	(সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ আহমদ শামসুল ইসলাম ..	(অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এ, করিম	(প্রাক্তন ডীন, কৃষি বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ রশিদুল হক	(অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ কে, আহমদ	(অধ্যক্ষ, জৈব রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এম, আমিনুল ইসলাম	(অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ আবু ওবায়দুল হক	(আই, এ, এস, টি, টি, ঢাকা)।
জনাব মোহাম্মদ জাফর আলী ..	(সহকারী প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা)।
ডঃ এ, এম, শরফুদ্দিন	(প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ঢাকা)।

জনাব হায়দর আলী মিয়া	(লালমনির হাট মিশন হাউজ, রংপুর)।
ডঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ	(অধ্যক্ষ, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এস, জেড, হায়দার	(অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৮। কৃষি শিক্ষা

ডঃ শামসুল ইষসলাম ..	(বিভাগীয় প্রধান, পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব এম, এ, সাত্তার	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ এস, ডি, চৌধুরী ..	(উপদেষ্টা, পরিকল্পনা কমিশন)।
ডঃ কাজী ফজলুর রহিম ..	(প্রাক্তন উপাচার্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ এম, ইসহাক ..	(নির্বাহী পরিচালক, ফলোন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।)
ডঃ এ, করিম ..	(প্রাক্তন ডীন, কৃষি বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এম, ইউ, আহমেদ চৌধুরী	(ডীন, পশু চিকিৎসা বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ এ, কে, এম, আমিনুল হক	(ডীন, মৎস্য বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ এ, এফ, এম, সিরাজুল ইসলাম	(প্রাক্তন ডীন, কৃষি—সম্প্রসারণ বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ আকবর হোসেন ..	(অধ্যাপক, উদ্যান বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ আনোয়ারুজ্জামান খান	(অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, আই, আর, ডি, পি, ঢাকা)।
ডঃ মোশাররাফ হোসেন ..	(অধ্যক্ষ, কৃষি কলেজ, ঢাকা)।
জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ	(বিশেষজ্ঞ-কৃষি শিক্ষা, বাংলাদেশ শিক্ষা—সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ঢাকা)।
ডঃ শাহান শাহ উদ্দীন চৌধুরী	(ডীন, প্রকৌশল বিভাগ, কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ শেখ গোলাম মাহবুব	(সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, কৃষি—সম্প্রসারণ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।
ডঃ আবদুল লতিফ মিয়া ..	(ডীন, কৃষি অনুষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।

৯। মেডিক্যাল এবং প্যারা মেডিক্যাল শিক্ষা

ডঃ নূরুল ইসলাম ..	.. (পরিচালক, পি, জি, এম, ইনষ্টিটিউট, ঢাকা এবং খণ্ড-কালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক
জনাব এম, ইউ আহমেদ	.. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম ..	.. (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)।
ডাঃ কে, এ, মনসুর	.. (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, মহাখালী মেডিক্যাল কমপ্লেক্স, ঢাকা)।
ডাঃ এ, কে, খান ..	.. (পরিচালক, যক্ষারোগ হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা)।
ডাঃ এম, এইচ, চৌধুরী ..	.. (অধ্যাপক, সার্জারী, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী)।
ডাঃ কামালউদ্দিন আহাম্মদ	.. (অধ্যাপক, পি, জি, এম, ইনষ্টিটিউট, ঢাকা)।
ডাঃ আবুল কাশেম ..	.. (অধ্যাপক, এনাটমি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)।
ডাঃ আকরাম হোসেন ..	.. (অধ্যাপক, সার্জারী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)।
ডাঃ হাবিবুজ্জামান ..	.. (পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা প্রশিক্ষণ গবেষণা)।
ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী	.. (সহযোগী অধ্যাপক, সাইকিয়াট্রি, পি, জি, এম, ইনষ্টিটিউট, ঢাকা)।
ডাঃ এম, এ, সোবহান ..	.. (অধ্যাপক রেডিওলজি, পি, জি, এম, ইনষ্টিটিউট, ঢাকা)।
ডাঃ এম, আর, চৌধুরী ..	.. (অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)।
ডাঃ এম, এ, কাদ্‌রী ..	.. (সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতি এবং অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)।

১০। বাণিজ্যিক শিক্ষা

ডাঃ এম, হাবিউল্লাহ ..	.. (অধ্যক্ষ, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহবায়ক।
জনাব এম, এ, সাত্তার ..	.. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডাঃ আবদুল হক ..	.. (জাতীয় সংসদ সদস্য এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব আলী এমদাদ খান ..	.. (চেয়ারম্যান, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডাঃ আজগর আলী তালুকদার .. (ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী .. (অধ্যক্ষ, সরকারী বাণিজ্য কলেজ, চট্টগ্রাম)।

জনাব এ, এ, এম, বাকের .. (ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডাঃ এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান .. (সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব মওদুদুর রহমান .. .. (অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব বিজিনেস এড্‌মিনিষ্ট্রেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব আবুল বশার .. .. (অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা)।

জনাব এম, শফিউল্লাহ .. .. (পরিচালক, ইনষ্টিটিউট অব বিজিনেস এড্‌মিনিষ্ট্রেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব আমিনুল ইসলাম .. .. (অধ্যক্ষ, কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা)।

জনাব নূর মোহাম্মদ হাওলাদার .. (সরকারী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা)।

জনাব রহিম বক্স তালুকদার .. (সহযোগী অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব বিজিনেস এড্‌মিনিষ্ট্রেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

১১। আইন শিক্ষা

ডঃ আবদুল হক .. .. (জাতীয় সংসদ সদস্য এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহবায়ক।

জনাব মোহাম্মদ নুরুস সাফা .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

বিচারপতি, এফ, কে, এম, এ, মুনীম .. (সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ, ঢাকা)।

ডঃ লুৎফল কবীর .. .. (ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ আলীম আল রাজী .. .. (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিটি 'ল' কলেজ, ঢাকা)।

জনাব এইচ, আর, শেলী বার-এট, ল .. (এড্‌ভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা)।

ডঃ জহরুল ইসলাম চৌধুরী .. (ডীন, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব কে, এ, এ, কামরুদ্দিন .. (এড্‌ভোকেট, ঢাকা এবং পরিচালক বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব 'ল' এণ্ড ইণ্টারনেশনাল এফেয়ার্স)।

মিসেস কামরুন্নাহার লাইলী .. (এড্‌ভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা)।

জনাব এ, এইচ, এম, আবদুল কাদের .. (অধ্যক্ষ, সেণ্ট্রাল 'ল' কলেজ, ঢাকা)।

জনাব শফিক আহমেদ (অধ্যক্ষ, সাট 'ল' কলেজ, ঢাকা)।

জনাব কামরুদ্দিন আহমেদ (এড্‌ভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা এবং সিনিয়ার পার্টনার, অভিগনাম এণ্ড কোং মতিঝিল, ঢাকা)।

অধ্যক্ষ, যশোর 'ল' কলেজ।
ডীন, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব আতাউল হক (এড্‌ভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা এবং সভাপতি' ঢাকা জেলা আইনজীবি সংস্থা)।

জনাব আসাদুজ্জামান খান .. (জাতীয় সংসদ সদস্য এবং এড্‌ভোকেট, ঢাকা)।

জনাব মোহাম্মদ সোহরাব আলী, বার-এট-ল (এড্‌ভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা)

১২। ললিত কলা শিক্ষা

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ... (সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)—আহবায়ক (৩১ জুলাই, ১৯৭০ পর্যন্ত)।

জনাব মাহ্‌মুদ মোকার্‌রম হোসেন (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহবায়ক (১লা আগষ্ট, ১৯৭০ থেকে)।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

শ্রী বারীন মজুমদার .. (অধ্যক্ষ, সংগীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা)।

জনাব সৈয়দ শফিকুল হোসেন (অধ্যক্ষ, চারু ও কারুকলা কলেজ, ঢাকা)।

মিসেস সনজিদা খাতুন (সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বি,শ্ব বিদ্যালয়)।

জনাব মীর আবু সালেক .. (পরিচালক, শিক্ষা কমিশন)।

১৩। পরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং ছাত্র নির্দেশনা

জনাব এম, ইউ, আহমেদ .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহবায়ক।

জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ মুহাম্মদ নুরুল হক .. .. (পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ মোমতাজ উদ্দীন চৌধুরী .. (জনশিক্ষা পরিচালক)।

ডঃ মোহাম্মদ রওশন আলী .. (সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ মুসলিম হুদা .. .. (অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব এম, মাসুদ খান	(পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ বাশারত আলী	(সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ মযহারুল হক	(সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ সৈয়দ আবদুস সালাম	(সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব এম, এন, ইসলাম	(অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, কুমিল্লা)।
ডঃ মুঃ খোরশেদ আলী	(পরিচালক, ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এ, এম, শরফুদ্দিন	(প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র)।
ডঃ আবদুল হক	(অবসর প্রাপ্ত চেয়ারম্যান, উচচ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর)।
জনাব সুরুজুদ্দিন আহাম্মদ	(পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উচচ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড, ঢাকা)।

১৪। শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও চাকুরী শর্ত

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ..	(অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব মোহাম্মদ নুরুস সাফা ..	(পূর্ণ কালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—যুগ্ম-আহ্বায়ক।
জনাব আবু সুফিয়ান	(অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ, এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব আশরাফ আলী খান ..	(সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব সৈয়দ আলী আহসান ..	(উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ অজয় রায়	(সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব কামরুজ্জামান	(সভাপতি, বাংলাদেশ বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং প্রধান শিক্ষক, জুবিলী হাই স্কুল, ঢাকা)।
ডঃ জিল্লুর রহিম	(অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এ, এইচ, এম, করিম ..	(অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ঢাকা)।
জনাব আবদুল হালিম	(বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি)।

জনাব এম, আই, চৌধুরী .. .. (সহকারী পরিচালক, জনশিক্ষা)।

জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল .. (দপ্তর সচিব, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি)।

১৫। গণসাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষা

জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী .. .. (শিক্ষা সচিব, বাংলাদেশ সরকার এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান .. (সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব মাহবুব আলম চাষী .. (সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)।

ডঃ মুহম্মাদ হাফিজুদ্দিন শেখ .. (সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব আবদুল কুদ্দুস .. .. (অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক, বয়স্ক-শিক্ষা, জনশিক্ষা)।

ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ .. (অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ)।

জনাব শাহেদ লতীফ .. .. (উপ-সচিব, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়)।

জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ .. (পরিচালক, গণশিক্ষা প্রকল্প, সমবায়, বাংলাদেশ ও সদস্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন)।

জনাব আবুল কালাম আজাদ .. (সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি)।

ডঃ আহমদুল্লাহ মিয়া .. .. (অধ্যক্ষ, সমাজকল্যাণ কলেজ, ঢাকা)।

শ্রী মনোমোহন বর্মন .. .. (ভাইস প্রিন্সিপাল, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ঢাকা)।

ব্রাদার জারলেথ ডি, সুজা .. (প্রধান শিক্ষক, সেন্ট প্লাসিডস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম)।

১৬। নারী শিক্ষা

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম .. .. (অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)—আহ্বায়ক।

মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতা .. (প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা ও খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

বেগম আজিজুন্নেসা .. .. (যুগ্ম-পরিচালক, জনশিক্ষা)।

বেগম সুফিয়া কামাল .. .. (প্রখ্যাত কবি)।

বেগম সাজেদা চৌধুরী .. .. (জাতীয় সংসদ সদস্য)।

মিসেস খোদেজা খাতুন .. .. (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)।

মিসেস হামিদা খানম .. .. (অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়)।

বেগজাদী মাহমুদা নাসির .. (অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল মহিলা কলেজ, ঢাকা)।

মিসেস হাসিনা খানম .. .. (বিদ্যালয় পরিদর্শিকা, ঢাকা বিভাগ)।

মিসেস কাজী জাহানারা খান .. (উপ-পরিচালক, শিক্ষা—সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ঢাকা)।

মিসেস লুৎফুন্নেসা হক .. .. (সহকারী পরিচালক, শরীর চর্চা শিক্ষা, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)।

১৭। বিশেষ শিক্ষা (শারীরিক, মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য এবং বিশেষ মেধাবীদের জন্য)

শ্রীমতি বাসন্তী গুহঠাকুরতা .. (প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।

জনাব এম, ইউ, আহমেদ .. (পূর্বকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব মুহাম্মদ বাকিয়াতুল্লাহ .. (অধ্যক্ষ, সারদাহ ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী)।

কাজী আজিজুর রহমান .. .. (অধ্যক্ষ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা)।

জনাব খান মুঃ সালেক .. .. (অধ্যক্ষ, ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

অধ্যক্ষ, অন্ধ, মূক ও বধির বিদ্যালয়, ঢাকা

১৮। স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা শিক্ষা

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী .. .. (সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষাকমিশন)—আহ্বায়ক (৩১-৭-৭৩ তারিখ পর্যন্ত)।

জনাব এম, ইউ, আহমেদ .. (পূর্বকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক (১-৮-৭৩ তারিখ থেকে)।

ডঃ কে, এ, মনসুর .. .. (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, মহাখালী মেডিক্যাল কমপ্লেক্স, ঢাকা)।

ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী .. (চিকিৎসক, ঢাকা)।

জনাব কাজী আবদুল আলীম .. (পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।)

জনাব মঃ বঃ খান মজলিস .. (পরিচালক, ফিজিক্যাল এডুকেশন, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)।

জনাব আফসার উদ্দীন আহম্মদ . (প্রধান শিক্ষক, জাহাঙ্গীর নগর ল্যাবরেটরী স্কুল)।

মিসেস লুৎফুন্নেছা হক .. .. (সহকারী পরিচালিকা, শরীর চর্চা শিক্ষা, জনশিক্ষা)।

জনাব এ, কে, শামসুল করিম .. (পরিচালক, শিক্ষা কমিশন)।

১৯। সামরিক শিক্ষা

জনাব এম, ইউ. আহমেদ . . . (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।

অধ্যাপক, কবীর চৌধুরী . . . (শিক্ষা সচিব, বাংলাদেশ সরকার এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব এম, মহিয়ুদ্দীন . . (চেয়ারম্যান, ঢাকা উচ্চ–মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড)।

জনাব ম,ব, খান মজলিস .. (অধ্যক্ষ, শরীর চর্চা কলেজ, ঢাকা।)।

স্কোয়াড্রন লীডার এ, কে, এম, বদিউর রহমান (অধ্যক্ষ, মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ)।

মেজর-জেনারেল জিয়াবুর রহমান অথবা তাঁর প্রতিনিধি।

২০। শিক্ষাঙ্গণ ও শিক্ষার উপকরণ

ডঃ আ, ম, জহুরুল হক .. .. (অধ্যক্ষ, তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।

জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা . (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—যুগ্ম আহ্বায়ক।

ডঃ এম, ইন্নাস আলী .. (সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সভাপতি, বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন)।

জনাব শাহ ফজলুর রহমান .. (অধ্যাপক, ফলিত পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ কে, এম, সিরাজুল ইসলাম .. (অধ্যক্ষ, সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া)।

জনাব মুস্তাফা মনোয়ার .. .. (বাংলাদেশ টেলিভিশন)।

ডঃ ওবায়েদর রহমান .. .. (সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ মোঃ বজলুল হক .. .. (পরিচালক, উপকরণ উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা)।

ডঃ এম, এ, রফিক .. .. (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব সৈয়দ আহমদ .. .. (সভাপতি, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা)।

জনাব এ, এইচ, চৌধুরী .. (অডিওভিস্যুয়াল অফিসার, ঢাকা)।

ডঃ এ, করিম .. .. (প্রাক্তন ডীন, কৃষি বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।

ডঃ আবদুর রহমান .. .. (সহযোগী অধ্যাপক, পি, জি, এম, ইনষ্টিটিউট, ঢাকা)।

জনাব মযহারুল ইসলাম .. .. (স্থপতি, ঢাকা)।

জনাব এম, এ, জহিরুদ্দিন .. (অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, বাংলাদেশ)।

ডঃ এস, এইচ, কে, ইউসুফজাই .. (অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।

ডঃ এম, সেলিম .. .. (পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব এম, এ, রশীদ .. .. (প্রকৌশল উপদেষ্টা, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা)।

ডঃ এ, কে, এম, আমিনুল হক .. (ডীন, মৎস্য বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ)।

জনাব খান মোহাম্মদ সালেক .. (অধ্যক্ষ, ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ শামসুল আলম .. .. (অধ্যাপক, যন্ত্র কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।

ডঃ আবদুল জব্বার মিয়া .. .. (সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়)।

২১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।

জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব এম, ইউ, আহমেদ .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব এম, এম, খান .. .. (অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জনাব আহমেদ হোসেন .. .. (প্রাক্তন পরিচালক, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা)।

জনাব শামসুল হক .. .. (গ্রন্থাগারিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।

জনাব এ রাজজাক .. .. (গ্রন্থাগারিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ কে, এম, করিম .. .. (পরিচালক, আরকাইভস এণ্ড লাইব্রেরী পরিদপ্তর

ডঃ নাজিমুদ্দিন .. .. (পরিচালক, আরকিওলজি এণ্ড মিউজিয়াম পরিদপ্তর)

ডঃ নূরুল আলম .. .. (রেজিস্ট্রার, কপিরাইটস্, বাংলাদেশ)।

পরিচালক, মিউজিয়াম অব সাইন্স এণ্ড টেক-নোলজি।

২২। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান

ডঃ মযহারুল হক .. .. (সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)—আহ্বায়ক।

জনাব মোহাম্মদ নূরুল সাফা .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

মিসেস বাসন্তী গুহঠাকুরতা .. (প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক .. .. (পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ এ, কে, এম, সিদ্দিক .. (অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

জনাব কিউ, এন, হক .. .. (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা)।

জনাব এ, এইচ, চৌধুরী .. (উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)।

ডাঃ বদরুদ্দোজা .. .. (চিকিৎসক, ঢাকা)।

ডঃ মোস্তফা নূরুল ইসলাম .. (অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)

জনাব এম, নূরুজ্জামান .. .. (অধ্যক্ষ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা)।

জনাব শামসুল হুদা, ... (অধ্যক্ষ, তোলারাম কলেজ, নারায়নগঞ্জ)।

জনাব হাফিজুদ্দিন আহমদ .. (প্রধান শিক্ষক, সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা)।

২৩। ছাত্র কল্যাণ।

ডঃ আনিসুজ্জামান .. .. (অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)-আহ্বায়ক।

জনাব এম, ইউ, আহমদ .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব মোহাম্মদ নূরুল সাফা .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

অধ্যাপক আবদুর রাজজাক	(অধ্যক্ষ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডাঃ মযহারুল ইসলাম . . .	(মহা পরিচালক, বাংলা একাডেমী এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
ডঃ আবদুল হক . .	(জাতীয় সংসদ সদস্য এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা-কমিশন)।
শ্রীমতি বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
শ্রীমতি হেনা দাস . .	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নারায়নগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

২৪। শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান।

ডঃ এস, এ, খান	(সহসভাপতি শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক (৩১-৫-১৯৭৩ তারিখ পর্যন্ত।
জনাব মোহাম্মদ নকুস সাফা . .	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক (১-৬-৭৩ তারিখ থেকে)।
জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন . .	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
অধ্যাপক আবদুর রাজজাক . .	(অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
শ্রীমতি বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা . .	(প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয় এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব এস, এ, আর, মতিন উদ্দিন . .	(প্রাক্তন পরিচালক, জনশিক্ষা, বাংলাদেশ)।
পরিচালক, জনশিক্ষা বাংলাদেশ।	
জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	(অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ মোঃ সেলিম	(পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব সৈয়দ আহমদ	(চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা)।
মিস উম্মে আয়েশা খাতুন চৌধুরী	(বিদ্যালয় পরিদর্শিকা, রাজশাহী বিভাগ)।
জনাব এম, খলিলুর রহমান	(রেজিষ্ট্রারার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।
জনাব আবদুল মান্নান . .	(প্রধান শিক্ষক, নবকুমার ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা)।
জনাব মুহাম্মদ ইরশাদুল্লাহ	(অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জগন্নাথ কলেজ)।
জনাব মোহাম্মদ হোসেন	(অধ্যক্ষ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা)।

২৫। শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান ও জনশক্তি।

ডঃ স্বদেশ রঞ্জন বসু .. .. (গবেষণা পরিচালক, উন্নয়ন অর্থনীতি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।

জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)-যুগ্ম-আহ্বায়ক।

ডঃ এস; এ, খান .. .. (সহ-সভাপতি শিক্ষা কমিশন)।

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান .. (সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ এম, হাবিবুল্লাহ ... ... (অধ্যক্ষ, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

জনাব আবু সুফিয়ান .. .. (অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ এবং খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

ডঃ এ, আর, খান .. .. (বিভাগীয় প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন)।

শিক্ষা বিভাগ প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।

জনাব মোস্তফা আবদুল হাই আল আজাদ (সহ-প্রধান শিক্ষা, বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন)।

জনাব এ, এইচ, এম, বিশ্বাস .. (উপ-প্রধান শিক্ষা, বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন)।

জনাব আবদুর রশীদ .. .. (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

জনাব এ, এইচ, চৌধুরী .. .. (উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)।

জনাব শফিকুর রহমান .. .. (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)।

২৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি।

জনাব মাহ্‌মুদ মোকার্‌রম হোসেন .. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)-আহ্বায়ক।

ডঃ মোহাম্মদ সেলিম .. .. (পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডঃ শামসুল হক .. .. (সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

প্রধান শিক্ষক, ওয়েষ্ট এণ্ড হাইস্কুল, ঢাকা।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব মোহাম্মদ নোমান ... (সহকারী পরিচালক, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা)।

২৭। ধর্ম শিক্ষা (ইসলামীয়াত) কমিটি।

জনাব মোহাম্মদ নূরুল আফা	..	(পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	..	(সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।
মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	..	
ডঃ মুঃ এনামুল হক	..	
অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-এ-আলীয়া, ঢাকা।	..	
ডঃ মোহাম্মদ ইসহাক	..	(অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ডঃ এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ	..	(অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
মাওলানা আলাউদ্দিন আল আজহারী	..	(মাদ্রাসা-আলীয়া, ঢাকা)।
জনাব মতিউর রহমান নিজামী	..	(সুপারিনটেনডেণ্ট, দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম)।

২৮। খৃষ্ট ধর্ম শিক্ষা কমিটি।

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	..	(সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
ব্রাদার জারলেথ ডি সুজা	..	(প্রধান শিক্ষক, সেণ্ট গ্রাসিভস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম)।
সিষ্টার মেরিয়ান টিরিজা	..	(হলিক্রস কলেজ, তেজগাঁও)।
ব্রাদার টমাস মোর	..	(প্রধান শিক্ষক, সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, ঢাকা)।
রেভারেণ্ড বি, ডি, মণ্ডল	..	(৪, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, ঢাকা)।
রেভারেণ্ড রাগেন বাড়ৈ	..	(ব্যাপটিষ্ট মিশন, ঢাকা)।

২৯। হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা কমিটি।

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	..	(সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)—আহ্বায়ক।
শ্রী বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো	..	(সদস্য- সচিব, বৌদ্ধ সংঘ, কমলাপুর, ঢাকা)।
মিঃ পি, আর, বড়ুয়া	..	(অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সরকারী কলেজ)।
শ্রী নিরঞ্জন কাব্যতীর্থ	..	(অধ্যক্ষ, বাকাই সংস্কৃত কলেজ, বরিশাল)।
শ্রী মাধব ভট্টচার্য্য	..	(অধ্যক্ষ, শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ, সিলেট)।

৩০। চারু ও কারুকলা সিলেবাস কমিটি।

জনাব কামরুল হাসান ..	.. (ডিজাইন সেন্টার, বিসিক)—আহ্বায়ক।
জনাব মামুন আল রশীদ ..	.. (অধ্যক্ষ, শাহীন স্কুল, ঢাকা)।
জনাব সৈয়দ শফিকুল হোসেন	.. (অধ্যক্ষ, চারু ও কারুকলা কলেজ, ঢাকা)।
জনাব আবদুল্লাহ খালেদ	.. (ডিজাইন সেন্টার, বিসিক)।
জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস ..	.. (ডিজাইন সেন্টার, বিসিক)।
জনাব আমিনুল ইসলাম	.. (চারু ও কারুকলা কলেজ, ঢাকা)।
জনাব মীর মোস্তফা আলী	.. (চারু ও কারুকলা কলেজ, ঢাকা)।
জনাব আমিনুল ইসলাম	.. (রুরাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভিস, বিসিক)।
জনাবা রওশন আরা আমিন	.. (ডিজাইন সেন্টার, বিসিক)।
জনাব কাজি তাহের উদ্দিন আহমদ	.. (ডিজাইন সেন্টার, বিসিক)।

রিপোর্ট সমন্বয় ও সম্পাদনা কমিটি।

জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	.. (সদস্য-সম্পাদক, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	.. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।
জনাব মাহমুদ মোকাররম হোসেন	.. (পূর্ণকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন))।
ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক ..	(পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা-সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ঢাকা ও খণ্ডকালীন সদস্য, শিক্ষা কমিশন)।

শিক্ষা কমিশনের অফিসারবৃন্দ

শিক্ষা কমিশনের অফিসারবৃন্দ।

পরিচালক।

১। জনাব মীর আবু সালেক, পরিচালক (প্রশাসন)। (১৯৭২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে)।

২। জনাব এ, কে, শামসুল করিম, পরিচালক (গবেষণা)। (১৯৭২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে)।

৩। ডক্টর মুহম্মদ নূরুল হক, পরিচালক (গবেষণা)। (১৯৭২ সালের ৬ ই নভেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের ১০ই জুলাই পর্যন্ত)।

৪। ডক্টর মুহাম্মদ লুতফর রাহমান, পরিচালক (গবেষণা)। (পরিচালক ১৯৭৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী থেকে এবং সহকারী পরিচালক ১৯৭৩ সালের ৮ই জানুয়ারী থেকে ১৯৭৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত)।

সহকারী পরিচালক।

১। জনাব ওবায়েদুল হক .. (১৯৭২ সালের ২৩শে আগষ্ট থেকে)।

২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন .. (১৯৭৩ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে)।

৩। জনাব শেখ মোহাম্মদ দামান আলা .. (১৯৭৪ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারী থেকে)।

৪। মিসেস রওশান আরা রহমান .. (১৯৭৪ সালের ১৩ই এপ্রিল থেকে)।

৫। জনাব মোহাম্মদ মাসুম .. (১৯৭৩ সালের ২০শে জুন থেকে ১৯৭৩ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত)।

হিসাব-রক্ষণ অফিসার—জনাব এম, এ, আহাদ। (১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে)।

শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

(ক) প্রাথমিক স্তরের শ্রেণী-ওয়ারী শিক্ষার্থী সংখ্যা (প্রক্ষেপিত)

(প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী)। (লক্ষের হিসাবে)

সন	৫+থেকে৯+ বয়সের জনসংখ্যা।	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা।	১ম শ্রেণী।	২য় শ্রেণী।	৩য় শ্রেণী।	৪র্থ শ্রেণী।	৫ম শ্রেণী।
১৯৭৪ ..	১১৮.০	৭২.০	২৫.১	১৫.৮	১৩.০	১০.১	৭.৭
১৯৭৫ ..	১২১.০	৭৭.০	২৭.০	১৬.৮	১৪.১	১০.৭	৮.০
১৯৭৬ ..	১২৩.৯	৮২.৭০	২৮.০	২০.৭	১৪.৬	১১.১	৮.৩
১৯৭৭ ..	১২৭.০	৯১.২৫	২৮.৭	২৬.৮৫	১৫.৬	১১.৫	৮.৬
১৯৭৮ ..	১৩০.০	১০৩.৬	২৯.০	২৭.৫০	২৫.৮	১২.০	৮.৯
১৯৭৯ ..	১৩৩.৫	১১৯.০	৩০.২	২৮.২০	২৬.২	২৫.২	৯.২
১৯৮০ ..	১৩৭.৬	১৩৭.৬	৩১.০	২৯.০	২৭.০	২৬.০	২৪.৬

(খ) প্রাথমিক স্তরের শ্রেণী-ওয়ারী শিক্ষার্থী সংখ্যা (প্রক্ষেপিত)

(ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী)। (লক্ষের হিসাবে)।

সন।	১০+থেকে ১২+বয়সের জনসংখ্যা।	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা।	ষষ্ঠ শ্রেণী।	সপ্তম শ্রেণী।	অষ্টম শ্রেণী।
১৯৭৪ ..	৬০.০০	১২.৫	৫.৪	৪.৩	২.৮
১৯৭৫ ..	৬১.৪০	১৪.০	৬.০	৪.৮	৩.২
১৯৭৬ ..	৬২.৮০	১৬.৫	৭.০	৫.৫	৪.০
১৯৭৭ ..	৬৪.৩০	২০.১	৮.২	৬.৭	৫.২
১৯৭৮ ..	৬৫.৮০	২২.৫	৯.০	৭.৫	৬.০
১৯৭৯ ..	৬৭.৩০	২.৫	১০.০	৮.৫	৭.০
১৯৮০ ..	৬৯.০০	২৮.৫	১১.০	৯.৫	৮.০
১৯৮১ ..	৭০.৭০	৪৩.৫	২৪.০	১০.৫	৯.০
১৯৮২ ..	৭২.৫০	৫৮.৮	২৫.৪	২৩.৪	১০.০
১৯৮৩ ..	৭৪.৩০	৭৪.৩	২৬.৪	২৫.১	২২.৮

(গ) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

		১৯৭২			১৯৭৪ (আনুমানিক)		
		প্রতিষ্ঠান সংখ্যা।	শিক্ষক সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা।	শিক্ষক সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।
১	প্রাথমিক স্তর (১ম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ..	৩০,৯৬০	১,২৯,০০০	৬২,০০,০০০	৩৮,০০০	১,৫৪,০০০	৭২,০০,০০০
২	মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী) ..	৬,৬৫০	৬০,০০০	১৬,৫০,০০০	৮,০০০ (২,৫০০ জুনিয়ার হাই স্কুলসহ)	৮২,০০০	১৮,৫৯,০০০
৩	কলেজ স্তর (উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর ও ডিগ্রী স্তর)	৪৫০	৮,২০০	৩,৮৬,০০০	৫১০	১০,০০০	৫,০০,০০০
৪	বিশ্ববিদ্যালয় :						
	(ক) সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ..	৪	৯৩৮	১৯,২৩৭	৪	১,২০০	২৫,৫০০
	(খ) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ..	১	১৯৭	১,৯০০	১	২০০	২,১০০
	(গ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ..	১	২৬৮	২,৪৯৫	১	২৭০	২,৮০০
৫	ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ..	২	৯৫	১,২২০	৩	১২০	১,৫০০
৬	পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট	১৫	৮২৭	৯,৬০০	১৬	১,১১০	১১,১০০

জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন

জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা

প্রশ্নোত্তরের নিয়ম ঃ

■ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নমালা রচিত হয়েছে। এর অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা প্রস্তাবের জন্য একাধিক সম্ভাব্য উত্তর দেয়া আছে। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য আপনার মনঃপূত বা সমর্থনযোগ্য একটিমাত্র উত্তর নির্বাচন করে উত্তরসূচক ক্রমিক নম্বরের বাম পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন। মনে রাখবেন কোন প্রশ্নের বা প্রস্তাবের জন্য একাধিক উত্তর কখনও চিহ্নিত করবেন না।

উদাহরণস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত নমুনাটি লক্ষ্য করুন। প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'আপনি কি মনে করেন যে, পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পড়াতে হবে?' আপনি যদি মনে করেন যে, তা করা উচিৎ, তা হলে 'হাঁ।" এই উত্তরটির বাম পাশে (√) চিহ্ন বসান। এখন আপনার উত্তরের নমুনা হল নিম্নরূপ:

নমুনাঃ

আপনি কি মনে করেন যে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পড়াতে হবে?

√১. হাঁ।
২. না।
৩. ভিন্নমত।

যে সকল প্রস্তাব বা প্রস্তাবের উত্তরগুলিতে 'ভিন্নমত' এই উক্তিটি সংযোজিত আছে সেখানে প্রদত্ত উত্তরের কোনটিই যদি আপনার মনঃপূত না হয়, তাহলে 'ভিন্নমত' এই উক্তিটির বামপাশে '√' চিহ্ন দিন এবং অনুগ্রহ করে আপনার নিজস্ব মতামত লিখে দিন।

মনে করুন উপরের উদাহরণের 'হাঁ' বা 'না' উত্তরের কোনটাই আপনার মনঃপূত নয়। আপনার মতে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিজ্ঞান ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ান উচিৎ। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিতরূপে আপনার উত্তর প্রদান করুন।

নমুনাঃ

আপনি কি মনে করেন যে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পড়াতে হবে?

১. হাঁ।
২. না।
√৩. ভিন্নমত—পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিজ্ঞান ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ান উচিত।

এই প্রশ্নমালার অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে আপনি যদি আলোকপাত করতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে সেই সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান পৃথক কাগজে লিখে প্রশ্নমালার সঙ্গে সংযোজিত করবেন। এই প্রশ্নমালা পাবার দশ দিনের মধ্যে এই সঙ্গে প্রেরিত খামে উত্তর প্রেরণ করলে বাধিত হব।

প্রশ্নোত্তর প্রেরণের ঠিকানা:

সদস্য-সচিব, শিক্ষা কমিশন,
১০, গ্রীন রোড,
ঢাকা-৫।

১। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনীন ও গণমুখী করতে হলে মূলতঃ প্রয়োজন :

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

৩. সর্বাগ্রে প্রাথমিক ও পরে পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

৪. কোন উচ্চস্তরের শিক্ষাকেই রাষ্ট্রায়ত্ত না করা।

৫. সমস্ত স্তরের শিক্ষাকেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা।

৬. ভিন্নমত।

২। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে নিকট ভবিষ্যতে একটি শিক্ষিত সমাজ হিসাবে গড়তে হলে অবিলম্বে উচিত—

১. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

২. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা।

৩. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

৪. দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা।

৫. দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

৬. সমস্ত স্তরের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা।

৭. ভিন্নমত।

৩। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সময় শিশুর বয়স হওয়া উচিত—

১. ৪ বছরের বেশী কিন্তু ৫ বছরের কম।

২. ৫ বছরের বেশী কিন্তু ৬ বছরের কম।

৩. ৬ বছরের বেশী কিন্তু ৭ বছরের কম।

৪. ৭ বছরের বেশী কিন্তু ৮ বছরের কম।

৫. ভিন্নমত।

৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা অংশ হওয়া দরকার।

২. এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার কোন দরকার নাই।

৩. ভিন্নমত।

৫। যদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিবেচ্য হয়, তবে নীচের কোন সম্ভাবনাটি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে?

১. প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২. প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এক বছরের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে তবে শিশুদের ভর্তি অভিভাবকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে।

৩. প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৬ মাসের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৪. প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৬ মাসের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থাকতে হবে, তবে শিশুদের ভর্তি অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

৫. প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম বছরের কর্মসূচীতে শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণী এরূপ দুই ভাগে ভাগ করে নতুন কর্মসূচীর সাহায্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা।

৬. প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথা, কিণ্ডারগার্টেন, নার্সারী, প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

৭. ভিন্নমত।

৬। যদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ধরে সার্বজনীন করতে হয়, তবে সেই অতিরিক্ত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. সরকার বহন করবে।

২. অভিভাবক বহন করবে।

৩. সরকার ও অভিভাবক যৌথভাবে বহন করবে।

৪. ভিন্নমত।

৭। নিম্নলিখিত শিক্ষাস্তরসমূহের কোন্ সমাবেশটা সবচেয়ে বেশী উপযোগী বলে আপনি মনে করেন?

১. প্রাথমিক	নিম্ন-মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ-মাধ্যমিক	উচ্চ-শিক্ষা
১-৫ শ্রেণী	৬-৮ শ্রেণী	৯-১০ শ্রেণী	১১-১২ শ্রেণী	১২ শ্রেণীর উপর
২. প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ শিক্ষা		
১-৮ শ্রেণী	৯-১২ শ্রেণী	১২ শ্রেণীর উপর		
৩. ১-৮ শ্রেণী	৯-১১ শ্রেণী	১১-শ্রেণীর উপর		
৪. ১-৮ শ্রেণী	৯-১০ শ্রেণী	১০ শ্রেণীর উপর		
৫. ভিন্নমত				

৮। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হলে উচ্চশিক্ষার মেয়াদ হওয়া উচিত—

	ডিগ্রী কোর্স			
	পাশ	অনার্স	ডিগ্রী-উত্তর	মোট মেয়াদ
১.	২ বছর	২ বছর	২ বছর	৪ বছর
২.	২ বছর	৩ বছর	২/১ বছর	৪ বছর
৩.	৩ বছর	৩ বছর	১ বছর	৪ বছর
৪.	৩ বছর	৩ বছর	২ বছর	৫ বছর
৫.	ভিন্নমত			

৯। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হলে উচ্চশিক্ষার মেয়াদ হওয়া উচিত—

	ডিগ্রী কোর্স			
	পাশ	অনার্স	ডিগ্রী-উত্তর	মোট মেয়াদ
১.	৩ বছর	৩ বছর	২ বছর	৫ বছর
২.	৩ বছর	৩ বছর	১ বছর	৪ বছর
৩.	২ বছর	৩ বছর	২/১ বছর	৪ বছর
৪.	ভিন্নমত			

১০। মাধ্যমিক শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হলে উচ্চশিক্ষার মেয়াদ হওয়া উচিত—

	ডিগ্রী কোর্স			
	পাশ	অনার্স	ডিগ্রী-উত্তর	মোট মেয়াদ
১.	৩ বছর	৪ বছর	২।১ বছর	৫ বছর
২.	—	৪ বছর	২ বছর	৬ বছর
৩.	ভিন্নমত			

১১। সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে—

১. প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত।
২. প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।
৩. প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত।
৪. প্রথম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
৫. প্রথম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
৬. প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে।
৭. সর্বস্তরে।
৮. ভিন্নমত।

১২। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ ব্যবস্থা

১. সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২. কেবল মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৩. জাতীয় প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৪. মেধা, কর্মসংস্থান ও জাতীয় প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৫. ভিন্নমত।

১৩। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভাষাসমূহের যেমন ইংরেজী, রুশ, জাপানী ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার সুযোগ থাকা প্রয়োজন :

১. যে-কোন একটির।

২. যে-কোন দুটির।

৩. দু'টির অধিক।

৪. ইংরেজী ও অন্য যে-কোন একটার।

৫. শুধু ইংরেজীর।

৬. ভিন্নমত।

১৪। ইংরেজী শেখানো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা উচিত কি?

১. হাঁ ঐচ্ছিকভাবে।

২. হাঁ, বাধ্যতামূলকভাবে।

৩. না।

৪. ভিন্নমত।

১৫। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শুধু ইংরেজী বিদেশী ভাষা শেখানো যদি আপনার মনঃপূত হয় তবে তার শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত—

১. ৩য় থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত।

২. ৩য় থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত।

৩. ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত।

৪. ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

৫. ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত।

৬. ভিন্নমত।

১৬। ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন বিদেশী ভাষা পড়ান যদি আপনার মনঃপূত হয়, তবে তার স্তর হবে—

১. ৬-১০ শ্রেণী।

২. ৬-১১ শ্রেণী।

৩. ৬-১২ শ্রেণী।

৪. ভিন্নমত।

১৭। ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে নীচের কোন্ প্রস্তাবটা আপনার নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য?

১. সাধারণ শিক্ষায়তনে ধর্মশিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।

২. সাধারণ শিক্ষায়তনে সকল ধর্ম সমন্বয়ে নীতিমালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩. ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

৪. ভিন্নমত।

১৮। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার সম্বন্ধে আপনার মত—

১. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা শুধু প্রাথমিক স্তরে থাকবে।

২. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে থাকবে।

৩. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে থাকবে।

৪. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কোন স্তরে থাকা উচিত নয়।

৫. ভিন্নমত।

১৯। প্রচলিত ওল্ড স্কীম, ফাজেল ও কামেল মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৪ শত এবং এগুলিতে প্রায় চার লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আপনি কোন্ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন?

১. মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

২. মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার করতে হবে।

৪. এই শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করতে হবে।

৫. ভিন্নমত।

২০। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর সুষ্ঠু, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আরিলম্বে বিকেন্দ্রিক করা প্রয়োজন—

১. জেলা ভিত্তিক।

২. বিভাগ ভিত্তিক।

৩. জেলা ও বিভাগ ভিত্তিক।

৪. ভিন্নমত।

২১। দেশে বিকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক সম্বলিত যে-সমস্ত দায়িত্ব স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে সেগুলি জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করা উচিত—

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

২২। শিক্ষা প্রশাসন ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের নিয়োগ করা এবং প্রশাসকদের জন্য প্রশিক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাখা উচিত।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

২৩। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষক নিয়োগ, বদলী ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা থাকবে যা হবে—

১. দেশভিত্তিক।
২. বিভাগভিত্তিক (অঞ্চলভিত্তিক)।
৩. জেলাভিত্তিক।
৪. ভিন্নমত।

২৪। টেক্সটবুক বোর্ডের দায়িত্ব হবে—

১. বিভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত পাঠ্য-পুস্তকের গুণাগুণ নিরূপণ ও গ্রহণযোগ্য পুস্তক বাছাই করণ।
২. পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ।
৩. পাঠ্য-পুস্তক সুষ্ঠু বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ।
৪. উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটা।
৫. ভিন্নমত।

২৫। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন—

১. টেক্সটবুক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।
২. টেক্সটবুক বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে বাছাই করা নির্ধারিত লেখক দ্বারা করা উচিত।
৩. ভিন্নমত।

২৬। জাতীয় স্বার্থ, সহজ মুদ্রণ ও সুষ্ঠু বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সমগ্র দেশে—

১. একটা কেন্দ্রীয় টেক্সটবুক বোর্ড ও দেশের প্রত্যেক বিভাগে তার শাখা অফিস থাকা উচিত।
২. দেশের প্রত্যেক বিভাগে সমান দায়িত্বের একটা করে টেক্সটবুক বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে তাদের শাখা অফিস থাকা উচিত।
৩. ভিন্নমত।

২৭। নোট বইয়ের ব্যবহার—

১. আইন করে বন্ধ করা উচিত।

২. স্থানীয় ভিত্তিতে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

৩. নোট বই লেখা ও প্রকাশনা কোন সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ হওয়া উচিত।

৪. নোট বইয়ের ব্যবহার প্রচলিত অবস্থায় চালু থাকা উচিত।

৫. ভিন্নমত।

২৮। শিক্ষার কোন্ শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুরু করা উচিত?

১. পঞ্চম শ্রেণী।

২. নবম শ্রেণী।

৩. দশম শ্রেণী।

৪. একাদশ শ্রেণী।

৫. ভিন্নমত।

২৯। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলনের কোন্ পদ্ধতি আপনার সবচেয়ে পছন্দ?

১. সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে যে-কোন একটি বৃত্তিমূলক বিষয় নিতে হবে।

২. ঐচ্ছিক বিষয়রূপে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে।

৩. বিভিন্নমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে থাকতে হবে।

৪. ভিন্নমত।

৩০। কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ইত্যাদি পেশার ক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকের অভাব জরুরী ভিত্তিতে পূরণের জন্য কি কোর্স চালু করা উচিত?

১. সার্টিফিকেট কোর্স।

২. ডিপ্লোমা কোর্স।

৩. সংক্ষিপ্ত ডিগ্রী কোর্স।

৪. শুধু সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স।

৫. ভিন্নমত।

৩১। পলিটেক্‌নিকের বর্তমান ডিপ্লোমা কোর্স সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. এই কোর্স যথেষ্ট ও ফলপ্রসূ।

২. এই কোর্স আদৌ ফলপ্রসূ নয়।

৩. ভিন্নমত।

৩২। প্রকৌশল শিক্ষার ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার কোন্ পদ্ধতিটি আপনার নিকট সমর্থনযোগ্য ?

১. বিজ্ঞানে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা ও প্রবণতা পরীক্ষার ভিত্তিতে।
২. উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার শুধু বিজ্ঞান বিষয়গুলোর ও প্রবণতা পরীক্ষার ভিত্তিতে।
৩. শুধু উচ্চ-মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষার ভিত্তিতে।
৪. বিজ্ঞানে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও প্রবণতা পরীক্ষার ভিত্তিতে।
৫. মাধ্যমিক পরীক্ষা ও প্রবণতা পরীক্ষার ভিত্তিতে।
৬. কারিগরি ডিপ্লোমা পরীক্ষার ভিত্তিতে।
৭. ভিন্নমত।

৩৩। প্রকৌশল শিক্ষায় প্রয়োগিক ও তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কিত কোন্ মতটা আপনার সবচেয়ে ভাল মনে হয় ?

১. প্রায়োগিক বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত।
২. প্রকৌশল শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ের উপর সমভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।
৩. সৃজনী শক্তি বিকাশের জন্য প্রকৌশলীদের তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত।
৪. ভিন্নমত।

৩৪। ডিপ্লোমাধারীদের জন্য ডিগ্রী প্রকৌশল শিক্ষা লাভের কোন পদ্ধতি আপনি ভাল মনে করেন ?

১. এক বছর প্রিপারেটরী কোর্সের পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৃতীয় বর্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকা।
২. ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকা।
৩. ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের জন্য পৃথক ভাবে সংক্ষিপ্ত তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা।
৪. ডিপ্লোমা পাশের পর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকা।
৫. ডিপ্লোমা পাশের পর অন্তত ১ বছর কাজে অভিজ্ঞতার পর ২য় বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকা।
৬. ভিন্নমত।

৩৫। মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য টাইপিং প্রাথমিক বিষয় হিসাবে রাখা প্রয়োজন—

১. শুধু বাণিজ্য গ্রুপের ছাত্রদের জন্য।
২. বাণিজ্য ও মানবিক গ্রুপের ছাত্রদের জন্য।
৩. সকল গ্রুপের ছাত্রদের জন্য।
৪. এই ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই।
৫. ভিন্নমত।

৩৬। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে 'মেধাবী ছাত্র' বাছাই করার প্রচলিত প্রথা—

১. যুক্তিসঙ্গত, কারণ বিভিন্ন ত্রুটি সত্ত্বেও এই প্রচলিত পরীক্ষাগুলি 'মেধাবী ছাত্র' বাছাইয়ের জন্য উপযুক্ত।

২. বিলোপ করে প্রতিভা যাচাইয়ের উপযোগী অন্যান্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ভিন্নমত।

৩৭। সমগ্র দেশ থেকে মেধাবী ছাত্র খুঁজে বের করার জন্য বিশেষভাবে প্রণীত পরীক্ষা লওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

১. হাঁ।

২. না।

৩. ভিন্নমত।

৩৮। মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চ-যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত বিশেষ ধরণের শিক্ষায়তন যেমন, আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

১. প্রয়োজন আছে, কারণ সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে একই ধরণের শিক্ষায়তনে লেখাপড়া করলে এদের মেধার প্রকৃত বিকাশ ব্যাহত হবে।

২. প্রয়োজন নাই, কারণ মেধাবী ছাত্র সাধারণ ছাত্রদের মতো লেখাপড়া করলেই তার মেধার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে এবং এরূপ পরিবেশেই সে দেশের যোগ্য নাগরিক ও চিন্তানায়করূপে গড়ে উঠতে পারবে।

৩. ভিন্নমত।

৩৯। ক্যাডেট কলেজ চালু থাকলে তাতে শুধু সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে—

১. এই মত আমি সমর্থন করি।

২. এই মত আমি সমর্থন করি না।

৩. ভিন্নমত।

৪০। আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত কিশোর অপরাধীদের জন্য বিশেষ ধরণের পৃথক স্কুলের (বোরষ্টাল স্কুল) প্রয়োজন আছে কি?

১. প্রয়োজন আছে, কারণ কিশোর অপরাধীদের শিক্ষা সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে দিলে তাদের চরিত্র সংশোধন সম্ভব হবে না।

২. প্রয়োজন নাই, তবে জেল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রেখে কিশোর অপরাধীদের সাধারণ স্কুলেই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ভিন্নমত।

৪১। মূক, বধির, অন্ধ ও অন্যান্য বিকলাঙ্গের জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত—

১. এই মত আমি সমর্থন করি।
২. এই মত আমি সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৪২। মূক, বধির, অন্ধ ও অন্যান্য বিকলাঙ্গের জন্য সকল স্কুলই আবাসিক হতে হবে কি?

১. হাঁ, এদের জন্য সকল স্কুলই আবাসিক হওয়া উচিত।
২. না, প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সংখ্যক আবাসিক এবং কিছু সংখ্যক অনাবাসিক স্কুল থাকলেই চলবে।
৩. না, সকল স্কুলই অনাবাসিক হওয়া উচিত।
৪. ভিন্নমত।

৪৩। আপনি কি মনে করেন যে শিক্ষার সমতা বিধানের নিশ্চয়তার জন্য ক্যাডেট কলেজ, আবাসিক আদর্শ বিদ্যালয়, সরকারী বিদ্যালয় ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা দূর করা উচিত?

১. হাঁ।
২. না।
৩. ভিন্নমত।

৪৪। আইন বিষয়ক উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রচলিত এল, এল, বি, কোর্সের মেয়াদ দুই বছর পরিবর্তে তিন বছরের হওয়া উচিত।

১. এই মত আমি সমর্থন করি।
২. এই মত আমি সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৪৫। আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা কত ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত? (বাংলাদেশে ইতিপূর্বে জাতীয় আয়ের ২%শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হত। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কিউবা ও জাপান তাদের জাতীয় আয়ের যথাক্রমে ৩·৬%, ৫·৫%, ৫% এবং ৭·১% শিক্ষার জন্য ব্যয় করে।)

১. ৪% এর কম।
২. ৪%।
৩. ৫%।
৪. ৬%।
৫. ৭%।
৬. ৭% এর বেশী

৪৬। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা পরিষদসমূহ শিক্ষাখাতে ব্যয়ভার বহন করার কিরূপ দায়িত্ব বহন করবে?

১. সমস্ত খরচ বহন করবে।
২. আংশিক খরচ বহন করবে।
৩. কোন খরচই বহন করবে না।
৪. ভিন্নমত।

৪৭। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে 'সহজ প্রমোশন নীতি' গ্রহণ করা উচিত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রমোশন প্রধানত ক্লাশ পরীক্ষাসমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৪৮। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষা (পাবলিক এক্‌জামিনেশন) সম্বন্ধে নীচের সমাবেশগুলির কোন্‌টি আপনার সমর্থনযোগ্য?

১. পরীক্ষা হবে একটি অষ্টম শ্রেণীর শেষে।
২. পরীক্ষা হবে একটি দশম শ্রেণীর শেষে।
৩. পরীক্ষা হবে একটি একাদশ শ্রেণীর শেষে।
৪. পরীক্ষা হবে দু'টি—একটি দশম ও অপরটি দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে।
৫. পরীক্ষা হবে দু'টি—একটি অষ্টম ও অপরটি দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে।
৬. পরীক্ষা হবে দু'টি—একটি অষ্টম ও অপরটি দশম শ্রেণীর শেষে।
৭. পরীক্ষা হবে তিনটি—একটি অষ্টম শ্রেণীর শেষে, অপরটি দশম শ্রেণীর শেষে এবং তৃতীয়টি দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে।
৮. পরীক্ষা হবে দু'টি—একটি অষ্টম ও অপরটি একাদশ শ্রেণীর শেষে।
৯. কোন বহিঃপরীক্ষা থাকা উচিত নয়।
১০. ভিন্নমত।

৪৯। বহিঃপরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে তুলে দিয়ে অন্তঃপরীক্ষার ভিত্তিতে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব স্ব শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদানের নীতি সম্পর্কে আপনার মত কি?

১. স্ব স্ব বিদ্যালয় হতে সার্টিফিকেট প্রদান শিক্ষার সকল স্তরেই গ্রহণ করা উচিত।
২. মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এর প্রবর্তন হওয়া উচিত।
৩. শুধু উচ্চশিক্ষাস্তরে এর প্রবর্তন হওয়া উচিত।
৪. শিক্ষার কোন স্তরেই উক্ত নীতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত নয়।
৫. ভিন্নমত।

৫০। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর হতে শুরু করে উর্ধ্বতর সমস্ত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে নতুন ধরণের প্রশ্নের মাধ্যমে 'ওপেন বুক টেষ্ট' (বই দেখে পরীক্ষা) চালু করা উচিত।

১. আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।
২. আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৫১। এক শ্রেণী হতে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বহিঃপরীক্ষার ন্যায় অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলকেও যথাযথ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১. আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।
২. আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৫২। মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হতে বহিঃপরীক্ষার ফল নির্দেশক যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে পরীক্ষার্থী কি কি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবং কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে সেগুলির উল্লেখ থাকবে, কিন্তু সামগ্রীকভাবে পাশ বা ফেলের কোন্ উল্লেখ থাকবে না।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৫৩। মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হতে বহিঃপরীক্ষার ফলস্বরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে তাদের স্ব স্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন অন্তঃপরীক্ষাগুলির ফলাফল আলাদাভাবে উল্লেখ থাকা উচিত।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৫৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত বহিঃপরীক্ষায় কোন ছাত্র কোন এক বছরে এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে এবং বাকী কয়েকটা বিষয়ে কৃতকার্য হলে সে পরের বছর শুধু অকৃতকার্য হয়েছে এমন বিষয়গুলিতে পরীক্ষা দিতে পারবে এবং সে শেষোক্ত পরীক্ষায় ঐ বিষয়গুলিতে কৃতকার্য হতে পারলে তাকে সামগ্রিকভাবে কৃতকার্য বলে বিবেচিত হবে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. আমি এটা সমর্থন করি।
২. আমি এটা সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৫৫। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা মোটামুটি একরূপ হলেও প্রচলিত সংখ্যাভিত্তিক নম্বর ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক নম্বরের বিরাট পার্থক্য থেকে যায়—যেমন বাংলাতে খুব ভাল করলেও একজন ছাত্রের পক্ষে শতকরা ৭০ নম্বর পাওয়া বেশ কঠিন, কিন্তু গণিতে খুব ভাল করলে শতকরা একশতও পাওয়া যায়—এই পার্থক্য দূরীকরণের জন্য অনেকে সমস্ত বিষয়ে লেটার গ্রেডে (অক্ষর-ভিত্তিক মান) নম্বর দানের পক্ষপাতি, যাতে যে কোন বিষয়ের খুব ভাল খাতাকে 'ক', ভাল খাতাকে 'খ', মাঝামাঝিকে 'গ', খারাপকে 'ঘ' ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা নম্বর প্রদান করা যায়।

পরীক্ষার খাতায় লেটার গ্রেড (অক্ষরভিত্তিক মান) দেওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. আমি লেটার গ্রেড প্রবর্তনের পক্ষে।

২. আমি এর বিপক্ষে।

৩. ভিন্নমত।

৫৬। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অন্তঃপরীক্ষা এবং ক্রমমূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন—

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্ন মত।

৫৭। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমস্ত পরীক্ষার আধুনিকীকরণের জন্য একটি 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সংস্কার সংস্থা' প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে।

১. আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।
২. আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৫৮। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজ নিজ পাঠ্য বিষয়/কোর্স নির্ধারণ; ভবিষ্যত কার্যক্ষেত্র সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য—

১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।
২. কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন নাই।
৩. ভিন্নমত।

৫৯। যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী—

১. শুধু প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত থাকবে।
২. শুধু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত থাকবে।
৩. শুধু উচ্চশিক্ষার স্তরে থাকবে।
৪. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে চালু থাকা উচিত।
৫. ভিন্নমত।

৬০। শিক্ষিত যুবকদের স্ব স্ব প্রবণতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।
২. আমি এই মত সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৬১। উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১. শুধু শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে।
২. শুধু প্রশাসনিক ব্যাপারে।
৩. শিক্ষাসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রে।
৪. কোন ক্ষেত্রেই না।
৫. ভিন্ন মত।

৬২। ছাত্র ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন্ মতটি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য?

১. দেশের প্রগতির জন্য শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থাকা উচিত।
২. ভোটাধিকার বয়সের পূর্ব পর্যন্ত (১৮ বৎসর) ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।
৩. ছাত্রাবস্থায় কোনমতেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।
৪. ভিন্নমত।

৬৩। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির কোনটি আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী সমর্থনযোগ্য?

১. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করা।
২. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের বর্তমান এক বছর মেয়াদী পাঠক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা।
৩. ভিন্নমত।

৬৪। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ প্রস্তাবটি আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী সমর্থনযোগ্য?

১. শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করা উচিত।
২. শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের প্রচলিত এক বছর মেয়াদী পাঠক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা উচিত।
৩. ভিন্নমত।

৬৫। দেশের মাধ্যমিক স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের তীব্র অভাব দূরীকরণের জন্য ডিগ্রী পর্যায়ে (পাশ ও অনার্স উভয় কোর্সে) 'শিক্ষক-প্রশিক্ষণ' ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

১. এই মত আমি সমর্থন করি।
২. এই মত আমি সমর্থন করি না।
৩. ভিন্নমত।

৬৬। মাধ্যমিক স্কুলে কার্যরত শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ প্রস্তাবটি আপনার নিকট সবচেয়ে সমর্থনযোগ্য?

১. প্রত্যেক শিক্ষকের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত।
২. প্রতি ১০ বছর চাকুরীর পর একবার স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত।
৩. ভিন্নমত।

৬৭। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. শিক্ষকতার কাজে সহায়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আছে।
২. শুধু কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষকতার কাজে সহায়ক বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।
৩. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
৪. ভিন্নমত।

৬৮। চারু ও ললিতকলা বিষয়ে

১. শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সরকারী খরচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত।
২. শিক্ষার জন্য আংশিক সরকারী খরচে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত।
৩. শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী ব্যবস্থায় থাকা উচিত।
৪. ভিন্নমত।

৬৯। শরীরচর্চা শিক্ষার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

১. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
২. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৩. দশম শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৪. একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৫. দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৬. প্রথম শ্রেণী হতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৭. ভিন্নমত।

৭০। শরীরচর্চা বিষয়ক শিক্ষাকে সম্প্রসারণ, কার্যকর এবং এর জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত?

১. অন্তত প্রত্যেক বিভাগে একটা করে শরীরচর্চা কলেজ স্থাপন করা উচিত।
২. অন্তত প্রত্যেক জেলায় একটা করে শরীরচর্চা কলেজ স্থাপন করা উচিত।
৩. সম্প্রসারণের কোন প্রয়োজন নাই।
৪. ভিন্নমত।

৭১। শিক্ষাব্যবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. অষ্টম শ্রেণীর পরে প্রত্যেক স্তরে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।
২. নবম শ্রেণী—একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।
৩. নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।
৪. শুধু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে—সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।
৫. শুধু উচ্চশিক্ষা স্তরে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত।
৬. শিক্ষার কোন স্তরেই সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত নয়।
৭. ভিন্নমত।

৭২। মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান নীতি কি হওয়া উচিত?

১. মেধানুযায়ী সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ খরচ বৃত্তিস্বরূপ দেওয়া উচিত।
২. মেধানুযায়ী বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীর আংশিক খরচ বৃত্তিস্বরূপ দেওয়া উচিত।
৩. ভিন্ন মত।

৭৩। বোর্ড পরীক্ষাগুলিতে বৃত্তি প্রদান বিভিন্ন গ্রুপভিত্তিক (কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্রভৃতি) হওয়া উচিত।

১. হাঁ।
২. না।
৩. ভিন্নমত।

৭৪। বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ খরচ সাহায্য হিসাবে দেওয়া উচিত।
২. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আংশিক খরচ সাহায্য হিসাবে দেওয়া উচিত।
৩. কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে (মেধাভিত্তিক) সম্পূর্ণ খরচ সাহায্য হিসাবে দেওয়া উচিত।
৪. কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে (মেধাভিত্তিক) আংশিক খরচ সাহায্য হিসাবে দেওয়া উচিত।
৫. কোন শিক্ষার্থীকেই কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত নয়।
৬. ভিন্নমত।

৭৫। যদি বর্তমানের তিন বছরের অনার্স কোর্স এবং দু'বছরের পাশ কোর্স ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য চালু থাকে—তবে অনার্সের জন্য কোন্ ব্যবস্থা আপনি ভাল মনে করেন?

১. প্রচলিত সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার নম্বর অনার্স পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

২. অনার্সের জন্য সংশ্লিষ্ট পার্শ্ব (সাবসিডিয়ারী) বিষয়গুলিকে অনার্সের মাইনর বিষয় ধরে সমস্ত বিষয়গুলিকে অনার্সের বিষয় ধরা উচিত।

৩. পার্শ্ব (সাবসিডিয়ারী) বিষয়গুলি তুলে দিয়ে শুধু অনার্স বিষয় পড়ান উচিত।

৪. ভিন্নমত।

৭৬। অনেকে মনে করেন উচ্চশিক্ষার প্রথম ডিগ্রী স্তরে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেজন্য পাশ এবং অনার্স কোর্সের সময়সূচী একই হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে অনার্সের জন্য বাছাই করা ছাত্রদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতিরিক্ত পাঠক্রম থাকতে হবে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. আমি এই মত সমর্থন করি।

২. আমি এই মত সমর্থন করি না।

৩. ভিন্নমত।

৭৭। আমাদের দেশে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা দেওয়ার উপরে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, গবেষণার পরিবেশ খুবই সীমিত। এ অবস্থায় নীচের কোনটা আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য?

১. চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশল ও সাধারণ বিজ্ঞানে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ শুধু সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে/উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকা উচিত।

২. গবেষণার জন্য পৃথক গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত।

৩. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান উভয় জায়গায় গবেষণার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৪. ভিন্নমত।

৭৮। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ ফল দেশের শিল্প, কলকারখানা, ক্ষেত্-খামার ইত্যাদির উৎপাদন ও উন্নতির সহায়ক। গবেষণার ব্যাপারে, এসব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কোন দায়িত্ব আপনি সমর্থন করেন?

১. এসব প্রতিষ্ঠানে ফলিত ও তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা 'সেল' থাকা দরকার।

২. এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকে জোর দেওয়া উচিত, গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই।

৩. এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণার জন্য নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত।

৪. ভিন্নমত।

৭৯। পেশাগত শিক্ষার (যেমন, কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন বা শিল্পভিত্তিক ইত্যাদি) জন্য অনেকে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ছয় মাস প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন সাপেক্ষে ডিগ্রি দেওয়া উচিত।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।

২. আমি এই মত সমর্থন করি না।

৩. ভিন্নমত।

৮০। রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক জ্ঞানসহ স্বাস্থ্যশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত—

১. ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত।

২. ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত।

৩. একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

৪. ভিন্নমত।।

৮১। বর্তমানে প্যারামেডিক্যাল শিক্ষার দেড় হইতে দুই বছর মেয়াদি যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেই সম্বন্ধে আপনার মত কি?

১. প্রচলিত ব্যবস্থাই যথেষ্ট।

২. প্রচলিত ব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট নয়।

৩. ভিন্ন মত।

৮২। নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিম্নের কোন ব্যবস্থাটা আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য?

১. তাদের পদ-মর্য্যাদা বাড়াতে হবে।

২. শিক্ষানবিশকালে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

৩. ভিন্নমত।

৮৩। অনেকে মনে করেন বর্তমান মেডিক্যাল শিক্ষা কলেজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বিধায় গ্রামের দৈনন্দিন চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা অনভিজ্ঞ। এর প্রতিবিধানের জন্য রেজিষ্ট্রেশন পাবার আগে কি ব্যবস্থা আপনি সমর্থন করেন?

১. নির্ধারিত সময়ের জন্য মফস্বল হাসপাতাল, পল্লী-স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে।

২. শিক্ষানবিশকালে কিংবা রেজিষ্ট্রেশনের পূর্বে ব্যবহারিক পল্লী-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৩. উপরোক্ত (১) এবং (২) উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

৪. এ বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাই যথেষ্ট।

৫. ভিন্নমত।

৮৪। দেশের চাহিদার তুলনায় বর্তমানে ডাক্তারের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এ অসুবিধা কিভাবে দূর করা যেতে পারে?

১. যদিও ব্যয় সাপেক্ষ এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম, তবুও অল্প সময়ে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. এল, এম, এফ/এম, এম, এফ বা ঐ জাতীয় সংক্ষিপ্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. উপরে (১) ও (২) নম্বরে উল্লিখিত উভয় ব্যবস্থাই থাকবে।

৪. ভিন্নমত।

৮৫। ডিগ্রী-উত্তর চিকিৎসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থার কোনটি সমর্থন করেন?

১. বাংলাদেশে প্রথম ডিগ্রী-উত্তর (পোষ্ট-গ্রাজুয়েট) চিকিৎসা শিক্ষা একাধিক শিক্ষায়তনে প্রবর্তন করা।

২. বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চিকিৎসক প্রেরণ।

৩. উভয় ব্যবস্থা চালু করা।

৪. ভিন্নমত।

৮৬। কোন্ শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পড়ান উচিত?

১. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত।

২. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

৩. দশম শ্রেণী পর্যন্ত।

৪. একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

৫. দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

৬. ভিন্নমত।

৮৭। শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম মানদণ্ড, যেমন বাৎসরিক বরাদ্দ, পাঠকক্ষে আসন সংখ্যা, বই ও সাময়িকীর সংখ্যা, কর্মচারীর সংখ্যা ইত্যাদি, বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করা উচিত।

১. আমি এই মত সমর্থন করি।

২. আমি এই মত সমর্থন করি না।

৩. ভিন্নমত।

৮৮। আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশে পাবলিক লাইব্রেরী-আইন প্রবর্তন করা দরকার?

১. হাঁ।

২. না।

৩. ভিন্নমত।

৮৯। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূর করতে হলে—

১. সাক্ষরতা অর্জন আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. নিরক্ষরদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

৩. ভিন্নমত।

৯০। সাক্ষরতা অভিযানকে ফলপ্রসূ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক পেতে হলে—

১. বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

২. প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৩. ভিন্নমত।

প্রশ্নোত্তরকারীর পরিচয়

নাম— বয়স—

পেশা/পদবী—

বর্তমান ঠিকানা—

প্রশ্নমালার জবাব বিশ্লেষণ

প্রশ্নমালা প্রেরণ ও জবাব বিশ্লেষণ

নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরণের সুধীবৃন্দের নিকট সর্বমোট ৯,৫৫১টি প্রশ্নমালা প্রেরিত হয় এবং তাঁদের কাছ থেকে ২,৮৬৯টি জবাব পাওয়া যায়:

	প্রশ্নমালা প্রেরণের সংখ্যা।	প্রাপ্ত জবাবের সংখ্যা।
(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, অধ্যাপক, ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ইত্যাদি।	৩০৩ ..	৮৯
(খ) উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক।	৫,১৩৪ ..	১,৬২২
(গ) স্কুল/কলেজ শিক্ষক সমিতি	১,০২১ ..	৩১৯
(ঘ) ডিগ্রী কলেজ ছাত্র সংসদ ও ছাত্র সংস্থা	২১০ ..	৪
(ঙ) শিক্ষা প্রশাসকগণ	৫৫৬ ..	২৯৯
(চ) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, অধ্যাপক, কারিগরি শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক, ছাত্র সংস্থা ও বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত প্রকৌশলী/কারিগর বৃন্দ।	২৮৫ ...	১০৪
(ছ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, অধ্যাপক, কৃষি শিক্ষায় ব্যাপৃত শিক্ষক, ছাত্র সংস্থা ও অন্যান্য কৃষিবিদগণ।	৫৭ ..	২৬
(জ) মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ডাক্তার ও চিকিৎসা কলেজের ছাত্র সংস্থা সমূহ।	১৮৫ ..	৫২
(ঝ) মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেণ্ট	৩০৩ ..	১৫৯
(ঞ) অবসর প্রাপ্ত বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যত্র কর্মরত শিক্ষাবিদগণ এবং সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকবৃন্দ।	৭১৩ ..	৩৬
(ট) বিভাগীয় প্রধানগণ (বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত)	১৫৪ ..	৩২
(ঠ) জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ	৩১৫ ..	২৯
(ড) বিবিধ	৩৮৫ ..	৯৮
সর্বমোট	৯,৫৫১	২,৮৬৯

সুধীবৃন্দের নিকট হতে প্রাপ্ত জবাবগুলো কম্পিউটার যোগে যাচাই করা হয় এবং কম্পিউটার প্রদত্ত যাচাই-ফল পরবর্তী পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হল। কম্পিউটার হতে প্রাপ্ত ছকের প্রথমও শেষ ঘরে Sl. No. দ্বারা প্রশ্নমালায় প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা দেখান হয়েছে এবং ছকের উপরের লাইনে (1) হতে (10) সংখ্যা দ্বারা প্রশ্নমালায় দেওয়া সম্ভাব্য জবাবগুলোকে বুঝান হয়েছে। Total দ্বারা বিশেষ প্রশ্নটির মোট জবাব দাতার সংখ্যা, Max দ্বারা সবচেয়ে বেশী জবাবদাতা যে জবাব নির্বাচন করেছেন তা এবং Per এর ঘরে এরূপ জবাবদাতা মোট জবাব দাতার শতকরা কত অংশ তা দেখান হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ছকের তথ্যানুযায়ী ১ নম্বর প্রশ্নের জবাবে (১), (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) নম্বর জবাব যথাক্রমে ১৬৭, ৭২৮, ১৫০৪, ৪৮, ৬৪৪ ও ৩২৯ জন নির্বাচন করেছেন এবং ঐ প্রশ্নের সর্বমোট জবাবদাতার সংখ্যা ২,৮২০ জন। (৩) নম্বর জবাবটি সবচেয়ে বেশী জবাবদাতা পছন্দ করেছেন। এবং এঁরা মোট জবাবদাতার শতকরা ৩৯·১৪ জন।

কম্পিউটার যোগে জবাব যাচাইয়ের ফল সর্বপ্রথম সকল জবাবদাতার একত্রে এবং পরে পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রুপ ভিত্তিক দেখান হয়েছে।

প্রত্যেক প্রশ্নের শেষ বিকল্প জবাব ছিল ভিন্নমত। প্রশ্নমালায় সন্নিবেশিত কোন জবাব নির্বাচন না করে জবাবদাতা বিকল্প মত হিসাবে যা বলতে চান তা এ ঘরে ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। সে হিসাবে উপরোক্ত উদাহরণে (৬) নম্বর ঘরে যে ১২৯ জনের সংখ্যা দেখান হয়েছে তাঁরা প্রদত্ত কোন জবাব পছন্দ না করে প্রশ্নমালার জবাবগুলোর সহিত ভিন্নতা নির্দেশ করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের ভিন্নমত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন তা পৃথক ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এরূপ পরীক্ষার ফল কম্পিউটারের জবাব যাচাইয়ের ছকগুলোর পরে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

BANGLADESH EDUCATION COMMISSION

PROCESSING OF ANSWERED QUESTIONNAIRES FOR PUBLIC OPINION

No. of replies processed—2,869

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Sl. No.
1	167	728	1,104	48	644	129	..	..	..	..	2,820	3	39·14	1
2	351	218	1,143	262	596	101	158	..	..	..	2,829	3	40·40	2
3	296	1,919	535	27	58	..	..	..	..	..	2,835	2	67·68	3
4	2,270	402	118	..	..	..	..	..	..	..	2,790	1	81·36	4
5	378	407	105	139	1,057	401	86	..	..	..	2,573	5	41·08	5
6	1,783	103	657	51	..	..	..	..	..	..	2,594	1	68·73	6
7	1,142	875	300	300	179	..	..	..	..	..	2,796	1	40·84	7
8	578	1,363	129	173	89	..	..	..	..	..	2,332	2	58·44	8
9	1,069	251	541	168	..	..	..	..	..	..	2,029	1	52·68	9
10	964	774	338	..	..	..	..	..	..	..	2,076	1	46·43	10
11	503	426	130	18	25	697	825	192	..	..	2,816	7	29·29	11
12	794	556	104	1,325	46	..	..	..	..	..	2,825	4	46·90	12
13	250	72	96	771	1,442	190	..	..	..	..	2,821	5	51·11	13
14	1,145	1,544	6	136	..	..	..	..	..	..	2,831	2	54·53	14
15	451	1,250	107	68	402	384	..	..	..	..	2,662	2	46·95	15
16	624	82	690	686	..	..	..	..	..	..	2,082	3	33·14	16

17	147	399	1,951	115	..	..	..	..	..	..	2,612	3	69·38	17
18	213	1,159	1,126	116	196	..	..	.	..	..	2,810	2	41·24	18
19	76	574	1,276	722	163	..	..	..	..	..	2,811	3	45·39	19
20	1,774	211	666	163	..	..	..	..	..	..	2,814	1	63·04	20
21	1,444	1,117	221	..	..	..	..	..	..	..	2,782	1	51·90	21
22	2,747	32	39	..	..	..	..	..	..	..	2,818	1	97·46	22
23	280	429	1,890	220	..	..	..	..	..	..	2,819	3	67·04	23
24	882	39	42	1,749	103	..	..	..	.	..	2,815	4	62·13	24
25	2,596	151	66	..	..	..	..	..	..	..	2,813	1	92·28	25
26	1,132	1,416	253	..	..	..	..	..	..	..	2,801	2	50·55	26
27	1,012	435	1,077	114	178	..	..	..	..	..	2,816	3	38·21	27
28	932	1,441	78	243	122	..	..	..	..	..	2,816	2	51·17	28
29	1,337	759	627	74	..	..	..	..	..	..	2,797	1	47·80	29
30	333	778	768	666	168	..	..	..	..	..	2,713	2	28·67	30
31	1,506	545	464	..	..	..	..	..	..	..	2,515	1	59·88	31
32	836	607	245	337	277	236	106	..	..	..	2,644	1	31·61	32
33	440	1,698	428	40	..	..	..	..	..	..	2,606	2	65·15	33
34	450	432	562	471	449	117	..	..	..	..	2,481	3	22·65	34
35	415	565	1,546	241	31	..	..	..	..	..	2,798	3	55·25	35
36	1,026	1,673	83	..	..	..	..	..	..	..	2,782	2	60·13	36
37	2,396	370	38	..	..	..	..	..	..	..	2,804	1	85·44	37
38	933	1,725	140	..	..	..	..	..	..	..	2,798	2	61·65	38

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
39	1,056	1,156	335	..	..	..	..	..	..	..	2,557	2	45·60	39
40	1,002	847	50	..	..	..	..	..	..	..	2,795	1	68·05	40
41	2,797	14	8	..	..	..	..	..	..	..	2,819	1	99·21	41
42	1,908	846	34	25	..	..	..	..	..	..	2,813	1	67·82	42
43	2,463	183	150	..	..	..	..	..	..	..	2,796	1	88·09	43
44	1,799	814	81	..	..	..	..	..	..	..	2,694	1	66·77	44
45	13	81	893	214	497	1,618	..	..	..	..	2,816	6	57·45	45
46	429	1,450	704	143	..	..	..	..	..	..	2,726	2	53·19	46
47	2,232	354	211	..	..	..	..	..	..	..	2,797	1	79·79	47
48	42	307	28	454	222	273	1,114	174	77	116	2,807	7	39·68	48
49	267	390	427	1,627	201	..	..	..	..	..	2,722	4	59·77	49
50	1,590	1,038	143	..	..	..	..	..	..	..	2,771	1	57·38	50
51	2,423	326	56	..	..	..	..	..	..	..	2,805	1	86·38	51
52	1,007	1,395	362	..	..	..	..	..	..	..	2,764	2	50·47	52
53	1,754	942	77	..	..	..	..	..	..	..	2,773	1	63·25	53
54	1,938	708	138	..	..	..	..	..	..	..	2,784	1	69·61	54
55	1,696	950	107	..	..	..	..	..	..	..	2,753	1	61·60	55
56	2,628	119	17	..	..	..	..	..	..	..	2,664	1	94·89	56
57	2,425	257	21	..	..	..	..	..	..	..	2,703	1	89·71	57
58	2,520	207	59	..	..	..	..	..	..	..	2,786	1	90·45	58

59	106	368	133	2,072	90	..	..	..	..	..	2,769	4	74·82	59
60	2,590	161	25	..	..	..	..	..	..	..	2,776	1	93·29	60
61	1,393	55	820	485	36	..	..	..	..	..	2,789	1	49·94	61
62	131	1,099	1,442	136	..	..	..	..	..	..	2,808	3	51·35	62
63	853	1,827	109	..	..	..	..	..	..	..	2,789	2	65·50	63
64	770	1,919	98	..	..	..	..	..	..	..	2,787	2	68·85	64
65	1,974	734	75	..	..	..	..	..	..	..	2,783	1	70·93	65
66	2,128	520	143	..	..	..	..	..	..	..	2,791	1	76·24	66
67	1,997	260	430	54	..	..	..	..	..	..	2,741	1	72·85	67
68	1,533	883	220	57	..	..	..	..	..	..	2,693	1	56·92	68
69	87	484	786	90	300	961	84	..	..	..	2,792	6	34·41	69
70	842	1,720	111	92	..	..	..	..	..		2,765	2	62·20	70
71	816	196	673	486	262	211	145	..	..	..	2,789	1	29·25	71
72	507	2,112	172	..	..	..	..	..	..	..	2,791	2	75·67	72
73	2,621	109	55	..	..	..	..	..	..	..	2,785	1	94·11	73
4	1,732	654	153	131	16	110	..	..	..	..	2,796	1	61·94	74
75	1,243	672	573	95	..	..	..	..	..	..	2,583	1	48·12	75
76	1,749	798	92	..	..	..	..	..	..	..	2,639	1	66·27	76
77	460	498	1,754	15	..	..	..	..	..	..	2,727	3	64·31	77
78	1,229	261	1,035	68	..	..	..	..	..	..	2,593	1	47·39	78
79	2,512	154	48	..	..	..	..	..	..	..	2,714	1	92·55	79
80	1,240	1,216	252	62	..	..	..	..	..	..	2,770	1	44·76	80

Sl. No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
81	1,166	1,154	141	..	..	..	..	..	..	..	2,461	1	47·37	81
82	693	1,727	248	..	..	..	..	..	..	..	2,668	2	64·73	82
83	857	158	1,601	68	16	..	..	..	..	..	2,700	3	59·29	83
84	680	488	1,471	88	..	..	..	..	..	..	2,727	3	53·94	84
85	556	193	1,924	51	..	..	..	..	..	..	2,724	3	70·63	85
86	74	812	1,494	105	255	62	..	..	..	..	2,802	3	53·31	86
87	2,628	102	41	..	..	..	..	..	..	..	2,771	1	94·83	87
88	2,366	218	61	..	..	..	..	..	..	..	2,645	1	89·45	88
89	1,509	1,195	88	..	..	..	..	..	..	..	2,792	1	54·04	89
90	1,548	1,128	89	..	..	..	..	..	..	..	2,765	1	55·98	90

GROUP A.

Vice-Chancellors, Heads of Departments, etc. of Universities, Principals of Degree Colleges etc., (General Type)

No. of questionnaire sent—303.

No. of Respondents—89.

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
1	6	5	25	1	37	14	..	..	..	..	88	5	42·04	1
2	17	2	45	3	12	5	3	..	..	..	87	3	51·72	2
3	11	55	21	1	1	..	..	..	..	..	89	2	61·79	3
4	70	13	6	..		..	..	..	..	..	89	1	78·65	4
5	14	20	3	6	20	13	2	..	..	..	78	5	25·64	5
6	52	4	22	..	..	..	..	..	..	..	78	1	66·66	6
7	32	30	9	9	7	..	..	..	..	..	87	1	36·78	7
8	12	44	7	6	4	..	..	..	..	..	73	2	60·27	8
9	26	6	9	11	..	..	..	..	..	..	52	1	50·00	9
10	14	26	15	..	..	..	..	..	..	..	55	2	47·27	10
11	6	9	1	..	1	32	33	7	..	..	89	7	37·07	11
12	4	17	5	62	1	..	..	..	..	..	89	4	69·66	12
13	3	..	1	42	34	9	..	..	..	..	89	4	47·19	13
14	39	43	..	7	..	..	..	..	..	..	89	2	48·31	14
15	9	39	2	3	16	8	..	..	..	..	77	2	50·64	15
16	13	5	21	22	..	..	..	..	..	..	61	4	36·06	16

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
17	17	24	46	9	..	..	..	..	..	..	89	3	51·68	17
18	11	41	16	8	12	..	..	..	..	..	88	2	46·59	18
19	4	10	50	19	5	..	..	..	..	..	88	3	56·81	19
20	44	11	25	8	..	..	..	..	..	..	88	1	60·00	20
21	30	41	15	..	..	..	..	..	..	..	86	2	47·67	21
22	82	2	3	..	..	..	..	..	..	..	87	1	94·25	22
23	12	22	42	12	..	..	..	..	..	..	88	3	47·72	23
24	34	1	1	47	4	..	..	..	..	..	87	4	54·02	24
25	78	6	3	..	..	..	..	..	..	..	87	1	89·65	25
26	47	24	15	..	..	..	..	..	..	..	86	1	54·65	26
27	35	17	26	1	9	..	..	..	..	..	88	1	39·77	27
28	13	53	2	14	5	..	..	..	..	..	87	2	60·91	28
29	37	21	25	4	..	..	..	..	..	..	87	1	42·52	29
30	9	22	14	27	9	..	..	..	..	..	81	4	33·33	30
31	32	16	26	..	..	..	..	..	..	..	74	1	43·24	31
32	37	21	7	6	3	1	5	..	..	..	80	1	46·25	32
33	18	56	4	3	..	..	..	..	..	..	81	2	69·13	33
34	21	7	15	17	14	3	..	..	..	..	77	1	27·27	34
35	10	14	48	13	2	..	..	..	..	..	87	3	55·17	35

36	37	43	8	..	..	..	..	..	..	..	88	2	48·86	36
37	66	20	2	..	..	..	..	..	..	..	88	1	75·00	37
38	28	51	8	..	..	..	..	..	..	..	87	2	58·62	38
39	39	27	15	..	..	..	..	..	..	..	81	1	48·14	39
40	68	19	2	..	..	..	..	..	..	..	89	1	76·40	40
41	86	2	1	..	..	..	..	..	..	..	89	1	96·62	41
42	53	33	1	2	..	..	..	..	..	..	89	1	59·55	42
43	72	7	9	..	..	..	..	..	..	..	88	1	81·81	43
44	63	20	1	..	..	..	..	..	..	..	84	1	75·00	44
45	1	1	8	5	25	49	..	..	..	..	89	6	65·05	45
46	14	50	11	9	..	..	..	..	..	..	84	2	59·52	46
47	72	7	9	..	..	..	..	..	..	..	88	1	81·81	47
48	1	6	1	15	9	6	29	7	7	6	87	7	33·33	48
49		4	25	34	11	..	..	..	..	..	83	4	40·96	49
50	47	7	12	..	..	..	..	..	..	..	86	1	54·65	50
51	78	9	2	..	..	..	..	..	..	..	89	1	87·64	51
52	32	40	17	..	..	..	..	..	..	..	89	2	44·94	52
53	63	23	2	..	..	..	..	..	..	..	88	1	71·59	53
54	61	21	5	..	..	..	..	..	..	.	87	1	79·11	54
55	51	33	3	..	..	..	..	..	..	..	87	1	58·62	55
56	83	2	1	..	..	..	..	..	..	..	86	1	96·51	56
57	71	15	3	..	..	..	..	..	..	..	89	1	79·77	57

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
58	78	9	2	..	..	..	..	..	..	..	89	1	87·64	58
59	..	18	5	58	7	..	..	..	..	..	88	4	65·90	59
60	81	6	2	..	..	..	..	..	..	..	89	1	91·01	60
61	40	2	25	18	1	..	..	..	..	..	86	1	46·51	61
62	3	28	47	9	..	..	..	..	..	..	87	3	54·02	62
63	20	61	5	..	..	..	..	..	..	..	86	2	70·93	63
64	21	62	4	..	..	..	..	..	..	..	87	2	71·26	64
65	66	17	4	..	..	..	..	..	..	..	87	1	75·86	65
66	71	11	6	..	..	..	..	..	..	..	88	1	80·68	66
67	39	8	32	6	..	..	..	..	..	..	85	1	45·88	67
68	46	31	3	3	..	..	..	..	..	..	83	1	55·42	68
69	5	6	23	6	21	25	1	..	..	..	87	6	28·73	69
70	40	37	5	2	..	..	..	..	..	..	84	1	47·61	70
71	9	2	18	24	17	10	7	..	..	..	87	4	27·58	71
72	21	54	13	..	..	..	..	..	..	..	88	2	61·36	72
73	74	6	5	..	..	..	..	..	..	..	85	1	87·65	73
74	40	26	9	5	..	6	..	..	..	..	86	1	46·51	74
75	35	38	6	6	..	..	..	..	..	..	85	2	44·70	75
76	41	38	6	..	..	..	..	..	..	..	85	1	48·23	76

77	14	9	63	1	..	..	..	..	..	..	87	3	72·41	77
78	29	7	40	8	..	..	..	..	..	..	84	3	47·61	78
79	80	4	2	..	..	..	..	..	..	..	86	1	93·02	79
80	43	31	8	2	..	..	..	..	..	..	84	1	51·19	80
81	29	39	5	..	..	..	..	..	..	..	73	2	53·42	81
82	28	40	16	..	..	..	..	..	..	..	84	2	47·61	82
83	33	4	42	2	1	..	..	..	..	..	82	3	51·21	83
84	26	14	40	4	..	..	..	..	..	..	84	3	47·61	84
85	14	3	64	4	..	..	..	..	..	..	85	3	75·29	85
86	4	21	43	7	11	1	..	..	..	..	87	3	49·42	86
87	87	..	1	..	..	..	..	..	..	..	88	1	98·86	87
88	72	8	1	..	..	..	..	..	..	..	81	1	88·88	88
89	50	32	4	..	..	..	..	..	..	..	86	1	58·13	89
90	50	32	5	..	..	..	..	..	..	..	87	1	57·47	90

GROUP B.

Principals of H.S.C. Colleges. Head Masters of High Schools (General Type).

No. of questionnaire Sent....5134.

No. of Respondents..1622.

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Tot.	Max.	Per.	Sl. No.
1	41	597	473	23	413	70	..	..	..	..	1,617	2	36·92	1
2	127	109	598	215	413	54	101	..	..	..	1,617	3	36·98	2
3	186	1,068	313	20	33	..	..	..	..	..	1,620	2	65·92	3
4	1,320	225	62	..	..	..	..	..	..	..	1,607	1	82·14	4
5	233	224	56	72	621	241	46	..	..	..	1,493	5	41·59	5
6	1,056	64	362	25	..	..	..	..	..	..	1,507	1	70·07	6
7	691	443	184	181	108	..	..	..	..	..	1,607	1	42·99	7
8	310	822	62	95	50	..	..	..	..	..	1,339	2	61·38	8
9	651	133	341	93	..	..	..	..	..	..	1,218	1	53·44	9
10	558	473	211	..	..	..	..	..	..	..	1,242	1	44·92	10
11	211	219	103	15	19	401	543	105	..	..	1,616	7	33·66	11
12	493	317	55	722	29	..	..	..	..	..	1,616	4	44·67	12
13	121	32	50	390	935	88	..	..	..	..	1,616	5	57·85	13
14	549	980	2	87	..	..	..	..	..	..	1,618	2	60·56	14
15	247	755	47	36	212	252	..	..	..	..	1,549	2	48·74	15

16	371	52	356	406	..	..	..	..	..	..	1,185	4	34·26	16
17	80	349	1,114	61	..	..	..	..	..	..	1,604	3	69·45	17
18	103	743	578	63	120.	..	..	..	..	..	1,607	2	46·23	18
19	34	303	758	430	75	..	..	..	..	..	1,600	3	47·37	19
20	1,058	87	377	85	..	..	..	..	..	..	1,607	1	65·83	20
21	849	636	116	..	..	..	..	..	..	..	1,601	1	53·02	21
22	1,578	15	20	..	..	..	..	..	..	..	1,613	1	97·83	22
23	150	224	1,134	102	..	..	..	..	..	..	1,610	3	70·43	23
24	493	28	26	1,006	58.	..	..	..	..	..	1,611	4	62·44	24
25	1,482	89	43	..	..	..	..	..	..	..	1,614	1	91·82	25
26	615	841	153	..	..	..	..	..	..	..	1,609	2	52·26	26
27	551	234	644	74	108.	..	..	..	..	..	1,611	3	39·97	27
28	496	868	37	148	66	..	..	..	..	..	1,615	2	53·74	28
29	794	458	315	40	..	..	..	..	..	..	1,607	1	49·40	29
30	182	461	467	378	70	..	..	..	..	.	1,558	3	29·97	30
31	884	326	237	..	..	..	..	..	..	..	1,447	1	61·09	31
32	469	378	132	214	180	107	47.	..	..	..	1,527	1	30·71	32
33	267	997	236	13	..	..	..	..	..	..	1,513	2	65·89	33
34	262	257	323	291	269	36	..	..	..	..	1,438	3	22·46	34
35	267	353	825	152	11	..	..	..	..	..	1,608	3	51·30	35
36	563	1,000	41	..	..	..	..	..	..	..	1,604	2	62·34	36
37	1,385	201	24								1,607	1	86·18	37

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(Tot).	Max.	Per.	Sl. No.
38	484	1,035	87	..	..	..	..	..	..	..	1,606	2	64·44	38
39	622	667	195	..	..	..	..	..	..	..	1,484	2	44·94	39
40	1,073	504	31	..	..	..	..	..	..	..	1,608	1	66·72	40
41	1,604	7	5	..	..	..	..	..	..	..	1,616	1	99·25	41
42	1,103	465	26	16	..	..	..	..	..	..	1,610	1	68·50	42
43	1,464	67	77	..	..	..	..	..	..	..	1,608	1	91·04	43
44	1,022	487	46	..	..	..	..	..	..	..	1,555	1	65·72	44
45	7	34	188	119	275	994	..	..	..	..	1,617	6	61·47	45
46	271	776	426	88	..	..	..	..	..	..	1,561	2	49·71	46
47	1,244	214	143	..	..	..	..	..	..	..	1,601	1	77·70	47
48	20	190	18	254	105	184	620	103	47	73	1,614	7	38·41	48
49	156	119	231	957	122	..	..	..	..	..	1,585	4	60·37	49
50	909	607	78	..	..	..	..	..	..	..	1,594	1	57·02	50
51	1,402	180	30	..	..	..	..	..	..	..	1,612	1	86·97	51
52	558	823	206	..	..	..	..	..	..	..	1,587	2	51·85	52
53	978	578	35	..	..	..	..	..	..	..	1,591	1	61·47	53
54	1,059	465	76	..	..	..	..	..	..	..	1,600	1	66·18	54
55	960	562	65	..	..	..	..	..	..	..	1,587	1	60·49	55
56	1,464	75	6	..	..	..	..	..	..	..	1,545	1	94·75	56

57	1,413	137	7	..	..	..	..	..	..	..	1,557	1	90·75	57
58	1,418	143	41	..	..	..	..	..	..	..	1,602	1	88·51	58
59	73	232	76	1,162	51	..	..	..	..	..	1,594	4	72·89	59
60	1,506	86	10	..	..	..	..	..	..	..	1,602	1	94·00	60
61	818	33	458	283	20	..	..	..	..	..	1,612	1	50·74	61
62	63	673	807	70	..	..	..	..	..	..	1,613	3	50·03	62
63	505	1,046	57	..	..	..	..	..	..	..	1,608	2	65·04	63
64	406	1,146	57	..	..	..	..	..	..	..	1,609	2	71·22	64
65	1,084	473	52	..	..	..	..	..	..	..	1,609	1	67·37	65
66	1,190	340	81	..	..	..	..	..	..	..	1,611	1	73·86	66
67	1,140	173	235	25	..	..	..	..	..	..	1,573	1	72·47	67
68	925	477	114	37	..	..	..	..	..	..	1,553	1	59·56	68
69	41	292	491	55	152	531	49	..	..	..	1,611	6	32·96	69
70	479	1,032	44	42	..	..	..	..	..	..	1,597	2	64·62	70
71	459	114	391	273	154	124	86	..	..	..	1,601	1	28·66	71
72	266	1,260	80	..	..	..	..	..	..	..	1,606	2	78·45	72
73	1,511	63	30	..	..	..	..	..	..	..	1,604	1	94·20	73
74	1,054	344	84	61	5	61	..	..	..	..	1,609	1	65·50	74
75	728	385	342	55	..	..	..	..	..	..	1,510	1	48·21	75
76	1,017	460	52	..	..	..	..	..	..	....	1,529	1	66·51	76
77	260	299	1,000	7	..	..	..	..	..	..	1,566	3	63·85	77
78	718	151	596	29	..	..	..	..	..	..	1,494	1	48·05	78

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
79	1,453	89	25	..	..	..	..	..	..	..	1,567	1	92·72	79
80	734	704	127	32	..	..	..	..	..	..	1,597	1	45·96	80
81	707	660	68	..	..	..	..	..	..	..	1,435	1	49·26	81
82	384	1,021	132	..	..	..	..	..	..	..	1,537	2	66·42	82
83	482	101	925	38	5	..	..	..	..	..	1,551	3	59·63	83
84	356	299	885	24	..	..	..	..	..	..	1,564	3	56·58	84
85	326	116	1,099	23	..	..	..	..	..	..	1,564	3	70·26	85
86	29	475	882	60	122	40	..	..	..	..	1,608	3	54·85	86
87	1,519	56	28	..	..	..	..	..	..	..	1,603	1	94·75	87
88	1,382	119	34	..	..	..	..	..	..	..	1,535	1	90·03	88
89	882	672	51	..	..	..	..	..	..	..	1,605	1	54·95	89
90	919	620	47	..	..	..	..	..	..	..	1,586	1	57·94	90

GROUP C.

Associations/Bodies of Teachers (General Educational Institutions).

No. of questionnaire Sent .. 1021

No. of Respondents.. 319

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Total	Max.	Per.	Per.	Serial No.
1	17	19	149	5	114	14	..	..	..	..	318	3	46·85	1
2	38	25	168	10	59	10	9	..	..	..	319	3	52·66	2
3	32	222	58	2	5	..	..	..	..	..	319	2	69·50	3
4	260	47	8	..	..	..	..	..	..	..	315	1	82·53	4
5	39	36	13	14	139	41	11	..	..	..	293	5	47·44	5
6	225	8	60	4	..	..	..	..	..	..	297	1	75·75	6
7	115	116	21	39	21	..	..	..	..	.	312	2	37·17	7
8	74	141	15	18	13	.	.	.	..	..	261	2	54·02	8
9	111	29	58	19	..	..	..	..	..	..	217	1	51·15	9
10	110	82	36	..	..	..	..	..	..	..	228	1	48·24	10
11	46	68	10	..	..	73	92	26	..	..	315	7	29·20	11
12	85	68	10	148	6	..	..	..	..	..	317	4	48·68	12
13	26	8	10	94	161	19	..	..	..	..	318	5	50·62	13
14	137	167	..	..	14	..	..	..	..	..	318	2	52·51	14
15	47	161	12	4	44	33	..	..	..	..	301	2	53·48	15
16	71	1	89	67	..	..	..	..	..	..	228	3	39·03	16

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Sl. No.
17	19	93	197	7	..	..	..	..	..	..	316	3	62·34	17
18	29	112	146	14	17	..	..	..	..	..	318	3	45·91	18
19	9	68	139	89	11	..	..	..	..	..	316	3	43·98	19
20	200	28	74	13	..	..	..	..	..	..	315	1	63·49	20
21	165	115	29	..	..	..	..	..	..	..	309	1	53·39	21
22	304	8	4	..	..	..	..	..	..	..	316	1	96·20	22
23	33	45	214	25	..	..	..	..	..	..	317	3	67·50	23
24	96	1	6	202	13	..	..	..	..	..	318	4	63·52	24
25	304	9	3	..	..	..	..	..	..	..	316	1	96·20	25
26	121	167	29	..	..	..	..	..	..	..	317	2	52·68	26
27	130	38	120	14	14	..	..	..	..	..	316	1	41·13	27
28	137	139	10	23	9	..	..	..	..	..	318	2	43·71	28
29	151	82	76	8	..	..	..	..	..	..	317	1	47·63	29
30	45	93	82	78	12	..	..	..	..	..	310	2	30·00	30
31	171	79	46	..	..	..	..	..	..	..	296	1	57·77	31
32	97	71	33	34	27	32	9	..	..	..	303	1	32·01	32
33	38	187	62	8	..	..	..	..	..	..	295	2	63·38	33
34	49	50	59	59	49	11	..	..	..	..	277	4	21·29	34
35	35	56	201	18	2	..	..	..	..	..	312	3	64·42	35
36	119	178	14	..	..	..	..	..	..	..	311	2	57·23	36

37	273	39	5	..	..	..	..	..	..	..	317	1	86·11	37
38	95	203	15	..	..	..	..	..	..	..	313	2	64·85	38
39	122	125	37	..	..	..	..	..	..	..	284	2	44·01	39
40	198	111	4	..	..	..	..	..	..	..	313	1	63·25	40
41	318	..	..	..	..	..	..	..	..	..	318	1	100·00	41
42	227	88	2	..	..	..	..	..	..	..	317	1	71·60	42
43	285	19	11	..	..	..	..	..	..	..	315	1	90·47	43
44	197	104	11	..	..	..	..	..	..	..	312	1	63·14	44
45	..	11	40	26	51	190	..	..	..	..	318	6	59·74	45
46	47	159	92	15	..	..	..	..	..	..	313	2	50·79	46
47	267	34	17	..	..	..	..	..	..	..	318	1	83·96	47
48	4	31	5	46	22	30	149	14	2	10	318	7	47·60	48
49	32	22	50	170	21	..	..	..	..	..	295	4	57·62	49
50	185	119	6	..	..	..	..	..	..	..	310	1	59·67	50
51	280	27	5	..	..	..	..	..	..	..	312	1	89·74	51
52	108	169	35	..	..	..	..	..	..	..	312	2	54·16	52
53	203	103	7	..	..	..	..	..	..	..	313	1	64·85	53
54	216	85	11	..	..	..	..	..	..	..	312	1	69·23	54
55	194	103	11	..	..	..	..	..	..	..	308	1	62·98	55
56	282	14	3	..	..	..	..	..	..	..	299	1	94·31	56
57	273	32	2	..	..	..	..	..	..	..	307	1	88·92	57
58	292	18	5	..	..	..	..	..	..	..	315	1	92·69	58

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
59	13	38	9	24	10	..	..	..	..	..	315	4	77·77	59
60	294	14	5	..	..	..	..	..	..	..	313	1	93·92	60
61	152	7	109	40	3	..	..	..	..	..	311	1	43·87	61
62	30	120	146	20	..	..	..	..	..	..	316	3	46·20	62
63	90	211	13	..	..	..	..	..	..	..	314	2	67·19	63
64	101	201	9	..	..	..	..	..	..	..	311	2	64·63	64
65	235	72	5	..	..	..	..	..	..	..	312	1	75·32	65
66	248	49	15	..	..	..	..	..	..	..	312	1	79·48	66
67	212	23	67	7	..	..	..	..	..	..	309	1	68·60	67
68	205	3	20	1	..	..	..	..	..	..	309	1	66·34	68
69	10	48	80	6	35	124	10	..	..	..	313	6	39·61	69
70	64	217	18	12	..	..	..	..	..	..	311	2	69·77	70
71	104	22	79	50	20	19	20	..	..	..	314	1	33·12	71
72	58	230	23	..	..	..	..	..	..	..	311	2	73·93	72
73	298	8	5	..	..	..	..	..	..	..	311	1	95·81	73
74	203	68	12	14	4	11	..	..	..	..	312	1	65·06	74
75	149	58	70	7	..	..	..	..	..	..	284	1	52·46	75
76	182	102	12	..	..	..	..	..	..	..	296	1	61·48	76
77	43	54	206	1	..	..	..	..	..	..	304	3	67·76	77
78	139	23	122		..	..	..	..	..	..	292	1	47·60	78

79	270	25	6	..	..	..	..	..	..	..	301	1	89·70	79
80	135	147	22	5	..	..	..	..	..	..	309	2	47·57	80
81	130	137	19	..	..	..	..	..	..	..	286	2	47·90	81
82	78	195	31	..	..	..	..	..	..	..	304	2	64·14	82
83	102	13	185	5	..	..	..	..	..	..	305	3	60·65	83
84	73	54	169	9	..	..	..	..	..	..	305	3	55·40	84
85	52	26	223	6	..	..	..	..	..	..	307	3	72·63	85
86	13	90	174	8	28	3	..	..	..	..	316	3	55·06	86
87	297	8	3	..	..	..	..	..	..	..	308	1	96·42	87
88	275	21	7	..	..	..	..	..	..	..	303	1	90·75	88
89	178	125	11	..	..	..	..	..	..	..	314	1	56·68	89
90	177	122	12	..	..	..	..	..	..	..	311	1	56·91	90

GROUP D.

Degree College Student Unions and various Student Organisations.

No. of questionnaire Sent .. 210

No. of Respondents .. 4.

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Sl. No.
1	..	1	2	..	1	..	..	..	..	..	4	3	50·00	1
2	..	1	2	..	..	..	1	..	..	..	4	3	50·00	2
3	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	100·00	3
4	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	4
5	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	3	5	66·66	5
6	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	1	66·66	6
7	2	1	..	1	..	..	..	..	..	..	4	1	50·00	7
8	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	100·00	8
9	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	3	66·66	9
10	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	10
11	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	4	7	50·00	11
12	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	4	4	75·00	12
13	1	..	..	2	1	..	..	..	..	..	4	4	50·00	13
14	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	14
15	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	75·00	15

16	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	4	50·00	16
17	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	17
18	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	18
19	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	4	4	50·00	19
20	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	20
21	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	21
22	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	22
23	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	23
24	1	..	..	3	..	..	..	..	..	..	4	4	75·00	24
25	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	25
26	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	26
27	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	27
28	2	1	..	1	..	..	..	..	..	..	4	1	50·00	28
29	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	29
30	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	3	2	66·66	30
31	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	3	3	33·33	31
32	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	3	5	33·33	32
33	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	100·00	33
34	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	3	4	33·33	34
35	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	4	3	75·00	35
36	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	100·00	36
37	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	37

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per	Sreial No.
38	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	38
39	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	3	3	33·33	39
40	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	40
41	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	41
42	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	42
43	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	43
44	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	75·00	44
45	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	4	6	50·00	45
46	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	46
47	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	47
48	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	4	7	50·00	48
49	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	4	4	75·00	59
50	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	50
51	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	51
52	2	2	1	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	52
53	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	53
54	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	54
55	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	55
56	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	100·00	56

57	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	100·00	57
58	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	100·00	58
59	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	3	4	100·00	59
60	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	60
61	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	61
62	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	62
63	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	100·00	63
64	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	100·00	64
65	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	65
66	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	66
67	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	67
68	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	68
69	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	4	3	75·00	69
70	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	75·00	70
71	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	71
72	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	4	3	50·00	72
73	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	73
74	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	75·00	74
75	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	3	4	33·33	75
76	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	66·66	76
77	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	3	100·00	77
78	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	3	4	33·33	78

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Sl. No.
79	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	10·00	79
80	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	66·66	80
81	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	66·66	81
82	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	66·66	82
83	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	3	100·00	83
84	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	4	3	75·00	84
85	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	3	66·66	85
86	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	4	3	75·00	86
87	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	100·00	87
88	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	100·00	88
89	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	89
90	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	50·00	90

GROUP E.

Officers of the Directorate of Public Instruction and others involved in General Education.

No. of questionnaire sent 556

No. of Respondents .. 299

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
1	33	29	200	4	21	7	..	..	..	..	294	3	68·02	1
2	62	42	122	14	31	8	19	..	..	..	298	3	40·93	2
3	12	238	44	1	3	..	..	..	..	..	298	2	79·86	3
4	228	47	16	...	...	...	..	...	...	..	291	1	78·55	4
5	30	30	13	7	124	49	10	..	..	..	263	5	47·14	5
6	166	8	84	7	..	..	..	..	..	..	265	1	62·64	6
7	107	114	44	19	14	..	..	..	..	..	298	2	38·25	7
8	73	142	15	15	10	..	..	..	..	..	255	2	55·68	8
9	124	37	62	20	..	..	..	..	..	..	243	1	51·02	9
10	130	80	27	..	..	..	..	..	..	..	237	1	54·85	10
11	69	74	9	..	2	76	44	24	..	..	298	6	25·50	11
12	73	65	13	145	2	..	..	..	..	..	298	4	48·65	12
13	38	8	5	75	153	19	..	..	..	..	298	5	51·34	13
14	152	139	..	8	..	..	..	..	..	..	299	1	50·83	14
15	67	127	13	8	40	34	..	..	..	..	289	2	43·94	15

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
16	69	8	86	68	..	..	..	..	..	..	231	3	37·22	16
17	3	49	236	9	..	..	..	..	..	..	297	3	79·46	17
18	10	122	150	3	14	..	..	..	..	..	299	3	50·16	18
19	3	66	142	71	15	..	..	..	..	..	297	3	47·81	19
20	209	15	51	24	..	..	..	..	..	..	299	1	69·89	20
21	175	99	21	..	..	..	..	..	..	..	295	1	59·32	21
22	291	2	6	..	..	..	..	..	..	..	299	1	97·32	22
23	13	26	215	45	..	..	..	..	..	..	299	3	71·90	23
24	93	2	5	187	10	..	..	..	..	..	297	4	62·96	24
25	274	20	5	..	..	..	..	..	..	..	299	1	91·63	25
26	104	172	21	..	..	..	..	..	..	..	297	2	57·91	26
27	114	48	100	14	20	..	..	..	..	..	296	1	38·51	27
28	108	142	10	26	13	..	..	..	..	..	299	2	47·49	28
29	149	68	75	6	..	..	..	..	..	..	298	1	50·00	29
30	47	81	86	65	9	..	..	..	..	..	288	3	29·86	30
31	179	53	40	..	..	..	..	..	..	..	272	1	65·80	31
32	98	45	32	31	29	39	6	..	..	..	280	1	35·00	32
33	46	165	63	1	..	..	..	..	..	..	275	2	60·00	33
34	38	51	64	47	60	6	..	..	..	..	266	3	24·06	34

35	40	57	172	22	..	..	..	..	..	..	296	3	58·10	35	
36	125	164	5	..	..	..	..	..	..	..	294	2	55·78	36	
37	258	32	3	..	..	..	..	..	..	..	293	1	88·90	37	
38	146	137	14	..	..	..	..	..	..	..	297	1	49·15	38	
39	90	156	29	..	..	..	..	..	..	..	275	2	56·72	39	
40	210	80	5	..	..	..	..	..	..		295	1	71·18	40	
41	294	3	..	..	..	..	..	..	..	..	297	1	98·98	41	
42	211	83	1	2	..	..	..	..	..	..	297	1	71·04	42	
43	232	46	14	..	..	..	..	..	..	..	292	1	79·45	43	
44	190	92	8	..	..	..	..	..	..	..	290	1	65·51	44	
45	..	10	48	24	55	160	..	..	..	..	297	6	53·87	45	
46	33	177	73	12	..	..	..	..	..	..	295	2	60·00	46	
47	228	47	24	..	..	..	..	..	..	..	299	1	76·25	47	
48	8	29	8	41	24	21	132	18	8	12	296	7	44·59	48	
49	30	22	44	168	26	..	..	..	..	..	290	4	57·93	49	
50	169	115	10	..	..	..	..	..	..	..	294	1	57·48	50	
51	242	47	7	..	..	..	..	..	..	..	296	1	81·75	51	
52	117	140	36	..	..	..	..	..	..	..	293	2	47·78	52	
53	198	90	8	..	..	..	..	..	..	..	296	1	66·89	53	
54	236	49	10	..	..	..	..	..	..	..	295	1	80·00	54	
55	194	93	7	..	..	..	..	..	..	..	294	1	65·98	55	
56	275	10	3	..	..	..	..	..	..	..	288	1	95·48	56	

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
57	256	31	3	..	..	..	..	..	..	..	290	1	88·27	57
58	282	10	4	..	..	..	..	..	..	..	296	1	95·27	58
59	7	29	17	241	2	..	..	..	..	..	296	4	81·41	59
60	269	22	1	..	..	..	..	..	..	..	292	1	92·12	60
61	150	6	86	51	3	..	..	..	..	..	296	1	50·67	61
62	6	106	175	11	..	..	..	..	..	..	298	3	58·72	62
63	105	182	10	..	..	..	..	..	..	..	297	2	61·27	63
64	107	185	5	..	..	..	..	..	..	..	297	2	62·28	64
65	208	81	6	..	..	..	..	..	..	..	295	1	70·50	65
66	246	43	8	..	..	..	..	..	..	..	297	1	82·82	66
67	237	22	31	4	..	..	..	..	..	..	294	1	80·61	67
68	133	129	25	4	..	..	..	..	..	..	291	1	45·70	68
69	9	43	82	12	28	113	9	..	..	..	296	6	38·17	69
70	81	191	12	11	..	..	..	..	..	..	295	2	64·75	70
71	114	28	59	46	20	21	10	..	..	..	298	1	38·25	71
72	58	219	20	..	..	..	..	..	..	..	297	2	73·73	72
73	285	9	3	..	..	..	..	..	..	..	297	1	95·95	73
74	188	64	14	13	2	16	..	..	..	..	297	1	63·29	74
75	158	59	57	3	..	..	..	..	..	..	277	1	57·03	75

76	215	66	6	..	..	..	..	..	..	..	287	1	74·91	76
77	65	56	170	..	..	..	..	..	..	..	291	3	58·41	77
78	137	37	90	9	..	..	..		..	..	273	1	50·18	78
79	269	10	2	..	..	..	..	..	..	..	281	1	95·72	79
80	117	138	29	10	..	..	..	..	..	..	294	2	46·93	80
81	118	133	15	..	..	..	..	..	..	..	266	2	50·00	81
82	70	195	20	..	..	..	..	..	..	..	285	2	68·42	82
83	104	17	162	7	..	..	..	..	..	..	290	3	55·86	83
84	70	32	165	3	..	..	..	..	..	..	290	3	56·89	84
85	67	19	203	2	..	..	..	..	..	..	291	3	69·75	85
86	11	83	155	10	29	10	..	..	..	..	298	3	52·01	86
87	274	16	2	..	..	..	..	..	..	..	292	1	93·83	87
88	244	31	9	..	..	..	..	..	..	..	284	1	85·91	88
89	151	139	6	..	..	..	..	..	..	..	296	1	51·01	89
90	159	127	6	..	..	..	..	..	..	..	292	1	54·45	90

GROUP F

Vice-Chancellor, 4 Professors of Engineering University, Principals, of Engineering Colleges, Polytechnic Institutes, Monotechnic Institutes, Teachers' Associations of Engineering Colleges, Polytechnic Institutes, etc., Officers involved in Technical Education, Engineers, Engineering Students Unions, etc.

No. of questionnaire Sent.....215

No. of Respondents...104

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Tot.	Max.	Per.	Serial No.
1	6	20	59	4	6	8	..	..	..	..	103	3	57·28	1
2	15	6	63	1	13	1	4	..	..	..	103	3	61·16	2
3	12	66	22	..	4	..	..	..	..	..	104	2	63·46	3
4	85	12	1	..	..	..	..	..	..	..	98	1	86·73	4
5	8	29	4	14	30	11	2	..	..	..	98	5	30·61	5
6	69	6	22	17	..	..	..	..	..	..	98	1	70·40	6
7	21	40	16	17	10	..	..	..	..	..	104	2	38·46	7
8	7	42	8	11	5	..	..	..	..	..	73	2	57·53	8
9	36	6	12	5	..	..	..	..	..	..	59	1	61·01	9
10	19	26	14	..	..	..	..	..	..	..	59	2	44·06	10
11	15	15	1	2	..	25	33	11	..	..	102	7	32·35	11
12	26	14	5	56	2	..	..	..	..	..	108	4	54·36	12
13	11	1	3	35	40	13	..	..	..	..	103	5	38·83	13
14	54	42	1	6	..	..	..	..	..	..	103	1	52·42	14

15	21	26	3	6	19	15	..	..	..	..	90	2	28·88	15
16	18	5	20	27	..	..	..	..	..	..	70	4	38·57	16
17	8	24	61	7	..	..	..	..	..	..	100	3	61·00	17
18	24	33	28	7	7	..	..	..	..	..	99	2	33·33	18
19	7	13	40	36	3	..	..	..	..	..	99	3	40·40	19
20	42	18	36	6	..	..	..	..	..	..	102	1	41·17	20
21	35	59	5	..	..	..	..	..	..	..	99	4	59·59	21
22	101	1	1	..	..	..	..	..	..	..	103	1	98·05	22
23	22	35	42	4	..	..	..	..	..	..	103	3	40·77	23
24	35	1	..	63	1	..	..	..	..	..	100	4	63·00	24
25	99	1	2	..	..	..	..	..	..	..	102	1	97·05	25
26	62	29	8	..	..	..	..	..	..	..	99	1	62·62	26
27	37	25	29	..	10	..	..	..	..	..	101	1	36·63	27
28	13	73	1	2	10	..	..	..	..	..	99	2	73·73	28
29	32	14	48	8	..	..	..	..	..	..	102	3	47·05	29
30	7	24	8	38	24	..	..	..	..	..	101	4	37·62	30
31	42	6	52	..	..	..	..	..	..	..	100	3	52·00	31
32	14	15	4	2	1	35	31	..	..	..	102	6	34·31	32
33	8	62	21	10	..	..	..	..	..	..	101	2	61·38	33
34	18	19	12	7	4	41	..	..	..	..	101	6	40·59	34
35	21	17	51	9	4	..	..	..	..	..	102	3	50·00	35
36	26	70	5	..	..	..	..	..	..	..	101	2	69·30	36

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Tot.	Max.	Per.	Serial No.
37	74	23	2	..	..	..	..	..	..	..	99	1	74·74	37
38	29	64	5	..	..	..	..	..	..	..	98	2	65·30	38
39	32	40	16	..	..	..	..	..	..	..	88	2	45·45	39
40	76	21	2	..	..	..	..	..	..	..	99	1	76·76	40
41	99	2	1	..	..	..	..	..	..	..	102	1	97·05	41
42	64	35	..	3	..	..	..	..	..	..	102	1	62·74	42
43	85	5	11	..	..	..	..	..	..	..	101	1	84·15	43
44	59	5	4	..	..	..	..	..	..	..	85	1	69·41	44
45	..	6	24	7	14	48	..	..	..	..	99	6	48·48	45
46	12	49	25	2	..	..	..	..	..	..	88	2	55·68	46
47	87	10	6	..	..	..	..	..	..	..	103	1	84·46	47
48	3	8	1	19	7	11	31	14	2	3	99	7	31·31	48
49	5	3	19	61	7	..	..	..	..	..	95	4	64·21	49
50	60	27	11	..	..	..	..	..	..	..	98	1	61·22	50
51	88	9	3	..	..	..	..	..	..	..	100	1	88·00	51
52	42	46	11	..	..	..	..	..	..	..	99	2	46·46	52
53	66	26	7	..	..	..	..	..	..	..	99	1	66·66	53
54	67	21	11	..	..	..	..	..	..	..	99	1	67·67	54
55	60	31	6	..	..	..	..	..	..	..	97	1	61·85	55

56	91	1	..	..	..	..	..	..	..	..	92	1	98·91	56
57	82	10	2	..	..	..	..	..	..	..	94	1	87·23	57
58	94	4	2	..	..	..	..	..	..	..	100	1	94·00	58
59	3	10	5	79	3	..	..	..	..	..	100	4	97·00	59
60	94	4	4	..	..	..	..	..	..	..	102	1	92·15	60
61	55	3	23	18	2	..	..	..	..	..	101	1	54·45	61
62	8	31	55	8	..	..	..	..	..	..	102	3	53·92	62
63	29	62	6	..	..	..	..	..	..	..	97	2	63·91	63
64	25	69	4	..	..	..	..	..	..	..	98	2	70·40	64
65	71	23	2	..	..	..	..	..	..	..	96	1	73·95	65
66	86	6	8	..	..	..	..	..	..	..	100	1	86·00	66
67	85	2	12	1	..	..	..	..	..	..	100	1	85·00	67
68	41	40	7	0	2	..	..	..	..	..	90	1	45·55	68
69	2	23	11	5	16	38	2	..	..	..	97	6	39·17	69
70	38	46	7	3	3	..	..	..	..	..	94	2	48·93	70
71	17	8	31	22	10	6	5	..	..	..	99	3	31·31	71
72	14	73	12	6	..	..	..	..	..	..	99	2	73·73	72
73	91	4	4	1	..	..	..	..	..	..	99	1	91·91	73
74	51	31	6	2	9	1	4	..	..	..	102	1	50·00	74
75	32	26	14	7	..	..	..	..	..	..	79	1	40·50	75
76	54	32	2	..	..	..	..	..	..	..	88	1	61·36	76
77	18	14	68	1	..	..	..	..	..	..	101	3	67·32	77

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
78	48	9	31	4	..	..	..	..	..	..	92	1	52·17	78
79	89	7	5	..	..	..	..	..	..	..	101	1	88·11	79
80	57	28	11	3	..	..	..	..	..	..	99	1	57·57	80
81	28	31	10	..	..	..	..	..	..	..	69	2	44·92	81
82	29	48	16	..	..	..	..	..	..	..	93	2	51·61	82
83	27	5	58	..	4	..	..	..	..	..	94	3	61·70	83
84	37	17	36	6	..	..	..	..	..	..	96	1	38·54	84
85	25	6	60	4	..	..	..	..	..	..	95	3	63·15	85
86	2	35	45	8	11	2	..	..	..	..	103	3	43·68	86
87	98	1	1	..	..	..	..	..	..	..	100	1	98·00	87
88	80	7	2	..	..	..	..	..	..	..	89	1	89·88	88
89	40	56	6	..	..	..	..	..	..	..	102	2	54·90	89
90	45	46	8	..	..	..	..	..	..	..	99	2	46·46	90

GROUP G.

Principals and Professors of Medical Colleges, Doctors and their Association, Medical College Students Union, etc.

No. of questionnaire Sent...185
No. of Respondents...52

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
1	4	5	15	..	1	1		..	..	..	26	3	57·69	1
2	9	..	11	..	2	2	2	..	..	..	26	3	42·30	2
3	1	14	10	..	1	..	..	..	..	..	26	2	53·84	3
4	21	4	1	..	..	..	..	..	..	..	26	1	80·76	4
5	5	4	..	3	6	2	2	..	..	..	22	5	27·27	5
6	13	3	5	1	..	..	..	..	..	..	22	1	59·09	6
7	10	11	3	..	2	..	..	..	..	..	26	2	42·30	7
8	3	11	2	2	3	..	..	..	..	..	21	2	52·38	8
9	7	1	1	4	..	..	..	..	..	..	13	1	53·84	9
10	5	5	6	...	...	...	...	...	...	...	16	3	37·50	10
11	2	..	..	..	..	13	10	1	..	..	26	6	50·00	11
12	1	7	1	16	1	..	..	...	..	..	26	4	1·53	12
13	1	2	1	11	9	2	..	..	..	..	26	4	42·30	13
14	4	20	..	2	..	..	..	..	..	..	26	2	76·92	14
15	2	12	1	1	13	2	..	..	..	..	21	2	57·14	15

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
16	5	..	3	10	..	..	..	..	..	..	18	4	55·55	16
17	5	10	10	1	..	..	..	..	..	..	26	3	38·46	17
18	8	8	1	3	5	..	..	..	..	..	25	2	32·00	18
19	3	1	16	3	3	..	..	..	..	..	26	3	61·53	19
20	16	4	5	..	..	..	..	..	..	..	25	1	64·00	20
21	7	14	5	..	..	..	..	..	..	..	26	2	53·84	21
22	25	..	1	..	..	..	..	..	..	..	26	1	96·15	22
23	5	4	14	3	..	..	..	..	..	..	26	3	53·84	23
24	7	..	1	8	1	..	..	..	..	..	26	4	69·23	24
25	24	1	..	..	..	..	..	..	..	..	25	1	96·00	25
26	14	7	5	..	..	..	..	..	..	..	26	1	53·84	26
27	9	3	10	2	2	..	..	..	..	..	26	3	38·46	27
28	8	12	..	1	2	..	..	..	..	..	25	2	48·00	28
29	6	8	9	2	..	..	..	..	..	..	25	3	36·00	29
30	4	5	13	3	1	..	..	..	..	..	26	5	42·30	30
31	12	1	11	..	..	..	..	..	..	..	24	1	50·00	31
32	11	8	..	3	..	..	..	..	..	..	26	1	42·30	32
33	3	23	..	..	..	..	..	..	..	..	26	2	88·46	33
34	9	..	1	4	3	3	6	..	..	..	23	1	39·13	34

35	2	8	11	3	2	..	..	..	..	..	26	3	42·30	35			
36	9	15	1	..	..	..	..	..	..	..	25	2	60·00	36			
37	19	6	..	..	..	..	..	..	..	..	25	1	76·00	37			
38	10	15	1	..	..	..	..	..	..	..	26	2	57·69	38			
39	8	11	2	..	..	..	..	..	..	..	26	1	52·38	39			
40	21	4	1	1	..	..	..	..	..	..	26	1	80·76	40			
41	26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	26	1	100·00	41			
42	18	8	..	..	..	..	..	..	..	..	26	1	69·23	42			
43	18	2	6	..	..	..	..	..	..	..	26	1	69·23	43			
44	22	2	1	..	..	..	..	..	..	..	25	1	88·00	44			
45	..	2	12	1	5	6	..	..	..	..	26	3	46·15	45			
46	2	15	5	4	..	..	..	..	..	..	26	2	57·69	46			
47	18	5	2	..	..	..	..	..	..	..	25	1	72·00	47			
48	..	1	..	4	8	..	8	1	3	1	26	7	30·76	43			
49	3	..	11	9	..	..	..	..	..	..	23	3	47·82	49			
50	7	13	6	..	..	..	..	..	..	..	26	2	50·00	50			
51	18	6	2	..	..	..	..	..	..	..	26	1	69·23	51			
52	2	17	6	..	..	..	..	..	..	..	25	2	88·00	52			
53	13	10	3	..	..	..	..	..	..	..	26	1	50·00	53			
54	15	7	4	..	..	..	..	..	..	..	26	1	57·69	54			
55	13	9	4	..	..	..	..	..	..	..	26	1	50·00	55			
56	25	..	..	..	..	..	..	..	..	..	25	1	100·00	56			
57	21	3	2	..	..	..	..	..	..	..	26	1	80·76	57			

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
58	21	4	..	..	..	..	..	..	..	..	25	1	84·00	58
59	..	8	2	12	2	..	..	..	..	..	24	4	50·00	59
60	23	2	1	..	..	..	..	..	..	..	26	1	88·46	60
61	14	1	7	4	..	..	..	..	..	..	26	1	53·84	61
62	4	7	13	2	..	..	..	..	..	..	26	3	50·00	62
63	12	10	3	..	..	..	..	..	..	..	25	1	48·00	63
64	10	11	5	..	..	..	..	..	..	..	26	2	42·30	64
65	17	6	2	..	..	..	..	..	..	..	25	1	68·00	65
66	21	5	..	..	..	..	..	..	..	..	26	1	80·76	66
67	12	2	11	1	..	..	..	..	..	..	6	1	46·15	67
68	12	12	1	1	..	..	..	..	..	..	26	2	46·15	68
69	1	4	8	..	2	8	3	..	..	..	26	6	30·76	69
70	12	11	2	1	..	..	..	..	..	..	26	1	46·19	70
71	2	..	4	5	6	4	5	..	..	..	26	9	23·07	71
72	9	16	1	..	..	..	..	..	..	..	26	2	61·53	72
73	24	..	2	..	..	..	..	..	..	..	26	1	92·30	73
74	11	9	3	1	..	2	..	..	..	..	26	1	42·30	74
75	8	11	1	3	..	..	..	..	..	..	23	2	47·82	75
76	14	6	4	..	..	..	..	..	..	..	24	1	58·33	76
77	2	1	22	1	..	..	..	..	..	..	26	3	84·61	77

78	7	1	16	2	..	..	..	..	..	..	26	3	61·53	78
79	24	..	2	..	..	..	..	..	..	..	26	1	92·30	79
80	18	7	1	..	..	..	..	..	..	..	26	1	69·23	80
81	12	7	1	..	..	..	..	..	..	..	20	1	60·00	81
82	12	8	6	..	..	..	..	..	..	..	26	1	46·15	82
83	9	2	15	..	..	..	..	..	..	..	26	3	57·69	83
84	15	..	4	7	..	..	..	..	..	..	26	1	57·69	84
85	3	..	21	2	..	..	..	..	..	..	26	3	80·76	85
86	1	8	12	..	5	..	..	..	..	..	26	3	48·15	86
87	24	1	..	..	..	..	..	..	..	..	25	1	96·00	87
88	22	2	..	..	..	..	..	..	..	..	24	1	91·66	88
89	10	14	2	..	..	..	..	..	..	..	26	2	53·84	89
90	13	12	1	..	..	..	..	..	..	..	26	1	50·00	90

GROUP H.

Vice-Chancellor and Professors of Agricultural University, Principal of Agricultural College, Agricultural Experts and Officers of the Agriculture Directorate, Agriculture Students Union, etc'.

No. of questionnaire Sent .. . 57

No. of Respondents 26

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
1	8	5	31	3	4	1	..	..	..	..	52	3	59·61	1
2	12	1	18	..	15	3	3	..	..	..	52	3	34·61	2
3	11	31	7	..	3	..	..	..	..	..	52	2	59·61	3
4	37	14	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	71·15	4
5	9	6	2	3	14	7	2	..	..	..	43	5	32·55	5
6	27	3	11	2	..	..	..	..	..	..	43	1	62·79	6
7	22	14	7	5	4	..	..	..	..	..	52	1	42·30	7
8	9	25	4	5	1	..	..	..	..	..	44	2	56·81	8
9	15	10	7	4	..	..	..	..	..	..	36	1	41·66	9
10	17	13	9	..	..	..	..	..	..	..	39	1	43·58	10
11	9	2	1	..	..	23	14	3	..	..	52	6	44·23	11
12	10	7	4	30	1	..	..	..	..	..	52	4	57·69	12
13	7	3	1	18	19	4	...	..	..	..	52	5	36·53	13
14	13	37	1	1	...	..	..	..	..	..	52	2	71·15	14
15	7	20	5	1	7	8	..	..	..	..	48	2	41·66	15

16	12	1	12	17	..	..	..	..	..	..	42	4	40·47	16
17	6	14	26	6	..	..	..	..	..	..	52	3	50·00	17
18	4	26	12	5	3	..	..	..	..	..	50	2	52·00	18
19	5	6	19	21	1	..	..	..	..	..	52	4	40·38	19
20	21	8	16	7	..	..	..	..	..	..	52	1	40·38	20
21	15	33	3	..	..	..	..	..	..	..	51	2	64·70	21
22	51	..	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	98·07	22
23	13	14	24	1	..	..	..	..	..	..	52	3	46·15	23
24	22	1	..	26	3	..	..	..	..	..	52	4	50·00	24
25	48	2	1	..	..	..	..	..	..	..	51	1	94·11	25
26	35	14	3	..	..	..	..	..	..	..	52	1	67·30	26
27	21	13	16	..	2	..	..	..	..	..	52	1	40·38	27
28	22	19	6	4	1	..	..	..	..	..	52	1	42·30	28
29	22	15	14	..	..	..	..	..	..	..	51	1	43·13	29
30	3	10	11	11	17	..	..	..	..	..	52	5	32·69	30
31	29	8	13	..	..	..	..	..	..	..	50	1	58·00	31
32	22	9	..	10	6	4	1	..	..	..	52	1	42·30	32
33	8	38	4	..	..	..	..	..	..	..	50	2	76·00	33
34	7	2	18	6	8	8	..	..	..	..	49	3	35·73	34
35	3	7	31	11	..	..	..	.	.		52	3	59·61	35
36	15	34	3	..	..	..	..	..	..	..	52	2	65·38	36
37	41	9	2	..	..	..	..	..	..	..	52	1	78·84	37
38	14	36	2	..	..	..	..	..	..	..	52	2	69·23	38

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
39	22	18	10	..	..	..	..	..	..	..	50	1	44·00	39
40	40	10	1	..	..	..	..	..	..	..	51	1	78·43	40
41	52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	52	1	100·00	41
42	36	14	..	2	..	..	..	..	..	..	52	1	69·23	42
43	42	3	6	..	..	..	..	..	..	..	51	1	82·35	43
44	34	10	2	..	..	..	..	..	..	..	46	1	73·91	44
45	..	3	11	7	15	16	..	..	..	..	52	6	30·76	45
46	7	32	10	2	..	..	..	..	..	..	51	2	62·74	46
47	46	5	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	88·48	47
48	1	7	..	13	4	4	15	5	..	3	52	7	28·84	48
49	4	5	2	37	3	..	..	..	..	..	51	4	72·54	49
50	26	23	2	..	..	..	..	..	..	..	51	1	50·98	50
51	38	13	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	73·07	51
52	23	22	6	..	..	..	.	.	.	..	51	1	45·09	52
53	28	21	2	2	..	..	..	..	..	..	52	1	54·90	53
54	31	15	5	..	..	..	..	..	..	..	51	1	60·78	54
55	26	25	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	50·07	55
56	47	2	1	..	..	..	..	..	..	..	50	1	94·00	56
57	47	5	..	..	..	..	..	..	..	..	52	1	90·38	57
58	48	3	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	92·30	58

59	..	4	5	40	..	..	..	..	..	..	49	4	81·63	59
60	46	6	..	..	..	..	..	..	..	..	52	1	88·46	60
61	24	..	15	12	1	..	..	..	..	..	52	1	48·15	61
62	6	19	26	1	..	..	..	..	..	..	52	3	50·00	62
63	8	40	2	..	..	..	..	..	..	..	50	2	80·00	63
64	14	34	1	..	..	..	..	..	..	..	49	2	69·53	64
65	45	7	..	..	..	..	..	..	..	..	52	1	88·53	65
66	43	6	2	..	..	..	..	..	..	..	51	1	84·31	66
67	37	5	8	1	..	..	..	..	..	..	51	1	72·54	67
68	25	18	7	1	..	..	..	..	..	..	51	1	49·01	68
69	..	10	11	1	5	24	1	..	..	..	52	6	46·15	69
70	17	26	4	4	..	..	..	..	..	..	51	2	50·98	70
71	14	4	11	11	5	5	2	..	..	..	52	1	28·92	71
72	9	36	7	..	..	..	..	..	..	..	52	2	69·23	72
73	44	7	1	..	..	..	..	..	..	..	52	1	84·61	73
74	20	21	3	4	1	2	..	..	..	..	51	2	41·17	74
75	15	16	15	1	..	..	..	..	..	..	47	2	34·04	75
76	37	11	2	..	..	..	..	..	..	..	50	1	74·00	76
77	11	8	32	1	..	..	..	..	..	..	52	3	61·53	77
78	20	5	23	2	..	..	..	..	..	..	50	3	46·00	78
79	48	2	2	..	..	..	..	..	..	..	52	1	92·30	79
80	18	21	11	2	..	..	..	..	..	..	52	2	40·38	80
81	24	17	9	..	..	..	..	..	..	..	50	1	48·00	81

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
82	13	29	10	..	..	..	..	..	..	..	52	2	55·78	82
83	10	2	25	10	5	..	..	..	..	..	52	5	48·07	83
84	13	8	8	23	..	..	..	..	..	..	52	4	44·23	84
85	8	3	35	8	..	..	..	..	..	..	52	3	63·48	85
86	..	20	23	3	5	1	..	..	..	..	52	3	44·23	86
87	48	1	3	..	..	..	..	..	..	..	52	1	92·30	87
88	42	5	1	..	..	..	..	..	..	..	48	1	87·50	88
89	26	23	2	..	..	..	..	..	..	..	51	1	50·98	89
90	23	26	1	..	..	..	..	..	..	..	50	2	52·00	90

GROUP 1,

Superintendents of Madrassas, Officers of Madrassa Education Board etc.

No. of questionnaire Sent 303

No. of Respondents.....159

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
1	17	21	60	5	35	8	..	..	..	..	146	3	41·09	1
2	27	18	42	14	32	14	4	..	..	..	151	3	27·81	2
3	17	95	33	3	2	..	..	..	..	..	150	2	63·33	3
4	111	17	9	..	..	..	..	..	..	..	137	1	81·02	4
5	21	28	3	10	54	6	4	...	..	...	126	5	42·85	5
6	96	1	27	3	..	..	..	..	..	..	127	1	75·59	6
7	77	36	7	10	4	..	..	..	..	..	134	1	57·46	7
8	44	51	7	8	..	..	..	..	..	..	110	2	46·36	8
9	39	11	24	1	..	..	..	..	..	..	75	1	52·00	9
10	51	30	5	..	..	..	..	..	..	..	86	1	59·30	10
11	111	14	2	..	1	7	4	4	..	..	143	1	77·02	11
12	81	32	7	26	..	..	..	..	..	..	146	1	55·47	12
13	19	13	20	31	33	27	..	..	..	..	143	5	23·07	13
14	119	24	..	6	..	..	..	..	..	..	149	1	79·86	14
15	24	51	12	3	29	7	..	..	..	..	126	2	40·47	15

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
16	29	3	56	26	..	..	..	..	..	..	114	3	49·12	16
17	..	2	146	7	..	..	..	..	..	..	155	3	94·19	17
18	..	7	144	..	4	..	..	..	..	..	155	3	92·90	18
19	..	77	31	5	44	..	..	..	..	..	157	2	49·04	19
20	85	16	44	5	..	..	..	..	..	..	150	1	56·66	20
21	90	38	10	..	..	..	..	..	..	..	138	1	65·21	21
22	144	2	..	..	..	..	..	..	..	..	146	1	98·63	22
23	10	23	106	8	..	..	..	..	..	..	147	3	72·10	23
24	41	4	3	92	6	..	..	..	..	..	146	4	63·01	24
25	125	15	2	..	..	..	..	..	..	..	142	1	88·02	25
26	42	93	2	..	..	..	..	..	..	..	137	2	67·88	26
27	59	24	57	4	6	..	..	..	..	..	150	1	39·33	27
28	90	34	4	5	11	..	..	..	..	..	144	1	62·50	28
29	59	57	21	3	..	..	..	..	..	..	140	1	42·14	29
30	18	29	42	38	2	..	..	..	..	..	129	3	32·55	30
31	71	25	11	..	..	..	..	..	..	..	107	1	66·35	31
32	32	18	25	11	20	7	..	..	..	..	113	1	28·31	32
33	19	60	25	1	..	..	..	..	..	..	105	2	57·14	33
34	25	19	22	19	18	..	..	..	..	..	103	1	24·27	34
35	6	19	105	5	2	..	..	..	..	..	137	3	76·64	35

36	63	70	2	..	..	..	..	..	..	..	135	2	51·85	36
37	131	15	..	..	..	..	..	..	..	..	146	1	89·72	37
38	56	84	3	..	..	..	..	..	..	..	143	2	58·74	38
39	63	48	10	..	..	..	..	..	..	..	121	1	52·06	39
40	88	49	1	..	..	..	..	..	..	..	138	1	63·76	40
41	142	..	..	..	..	..	..	..	..	..	142	1	100·00	41
42	89	49	3	..	..	..	..	..	..	..	141	1	63·12	42
43	129	8	3	..	..	..	..	..	..	..	140	1	92·14	43
44	95	35	2	..	..	..	..	..	..	..	132	1	71·98	44
45	3	7	27	11	29	65	..	..	..	..	142	6	45·77	45
46	29	85	23	2	..	..	..	..	..	..	139	2	61·13	46
47	124	12	1	..	..	..	..	..	..	..	137	1	90·31	47
48	3	19	..	29	15	10	62	4	..	2	142	7	43·05	48
49	11	10	13	98	1	..	..	..	..	..	133	4	73·68	49
50	75	59	5	..	..	..	..	..	..	..	139	1	53·93	50
51	120	19	2	..	..	..	..	..	..	..	141	1	85·10	51
52	44	74	16	..	..	..	..	..	..	..	134	2	55·22	52
53	80	53	1	..	..	..	..	..	..	..	134	1	39·70	53
54	119	15	5	..	..	..	..	..	..	..	139	1	85·61	54
55	88	38	2	..	..	..	..	..	..	..	128	1	68·75	55
56	96	11	1	..	..	..	..	..	..	..	108	1	88·88	56
57	96	16	..	..	..	..	..	..	..	..	114	1	85·96	57

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No
58	122	7	2	..	..	..	..	..	..	..	131	1	93·12	58
59	5	7	5	111	1	..	..	..	..	..	129	4	86·04	59
60	115	9	..	..	..	..	..	..	..	..	124	1	92·74	60
61	66	..	31	32	1	..	..	..	..	..	130	1	50·76	61
62	2	38	91	7	..	..	..	..	..	..	138	3	65·94	62
63	26	107	3	..	..	..	..	..	..	..	136	2	78·67	63
64	24	106	4	..	..	..	..	..	..	..	134	2	79·10	64
65	107	21	3	..	..	..	..	..	..	..	131	1	81·67	65
66	82	39	8	..	..	..	..	..	..	..	129	1	63·56	66
67	106	5	14	4	..	..	..	..	..	..	129	1	62·17	67
68	47	26	37	4	..	..	..	..	..	..	114	1	41·22	68
69	10	34	36	1	9	39	3	..	..	..	132	6	29·54	69
70	31	81	14	2	..	..	..	..	..	..	128	2	63·28	70
71	48	8	31	20	15	9	3	..	..	..	134	1	35·82	71
72	27	104	5	..	..	..	:	..	..	..	136	2	76·47	72
73	120	5	..	..	..	..	..	..	..	..	133	1	96·24	73
74	90	25	10	8	2	2	..	..	..	..	137	1	65·69	74
75	62	24	29	1	..	..	..	..	..	..	116	1	53·44	75
76	86	32	1	..	..	..	..	..	..	..	119	1	72·26	76
77	14	37	77	1	..	..	..	..	..	..	129	3	59·68	77

78	40	10	65	2	..	..	..	..	..	..	117	3	55·55	78
79	125	5	..	..	..	..	..	..	..	..	130	1	96·15	79
80	44	63	24	4	..	..	..	..	..	..	135	2	46·66	80
81	58	53	4	..	..	..	..	..	..	..	115	1	50·43	81
82	23	87	6	..	..	..	..	..	..	..	116	2	75·00	82
83	34	6	84	4	1	..	..	..	..	..	129	3	65·11	83
84	29	14	89	2	..	..	..	..	..	..	134	3	66·41	84
85	26	4	102	..	..	..	..	..	..	..	132	3	77·27	85
86	4	37	71	2	18	4	..	..	..	..	136	3	52·20	86
87	124	7	1	..	..	..	..	..	..	..	132	1	93·93	87
88	115	9	1	..	..	..	..	..	..	..	125	1	92·00	88
89	77	59	2	..	..	..	..	..	..	..	138	1	55·79	89
90	62	74	2	..	..	..	..	..	..	..	138	2	53·62	90

GROUP J.

Educationists, Essayists, Poets, Novelists, Editors of etc.

No. questionnaire Sent .. 713

No. of Respondents .. 36

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
1	10	6	14	..	2	4	..	..	..	..	36	5	38·88	1
2	9	4	12	..	3	2	6	..	..	..	36	3	33·33	2
3	2	26	3	..	4	..	..	..	..	..	35	2	74·28	3
4	27	2	7	..	..	..	..	..	..	..	36	1	75·00	4
5	3	11	1	3	7	4	4	..	..	..	33	2	33·33	5
6	13	3	13	4	..	..	..	..	..	..	33	3	39·39	6
7	12	12	2	4	6	..	..	..	..	..	36	2	33·33	7
8	9	15	1	..	1	..	..	..	..	..	26	2	57·69	8
9	6	1	5	4	..	..	..	..	..	..	16	1	37·50	9
10	3	9	4	..	..	..	..	..	..	..	16	2	56·25	10
11	3	2	1	..	1	12	14	2	..	..	35	7	40·00	11
12	6	7	1	20	3	..	..	..	..	..	36	4	55·55	12
13	3	3	1	18	7	3	..	..	..	..	35	4	51·42	13
14	16	17	1	2	..	..	..	..	..	..	36	2	47·22	14
15	4	6	1	3	9	10	..	..	..	..	33	6	30·30	15
16	4	3	7	13	..	..	..	..	..	..	27	4	48·14	16

17	18	10	10	5	..	..	..	..	..	..	33	3	30·30	17
18	4	7	6	5	9	..	..	..	..	..	31	5	29·03	18
19	3	1	13	13	5	..	..	..	..	..	35	4	37·14	19
20	12	8	8	7	..	..	..	..	..	..	35	1	34·28	20
21	8	21	26	..	..	..	..	..	..	..	35	2	60·00	21
22	32	1	1	..	..	..	..	..	..	..	34	1	94·11	22
23	18	7	14	6	..	..	..	..	..	..	35	3	40·00	23
24	13	1	18	4	..	..	..	..	..	..	36	4	50·00	24
25	29	1	6	..	..	..	..	..	..	..	36	1	80·55	25
26	20	7	9	..	..	..	..	..	..	..	36	1	55·55	26
27	13	5	14	..	3	..	..	..	..	..	35	3	40·00	27
28	2	23	2	3	5	..	..	..	..	..	35	2	65·71	28
29	13	8	9	3	..	..	..	..	..	..	33	1	39·39	29
30	2	18	14	7	4	..	..	..	..	..	35	3	40·00	30
31	12	4	13	..	..	..	..	..	..	..	29	3	44·82	31
32	12	10	2	3	5	..	1	..	..	..	33	1	36·36	32
33	6	22	2	3	..	..	..	..	..	..	33	2	66·66	33
34	5	14	10	6	2	3	..	..	..	..	30	3	33·33	34
35	11	5	17	2	1	..	..	..	..	..	36	3	47·22	35
36	22	10	3	..	..	..	..	..	..	..	35	1	62·85	36
37	26	8	2	..	..	..	..	..	..	..	36	1	72·22	37
38	16	17	2	..	..	..	..	..	..	..	35	2	48·57	38
39	9	13	8	..	..	..	..	..	..	..	30	2	43·33	39

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
40	22	10	3	..	..	..	..	..	..	..	35	1	62·85	40
41	36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	36	1	100·00	41
42	21	15	..	..	..	..	..	..	..	..	36	1	58·33	42
43	22	7	7	..	..	..	..	..	..	..	36	1	61·11	43
44	20	8	3	..	..	..	..	..	..	..	31	1	64·51	44
45	..	1	9	2	6	18	..	..	..	..	36	6	50·00	45
46	3	21	8	2	..	..	..	..	..	..	34	2	61·70	46
47	32	2	1	..	..	..	..	..	..	..	36	1	88·88	47
48	..	3	..	6	8	..	8	3	2	5	35	7	22·85	48
49	5	4	5	17	2	..	..	..	..	..	33	4	51·51	49
50	14	14	6	..	..	..	..	..	..	..	34	2	41·17	50
51	28	5	3	..	..	..	..	..	..	..	36	1	77·77	51
52	12	14	10	..	..	..	..	..	..	..	36	2	38·88	52
53	18	11	7	..	..	..	..	..	..	..	36	1	50·00	53
54	18	10	8	..	..	..	..	..	..	..	36	1	50·00	54
55	21	10	5	..	..	..	..	..	..	..	36	1	58·33	55
56	29	1	2	..	..	..	..	..	..	..	32	1	90·62	56
57	31	2	..	..	..	..	..	..	..	..	33	1	93·93	57
58	31	4	1	..	..	..	..	..	..	..	36	1	86·11	58
59	1	7	4	21	2	..	..	..	..	..	35	4	60·00	59

60	31	5	..	..	..	..	..	..	..	..	36	1	86·11	60
61	8	1	14	9	3	..	..	..	..	..	35	3	40·00	61
62	..	17	15	3	..	..	..	..	..	..	35	2	48·57	62
63	11	21	3	..	..	..	..	..	..	..	35	2	60·00	63
64	12	21	3	..	..	..	..	..	..	..	38	2	58·53	64
65	26	9	..	..	..	..	..	..	..	..	35	1	74·28	65
66	28	6	1	..	..	..	..	..	..	..	35	1	80·00	66
67	19	7	6	3	..	..	..	..	..	..	35	1	54·26	67
68	15	15	..	3	..	..	..	..	..	..	33	2	43·43	68
69	2	4	8	2	6	11	2	..	..	..	35	6	31·42	69
70	14	18	..	4		..	..	..	..	..	36	2	50·00	70
71	5	2	11	7	7	4	2	..	..	..	36	3	30·55	71
72	9	22	4	..	..	..	..	..	..	..	35	2	62·85	72
73	31	1	4	..	..	..	..	..	..	..	36	1	86·11	73
74	14	9	3	4	..	4	..	..	..	..	34	1	41·17	74
75	10	10	4	6	..	..	..	..	..	..	37	2	33·33	75
76	16	15	5	..	..	..	..	..	..	..	34	1	47·05	76
77	5	5	24	1	..	..	..	..	..	..	33	3	72·72	77
78	16	4	11	..	..	..	..	..	..	..	31	1	51·61	78
79	29	4	1	..	..	..	..	..	..	..	34	1	85·29	79
80	19	11	3	2	..	..	..	..	..	..	35	1	54·28	80
81	10	10	6	..	..	..	..	..	..	..	26	2	36·48	81
82	7	19	7	..	..	..	..	..	..	..	33	2	57·57	82

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
83	9	1	22	1	..	..	..	..	..	..	33	3	88·88	83
84	12	6	14	3	..	..	..	..	..	..	35	3	40·00	84
85	5	4	25	..	..	..	..	..	..	..	34	3	73·52	85
86	..	12	13	2	9	..	..	..	..	..	36	3	36·61	86
87	37	1	4	..	..	..	..	..	..	..	33	1	90·90	87
88	26	3	4	..	..	..	..	..			31	1	83·87	88
89	27	11	4	..	..	..	..	..	..	..	35	1	57·14	89
90	17	14	5	..	..	..	..	..	..	..	38	1	47·22	90

GROUP K.

Officers in Non-educational Government offices and Autonomous Bodies.

No. of questionnaire sent . 154

No. of Respondents .. 32

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
1	4	5	18	1	2	2	..	..	..	..	32	3	56·25	1
2	9	1	13	2	5	..	2	..	..	..	32	3	40·62	2
3	3	26	2	..	1	..	..	..	..	..	32	2	81·25	3
4	25	5	1	..	..	..	..	..	..	..	31	1	80·64	4
5	4	2	3	5	7	6	..	..	..	..	27	5	25·92	5
6	18	1	8	..	..	..	..	..	..	..	27	1	66·66	6
7	16	11	3	1	1	..	..	..	..	..	32	1	50·00	7
8	10	14	4	2	..	..	..	..	..	..	30	2	46·66	8
9	14	3	5	1	..	..	..	..	..	..	25	1	60·66	9
10	10	10	4	..	..	..	..	..	..	..	24	2	41·66	10
11	6	3	1	..	..	8	10	4	..	..	32	7	31·25	11
12	2	8	1	21	..	..	..	..	..	..	32	4	65·62	12
13	3	..	2	16	9	2	..	..	..	..	32	4	50·00	13
14	12	19	..	1	..	..	..	..	..	..	32	2	59·37	14
15	5	11	3	2	4	3	..	..	..	..	28	2	39·28	15
16	8	1	7	8	..	..	..	..	..	..	24	4	33·33	16

Sl. No.	(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Sl. No.
17	3	5	24	..	..	..	..	..	..	..	32	3	75·00	17
18	3	19	6	2	2	..	..	..	..	..	32	2	59·37	18
19	2	6	13	11	..	..	..	..	..	..	32	3	40·62	19
20	13	7	9	3	..	..	..	..	..	..	32	1	40·62	20
21	12	17	3	..	..	..	..	..	..	..	32	2	53·12	21
22	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	100·00	22
23	3	14	12	3	..	..	..	..	..	..	32	2	43·75	23
24	13	..	1	17	1	..	..	..	..	..	32	4	53·12	24
25	31	1	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	96·87	25
26	22	8	2	..	..	..	..	..	..	..	32	1	68·75	26
27	7	8	15	1	1	..	..	..	..	..	32	3	46·87	27
28	12	11	1	8	..	..	..	..	..	..	32	1	57·50	28
29	19	7	4	..	..	..	..	..	..	..	30	1	63·33	29
30	[illegible]	11	9	2	6	..	..	..	..	..	30	2	36·66	30
31	17	4	8	..	..	..	..	..	..	..	29	1	58·62	31
32	14	9	1	4	2	...	1	..	..	..	31	1	45·16	32
33	7	20	3	..	..	..	..	..	..	..	30	2	66·66	33
34	7	9	7	2	3	1	...	..	...	..	29	2	31·03	34
35	4	10	17	1	..	..	..	..	..	..	32	3	53·12	35
36	16	15		..	..	..	..	..	..	..	31	1	51·61	36

37	26	6	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	81·25	37
38	9	23	..	..	..	..	..	..	..	..	32	2	71·87	38
39	14	16	2	..		..	..	..	..	..	32	2	50·00	39
40	25	7	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	78·12	40
41	32	..	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	100·00	41
42	14	18	..	..	..	..	..	..	..	..	32	2	56·25	42
43	29	2	1	..	..	..	..	..	..	..	32	1	90·62	43
44	25	3	2	..	..	..	..	..	..	..	30	1	83·33	44
45	..	..	9	3	4	16	..	..	..	..	32	6	50·00	45
46	3	16	8	3	..	..	..	..	..	..	30	2	33·33	46
47	27	2	3	..	..	..	..	..	..	..	32	1	84·37	47
48	..	3	..	9	6	1	11	2	..	..	32	7	34·37	48
49	1	3	6	18	2	.	..	..	..	..	30	4	60·00	49
50	17	12	3	..	..	..	..	..	..	..	32	1	53·12	50
51	28	4	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	87·50	51
52	12	13	6	..	..	..	..	..	..	..	31	2	41·93	52
53	22	9	..	..	..	..	..	..	..	..	31	1	70·96	53
54	27	5	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	84·37	54
55	22	6	1		..	..	..	..	..	..	31	1	70·96	55
56	31	1	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	96·87	56
57	30	..	2	..	..	..	..	..	..	..	32	1	93·75	57
58	29	3	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	90·62	58
59	..	6	3	21	2	..	..	..	..	..	32	4	65·62	59

Sl. No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Sl. No.
60	29	3	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	90·62	60
61	19	..	9	4	..	..	..	..	..	..	32	1	59·37	61
62	...	15	17	..	..	..	..	..	..	..	32	3	53·12	62
63	8	23	1	...	..	..	..	..	..	..	32	2	71·87	63
64	7	21	3	..	..	..	..	..	..	..	31	2	67·74	64
65	27	5	..	..		..	..	..	..	..	32	1	84·37	65
66	24	4	4	..	..	..	..	..	..	..	32	1	75·00	66
67	24	3	5	..	..	..	..	..	..	..	32	1	75·00	67
68	16	11	4	1	..	..	..	..	..	..	32	1	50·00	68
69	2	6	9	1	7	7	..	..	..	..	32	3	28·12	69
70	15	10	4	3	..	..	..	..	..	..	32	1	48·87	70
71	4	1	8	9	1	6	3	..	..	..	32	4	28·12	71
72	8	22	2	..	..	..	..	..	..	..	32	2	68·75	72
73	31	1	..	..	..	..	..	..	..	..	32	1	96·87	73
74	14	10	3	5	...	..	..	..	..	..	32	1	43·75	74
75	11	9	9	2	..	..	..	..	..	..	31	1	35·48	75
76	18	13	1	..	..	..	..	..	..	..	32	1	56·25	76
77	5	4	22	..	..	..	..	..	..	..	31	3	70·96	77
78	17	4	10	..	..	..	..	..	..	..	31	1	54·83	78

79	28	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	30	1	93·33	79
80	14	13	3	1	..	..	..	..	..	..	..	31	1	45·16	80
81	18	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27	1	66·66	81
82	10	19	2	..	..	..	..	..	..	..	..	31	2	61·29	82
83	15	3	13	..	..	..	..	..	..	..	..	31	1	48·38	83
84	10	6	14	1	..	..	..	..	..	..	..	31	3	45·16	84
85	9	2	20	..	..	..	..	..	..	..	..	31	3	64·51	85
86	..	14	11	1	4	1	..	..	..	..	..	31	2	45·16	86
87	30	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	31	1	96·77	87
88	22	4	1	..	1	..	1	..	..	..	..	27	1	81·48	88
89	19	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31	1	61·29	89
90	19	12	..	1	..	..	10	..	3	..	..	31	1	61·29	90

GROUP L.

Members of Parliament.

No. of questionnaire Sent....315.

No. of Respondents ... 29.

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
1	1	5	17	1	4	..	..	..	..	..	28	3	60·71	1
2	7	2	12	1	5	..	1	..	..	..	28	3	42·85	2
3	5	21	2	..	1	..	..	..	..	..	29	2	72·41	3
4	16	11	1	..	..	..	..	..	..	..	28	1	57·14	4
5	2	3	1	..	10	2	3	..	..	..	21	5	46·61	5
6	11	1	7	2	..	..	..	..	..	..	21	1	52·38	6
7	17	13	2	1	1	..	..	..	..	..	27	2	48·14	7
8	6	14	1	2	..	..	..	..	..	..	23	2	60·86	8
9	6	3	7	1	..	..	..	..	..	..	17	3	41·17	9
10	9	4	2	..	..	7	..	..	..	..	15	1	60·00	10
11	2	4	..	..	..	7	13	1	..	..	27	7	48·14	11
12	1	6	3	19	..	..	..	..	..	..	29	4	65·51	12
13	3	1	1	11	11	1	..	..	..	..	28	3-+4	39·28	13
14	17	11	..	1	..	..	..	..	..	..	29	1	58·62	14
15	5	11	3	1	5	2	..	..	..	..	27	3	40·74	15

16	7	1	4	9	..	..	..	..	..	..	21	4	42·85	16
17	2	8	17	..	..	..	..	..	..	..	27	3	62·96	17
18	8	13	5	2	1	..	..	..	..	..	29	2	44·82	18
19	3	4	10	10	1	..	..	..	..	..	28	4	35·71	19
20	19	4	3	2	..	..	..	..	..	..	28	1	67·85	20
21	17	7	5	..	..	..	..	..	..	..	29	1	58·62	21
22	27	1	1	..	..	..	..	..	..	..	29	1	93·10	22
23	3	3	20	3	..	..	..	..	..	..	29	3	68·96	23
24	9	..	..	18	2	..	..	..	..	..	29	4	62·06	24
25	25	3	1	..	..	..	..	..	..	..	29	1	86·20	25
26	16	10	3	..	..	..	..	..	..	..	29	1	55·17	26
27	10	4	12	2	2	..	..	..	..	..	29	3	41·37	27
28	10	17	2	..	..	..	..	..	..	..	29	2	58·62	28
29	1	5	8	..	..	..	..	..	..	..	28	1	53·57	29
30	2	9	11	5	1	..	.	.	.		28	3	39·28	30
31	17	8	2	..	..	..	..	..	..	..	27	1	62·96	31
32	10	9	1	4	1	1	..	..	..	..	26	1	38·46	32
33	4	20	1	1	..	..	..	..	..	..	26	2	76·92	33
34	4	3	13	2	4	1	..	..	..	..	27	3	48·14	34
35	3	3	18	3	2	..	..	..	..	..	29	3	62·06	35
36	10	18	..	..	..	..	..	..	..	..	28	2	64·28	36
37	25	3	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	69·28	37
38	9	18	2	..	..	..	..	..	..	..	29	2	62·06	38

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
39	13	6	6	..	..	..	..	..	..	...	25	1	52·00	39
40	20	8	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	71·42	40
41	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29	1	100·00	41
42	21	7	1	..	..	..	..	..	..	..	29	1	72·41	42
43	23	2	4	..	..	..	..	..	..	..	29	1	79·31	43
44	20	9	..	..	..	..	..	..	..	..	29	1	68·96	44
45	1	2	3	1	6	15	..	..	..	..	28	6	53·57	45
46	4	16	7	1	..	..	..	..	..	..	28	2	57·14	46
47	24	4	1	..	..	..	..	..	..	..	29	1	82·75	47
48	1	1	..	7	6	1	10	2	..	..	28	7	35·71	48
49	1	2	7	15	1	..	..	..	..	..	26	4	57·69	49
50	15	13	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	53·57	50
51	26	2	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	92·85	51
52	15	10	2	..	..	..	..	..	..	..	27	1	55·55	52
53	24	3	..	..	..	..	..	..	..	..	27	1	88·88	53
54	22	6	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	78·57	54
55	23	5	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	82·14	55
56	27	1	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	96·42	56
57	27	2	..	..	..	..	..	..	..	..	29	1	93·10	57
58	26	2	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	92·85	58

59	..	2	2	21	2	..	..	..	..	..	7	4	77·77	59
60	26	..	1	..	..	..	..	..	..	.	27	1	96·29	60
61	9	..	11	7	1	..	..	..	..	..	28	3	39·28	61
62	3	18	5	2	..	..	..	..	..	..	28	2	64·28	62
63	7	20	2	..	..	..	..	..	..	..	29	2	68·96	63
64	12	16	..	..	..	..	..	..	..	..	28	2	57·14	64
65	26	2	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	92·85	65
66	25	3	1	..	..	..	..	..	..	..	29	1	86·20	66
67	20	3	4	..	..	..	..	..	..	..	27	1	74·07	67
68	19	9	1	..	..	..	..	..	..	..	29	1	65·51	68
69	1	3	9	1	4	8	3	..	..	..	29	3	31·03	69
70	10	18	..	1	..	..	..	..	..	..	29	2	62·06	70
71	8	2	8	3	4	3	1	..	..	..	29	3	27·58	71
72	9	18	1	..	..	..	..	..	..	..	28	2	64·28	72
73	29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	29	1	100·00	73
74	13	9	3	3	..	1	..	..	..	..	29	1	44·82	74
75	10	9	8	2	..	..	..	..	..	..	29	1	34·48	75
76	20	7	..	..	..	..	..	..	..	..	27	1	74·07	76
77	11	3	14	..	..	..	..	..	..	..	28	5	30·00	77
78	15	5	7	2	..	..	..	..	..	..	29	1	51·72	78
79	24	3	1	.	..	..	..	..	..	..	28	1	85·71	79
80	9	11	7	1	..	..	..	..	..	..	28	2	39·28	80
81	11	14	2	..	..	..	..	..	..	..	27	2	51·85	81

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
82	7	21	..	..	..	..	..	..	..	..	28	2	75·00	82
83	13	1	13	1	..	..	..	..	..	..	28	5	46·42	83
84	13	3	9	4	..	..	..	..	..	..	29	1	44·82	84
85	5	1	20	1	..	..	..	..	..	..	27	3	74·07	85
86	2	6	13	2	6	..	..	..	..	..	29	3	44·82	86
87	26	2	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	92·85	87
88	23	3	1	..	..	..	..	..	..	..	27	1	85·18	88
89	16	12	..	..	..	..	..	..	..	..	28	1	57·14	89
90	17	10	1	..	..	..	..	..	..	..		1	60·71	90

GROUP M:

No. of questionnaire Sent .. .. 385.

No. of Respondents .. .. 98.

Miscellaneous (Not classified).

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Sl. No.
1	20	10	42	1	3	..	..	..	..	..	76	3	55·26	1
2	19	6	37	2	7	2	3	..	..	..	76	3	48·68	2
3	4	53	20	..	..	..	..	..	..	..	77	2	68·83	3
4	68	6	2	..	..	..	..	..	..	..	76	1	89·47	4
5	10	12	6	2	24	19	..	..	..	..	76	1	32·87	5
6	34	2	36	1	..	..	..	..	..	..	73	3	49·31	6
7	27	34	2	13	1	..	..	..	..	..	77	2	44·15	7
8	21	39	3	9	2	..	..	..	..	..	74	2	52·70	8
9	33	11	8	5	..	..	..	..	..	..	57	1	57·89	9
10	35	16	4	..	..	..	..	..	..	..	55	1	63·63	10
11	22	16	1	..	1	21	13	3	..	..	77	1	28·57	11
12	11	8	..	57	1	..	..	..	..	..	77	4	74·02	12
13	14	1	1	28	30	3	..	..	..	..	77	5	38·98	13
14	30	43	1	2	..	..	..	..	..	..	76	2	56·57	14
15	13	28	4	..	14	10	..	..	..	..	69	2	40·57	15

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total.	Max.	Per.	Serial No.
16	16	1	30	12	..	..	..	..	..	..	59	3	50·84	16
17	3	10	62	2	..	..	..	..	..	..	77	3	80·51	17
18	7	29	31	4	2	..	..	..	..	..	73	3	42·46	18
19	1	18	45	13	..	..	..	..	..	..	77	3	58·44	19
20	53	4	17	3	..	..	..	..	..	..	77	1	68·83	20
21	39	36	2	..	..	..	..	..	..	..	77	1	50·84	21
22	77	..	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	100·00	22
23	7	12	52	6	..	..	..	..	..	..	77	3	67·53	23
24	24	..	..	52	1	..	..	..	..	..	77	4	67·53	24
25	74	3	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	96·10	25
26	32	42	3	..	..	..	..	..	..	..	77	2	54·54	26
27	26	14	32	2	2	..	..	..	..	..	76	3	42·10	27
28	19	49	1	8	..	..	..	..	..	..	77	2	63·63	28
29	40	13	21	..	..	..	..	..	..	..	74	1	54·05	29
30	12	24	21	13	3	..	..	..	..	..	73	2	32·87	30
31	39	14	3	..	..	..	..	..	..	..	56	1	69·64	31
32	20	13	8	14	3	9	2	..	..	..	69	1	28·98	32
33	16	45	7	..	..	..	..	..	..	..	68	2	66·17	33
34	5	10	17	10	15	1	..	..	..	..	58	3	29·31	34
35	13	15	47	2	..	..	..	..	..	..	77	3	61·03	35

36	21	52	1	..	..	..	..	..	..	..	74	2	70·27	36
37	69	8	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	89·61	37
38	36	40	..	..	..	..	..	..	..	..	76	2	52·63	38
39	21	38	4	..	...	..	..	..	..	..	63	2	60·31	39
40	58	18	..	..	..	..	..	..	..	..	78	1	76·31	40
41	77	..	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	100·00	41
42	48	29	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	62·33	42
43	59	15	1	..	..	..	..	..	..	..	75	1	78·66	43
44	51	19	..	..	..	..	..	..	..	..	70	1	72·85	44
45	..	4	12	8	13	39	..	..	..	..	76	6	51·31	45
46	5	52	15	2	..	..	..	..	..	..	74	2	70·27	46
47	59	11	3	..	..	..	..	..	..	..	73	1	80·82	47
48	1	8	..	11	8	4	37	1	6	1	77	7	48·05	48
49	10	6	13	41	4	..	..	..	..	..	74	4	55·40	49
50	62	10	3	..	..	..	..	..	..	..	75	1	82·66	50
51	72	4	1	..	..	..	..	..	..	..	77	1	93·50	51
52	41	25	10	..	..	..	..	..	..	..	76	1	53·94	52
53	60	13	4	..	..	..	..	..	..	..	77	1	77·92	53
54	66	9	..	..	..	..	..	..	..	..	75	1	88·00	54
55	40	34	2	..	..	..	..	..	..	..	76	2	52·63	55
56	76	1	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	98·70	56
57	73	4	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	94·80	57

4-529

Serial No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Total	Max.	Per.	Serial No.
58	77	..	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	100·00	58
59	4	7	..	58	8	..	..	..	..	..	77	4	75·32	59
60	74	3	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	96·10	60
61	36	2	30	7	1	..	..	..	..	..	76	1	47·36	61
62	5	27	44	1	..	..	..	..	..	..	77	3	57·14	62
63	32	41	4	..	..	..	..	..	..	..	77	2	33·24	63
64	30	44	3	..	..	..	..	..	..	..	77	2	57·14	64
65	57	19	1	..	..	..	..	..	..	..	77	1	74·02	65
66	8	8	..	..	..	..	..	..	..	..	77	1	80·51	66
67	62	7	4	2	..	..	..	..	..	..	75	1	82·66	67
68	62	30	1	..	..	..	..	..	..	..	77	1	59·74	68
69	3	10	15	..	15	34	1	..	..	..	78	6	43·58	69
70	40	31	..	7	..	..	..	..	..	..	78	1	51·28	70
71	31	5	20	14	3	3	1	..	..	..	77	1	40·25	71
72	18	57	2	..	..	..	..	..	..	..	77	2	74·02	72
73	71	5	1	..	..	..	..	..	..	..	77	1	92·20	73
74	31	38	2	4	1	1	..	..	..	..	77	2	49·35	74
75	24	27	17	..	..	..	..	..	..	..	68	2	39·70	75
76	47	15	2	..	..	..	..	..	..	..	64	1	75·43	76
77	..	10	54	..	..	..	..	..	..	..	76	5	71·65	77

		4	23	1	..	..	..	..	..	..	70	1	60·00	78	
79	71	4	..	..	..	..	..	..	..	..	75	1	94·66	79	
80	31	40	6	..	..	..	..	..	..	..	77	2	31·94	80	
81	20	42	1	..	..	..	..	..	..	..	63	2	66·66	81	
82	30	44	2	..	..	..	..	..	..	..	76	2	57·89	82	
83	19	2	55	..	..	..	..	..	..	..	76	3	72·36	83	
84	25	15	35	2	..	..	..	..	..	..	77	3	43·45	84	
85	15	8	53	1	..	..	..	..	..	..	77	3	68·83	85	
86	6	11	49	2	7	..	..	..	..	..	77	3	63·63	86	
87	68	8	..	..	..	..	..	..	..	..	76	1	89·47	87	
88	59	6	2	..	..	..	..	..	..	..	67	1	88·05	88	
89	39	37	..	..	..	..	..	..	..	..	76	1	51·31	89	
90	45	31	1	..	..	..	..	..	..		77	1	58·44	90	

জবাব পত্রে ভিন্ন মত হিসাবে দেওয়া সুপারিশসমূহঃ

প্রশ্নমালার জবাবে ভিন্নমত হিসাবে কোন একটি বিশেষ সুপারিশ দানকারীর সংখ্যা সাধারণতঃ নগন্য। ভিন্ন মতের মধ্যে যেসব উল্লেখযোগ্য সুপারিশ পাওয়া গেছে তা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ক্রম সংখ্যা উল্লেখ করে নীচে দেওয়া হল:

প্রশ্ন-২। অবিলম্বে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা উচিত। (১২ জন)।

প্রশ্ন-৮। (ক) পাস ডিগ্রী কোর্স থাকার প্রয়োজন নেই এবং অনার্স ডিগ্রী ও ডিগ্রী উত্তর ২+২ বা ৩+১ বছরে হবে। (৫ জন)।

(খ) ডিগ্রীতে সবাই একই কোর্স পড়বে এবং নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বেশী নম্বর যারা পাবে তাদেরে ডিষ্টিংশন দিয়ে অনার্স দেওয়া হবে অনার্স প্রাপ্তরা ডিগ্রী-উত্তর কোর্স পড়বে। (৫ জন)।

প্রশ্ন-৯। (ক) পাস ডিগ্রী থাকবেনা এবং ৩+২ বা ৪+১ বছরে অনার্স ও ডিগ্রী-উত্তর কোর্স সম্পূর্ণ করা যাবে। (১০ জন)।

(খ) পাস/অনার্স ডিগ্রী এবং ডিগ্রী-উত্তর কোর্স ৩/৪+২/১ বছরে হবে। (২৮ জন)।

(গ) ডিগ্রীতে সবাই একই কোর্স পড়বে এবং যারা ভাল ফলের দরুন অনার্স পাবে তারাই শুধু ডিগ্রী-উত্তর কোর্স পড়তে পারবে। (৫ জন)।

প্রশ্ন-১০। (ক) পাস/অনার্স ডিগ্রী এবং ডিগ্রী-উত্তর কোর্স ৪/৫+২/১ বছরের মেয়াদে হবে। (৫৮ জন)।

(খ) অনার্স থাকবে না এবং ডিগ্রী ও ডিগ্রী-উত্তর কোর্স ৪+২ বছরে হবে। (৬ জন)।

প্রশ্ন-১১। সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে ১ম হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে। (১২ জন)।

প্রশ্ন-১৩। (ক) ইংরেজী সকলের জন্য ও মুসলিমদের জন্য অতিরিক্তভাবে আরবী। (১৫ জন)।

(খ) ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজী ও যে-কোন আর একটি। (৫ জন)।

প্রশ্ন-১৯। মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর ইহা চালু রাখতে হবে। (৪২ জন)।

প্রশ্ন-২০। প্রাথমিক শিক্ষা জেলাভিত্তিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগভিত্তিক অবিলম্বে বিকেন্দ্রিক করা প্রয়োজন। (৬ জন)।

প্রশ্ন-২১। একটি টেক্সটবুক বোর্ডের উপর সমস্ত দেশের জন্য প্রকাশনের দায়িত্ব দিয়ে বিতরণ ব্যবস্থাপনা বিভাগভিত্তিক করা। (৫ জন)।

প্রশ্ন-২৩। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য জেলাভিত্তিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বিভাগভিত্তিক। (১২ জন)।

প্রশ্ন-২৭। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নোট বই তৈরী না হয়ে শুধু সাহায্যকারী বই ব্যবহৃত হতে পারে এমন ভাবে নোট বই তৈরী হবে। (৫ জন)।

প্রশ্ন–২৮। কতিপয় বৃত্তির জন্য ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে। (৫ জন)।

প্রশ্ন–৩০। পেশার প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমা/ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা উচিত। (৬ জন)।

প্রশ্ন–৩১। ডিপ্লোমা কোর্স ফলপ্রসু কিন্তু ইহা আরও উন্নত করা দরকার। (২৫ জন)।

প্রশ্ন–৩৯। ক্যাডেট কলেজের প্রয়োজন নাই। (১২ জন)।

প্রশ্ন–৪৪। এল এল, বি, কোর্সের মেয়াদ ২ বছর এবং ডিগ্রী পাবার পূর্বে এক বছর শিক্ষানবিসরূপে প্রেক্‌টিস্‌ করতে হবে। (৫ জন)।

প্রশ্ন–৪৮। (ক) বহিঃপরীক্ষা হবে ৫ম শ্রেণী, ৮ম শ্রেণী, ১০ম শ্রেণী ও ১২শ শ্রেণীর শেষে। (৩ জন)।

(খ) বহিঃপরীক্ষা হবে ৫ম শ্রেণী, ১০ম শ্রেণী ও ১২শ শ্রেণীর শেষে। (১০ জন)।

প্রশ্ন–৪৯। (ক) জাতীয় চরিত্রের উন্নতির পূর্বে অন্তঃপরীক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে না। (২ জন)।

(খ) বহিঃপরীক্ষাকে মূল ধরতে হবে এবং অন্তঃপরীক্ষার ফল উল্লেখ করে সার্টিফিকেট দিতে হবে। (৬ জন)।

প্রশ্ন–৫২। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের উল্লেখসহ পাশ/ফেল উল্লেখ করতে হবে। (১১ জন)।

প্রশ্ন–৭২। মেধানুযায়ী বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীর আংশিক খরচ বৃত্তিস্বরূপ এবং ঋণ হিসাবে বাকী খরচ পাবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। (৩ জন)।

প্রশ্ন–৭৫। অনার্স ও সাবসিডিয়ারী বিষয়ের নম্বর পৃথকভাবে বিবেচনা করা উচিত। (৫ জন)।

বা:স:মু:–১৯৭৪/৭৫–১৪৮১–ভি–১৫ হাজার–১৫–৯–১৯৭৪।

F BANGLADESH

AFFAIRS AND SPORTS

ON

I SECRETARY

ADDITIONAL EDUCATIONAL ADVISER AND ADDITIONAL EDUCATION SECRETARY

VISER
RY

JOINT EDUCATIONAL ADVISER AND JOINT SECRETARY

JOINT EDUCATIONAL ADVISER AND JOINT SECRETARY

DEPUTY EDUCATIONAL

DEPUTY EDUCATIONAL

DEPUTY EDUCATIONAL ADVISER AND DEPUTY

DEPUTY EDUCATIONAL ADVISER AND DEPUTY

DEPUTY EDUCATIONAL ADVISER AND DEPUTY SECRETARY.

DEPUTY EDUCATIONAL ADVISER AND DEPUTY SECRETARY.